চরাচর

সম্পাদনা—

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

১৮ই আগষ্ট, ১৯৬৫

প্রকাশক
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

মা সারদা

....

সংস্কারমুক্ত অকুতোভয় অসামান্যা নারী

এক

মেঘলা দুপুরে যে ডাকপিওন দরজা আস্তো ফাঁক করে, মুখবন্ধ সাদা খাম ঘাসের ওপর ফেলে রেখে গেছে, আমি তাকে দেখিনি। হয়ত সে আমার নাম ধরে ডেকেছিল কয়েকবার। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়েছিল টুং টাং করে। তারপর কোনরকম সাড়া শব্দ না পেয়ে, মুখবন্ধ খামটিকে সাবধানে শুইয়ে দিয়ে গেছে ঘাসের বিছানায়।

রেলস্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে আমাদের এই অঞ্চলটা এখনও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। জমির দাম নাগালের বাইরে যায়নি। সবুজ গাছপালা আছে। পুকুর ডোবা এবং অনাবাদী চাষের জমিও আছে। পাখির ডাক, গরুর হাম্বা ডাক, শিশুর কান্না প্রকৃতির অঙ্গভূষণ হয়ে আছে। হাল ফ্যাসানের তিন চারটি বাড়ি, চায়ের গুমটি এবং একটি সাইকেল গ্যারেজ, অনুপ্রবেশকারীর মতো রেলস্টেশনের ওপার থেকে যেন হঠাৎই চুপিসারে এপারে এসে বেমানান কিন্তু সংকোচহীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইছে। বিশ বাইশ বছর আগে বাবা যখন এখানে জমি কিনে বাড়ি করলেন, প্রতিবেশী বলতে, আর্ট স্কুলের মাষ্টারমশাই অলোকেশবাবু, গ্যাঞ্জেস জুট মিলের বদলি শ্রমিক ছোটন মিস্ত্রি, রেলের ঠিকাদার রতনলাল আর দিন আনি দিন খাই চার পাঁচ ঘর নীচু জাতের মানুষ। বাবা বরাবরই একটু ভাবুক প্রকৃতির। এমন খোলামেলা চারপাশ, কোনরকম হৈ হট্টগোল নেই, বিছানায় শুয়ে শুয়েই সবুজ গাছ, পুকুরের টলটলে জল দেখা যায়, দূরে আবছা রেখার মতো টানটান শুয়ে সমান্তরাল দুটি রেল লাইন, ঋতুভেদে বিভিন্ন পাখির ডাক, চারপাশের এমন সমারোহ আয়োজনে বাবা এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রায়ই বলতেন, আমি মারা গেলে দাহ করবি না। এই বাড়ির বাগানে গর্ত করে আমাকে তার মধ্যে শুইয়ে দিস।

অবচেতনে বাবার হয়ত বিশ্বাস জন্মেছিল আবহমানকাল এখানকার প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বিন্যাস একইরকম থাকবে। রূপ রস বর্ণ গন্ধের মাত্রায় কোন হেরফের ঘটবে না। এমনকি মৃত্যুর পরেও আমার বাবার প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গুলি সে সবের স্পর্শ অনুভব করবে।

আমি যখন এইট থেকে নাইনে উঠলাম এবং স্কুলের পোশাক পাল্টে গেল জামা

থেকে শাড়িতে, বাড়ির আর কারোর চোখে নয়, শুধু বাবার চোখেই আমি রাতারাতি বড় হয়ে গেলাম। গোপন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, খুবই সাদামাটা কথা, বাবা আমাকে একান্তে ডেকে এমনভাবে বলতে লাগলেন, যেন আর ভাইবোনেদের সামনে সে সব কথা বলা যায় না বা বললেও তারা তার অর্থ বুঝবে না। বাবা একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নীচু গলায় থেমে থেমে বললেন, কোন নির্জন মেঘলা দুপুরে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে যদি কোন ডাকপিওন মুখবন্ধ একটি খাম, পাহাড় সমুদ্র বা ঘন অরণ্যের উচ্ছ্বাসে ভরা, আস্তো করে শুইয়ে রেখে যায়, ঘাসের ওপর, ঝরা পাতার ওপর, তখন ...! একটানে কথা বলার জন্যই হয়ত বা বুকের ভেতর তোলপাড়ানিটুকু সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না বলেই বাবা অল্পক্ষণ নিশ্চুপ অপলক তাকিয়ে ছিলেন আমার মুখের দিকে। আমি অস্ফুটে 'কী' বলামাত্রই বাবা হেসে ঘাড় দুলিয়েছিলেন,কী করবে তখন, মামন?

বাবাকে এভাবে কথা বলতে শুনিনি কোনদিন। শব্দ, তার ব্যবহার শৈলী, এমনকি বলার ভঙ্গীমায় অভিনবত্ব, এতটাই অচেনা যে আমি রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাবার সব কথার অর্থ বুঝতে না পেরেও দুম করে বলে বসলাম, কে পাঠাবে চিঠি?

সে কি ছাই আমিই জানি! বাবা অল্প হেসে বললেন।

বাবা হয়ত সত্যি জানতেন না, আমাদের ছন্দবিহীন গতানুগতিক দিনযাপনের আঙিনায় পাহাড় সমুদ্র বা নিবিড় অরণ্যের শিহরণ বয়ে নিয়ে কেউ আসতে পারে কিনা। এখন বুঝি বৈষয়িক ভাবনায় বাবা দীন ছিলেন যতটাই, কল্পনা বিলাসে ঠিক ততটাই লাগাম ছাড়া ছিলেন। আর কিভাবে যেন বুঝতে পেরে গেছিলেন, তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে কেবল আমার ভেতরে এইসব আহ্লাদী ভাবনা চিন্তার বীজ রোপণ করে দিতে পারলে, রক্তের ধারাবাহিকতায় আমার বাবার এইসব গোপন অপূরণীয় নস্টালজিক ভাবনা চিন্তাগুলি সযত্নে লালিত হবে।

আমার মা, ছোটবেলায় যেমন দেখেছি, আজও তেমনই। সব ব্যাপারেই উদাসীন, নিস্পৃহ। হলেও ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ চারপাশের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে এমন নিরাসক্ত রাখে কেমন করে, ভাবতেই অবাক লাগে। কোন বিষয়ে বাড়ির সকলে যখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে বা বেদনায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, মা তখন নির্ভুল গাণিতিক নিয়মে সাংসারিক কাজ করছে। কোন প্রশ্ন নেই। কৌতূহল নেই। অস্ফুটে 'ছিঃ' বা 'বাঃ' উচ্চারণটুকুও নেই। সব ব্যাপারে মায়ের এই আলগা গা-ছাড়া ভাব, বাবাকে নিশ্চয়ই খুব অবাক করত। কষ্ট দিত। একজন পুরুষ মানুষ তার

ভাব বিনিময়ের সঙ্গী হিসাবে স্ত্রীকে সবচেয়ে আপনার বলে মনে করে। এটাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি আড় আড় ছাড় ছাড় ভাব করে প্রতিমুহূর্তে এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, মামুলি সাংসারিক কাজকর্মের বাইরে অন্য কোন ঘটনার আবেগ বিষাদ লজ্জা বা ভয় কিছুই তাকে স্পর্শ করে না, যে কোন স্বামীর ক্ষেত্রেই সেটা কেবল দুঃখের নয়, দুর্ভাগ্যেরও। কিন্তু আশ্চর্য এ ব্যাপারে বাবার চোখে মুখে কোনদিন কষ্টের বা বিরক্তির ছাপ দেখিনি। ভাল বা মন্দের অনুভূতিটুকু বাবা একাই বহন করেছেন।

তারপর যেদিন জামার পরিবর্তে শাড়ির আবরণে নিজেকে ঢাকলাম, বাবার আর আমার মধ্যেকার দ্বিধা সংকোচের দূরত্বটুকু, বাবা-ই এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ভাব প্রকাশ, মত বিনিময় সব ব্যাপারে আমিই বাবার পরিপূরক হয়ে উঠলাম। এমনকি যত্নে লালিত গোপন আশা আকাঙ্খা বা অব্যক্ত ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাগুলিও বাবা অকপটে আমাকে বলতে লাগলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মতামত জানতে চাইতেন। আমি সব কথার থই পেতাম না। আলো আঁধারীর রহস্যময়তায় কিছু প্রতীকী শব্দ, কাল্পনিক কোন কোন ঘটনার ছবি আমার দেহ সত্তা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল যে, বাবার মতো আমিও ভাবতে শুরু করলাম, শেষ বিকালের আলো গায়ে মেখে ধোপদুরস্ত পোশাকের একজন সন্ন্যাসী হঠাৎ করে এসে আমার নাম ধরে ডাকবে। দুর্গম পাহাড়, অতলান্ত সাগর, দুর্ভেদ্য অরণ্যের গল্প শোনাবে আমায়। বিদায় বেলায় হেসে বলবে, ঘুমোবে তো সবাই। শুধু তোমাকেই ঘুমোনোর আগে আযোজন পথ পার হতে হবে।

একটি পেঁচার কথা বাবা আমাকে প্রায়ই বলতেন। বুক কাঁপানো দুরগুম দুরগুম আওয়াজ করে পেঁচাটি নাকি বাগানের ঝাঁকড়া পিয়ারা গাছটির ডালে বসে ডাকে মাঝরাতে। অবিকল 'কাছে আয়' 'কাছে আয়' ডাকটা নাকি এরকমই শোনায়। সে ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরোলে, আর নাকি ঘরেই ফেরা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে যৌবন কৈশোর ফেলে বাল্যের নদীটির পাড়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। সময় পেরিয়েও নদীটি নাকি একইরকম দেখতে আছে। এমনকি নদীর বুকে ভাসমান ডিঙ্গির মধ্যে বসে পরাণ বা রমজান মাঝি বহু বছর আগের মতো একই ভঙ্গীমায় মাটির উনুনে কাঠকুটো জ্বেলে মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে। বেসুরো গলায় গান গায়, কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি, তুমি হও কন্যা গহিন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।

ধোপদুরস্ত পোশাকের একজন সন্ন্যাসী এবং গহিন রাতের পেঁচার দুর্দমনীয় ডাকের প্রতীক্ষায় আমার দুচোখ এবং কান যখন উৎকর্ণ ক্লান্ত, ঠিক তখনই চালচুলোহীন অয়নের

আগমন আমাদের বাড়িতে। বাবার বন্ধু শেখরকাকুর ছেলে অয়ন, ভাগলপুরে মামার বাড়িতে মানুষ। সেখানে স্কুল জীবন শেষ করে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছে, বাংলায় অনার্স নিয়ে। চেহারায় জৌলুস নেই। পোশাকের ছিরিছাঁদ নেই। স্বভাবে লাজুক নয়। আবার বেপরোয়াও নয়। যে কোন বিষয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুক্তি তর্ক বা উপযুক্ত রেফারেন্সের অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে, লাজুক হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, ওই আর কি! কিন্তু ওর চোখ মুখের প্রতিক্রিয়ায় বোঝা যায়, বিপক্ষের যুক্তিতে ও হার স্বীকার করছে না। প্রয়োজনে থেমে যাওয়া, অপরাজিতের সৌজন্য, অন্যকে নিরুচ্চার উদারতা দেখানো, অয়নের বিশ্বাস এইরকম বা এর মধ্যে ও বিজাতীয় শ্লাঘা অনুভব করে।

যেমন আলাপের প্রথম দিনেই অয়ন মুহূর্তের একান্তে আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কবিতা লেখ? আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো। অয়ন দু ভ্রূ নাচিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করল, সে কি! যেন কবিতা না লেখা মহা অপরাধ। যেন আমার বয়সী যে কোন মেয়ের কবিতা লেখা একটি আবশ্যিক কর্তব্য। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ওর করুণা কিম্বা কৌতূহল জাগল মনে, ভাল কবিতা পড়? একটু থেমে বলল, কবিতা পড়তে ভাল লাগে? আমি ঘাবড়ে গেলাম। এ যেন রীতিমত জেরা। কোনরকমে বললাম, হ্যাঁ।

— 'যমুনাবতী সরস্বতী' পড়েছ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

— মণিভূষণের 'গান্ধীনগরে এক রাত্রি'? বা বিনয় মজুমদারের 'অঘ্রাণে অনুভূতিমালা'?

প্রথমে অস্ফুটে বললাম, না। তারপর সত্যি সত্যি রাগত গলায়, ও সব আমাদের স্কুলের বইয়ে নেই — বলে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই, অয়ন আস্তো করে বলল, তোমাকে আমি বই দিয়ে যাব। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এই সব লেখা পড়লে জীবনবোধই পাল্টে যাবে।

'জীবনবোধ' শব্দটি তখনও অব্দি আমার কাছে অপরিচিত। শব্দের জাল বুনে বাবা আমায় অনেক রঙিন অলীক মুহূর্তের গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু একটি মানুষের বড় হওয়ার সাথে সাথে যে কোন ঘটনার ন্যায় অন্যায়, ঠিক বেঠিক, ভাল মন্দের বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে, তার সত্তার নিজস্বতা গড়ে ওঠে, এই ধারণাটা অয়নই প্রথম মাথায় ঢুকিয়েছিল। ওর কিছু কিছু কথা গোলমেলে লাগত। যেমন ও বলত, উদারতা যে কোন ক্ষেত্রেই

খুব বড় জিনিস, কিন্তু তার জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে এবং অবশ্যই তা আপেক্ষিক। আমি বুঝতে না পারার অপরাগতায় ওর মুখের দিকে তাকালে ও হেসে বলত, জীবনটা আসলে শুধুই কবিতা নয়। আবার নিছক অঙ্কও নয়। হয়ত এর কোনটাই নয়। কিম্বা এই দুয়ের এক জটিল যোগফল। আর তাই উদারতা, নীচতা বা ক্রুয়েলিটি, স্থান কাল পাত্র বিশেষে একই ইনসটিংক্টের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, পরিমাপ।

অয়ন যখন এই ধরণের কথাবার্তা বলত, তখন ওর চোখমুখের চেহারাই বদলে যেত। আমার কেবলই মনে হত আমাকে বলবে বলেই ও এই সব জটিল জটিল কথাবার্তা সাজিয়ে গুছিয়ে, আমাদের বাড়ি আসবার আগে, পাঁচবার সাতবার মহড়া দিত মনে মনে। কখনও এমনও মনে হত ওর সমস্ত কথাবার্তা অসংলগ্ন, অন্তঃসারশূন্য। কেবলমাত্র শব্দের জাগলারি। কিন্তু তারপরেও বেশ বুঝতে পারছিলাম অয়নের এই সব দুর্ভেদ্য কথাবার্তাগুলির প্রতি আমার মোহ জন্মাচ্ছে। বিষয়ের গভীরে যাওয়ার জন্য আগ্রহ তৈরী হচ্ছে। এমনকি কিছুদিন পরে আগন্তুক সন্ন্যাসী বা মাঝরাতের পেঁচার ডাকের রহস্যময়তা, আমার কাছে সত্যি খুব হালকা এবং নিছক ফ্যান্টাসি বলে মনে হতে লাগল। আমি জানতে পারলাম না, বুঝতেই পারলাম না, ভাবনা চিন্তার সঙ্গী হিসাবে আমি বাবার থেকে কতটা দূরে এবং অয়নের কতটা কাছে চলে এলাম। এমন নয়, অয়নের প্রতি আমার অন্য কোন আকর্ষণ তৈরী হচ্ছিল। নির্ভেজাল আড্ডায় অয়নের জড়তা আছে। আমার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তায় অয়ন মোটেই স্বচ্ছন্দ নয়। বাড়ির বাইরে আমার পাশে পাশে দুপা চলতে গিয়েও অদ্ভুত গ্রাম্য সংকোচ বোধ করে। এমনকি আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে গিয়েও অয়নের চোখের পাতা কাঁপে না। অন্য কোন ছায়া ঘনায় না সেখানে। তারপরেও অয়নের উপস্থিতি আমায় উদগ্রীব করে রাখত। অয়নের মুখোমুখি আমি শিহরিত বোধ করতাম।

নাইন থেকে টেনে উঠলাম যখন, অয়ন আমায় একটি বই উপহার দিল। শঙ্খ ঘোষের কবিতার বই। প্রচ্ছদের ভিতরের পাতায় সবুজ কালিতে লেখা, 'দুই হাতে দুই মশাল দিও। শান্তিও চাই, অশান্তিও'। কোন উচ্ছ্বাস বা অব্যক্ত কোন যন্ত্রণার কথা লেখেনি অয়ন। তবু মনে হল বইটা কাউকে দেখানো যাবে না। বাবাকেও না। পড়তে বসার ছল করে, অঙ্কের খাতার আড়ালে, বইটির সমস্ত কবিতা পড়ে ফেললাম এক নিঃশ্বাসে। একসঙ্গে এতগুলি কবিতা এর আগে পড়িনি, অন্তর্নিহিত ভাবছন্দ ঠিকমত ধরতেও পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অনুভূতি হল। যার সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুই ভাললাগার অনুভূতি। শীর্ণকায়া নদী হেঁটে পার হওয়া বা বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে

বারান্দার টবের গাছটিকে ছুঁয়ে দেখা, এই জাতীয় অনুষঙ্গবিহীন ভাললাগা।

পরদিন অয়ন যখন জিজ্ঞেস করল, পড়েছ কবিতাগুলি? কেমন লাগল?

— ভাল। আমি কোন রকমে বললাম। অয়নের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সত্যি ভাল লেগেছে? আমি ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ।

— কবিরা সত্যি কথা বলেন। ঠিক কথা বলেন। কবিতায় সময়ের প্রতিফলন পাওয়া যায়। উচ্ছ্বাসে দুচোখ বন্ধ করে অল্প অল্প মাথা দোলাচ্ছিল অয়ন, সময়ের প্রয়োজনে কবিরা কলম ফেলে রাইফেল ধরতে পারেন। শান্তিও চান। আবার অশান্তিতে মেতে উঠতেও পারেন।

আমি চমকে উঠলাম। প্রচ্ছদের ভিতরের পাতায় সবুজ কালিতে কবিতার যে দুটি ছত্র লিখেছে অয়ন, তার মর্মার্থ তাহলে এই। বা এর কাছাকাছি কিছু। মুহূর্তের কালক্ষেপে আমি যেন অনেকটা পথ পার হয়ে গেলাম। সুতোর জটিল গিঁট, ভেবেছিলাম যা সহজে খোলা যাবে না, অয়ন কেমন অনায়াসে আঙ্গুলের যাদুকরী কায়দায় তা খুলে ফেলে বলল, এই দ্যাখ।

আমি কবিতা লিখতে শুরু করলাম গোপনে। অয়নের সঙ্গে কবিতা বিষয়ক আলোচনাতে হঠাৎ হঠাৎ এমন দুএকটি প্রশ্ন করে বসলাম যে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল। হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'পরাঙ্মুখ সবুজ নালি ঘাস'; রিজিডলি এর অর্থ বলতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, 'পারব না' বলতে পারার লজ্জায় অয়ন এতটুকু সংকুচিত হল না, পরিবর্তে আমার জানতে চাওয়ার আগ্রহে ওকে অনেক বেশী খুশি দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যে অয়ন নিজের সম্পাদনায় একটি ছোট পত্রিকা বের করল। নামটিও অদ্ভুত। 'কবিতা বিষয়ক'। প্রথম সংখ্যাটি আমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করল বাবাকে। বাবা তো রীতিমত হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। আর বারবার একই কথা বলতে লাগলেন, ভাবা যায়, এতটুকু ছেলে একা একটি পত্রিকা বের করছে! বাবার এই মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস আমার বেশ বাড়াবাড়ি মনে হল। অয়ন মোটেই এতটুকু দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। সাজানো গোছানো বা কবিতার গুণগতমানে পত্রিকাটিও এমন কিছু আহামরি নয়। কারণ অয়নের সৌজন্যেই আমি ইতিমধ্যে অনেক ছোট পত্রিকা দেখে ফেলেছি। পাতা উল্টে মন দিয়ে লেখাগুলিও পড়েছি। অয়ন লাজুক লাজুক মুখ করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন এমন বিশাল তারিফে সে রীতিমত অভ্যস্ত। কোনরকম প্রশংসা বা স্তুতি তাকে আর বিচলিত করে না।

মা এঘর ওঘর করছিল। দ্যাখ, দ্যাখ, অয়ন কি করেছে! বলে বাবা মায়ের হাতে পত্রিকাটি দিলেন। প্রচ্ছদে অয়নের নামটি দেখেই বোধহয় মা, অয়নের বই? বেশ হয়েছে। নির্লিপ্ত গলায় কোনরকমে এইটুকু বলে বইটি বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। অয়ন কী ভাবল কে জানে! আমার কিন্তু কষ্ট হল অয়নের জন্য। রাগ হল মায়ের ওপর।

সে রাতে অয়ন অন্যদিনের চেয়ে অনেকক্ষণ বেশী সময় ছিল আমাদের বাড়ি। সকলের সামনেই অকপটে আমায় বলল, ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে তুমিও আমার পত্রিকার কাজে যোগ দিতে পার। কোনও কোনও কথা অয়ন এমন বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করে, মনে হয় পৃথিবী ওলোট পালোট হয়ে গেলেও সেসব কথার কোনও নড়চড় হবে না। দায়বদ্ধতা ফুরোবে না। যেমন 'আমার পত্রিকার কাজ' যেন স্বদেশী আন্দোলন বা কোন অসাম্যের বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াই, এই ধরনের কৃতসঙ্কল্প সামাজিক একটি কাজ। যদিও মনে মনে বুঝলাম, ১৫/১৬ পৃষ্ঠার ছোট একটি পত্রিকা বছরে দুবার কি তিনবার প্রকাশিত হবে, সেই কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বানে রাতের ঘুম চলে যাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু সে রাতে সত্যি সত্যি ঘুম এল না। অকারণে যেমন মন খারাপ হয় কখনও কখনও, ঠিক তেমনি, কারণবিহীন আনন্দ। মনের ওপরতলে যার যুক্তিগ্রাহ্য কোন হেতু নেই। অনেকটা ঘুসঘুসে জ্বরের মতো। থার্মোমিটারে ধরা পড়ছে না।

পরদিন সকালে, হয়ত আমার চোখমুখে নিদ্রাহীনতার ছাপ লক্ষ্য করেই বাবা কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তোর কি শরীর খারাপ, মামন?

কই? আমি খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, না তো। আমার উত্তরটা বাবার মনঃপূত হল না বলেই বোধহয় আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন কিছু নিয়ে সারারাত ভেবেছিস বোধ হয়? এবারও 'না' বলতে গিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম মুখের মধ্যেটা শুকনো লাগছে। উচ্চারণও স্পষ্ট হচ্ছে না। বাবার মুখের থেকে মাথা নামিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। বাবা আমায় ইশারায় ডাকলেন। আমি বারান্দার সিঁড়ি পার হয়ে বাগানে বাবার পাশে পাশে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। দুজনেই নিশ্চুপ। কুয়োতলা পার হয়ে বাতাবী লেবু গাছটার গোড়ায় বাবা হঠাৎই বসে পড়লেন ঝুপ করে। আমায় বললেন, বোস এখানে। আমি বাধ্য মেয়ের মতো বাবার পাশটিতে বসলাম। বাবা কিন্তু অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে রইলেন। দিনের এই শুরুটায় আমাদের বাগানটার অন্য রকম রূপ আছে। গাছের পাতাগুলিকে বেশী সবুজ দেখায়। প্রথম সূর্যের আলোয় কুয়োতলার চারপাশে ঘাসের

ফাঁকে জমে থাকা জল কেমন স্ফটিকের মতো চকচকে মনে হয়। খুব কাছে বসে ডাকলেও পাখির ডাক আবছা কিন্তু বেশ সুরেলা শোনায় কানে। এমনকি আমাদের পোষা কুকুরটির ছোট ছোট লাফে উড়ন্ত পোকামাকড় ধরার পরিচিত দৃশ্যটিও মনে হয়, আজই প্রথম দেখছি। চারপাশের এইসব মনে রাখার মতো শব্দ এবং ছবি আমায় কিন্তু কোনভাবেই আকৃষ্ট করছিল না। বাবার নিশ্চুপ বসে থাকা প্রথমে উৎকণ্ঠা এবং পরে ভয় সৃষ্টি করল আমার মনে। বাবা কি আমার চোখমুখের অব্যক্ত অভিব্যক্তি ধরতে পেরে গেছেন ? নিদ্রাহীনতার কারণ আন্দাজ করতে পেরেছেন ? আমি যখন ভিতরে ভিতরে নিজেকে প্রস্তুত করছি, বাবা কিছু বলবে? এই জাতীয় কিছু বলব বলে, বাবা হঠাৎই আমার দিকে মুখ না ঘুরিয়েই স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, আমিও ভাবতাম মামন, জীবনে একটা দাগ রেখে যেতে হবে। একটু থেমে বললেন, আকাশ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে মামন, তবে সেটা নারকোল গাছের মাথা পর্যন্ত পৌঁছবে। তুমি একবার দৌড়তে শুরু কর, দেখবে অনেকেই তোমার পিছনে পড়ে যাচ্ছে।

আমিও ভাবি বাবা ...! এইটুকু বলা মাত্রই বাবা চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। চশমার ভিতরে বাবার বিস্ফারিত দু চোখ জুড়ে মুগ্ধতা। অপলক আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন অল্পক্ষণ। তারপর আমার অসম্পূর্ণ কথাটুকু যেন বুঝতে পেরে গেছেন, এমনি বিশ্বাসে আমার মাথায় নরম করে হাত বুলিয়ে দিলেন, তোমার সামনের দক্ষিণের দরজাটা খুলে গেছে মামন। সেখান দিয়ে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

বাবার এ কথায় আমি কিন্তু ধন্দে পড়ে গেলাম। দক্ষিণের দরজা বলতে বাবা একটা সম্ভাবনার কথা বলছেন, এটা আমি ধরতে পারলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি এমন কোন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে কিনা, কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। দক্ষিণের দরজাই বা কোথায় ? হাওয়ার মাতামাতিই বা কোথায় ? আমায় নিশ্চুপ দেখে বাবা আমার আর একটু কাছে সরে এসে যেন খুব গোপন কথা বলছেন, এমনি সাবধানে চারপাশ দেখে নীচু গলায় বললেন, অয়নের সঙ্গে পত্রিকার কাজে লেগে পড়। ও বেশ ডায়নামিক। তারপর আচমকা ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দৃষ্টিটাকে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, ও আমার একলব্য।

বাবার দিকে মাথা তুলে তাকাতে গিয়ে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি ধরা পড়ে গেলাম ? নাকি বাবাই আমায় ধরিয়ে দিলেন ? চিনিয়ে দিলেন ? পাহাড়ে সূর্যোদয়ের মতো আকাশের রং পালটে গেল চোখের পলকে, হালকা নীল থেকে গাঢ় হলুদ ছুঁয়ে গৈরিকে। প্রথমে অয়ন যেমন, আজ বাবা তেমনি একলাফে অনেকটা

পথ পার করে দিলেন আমাকে। কবিতার প্রেমে অবগাহন করতে করতে যেন হঠাৎই চোখ তুলে দেখলাম প্রেমের কবি, মোহন বাঁশী তমাল তরুমূলে। দ্বিধাহীন দুহাত বাড়িয়ে নির্ভীক বললাম, হাত ধরো, অয়ন।

সেদিন সন্ধ্যায় অয়নের আসার কথা আমাদের বাড়িতে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। আজ আমার কোন ভয় নেই। সংকোচ নেই। অয়নের সঙ্গে কথা বলার সময়ের হিসাব নেই। আজ আমি অয়নকে চোখের শাসনে ধমকাতে পারি। সবার সামনেই অনুযোগের কথা বলতে পারি অনুচ্চ ফিসফিসে গলায়। এমনকি বিদায়বেলায় অয়নের পাশাপাশি বাগান পার হয়ে গেট অব্দি যেতে পারি। যতক্ষণ না এগ্রিকালকাচারাল ফার্মের পাঁচিলটা পার হচ্ছে ও, আমি দরজা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ওর চলার পথের দিকে চেয়ে। গুটিকয় কথাকেই সারাদিন ধরে মনের মধ্যে সাজালাম, ক্রিয়া অব্যয় বিশেষণকে এগিয়ে পিছিয়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিমানী অনুযোগী এবং আহ্লাদী মুখের অভিব্যক্তি দেখলাম, নিজেরই। অকিঞ্চিতকর দুএকটি জিনিস, যেমন সরু লম্বা চিমনি সমেত তেলের বাতিদান, পুরনো আমলের হাতলওলা রংওঠা একটি কাঠের চেয়ার, দেওয়ালে ঝোলানো নিসর্গের একটি বিবর্ণ বাঁধানো ছবি, শাড়ির আঁচলে মুছলাম। এ দেওয়াল ও দেওয়াল, এ কোণ ও কোণ করে সেগুলিকে সাজাতে সাজাতে একসময় আপন মনেই বলে উঠলাম, হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। আমার পরের বোন তখন ঘরের মধ্যেই ছিল। আমাকে বলল, কী হচ্ছে না রে দিদি? চকিতে সম্বিত ফিরে পেলাম, গম্ভীর গলায় বললাম, কী আবার! পুরোনো জঞ্জাল দিয়ে ঘর সাজানো যায়? জায়গা পাল্টালে তো আর জিনিস পাল্টায় না।

সন্ধের পর বাথরুমে গা ধুতে গেলাম। সময়টা আশ্বিনের শুরু। বাতাসে অল্প গা শিরশিরানি ভাব। বাথরুমের জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তেই, দমকা বাতাসে যেমন ছিটকিনিবিহীন দরজা জানলা আছড়ে পড়ে, কখনও কাঁচ ভেঙে পড়ে ঝনঝন শব্দে, তেমনি আচম্বিতে আমার শরীর মন জুড়ে নিরুচ্চার ঝনঝন শব্দে অদ্ভুত তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ছেঁড়া কানির মতো চাঁদ আকাশের এক কোণে। জ্যোৎস্না নয়। জ্যোৎস্নার মতো। গা ছমছমে আলো আঁধারী। বাগানের ঝাঁকড়া গাছগুলির নীচে চাপচাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের বুক জুড়ে টিপটিপ করে জ্বলছে জোনাকী। দুধের পাতলা সরের মতো কুয়াশা নেমে আসছে আকাশ থেকে মাটির দিকে। আর সেই

কুয়াশা ভেদ করেও দূরে রেলস্টেশনের লাল আর সবুজ আলো দুটি দেখা যাচ্ছে। ক্ষীণ আবছা। থেমে থেমে একটি পাখি, নিঃসঙ্গ একাই ডেকে চলেছে। আমগাছের এ ডাল থেকে ও ডালে, সক্ষম জাল বেয়ে একটি বড়সড় মাকড়সা ধীর কিন্তু স্থির বিশ্বাসী পায়ে হেঁটে চলেছে। প্রকৃতির এমন সুচারু বিন্যাস আগে আমার চোখে পড়েনি। চারপাশে কোন ব্যস্ততা নেই। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই। শব্দের ভিড় নেই। এ যেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, জীবনে যা কদাচিৎ বা একবারই আসে, যখন জাগতিক চাওয়া পাওয়া, লোভ রিরংসাকে দুহাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা করা যায়। বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠল। দু চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। জল পড়ার ছরছর শব্দ ক্ষীণ হতে হতে একসময় অশ্রুত হারিয়ে গেল। তখন আমাদের বাড়ি, আশপাশের বাড়ি, গাছ গাছালিতে ভরা বাগান, দূরের রেলস্টেশন, অপসৃয়ান অন্ধকারের মতো ফিকে হতে হতে মুছে গেল দৃশ্যপট থেকে। চরাচর ছেয়ে গেল সবুজ তৃণভূমে। আর সেই মৌনী তৃণভূমে একা দাঁড়িয়ে আমি, অস্ফুটে তিনবার চারবার বললাম, আজ নয়, প্লীজ, আজ এসো না অয়ন।

মুখবন্ধ সাদা খামটি হাতে অনেকক্ষণ বসে আছি বিছানায়, চুপ করে। খামের ওপরে ইংরাজী ক্যাপিটাল অক্ষরে আমার নাম ঠিকানা লেখা। পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প এমনই আবছা যে প্রেরকের ঠিকানা বোঝা যাচ্ছে না। ইদানীং কোন ঘটনায় তেমন বিচলিত বোধ করি না, এমনকি কারোর মৃত্যু সংবাদেও চমকে উঠি না। হাতে ধরা খামটিকে খুলতে হবে এই ভাবনায়, ঠিক ভয় বা শিহরণ নয়, পাতা ওল্টালেই রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে, মন খারাপের এই ধরণের আশংকায় বই বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিই যেমন কখনও সখনও, ঠিক তেমনিভাবে নিজের মনেই গুনছি চার পাঁচ ছয় তের চোদ্দ পনের বা শেষ বিকেলের রোদ সরতে সরতে জবা গাছটির গোড়া ছোঁবে যে মুহূর্তে কিম্বা জ্যামিতিক ভঙ্গীতে নিদ্রিত কুকুরটি হঠাৎই ঘুম ভেঙ্গে ঘেউ ঘেউ শব্দে ছুটে যাবে পাঁচিলের দিকে, তখন সেই মুহূর্তে নখের আঁচরে একটানে ছিঁড়ে ফেলব খামের মুখটি। বাড়ির কেউ বুঝতে পারছে না খামটি হাতে নিয়ে নিশ্চুপ বসে আসলে আমি খেলা করছি, নিজের মনে। নিজের সঙ্গে।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুরে দু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। এখন হাওয়া বইছে। বেশ জোরে। আকাশের জমাট মেঘ হাওয়ার দাপটে সরে যাচ্ছে। নীল আকাশের বুক চিরে শেষ বিকালের রোদ এসে পড়েছে বাগানে, বারান্দার কোণে। কাজের মানুষ মাংগীলাল উবু হয়ে বসে আছে বারান্দায়। থেকে থেকেই মুখ হাঁ করে বড় করে শ্বাস টানছে। আপন মনে বিড় বিড় করছে। আমি জানি মাংগীলাল একটা কথাই বলছে

বারবার, সময়ে খপর পেলে কি আর পাইলে যেতে দিতাম। সাতকুলে মাংগীলালের কেউ নেই। কার খবর, পালিয়েই বা গেল কে, জিজ্ঞেস করলে বলে, সে একজন, চিনবেনি। ষোল সতের বছর বয়সে মাংগীলাল বিহারের মধুবনী জেলা থেকে প্রথমে জ্যাঠার বাড়ি কোন্নগরে, তারপর জ্যাঠা মারা যাওয়ার পর বছর দশেক হল আমাদের বাড়ি, ভাত কাপড়ের চাকর। ইদানীং বয়সের ভারে ভারি কোন কাজই করতে পারে না। তবু আছে। পুরোনো আসবাবের মতো। কালোপযোগী, ব্যবহারযোগ্য না হয়েও রয়ে গেছে।

আমি যদি এখন ডেকে বলি, মাংগীলাল, বল তো চিঠিটা কে পাঠিয়েছে? কি লেখা আছে চিঠিতে? মাংগীলাল প্রথমে হাঁ হাঁ করে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়বে। তারপর চোখ বড় বড় করে বলবে, এ চিঠি দাদাবাবু পাঠিয়েছে। আলবাৎ দাদাবাবু। চিঠিতে তোমার কথা লিখেছে।

অয়নকে মাংগীলাল দাদাবাবু বলত। ওর বিশ্বাস আমার নামে যত চিঠি আসে, সবই ওর দাদাবাবুর লেখা। প্রথম প্রথম মাংগীলালের এইসব কথায় খুব জোর পেতাম মনে। একটা অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মাত সত্যি সত্যি একদিন মুখবন্ধ খামে ভরে চিঠি পাঠাবে অয়ন। আজ কাল পরশু করতে করতে কত দিন কত মাস কেটে গেল, নিতান্ত হেলফেলায় লেখা দুচার ছত্রের একটি অকিঞ্চিতকর চিঠিও অয়ন পাঠায়নি। মাঝে মাঝে শেখরকাকু আসেন। তাঁর মুখে শুনতে পাই, বিলাসপুরে নতুন চাকরিতে অয়নকে নাকি এমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় যে নিজের বাড়িতেও সে নিয়মিত চিঠি লেখার সময় পায় না। শেখরকাকুর লম্বা চিঠির জবাবে, 'ভাল আছি, তোমরা ভাল থেকো' এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত উত্তর পাঠায়। দিন পনেরো আগে শেখরকাকু এসেছিলেন। যাবার সময় আমাকে কাছে ডেকে আস্তে করে বললেন, তোমাকে চিঠি লেখবার কথা বলে দিয়েছি অয়নকে, দেখবে এবার তোমায় চিঠি দেবে। ভুল হবে না।

আমার সারা শরীর রাগে দপ দপ করে উঠল। শেখরকাকু কি আমাকে এতটাই অপাংক্তেয়, দীন হীনবল বলে মনে করেন, যে তাঁর নির্দেশ মেনে নিতান্ত করুণাবশত অয়ন আমাকে একটি চিঠি পাঠাবে, আর সেই চিঠির প্রতীক্ষায় জগত সংসারের সব কিছু ভুলে, আমি নির্নিমেষ চেয়ে থাকব পথের পানে? সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, শেখরকাকুকে বেশ কড়া গলায় বলে দিই, আমার সঙ্গে কথা না বলে, আপনার ছেলেকে এসব লেখা উচিত কাজ হয়নি। আর আমিও কম ব্যস্ত নই। চিঠি এলে সেটা আদ্যন্ত পড়ে ওঠবার ফুরসৎ নাও পেতে পারি।

শেখরকাকু চলে যাওয়ার পরে এই কথাগুলিই আমি একাধিকবার আওড়েছিলাম মনে মনে। আর প্রতিবারই মনে হয়েছে, যা বলছি সত্যি কি তাই! নাকি নিজের বেদনা নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়, এই সীমাহীন লজ্জা, কষ্টকে আড়াল করবার জন্যই নিজের মতো করে নিজেকেই বোঝাচ্ছি, 'ইচ্ছে হল এই বলি, তাই বলি।' এইসব কাল্পনিক সংলাপে, এই যেমন মুখবন্ধ খামটি হাতে ধরে আপন মনে গুনতে গুনতে দুশো ছাব্বিশ, সাতাশ, ... পঁচাত্তর, দুশো আশির সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছি, দু কান উৎকর্ণ করে রেখেছি 'ঘেউ ঘেউ' ডাক শোনার জন্য, অপলক চেয়ে আছি বিকেলের মরা রোদ জবা গাছটিকে ছুঁয়ে ফেলবে কখন ঠিক কোন মুহূর্তে, আমি চক্ষের পলকে খামটি ছিঁড়ে ফেলে ...!

কেউ কি ডাকল, মামন বলে? ও নামে এখন কেউ তো আমায় ডাকে না। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনেছি, 'মামন' বলে কে যেন ডাকল আমায়। আমার সারা শীরর কেঁপে উঠল থরথর করে।

আজ মেঘলা দুপুরে ডেকে ডেকে সারা না পেয়ে ডাকপিয়ন মুখবন্ধ সাদা খামটি বাগানে ফেলে দিয়ে গেছে। বাবা অবিকল এই রকমই বলতেন, মুখবন্ধ একটি খাম, পাহাড় সমুদ্র বা ঘন অরণ্যের উচ্ছ্বাসে ভরা, ঘাসের ওপর, ঝরা পাতার ওপর আস্তো করে শুইয়ে দিয়ে যায় যদি কোন ডাকপিয়ন! ... কী, কী করবে তখন, মামন?

বাবা জানতেন না, সত্যি এমনভাবে এই জাতীয় চিঠি আদৌ কোনদিন আসবে কিনা! স্বপ্নের এমন নিখুঁত বাস্তবায়ন বাবার কল্পনায় ছিল না। আমিই কি কোনদিন, এমনটি হতে পারে, ভাবতে পেরেছিলাম? আজ দুপুরে আকাশ মেঘলা ছিল। চারপাশও সুনসান ছিল নিশ্চয়ই। ডাকপিয়নও ডেকেছে আমার নাম ধরে, নিশ্চয়ই তিনবার চারবার বা তারও অধিক। পরে দোব, এমন কিছু না ভেবে খামটিকে বাগানের দরজা আস্তো ফাঁক করে, ঘাসের ওপর, ঝরা পাতার ওপর ...!

আমি আর ভাবতে পারছি না। বেশ বুঝতে পারছি উত্তেজনায় আমার পা দুটি দুর্বল লাগছে। হাতে ধরা খামটি কাঁপছে তিরতির করে। পরিচিত দৃশ্যপট চোখের সামনে কেমন আবছা হয়ে যাচ্ছে। এখনি এই মুহূর্তে আমায় খামের মুখটি খুলে ফেলতে হবে। সাগর পাহাড় বা অরণ্যের উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে, কালির আঁচরে সাদামাটা কোনও খবরও থাকতে পারে সেখানে। আর যদি এই দুয়ের বাইরে খামটির মধ্যে হালকা সবুজ বা ফিকে গোলাপী একটি পাতায়, কোন সম্বোধন নেই, প্রেরকের নামটি পর্যন্ত নেই, ঠিকানাবিহীন, সন তারিখ শূন্য, রঙিন পাতাটির বুক জুড়ে স্পষ্ট অক্ষরে শুধুই কয়েকটি ছত্র লেখা —

শরীর থেকে শীতের বাকল
শহর গেছে খুলে
মাথার ওপর ছড়িয়ে গেছে হাঁস।
ঠিক তখনই সৌরধূলায়
অন্ধ বলেছিলাম
এই গোধূলী অনন্ত সন্ন্যাস।

....

দু হাত দিয়ে ধরেছিলাম
রইল না তো তবু,
হাতেই কোন ভুল ছিল কি তবে!

উচ্ছ্বাসের ঘনঘটায় কেউ কি মূর্ছা যায়? নাকি চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন করে, আমিও সেইভাবে ছিন্ন খামটি অন্যমনস্ক হাতে ধরে আপন মনেই বলব, জীবন গিয়েছে চলে, আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার।

নাকি দ্রুত ঘরে ফিরে চৌকির নীচু বিছানায় কোল বালিশ বুকে নিয়ে মনোযোগী ছাত্রীর মতো, গভীর অভিনিবেশে, যেন একটি অক্ষরও ছোট বড় না হয়ে যায়, একটি লাইনও বেঁকে না যায়, স্পষ্ট অক্ষরে বড় বড় করে লিখব :

মানুষের মৃত্যু হলে
তবুও মানব থেকে যায়।

মন হল গেরস্তর ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি, তুমি প্রায়ই বলতে। রাগ দুঃখ অভিমান, সৃষ্টির এই আদি বীজগুলি সাবধানে আগলে রাখতে হয়। ন্যাতাক্যাতার হাঁড়িতে যেমন শসার বীজ, সমুদ্রের ফেনা, চন্দন মাটি, কাপড়ের মোড়কে সাবধানে তুলে রাখে বাড়ীর কর্ত্রী। হাঁটতে হাঁটতে আজ আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি ভাবতেই পারবে না। কোন অলীক ভাবনা এখন আর আমায় পুলকিত করে না। বিচলিত করে না। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, আজ আমি এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি বা জড়িয়ে ফেলছি নিজেকে প্রতিমুহূর্তে যে, ক্ষোভ দুঃখ অভিমান এই জাতীয় নমনীয় অনুভূতিগুলির সঙ্গে আজ আমার দ্রোহিতা। তারপরেও যেমন পুরোনো অসুখ, পুরোনো প্রিয় কোন গানের কলি অসতর্ক মুহূর্তে ঘাই মারে শরীরে, বুকের মধ্যে, মুখবন্ধ খামটি কিছু সময়ের জন্য আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ঠিক তেমনিভাবে। এখন আমি যা বা যে ধরণের কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে

নিয়োজিত করেছি, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও বেশী বিশ্বস্ত, সিনসিয়ার করার চেষ্টা করছি, ফেলে আসা দিনগুলির ভাবালুতায়, কাব্যিক অনুষঙ্গে, নিজের অবস্থান এবং সেইসব কাজকর্মগুলিকে হয়ত আরও কিছু ঘন্টা বা কয়েকটা দিন বিস্মৃত হতাম, যদি না ঠিক এই মুহূর্তে প্রিয়লাল একরকম হন্তদন্ত হয়ে এসে ডাক দিত, নীরুদি, এখুনি একবার যেতে পারবেন, আমাদের বস্তিতে?

দৌড়ে আসার ধকলে প্রিয়লাল রীতিমত হাঁফাচ্ছিল।

আমি বললাম, কেন, কী হয়েছে?

— চলুন না। প্রিয়লাল শসব্যস্ত গলায় বলল, নয়নচাঁদকে আটকান যাচ্ছে না। মার খেতে খেতে ওর বউটা মরেই যাবে।

— ইস! অজান্তেই আমার বুকের মধ্যে থেকে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এল, চল, আমি এখুনি যাচ্ছি।

প্রিয়লাল বড় বড় পা ফেলে একরকম ছুটছে। আমি কি পারি অত জোরে দৌড়োতে? আমাদের দুজনের মধ্যেকার দূরত্বটা ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে। চীৎকার করে বললাম, তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি। হঠাৎ খেয়াল হল মুখবন্ধ খামটি হাতেই ধরা রয়েছে। এখন আমার বুকের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন নয়, কান্নার শব্দ আছড়ে পরছে। চোখের পর্দায় শ্বেত শুভ্র পাহাড় বা নিবিড় সবুজ অরণ্যের পরিবর্তে রাগী হিংস্র একটি মুখের পাশাপাশি অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত দুটি চোখের ছবি। মুখবন্ধ সাদা খামটিকে ভাঁজ করে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। সমুদ্র পাহাড় এবং অরণ্যের মহিলারী বিভাব, অনতিক্রম্য ডাক, আপাতত নেপথ্যে থাক।

দুই

খানাখন্দ বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল নয়নচাঁদ। গলায় ঝোলানো গামছায় আচমকা হ্যাঁচকা টান। নয়নচাঁদ চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ক্যালেন্ডারের ছবিতে যেমন দেখা যায়, ঠিক সেইভাবে সমুদ্র মন্থনের বিকটাকার দৈত্যের মতো আরোহী, চিটচিটে গামছাটা ধরে টানছে প্রাণপণে। নয়নচাঁদ লাফ দিয়ে সিট থেকে মাটিতে নামল। একপ্রান্ত টানশূন্য হয়ে যাওয়ায়, আরোহীও টলমল করতে করতে ঝপ করে পড়ল রিক্সার ফুটবোর্ডে। নয়নচাঁদ সময়মত ধরে না ফেললে ঘাড় মুখ গুঁজরে মাটিতেই পড়ত। বুক পেটের ওপর দিয়ে রিক্সার চাকা চলে যেত। অন্য যে কেউ হলে ঘাবড়ে তো যেতই,

ভয়ও পেত। আবার তেমন মাথাগরম লোক হলে আরোহীকে দুচার ঘা লাগিয়েও দিত। রাত বিরেতের লাইন বাজারের প্যাসেনজারদের, নয়নচাঁদের মতো হাড়ে মজ্জাতে কেউ চেনে না। রাত দশটা না বাজতেই দু নম্বর গেটের মোড় সুনসান ফাঁকা। কিশোরীলালের সেলুন, বুড়োর পান বিড়ির গুমটি, মিশিরজির চায়ের দোকান, নবাব টেলার্স, সব নটা বাজতে না বাজতেই বন্ধ। খদ্দেরপাতি না থাকলে মিছিমিছি বাল্বের কারেন্ট বা হ্যারিকেনের তেল পুড়িয়ে লাভ কি? ভূতবাগানের সাট্টার শেষ খবর আসে সাড়ে আটটা নাগাদ। তখন কিছুক্ষণের জন্য একটু হৈ চৈ হয়। মিশিরজির দোকান ঘরের পিছনে বাংলা মদের বোতল বিক্রি হয়। মিসিরজির দ্বিতীয় পক্ষের বউ সুরিয়া এই কারবারটা চালায়। সুরিয়ার বয়স কম। স্বাস্থ্যটাও আটসাঁট। পায়ে তোড়া পড়ে। নাকে নথ ঝোলায়। হাঁটলে ঝুমুর ঝুম করে আওয়াজ হয়। কুপীর আলোতে নথে জেল্লা মারে। তাতে মুখখানা ঠাকুর ঠাকুর দেখায়। সুরিয়া হাতে ধরে গেলাস এগিয়ে দিলে, 'না' বলতে পারার মত হিম্মতওলা এ তল্লাটে একজনও নেই। অমন যে বদমেজাজী লালটুবাবু, সাট্টার কিং, সেও নাকি সুরিয়ার ট্যারাব্যাঁকা সব কথাতেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। কামারশালার হানিফ গল্প করেছিল নয়নচাঁদের কাছে, রঙ্গ তামাসার কথা বলতে বলতে সুরিয়া নাকি একদিন ঠাস করে চড় মেরেছিল লালটুবাবুর গালে। ঠেকের সবাই এমন ভয়ে পেয়ে গেছিল যে মাটি থেকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। পাতা খসে পড়লে তার আওয়াজ শোনা যাবে, এমনি নিশ্চুপ কেটেছিল কয়েক মুহূর্ত। লালটুবাবুর মুখখানা তখন কেমন দেখতে হয়েছিল কেউ ভাল করে দেখেনি। কিন্তু ঠেকের নীচু দরজাটার কাছে গিয়ে যখন সে শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে মাথা নামিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লম্বা করে শ্বাস ফেলেছিল, সে আওয়াজ সবাই শুনতে পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়ার রকমফের নিয়ে অনেকে অনেক রকম ভেবেছিল। মাঝরাতে মিশিরজির দোকান ঘর জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। আধবুড়ো মিশিরজি ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হয়ত আর ঘরেই ফিরবে না। আর তা না হলে পুলিশ এসে বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে মিশিরজির দোকান, মদের ঠেক ভেঙ্গে তছনছ করে দেবে। দিনদুপুরে সুরিয়ার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুলবে জালঘেরা কালো গাড়িতে। থানা পুলিশের সঙ্গে লালটুবাবুর ভীষণ দহরম মহরম। লালটুবাবু কচ্চিৎ কোনদিন থানায় গেলে, মেজবাবু ছোটবাবু সব চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বিহারী পুলিশ কনস্টেবল খৈনী বানিয়ে দেয় লালটুবাবুকে। আর কে না জানে, যাবতীয় অপকর্ম ঘটাতে এবং ঢাকা দিতে পুলিশের তুল্য কেউ নেই।

আদপে কিন্তু কিছুই হল না। যার যা ভাবনা, তার তার কাছেই রয়ে গল। মিশিরজির

চায়ের দোকান থেকেই লালটুবাবু লেবুলিকার চা খেতে লাগল। সুরিয়াও পায়ে তোড়া, নাকে নথ ঝুলিয়ে মক্ষিরাণী হয়ে ঠেক চালাত লাগল। গল্পটা ভালরকম চাউর হয়ে গেছিল। আর তাই আড়ালে আবডালে সুরিয়া আর লালটুবাবুকে ঘিরে আরও কিছু গল্প তৈরী হল। দু-চারজন অবশ্য, তাদের মধ্যে নয়নচাঁদও একজন, একটু অন্যরকম কথা বলল, সুরিয়া ঠিক জেনানা নয়, জেনানার বেশধারী হুরীপরী। ফিনফিনে জ্যোৎস্নার রাতে সুরিয়া মিশিরজিকে সোহাগ করে ঘুম পাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পায়ের তোড়া, নাকের নথ সব খুলে রেখে যায় ঘরের মেঝেতে। এমনকি পরণের শাড়িটিও। মাথার লম্বা বেণী খুলে ফেলে। কালো চুলের ঢল পিঠ ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে আসে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সুরিয়া জোড়া ঝিলের মাঝের সরু রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সিঙ্গি বাগান পর্যন্ত চলে যায়। ট্রেনের হকার গণেশ, চোর মাতন, এমনকি প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার দীননাথবাবু, তিনজনেই সুরিয়াকে দেখেছে জ্যোৎস্নারাতে সিঙ্গি বাগানের দিকে যেতে। অনেক চেষ্টা করেও, পিছন থেকে পাশ থেকে, সুরিয়ার মুখ দেখতে পায়নি তিনজনের কেউই। দিনের আলোতেই সিঙ্গি বাগানের ভূতুড়ে চেহারা। গা ছমছমে অন্ধকার। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে মাটি। কালেভদ্রে পাঁচঘরার গিধন সাঁওতাল তিন চারজন সঙ্গীসাথী নিয়ে তীর ধনুক আর ক্যাঁচা হাতে সিঙ্গি বাগানে ঢোকে, মেটে ইঁদুর, ঢ্যামনা সাপ বা লোমশ ভাম শিকার করতে। বাগানের মাঝ বরাবর একটি পুকুর আছে। শ্যাওলা আর বুনোজ লতাপাতায় পুকুরের জল ঢাকা পড়ে গেছে। একবার পুকুরের চারপাশে নরম মাটিতে পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিল গিধন আর তার সঙ্গী সাথীরা। ঠিক যেন কোন একজন মানুষ পুকুরটাকে প্রদক্ষিণ করেছে। সূর্যের আলোর অভাবে ছাপগুলি জীবন্ত সতেজ। সেদিন এই পুকুর পাড় থেকেই গিধন মেটে সিঁদুর রংয়ের বড় একটি টিপ এবং ফুলছাপ ব্লাউজ কুড়িয়ে পেয়েছিল। তামাম অঞ্চলে একমাত্র সুরিয়াই মেটে সিঁদুর এবং ঐ রংয়ের টিপ পড়ে কপালে। কোন সুস্থ মানুষ, তা সে যত সাহসীই হোক না কেন, রাতের বেলায় সিঙ্গি বাগানের ভেতরে ঢোকবার কথা ভাবতেই পারে না। সুরিয়া নিশ্চয়ই আর পাঁচ জন মানুষের মতো নয়।

অশরীরী কোন আত্মা মানুষের চেহারা ধরে, মিশিরজির বিবি সেজে, সংসার করছে, মদের ঠেক চালাচ্ছে। ঠেকের পুরুষ মানুষগুলোকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে শান দেওয়া চোখের চাউনিতে, বিষ মাখানো হাসিতে। লালটুবাবুর মতো ডরপকহীন মানুষ তাই সুরিয়ার চড় থাপ্পড় খেয়ে দপ করে জ্বলে ওঠার পরিবর্তে ভিজে চুপসে এতটুকু হয়ে কোনরকমে ঠেক ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।

এই ঘটনার পর থেকে সুরিয়া সম্পর্কেনয়নচাঁদের একটা অদ্ভুত ভীতি। ভয়ের কথাটা সে কারোর কাছে প্রকাশ করে না। পথে ঘাটে সুরিয়ার মুখোমুখি হলে সে রীতিমত সিঁটিয়ে যায়। সুরিয়ার বিদ্যুৎ চমকানো শরীর বা ঢলঢলে মুখ, কোন কিছুই আর তখন তাকে টানে না। সে কোনরকমে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নয়নচাঁদ গরীবগুর্বো মানুষ। রিক্সা টেনে গুঁজরে গাঁজরে দিন চালায়। রাতের বেলায় বাড়ি ফেরার পথে ভাঙ্গা ঠাকুর দালানের পিছনে বসে নন্তে দিলু মহাদেবদের সঙ্গে হাল্লাগুল্লা করতে করতে দু টাকায় এক গেলাস চোলাই পেটে পড়লেই তার ফূর্তির অন্ত থাকে না। সুরিয়ার ঠেকে বেশী পয়সার মদ গিলে মস্তি করতে যে সব লোকগুলি ঢোকে এবং বেরোয়, নয়নচাঁদ তাদের দিকে করুণার চোখে তাকায়। কোন কোন দিন তার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসে লোকগুলির কথা ভেবে। বেচারীরা জানে না সুরিয়া কেবল ওদের পকেটেই থাবা বসাচ্ছে না, শরীরের ভেতরের সার পদার্থগুলোও শুষে নিচ্ছে। তারপর যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে কষের দুপাশের তীক্ষ্ণ দাঁত আর চোখের আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে জানে প্রাণে শেষ করে দেবে। আজ না হোক কাল। কারোর দুদিন আগে। কারোর চারদিন পরে। লালটুবাবুর মতো শক্ত কলজের লোক এক-আধজনই থাকে, যে কোনরকমে টাল সামলে জলজ্যান্ত ফিরতে পারে।

আজও নয়নচাঁদ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল লাস্ট প্যাসেনজার এই মাতাল বাবুটিকে লাইন বাজারের মুখে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে ভাঙ্গা ঠাকুরের দালানের পিছনে। সেখানে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে খিস্তিখেউর, ঝগড়াঝাঁটি মায় ছোটখাট ঠেলাঠেলি এইসব করতে করতে সুরুৎ সুরুৎ করে গেলাসে চুমুক মারবে, আর বেশ বুঝতে পারবে প্রথমে মাথায় তারপর সারা শরীর জুড়ে অবশ ঝিনঝিনানি আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে। তখন কান্না হাসি আপনিই বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইবে। হাত পা চোখ একটু ভারি ভারি লাগবে। কিন্তু হাঁটতে চলতে কোন কষ্ট হবে না। বরং রিক্সার সিটে বসে প্যাডেলে চাপ দিলেই গায়ে একটু হাওয়া লাগবে। তাতে মাথার ভার হালকা হয়ে যাবে। কান্নাহাসির গুড়গুড়ুনি সব মিলিয়ে যাবে। গলায় গান আসবে। ছুই বিস্তির মোড়ে দাঁড়িয়ে নয়নচাঁদ একদিন সিট থেকে নেমে ওস্তাদ গাইয়েদের মতো একহাতে কান চেপে ধরে অন্য হাত আকাশের পানে উঁচু করে তুলে ধরে 'দিল মেরা এক আশকা পনছী' এই একটি লাইন পাঁচবার ছবার গেয়েছিল। তার গলায় যে এত ভাল সুর আছে, সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছিল। তারপর গান গাইতে গাইতে আপন খেয়ালে রিক্সা চালিয়ে যতক্ষণ না বাড়ির

দোড়গোড়ায় পৌঁছেছিল, রাতচরা কুকুরের দল পর্যায়ক্রমে ডাকতে ডাকতে তার রিক্সার পিছন পিছন দৌড়েছিল। সে রাতের কথা মনে পড়লে এখনও নয়নচাঁদের মন খুশিতে ভরে ওঠে।

কিন্তু আজ এই প্যাসেনজারবাবু তো সব হিসেবে গোলমাল পাকিয়ে দিল। ফুটবোর্ডে বসে রিক্সার সিটে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কেমন প্যাঁটপ্যাঁট করে দেখছে নয়নচাঁদকে। নয়নচাঁদ আস্তো করে ডাকল, বাবু, লাগেনি তো?

কোন জবাব নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়ত ব্যোমকে গেছে, এই ভেবে নয়নচাঁদ নরম করে বলল, নিজে নিজে উঠতে পারবেন? না ধরতে হবে?

প্যাসেনজারবাবুটি এবার সামান্য নড়ে চড়ে বসল। তারপর ধীর গলায় বলল, গাড়ি ঘোরাও। লাইন বাজারে যাব না। নয়নচাঁদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনেনি। লাইন বাজারের প্যাসেনজার ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করে না। না চাইতেই বকশিস দেয়। সিগারেট, পানপরাগ খাওয়ায়। এইসবের জন্যই সে দু নম্বর গেটের মোড়ে রাত নটার পরও দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ যে প্যাসেনজার মেলে এমন নয়। নটা কুড়ির লাস্ট বাস আর ট্রেকার প্রায় গায়ে গায়েই আসে। দু চারজন নামে। তাদের মধ্যে থেকেই এক একদিন নয়নচাঁদের মনের মানুষটি হাজির হয়। উটকো মানুষের হাঁটা চলা, যেন কী খুঁজছে এই ভঙ্গীমায় এদিক ওদিক তাকানো, এইসব দেখলেই নয়নচাঁদ বুঝতে পারে, এ বাবু কোথায় যাবে, কোন বাড়ির অতিথি। আর এই জাতের বাবুদের রকমফেরও তো নয়নচাঁদ কম দেখল না। সারা রাস্তা নিজের বিয়ে করা সতীলক্ষ্মী বউয়ের গুনগান করতে করতে লাইন বাজারের মোড়ে নেমে একগাল হেসে বলল, বেবুশ্যে হলে কি হবে, কমলা বড় ভাল মেয়ে। মা জগদ্ধাত্রী হয়ে আমাকে দু হাতে আগলে রেখেছে। আর একদিন রোগা শুঁটকো চেহারার একজন বাবু নয়নচাঁদের পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। একলা যেতে লজ্জা করে। নয়নচাঁদ কথার জবাব দেবে কি, হেসেই খুন। শেষে যখন 'আপনি যান, যতক্ষণ না ফিরছেন আমি গলির মুখে থাকব' এই কথা বলল, তখন বাবুটি লম্বা শ্বাস ফেলল, আঃ বাঁচালে। আস্ত একটি সিগারেটের প্যাকেট নয়নচাঁদের দিকে এগিয়ে দিল, ধরো। একটু চুপ করে থেকে বলল, প্রতিবারই একা ঢুকতে কেমন লজ্জা করে।

আজকের বাবুটি, নয়নচাঁদের দেখা সবচেয়ে তাজ্জব মানুষ। নেশায় টলমল করছে, কথাবার্তায় এতটুকু বেসামাল নয়। নয়নচাঁদ ধরতে যাচ্ছিল, হাত তুলে নিষেধ করল। টেনে হিঁচড়ে নিজেই কোনরকমে রিক্সার সিটে উঠে বসল। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে

ফুরফুরে গন্ধওলা রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা মুছল। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসল, মন হল হাওয়ার মতো, বুঝলে না! যখন তখন ঘুরে যায়। এই যেমন, বলে একটু হাসল। তারপর উদাস গলায় বলল, মন বলছে বেন্দাবন।

নয়নচাঁদ এসব কথার কিছুই বুঝতে পারল না। সে হাঁ করে বাবুর মুখের পানে চেয়ে রইল। সত্যি সত্যি রিক্সা ঘোরাবে কি ঘোরাবে কিনা ভাবতে ভাবতে ফস করে বলে ফেলল, যেখেনে যাচ্ছিলেন, ভালই লাগত। খাসা জায়গা।

সেই ভেবেই তো বেরিয়েছিলাম। ধীর গলায় থেমে থেমে বলল বাবু, হঠাৎ মনে হল চারধারটা বড় চেনা চেনা। এখেনেই তাকে প্রথম দেখেছিলাম। পায়ে তোড়া। নাকে নথ। হাসিতে ছুরির শান। মুখের পানে তাকালে চোখের পাতা পড়ে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। এই আশপাশেই কোথায় যেন ...! বলতে বলতে বাবুটি বলা নেই কওয়া নেই, ঝপ করে রিক্সা থেকে মাটিতে নেমে, বকের মতো গলা উঁচু করে চারপাশে তাকাতে লাগল। নয়নচাঁদ জবাব দেবে কি, তার হাতের চেটো পায়ের তলা ঘামতে শুরু করেছে। চলুন সেখেনেই নিয়ে যাই। এই কথাটুকু ঠোঁটের ডগায় ঝুলতেই লাগল। পরিবর্তে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল। অর্থাৎ সে জানে না। কিছুই বুঝতে পারছে না।

বাবু নয়নচাঁদের রিক্সার হ্যান্ডেল চেপে ধরে নাছোড়বান্দার মতো একই কথা বারবার বলতে লাগল, গাড়ি ঘোরাও। খুঁজে বার করো।

বাবুর ফুরফুরে ভাবটাব সব হাওয়া হয়ে গেছে। চোখ দুটো লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে। নিশ্বাস ফেলছে ভোঁস ভোঁস করে আওয়াজ হচ্ছে। নয়নচাঁদ কাতর গলায় বলল, আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

চোপ। বাবু হুংকার ছাড়ল, তামাম দুনিয়া তাকে চেনে, তুমি চেনো না? ফেরেব্বাজ, গাড়ি ঘোরা।

নয়নচাঁদ রীতিমত ঘাবড়ে গেল। লাইন বাজারের প্যাসেনজার, শরিফ মেজাজের মানুষ হয়। এতদিন এটাই তার জানা ছিল। এমন বায়ুচুড়া মারকাটারি মেজাজের জানলে, কখনই সে রিক্সায় তুলত না। এমনিতেই দাঁতাল এবং মাতালকে বিশ্বাস নেই, কখন কী করে বসে। তার ওপর পায়ে তোড়া, নাকে নথ ভর করেছে। নয়নচাঁদের আফশোষ হতে লাগল, বুদ্ধির দোষেই তাকে এই ঘোরতর সংকটের মধ্যে পড়তে হল। যখনই গলায় গামছা ধরে টান মেরেছিল, তখনই তার বোঝা উচিত ছিল, হয় এ পাগল, তা না হলে অন্য কোন এলাকার রংবাজ মস্তান। হাড়ে মজ্জায় বদমাইশিতে ভরা। রাত এমন কিছু নয়। কিন্তু রাস্তাঘাট ফাঁকা। চীৎকার চেঁচামেচি শুনলে এখন আর কেউ এগিয়ে আসে

না। অপরের ব্যাপারে মাথা গলাতে নেই, এ সভ্যতা জ্ঞান প্রত্যেকের বেশ টনটনে। তিরিশ বছরের রিক্সা চালকের জীবনে এমন বিপদে নয়নচাঁদ কোনদিন পড়েনি। এমনিতে মানুষ হিসেবে সেও রগচটা গোঁয়ার। কিন্তু সব কিছুরই তো প্রকার ভেদ আছে। যেমন বাপের বাপ আছে। গোঁয়াড়ের উর্দ্ধে রাম গোঁয়ার আছে। রাগীর এককাঠি ওপরে বদরাগী। অগত্যা নয়নচাঁদ ভয়ে কুঁচকে এতটুকু হয়ে রিক্সার হ্যান্ডেল ঘোরাল। মিনমিন করে বললে, বসেন। দেখি কমনে তাকে পাওয়া যায়।

এ্যাই তো! বলে বেশ জোরেই নয়নচাঁদের কাঁধে থাপ্পড় মারল বাবু, তুমি হলে গিয়ে বুড়ো শকুনি। কোনখেনে কোন ভাগাড় আছে, তুমি জানবে না? কথা শেষ করে বাবু হাঃ হাঃ শব্দ করে হাসতে লাগল। 'সীতার পাতাল প্রবেশ' যাত্রাপালায় রাবণ যেভাবে হেসেছিল, অবিকল সেইরকম হাসি। অন্য সময় হলে নয়নচাঁদ ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুর মুখখানা দেখত। তাকে বুড়ো শকুনি বলার জন্য দপ করে রেগেও যেত। রিক্সা থামিয়ে চোটপাট করত। কিন্তু আজ তার ভেতরে বাইরে ভয়।

নয়নচাঁদ রিক্সা চালাচ্ছে ঢিমেতালে। ঘাড় গলার শিরা ফুলিয়ে, হ্যা হ্যা করে শ্বাস ফেলে এমন একটা ভাব করছে, যেন সে আপ্রাণ শক্তিতে গাড়িটাকে টানার চেষ্টা করছে। প্যাডেলে ক্যাঁচ কোঁচ করে আওয়াজ হচ্ছে। অন্যমনস্ক বলেই হয়ত বড়সড় একটি গর্তের কিনারায় পিছনের চাকা পড়ে রিক্সাটি একপাশে কাত হয়ে পড়ল। বাবু পায়ের ওপর পা তুলে খোশমেজাজে বসেছিল। আচমকা টাল খেয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে রিক্সার হুডটাকে দুহাতে খামচে ধরল এবং সেই অবস্থাতেই ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে চীৎকার করে উঠল, মারবি নাকি রে শালা?

এবার নয়নচাঁদ সত্যি সত্যি রেগে গেল, রাস্তাটার দিকে একবার দেখবেন তো? খোস পাঁচরায় ভরা। নয়নচাঁদের বিকৃত গলার স্বর এবং গনগনে চাউনির ধাক্কায় বাবু বেশ থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

একটু নামুন দেখি। নয়নচাঁদ বেশ গম্ভীর গলায় বলল। বাবু বাধ্য অনুগতের মতো রিক্সা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বদ ভাবনাটা এখনও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দামী কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মানুষ যে অভিনিবেশে সেটিকে খোঁজে, অবিকল সেই ভঙ্গীতে বাবু নরকের রাস্তা খুঁজছে।

রিক্সাটাকে টেনে সরিয়ে ঠিকঠাক জায়গায় এনে, নয়নচাঁদ চামড়ার সিটে জোর দুটি

চাপড় মেরে উঠে বসল এবং প্যাডেল ঘোরাল ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করে। শরিফ মেজাজে বাবু নয়নচাঁদের ঘাম জবজবে পিঠে আস্তো হাত ছুঁইয়ে বলল, সবই ঈশ্বরের যোগাযোগ। ঈশ্বর সঠিক সময়ে মনে করিয়ে দিলেন। আবার তোমার মতো একজন ভাল মানুষের দেখাও মিলিয়ে দিলেন। নয়নচাঁদ কোন জবাব দিল না। তার হাসি পাচ্ছিল। দু দণ্ড আগে বাবু তাকে 'বুড়ো শকুনি' বলেছিল, এখন বলছে 'ভালমানুষ'। এমন ধুরন্ধরের মুখখানা একবার না দেখলেই নয়, এই ভেবে নয়নচাঁদ আস্তো করে ঘাড় ফেরাল। অবাক কাণ্ড! বাবু জেগে আছে না ঘুমিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। চোখ দুটি বোজা। মুখমণ্ডল জুড়ে হাসি হাসি ভাব। বাচ্ছারা ঘুমের মাঝে যেমন দেয়ালা করে, মুখখানা ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে মুখে। বসন্তের দাগে ভরা কুৎসিত মুখখানা চাঁদের আলো আর ছাই চাপা আগুনের মতো ধিকি ধিকি হাসির দৌলতে বেশ বাহারী দেখাচ্ছে। বাবুর এই সব পেয়েছির তৃপ্তিতে ভরা মুখটির দিকে অপলক অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নয়নচাঁদের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। সর্বনাশের খেলা শুরু হয়ে গেছে। বাবু আর বাবুর মধ্যে নেই। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে দুচোখ বুজে বাবু এখন সুরিয়ার কামবিলাসিনী শরীরটা দেখছে। ঝিঁঝির ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ বা পুরোনো রিক্সার শরীর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা করুণ ধাতব কান্না, কিছুই এখন আর বাবুর কানে ঢুকছে না। শরীরের মোচড়ে রূপোর তোড়া বাজছে ঝুমুর ঝুম আওয়াজ করে। দু কানে হাত চাপা না দিয়েও, বাবু এখন চারপাশের সব কিছু বিশ্রুত হয়ে, রাবণের চিতার আওয়াজ শুনছে ঝমর-ঝমর, ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুম-ঝুম-ঝুম।

সুরিয়ার ঠেকের বিশ তিরিশ হাত তফাতে রিক্সা থামিয়ে নয়নচাঁদ বলল, এখেনেই হবে। একটু ভেতরপানে পাত্তা করে দেখুন তো।

— কেন বাওয়া, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে? বাবুর গলার স্বরে রস জমেছে। কথাগুলি ঢেউয়ের মতো দুলে দুলে যাচ্ছে।

— খেপেছেন? নয়নচাঁদ দু হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাল, ওসব মোচ্ছবে আমার মতি নেই।

— কে তুমি নাঙের পো? বাবু ঘাড় দুলিয়ে হাসল, দধিচী না দুর্বাসা? দধিচী, দুর্বাসা না বুঝলেও 'নাঙের পো' নয়নচাঁদের চেনা শব্দ। সে দপ করে রেগে উঠল, উলটা সিধা বকছেন কেন?

— যাচ্চলে! বাবু দু চোখ বড় বড় করে বিস্মিত গলায় বলল, ঠাকুর দেবতার নাম করা পাপ?

— গাড়ি থেকে নামুন তো। নয়নচাঁদ কড়া গলায় বলল।

— নামছি, নামছি। সিটে বসেই বাবু শরীরের উর্ধাংশটুকু একটু দোলালেন মাত্র, মাথা গরম করছ কেন? রাত বিরেতে লোক জড়ো হয়ে যাবে যে।

ধীরে সুস্থে গাড়ি থেকে নেমে বাবু গোড়ালি উঁচু করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর খিক খিক করে একটু হেসে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে ঠিক জায়গায় এয়িচি। কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ধুপধুনোর গন্ধও নাকে আসছে। একটু হেসে নয়নচাঁদের কাঁধে আস্তো হাত রেখে বললেন, বাতাসে ম ম করছে সোন্দর গন্ধ। তুমি পাচ্ছ না?

নয়নচাঁদ সন্দিগ্ধ চোখে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই দুবার ফোঁ ফোঁ করে নাক টানল। ঘাড় দুলিয়ে বলল, স্যাঁতাপরা বাস। সোন্দর না ছাই।

— উঁহু। বাবু দু চোখ বুজে মাথা নাড়লেন, অমন কথা বলে না। সুন্দুরী মেয়ে মানুষের গা থেকে কস্তুরীর গন্ধ বেরোয়। যোজন মাইল দূর থেকে সে গন্ধ নাকে আসে। বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। মানুষ পশুপক্ষী মায় গাছপালাটি অব্দি সে গন্ধ পায়। যোজনগন্ধা নাম শোননি?

নয়নচাঁদ জবাব দেবে কি! বাবুর ধোঁয়াটে দুর্বোধ্য কথার তোড়ে সে রীতিমত হড়কে গেছে। এমনকি তার কাঁধে রাখা বাবুর হাতটি ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নয়নচাঁদ স্পষ্ট অনুভব করল, তার সঙ্গে ভারি। খেলা শুরু নয়, নয়নচাঁদ বুঝতে পারল, পাকাপাকি জমেও গেছে। খড়ির গন্ডীর মধ্যে সে যে আটকা পড়ে গেছে এটা বুঝতে পেরে তার কান্না পেয়ে গেল। ভয়ে এবং দুঃখে। ডানে শিয়াল দেখছিল না একা নির্বান্ধব একটি শালিক, নাকি কালো বেড়াল পথ কেটেছিল, কিছুই খেয়াল করতে পারল না। এমন ঘোরতর দুর্যোগের কোনরকম আগাম জানান ছিল না। পালানো দূরের কথা, ঘুরে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও তার নেই। না শরীরে, না মনে। পা দুটি যেন পেরেক মেরে বা আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে কেউ মাটির সঙ্গে। কাঁধের ওপর বাবুর হাতখানি জগদ্দল পাথরের মতো ভারি। বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। নয়নচাঁদের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে লাগল। ল্যাম্প পোস্টের আলোটাকে মরা মাছের চোখের মতো ফ্যাকাসে ঘোলাটে দেখতে লাগল। লম্বা করে শ্বাস টানার চেষ্টা করল। পারল না। কিছু বলার জন্য হাঁ করল, জিভ উল্টে গেল মুখের ভেতর। মায়াবী খেলায় নিজেকে ধরে রাখা কি যে সে লোকের কম্ম! চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলা নেই কওয়া নেই, কাটা কলাগাছের মতো ঝুপ করে পড়ে গেল নয়নচাঁদ। হতচকিত বাবু মাটিতে ঘাড় মুখ গুঁজরে পড়ে

যাওয়া নয়নচাঁদের মাথাটি দুহাতে সাপটে ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিল, এই মরেচে। বাবুর গলার স্বরে স্পষ্ট ভয়, শুনছ, কী হল বাপ আমার?

নয়নচাঁদের কানে 'বাপ আমার' ডাকটি পৌছাল ক্ষীণ আবছা আওয়াজে। তার মনে হল বহু দূর থেকে তার মা যেন তাকে ডাকছে। কোন ছোটবেলায় মা মারা গেছে, মায়ের মুখটাও ভালভাবে মনে পড়ে না। কতদিন পরে আজ তাকে মা ডাকছে 'বাপ আমার' বলে।

নয়নচাঁদ খুব কষ্ট করে দু চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে বাবুর মুখের পানে তাকাল। জড়ানো গলায় টেনে টেনে বলল, আওয়াজ .... বেশ জোরে জোরে .... গন্ধ .... সব পাচ্ছি।

নয়নচাঁদ তখন সত্যি সত্যি একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম করে টানা একটি আওয়াজ তার কানে বাজছিল। স্নো পাউডার পমেটমের ঝিমধরানো গন্ধও টের পাচ্ছিল। শব্দ এবং গন্ধ দুটোই এতটাই নাগালের মধ্যে যেন খামচে ধরা যাবে। চেতন এবং অবচেতনের মাঝামাঝি ভাসমান একটি পর্যায় নয়নচাঁদ প্রাণপণ চেষ্টা করেও জাগতিক বর্ণমালাকে কিছুতেই স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারছিল না। নাকের পাটায় বসা নাছোড়বান্দা মাছির মতো, ঝুমুর ঝুম শব্দ আর এসেন্সের তীব্র গন্ধ চারপাশের সব কিছুকে ঠেলে সরিয়ে তাকে একটি ভিন্নতর জগতের মধ্যে তলিয়ে দিচ্ছিল। নয়নচাঁদ কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কে জানে। তার ঘুম ভাঙ্গল যখন পিটপিটে চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারল না। তার নিজের ঘরে রাতের বেলায় কোন আলো জ্বলে না। সারারাত কেরোসিন পুড়িয়ে নবাবী করার কথা সে বা তার বাড়ির কেউই ভাবতে পারে না। একান্ত প্রয়োজনে রাতের বেলায় যে কাউকে উঠতে হলে, নীরেট অন্ধকারের মধ্যেই সে জলের কলসিতে পলিথিনের গ্লাস ডুবিয়ে জল খেয়ে নেয়। দড়িতে ঝোলানো চাদর টেনে নিয়ে গায়ে দেয়। ঘরের দরজা খুলে বাইরে যায়। আবার ফিরে এসে ঠিক ঠিক দরজায় হুড়কো দেয়। একে কী বলা যায়। অবস্থা-প্রেক্ষিত ক্ষমতা? নাকি নয়নচাঁদের বুড়ো বাপ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে যা বলে, নিজের চারপাশটুকু য্যাত ভালবাসবে, ত্যাত চিনবে। 'সহবত' ইকেই বলে। শব্দটা 'সহবত' না হয়ে স্বাভাবিক, বা ঐ জাতীয় কিছু হবে। নয়নচাঁদও এই 'সহবত'-এ অভ্যস্ত।

আজ কিন্তু সে খুব অবাক হয়ে গেল, সারা ঘর জুড়ে হালকা আলোর আভা। আর সে নিজে শুয়ে রয়েছে চাদর মোড়া বিছানায়। মাথায় আবার বেশ নরমসরম একটি বালিশ। কনুইয়ে ভর দিয়ে নয়নচাঁদ শরীরটাকে একটু চাগাবার চেষ্টা করল। আর তাতেই

তার চক্ষু ছানাবড়া। তার ঠিক উল্টোদিকে চৌকির বিছানায় বাবু আড়ুইনাথ বদ্যিনাথ হয়ে চিৎপটাং শুয়ে। বাবুর মাথার কাছে বসে সুরিয়া বাবুর চুলে বিলি কাটছে। সুরিয়ার চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। বুকের ওপর হাত দুটি জড়ো করে দু চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে বাবু। ঘুমোয়নি। কারণ পা দুটি অল্প অল্প নাড়ছে। মনমাতানো গান শুনে লোকে যেভাবে চোখদুটি বন্ধ করে সুরটুকুকে আত্মস্ত করার চেষ্টা করে, মৃদু পা দুলিয়ে ছন্দটুকুকে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সেই ভঙ্গী। নয়নচাঁদ যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠে, স্মৃতির কুঠুরি হাতড়ে, তার চির পরিচিত ঘর, চেনা মুখগুলোকে খুঁজছে। তার দৃষ্টি অসহায় এবং তাতে আকুলতার ছাপ স্পষ্ট। নয়নচাঁদের নড়াচড়াটুকু সুরিয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে হাসিহাসি মুখ করে ঢলঢলে গলায় বলল, কী হল, লয়নবাবু? নিদ ভেঙ্গে গেল? এমনিতেই নয়নচাঁদের মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে ছিল। সুরিয়ার সব কথা সেখানে ঠিক ঠিক পৌঁছাল না। কেবল 'লয়নবাবু' ডাকটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। তাকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। ডাকলেও 'চাঁদ' 'টাঁদ' এত কিছু বলে না। 'বাবু' বলার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুরিয়া তাকে ডাকছে 'লয়নবাবু' বলে। অন্য যে কোন লোক হলে সুরিয়ার এমন ঢেউ খেলানো ডাকে চনমনিয়ে উঠত। গর্ব বোধ করত। নয়নচাঁদ তেমন বুরবক নয়। এ ডাকের মানে অন্য। বড় গভীর, ভীষণ ভয়ংকর এ ডাকের মোহ। রাতচরা অশরীরীরা যেভাবে পথ হারানো পথিককে ডাকে, নির্জন প্রান্তরে, নয়নচাঁদ শুনেছে রেডিওর থিয়েটারে — কী হল পথিক? পথ হারিয়েছ? হুবহু সেই গলায়, সেই কৌশলে, সুরিয়া ডাকছে তাকে। সোজা চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাবে কি, নয়নচাঁদ ঘামতে শুরু করেছে কুলকুল করে। আর অবাক কান্ড, তার যত বেশী ভয় করতে লাগল, সত্যি ব্যাপারগুলো তত বেশী করে মনে পড়তে লাগল। দু নম্বর গেটে বাবুর রিক্সায় চড়া, সুরিয়ার ঠেকের হাত বিশেক দূরে বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার ঝুপ করে মাটিতে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত, সমস্ত ঘটনাগুলি সিনেমার ছবির মতো একের পর এক মনে পড়তে লাগল। শেষমেষ এখানে এই ঘরের মধ্যে সে এল কী ভাবে বা কে তাকে নিয়ে এল, এটা কিছুতেই মনে করতে পারল না। শেষ পর্বটুকু কেবল অস্বচ্ছ ধোঁয়াটেই নয়, যথেষ্ট রহস্যময়। গটগট করে নিজে পায়ে হেঁটে সে এখানে এসে ঢোকেনি নিশ্চয়ই। পিরিতে মজলিশে বাবুই বা ডাকবে কেন তাকে? অথচ সে শুয়ে রয়েছে চাদরমোড়া বিছানায়। মাথায় নরম বালিশ। আর হাত কয়েক তফাতে বসে সুরিয়া, তার কল্পলোকের নারী। যাকে সে ভয় পায়। সমীহ করে। আবার অবচেতনে ভালওবাসে। কোন কোন অলস মুহূর্তে চোখের পাতা নিভিয়ে দিয়ে সে নগ্ন সুরিয়ার ছবি দেখে। দুহাতের বেড়ে

সুরিয়ার কোমড় জাপটে ধরে। আঙ্গুলের আস্তো টোকা মারে নাকের নথে। হাত দিয়ে পায়ের তোড়া চেপে ধরে। চলতে দেবে না। কোন শব্দ হতে দেবে না। এমনি আকুতিভরা আব্দারে।

সুরিয়া বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, বাবু তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিল। সুরিয়াও মাদী হাঁসের মতো গদগদ সোহাগী, বাবুর মাথার কাছটিতে বসে, বাবুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চ ফিসফিসে গলায় কিছু বলল। নয়নচাঁদ সেসব শুনতে পেল না। কেবল সুরিয়ার ঠোঁট নড়াটুকু দেখতে পেল। তাতেই তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপিনি শুরু হল। যে কোন মানুষ, সে বুদ্ধিমান বা নির্বোধ যাই হোক না কেন, শেষ সময় আসন্ন বুঝতে পেরে, যা হবার হোক, এমনি ভেবে নিয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

নয়নচাঁদ যখন স্থির নিশ্চিত হল যে, সে মাকড়সার জালে আটকে পড়েছে, তুচ্ছ একটি কীটপতঙ্গের মতো এবং সুরিয়া, রক্তলোলুপ মাদী মাকড়াটি খুব সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে আসছে, কষের তীক্ষ্ণ দাঁত এবং দু চোখের ঝলসানো দৃষ্টি নিয়ে, নয়নচাঁদ, 'হয় মরি, না হয় মারি' — এইরকম একটি মরীয়া প্রচেষ্টায়, বিছানা থেকে চুপিসারে নেমে এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালাবার মতলব ভাঁজল মনে মনে। ঘরের দরজাটি আস্তো ভেজানো। সে যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে দরজাটি তার খুবই কাছে। নাগালের মধ্যে। টাইমিং ঠিক ঠিক হলে দু এক লহমায় এ যাত্রা বেঁচে যেতে পারে। আর তা না হলে নয়নচাঁদ আড়চোখে দেখে নিয়েছে, মোটামুটি বড়সড় শক্তপোক্ত একটি কাঠের টুকরো, দরজার আগল হবে নিশ্চয়ই, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। কোনরকম বাধা এলে কাঠের টুকরোটা দিয়ে সজোরে দু চার ঘা বসিয়ে দিতে পারলেও কেল্লা ফতে। সঠিক নিশানা না হয়ে, এলোমেলো চালালেও কাজ হবে। সুরিয়া না হোক, বাবু যদি আচমকা আঘাতে গঁক করে উঠে একটু খাবি খায় বা চোখ দুটো বড় বড় হয় ঠেলে বেরিয়ে আসে, সুরিয়ার মায়া যাদু সর্বনাশা ক্ষমতা একটু সময়ের জন্যে হলেও সব উল্টেপাল্টে যাবে। মূল কাজটুকু সারবার জন্য নয়নচাঁদের তো বেশী সময়ের দরকার নেই। পনের বিশ সেকেণ্ড যথেষ্ট। বাবুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুরিয়া যেন আঙ্গুলের আস্তো ছোঁয়ায় বাবুর কপালে গালে থুতনিতে বাহারের আলপনা আঁকছে। ফটফটে নয়, তার চেয়ে সামান্য ঢিমে আলোয়, মুখোমুখি দুজনে লায়লা মজনুটি হয়ে বকম বকম করছে। সুরিয়ার ভারি পুরুষ্টু বুকদুটির আভা নয়নচাঁদ দেখতে পাচ্ছে। সুরিয়ার ঘাড় পিঠ কোমর এই বিস্তৃত মনোভূমে বাবুর হাত দুটি পর্যায়ক্রমে কেমন অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নয়নচাঁদ বুঝতে পারল আর সামান্যক্ষণ ঐ দুজনের অন্তরঙ্গতা দেখতে দেখতে তার মধ্যে একটি বিজাতীয় প্রতিহিংসা জেগে উঠবে। তখন সে তার আসল কম্মটুকু ভুলে যাবে। উন্মত্ত ক্রোধে সে হয়ত লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে পালাবার পরিবর্তে, দু হাতের ফাঁসে বাবুর গলাটি সাপটে ধরে প্রাণপণ চাপ দেবে, যতক্ষণ না জিভ বেরিয়ে আসে। তারপর অন্ধ আক্রোশে সুরিয়ার দেহটাকে জাপটে ধরে, আপ্রাণ টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, চাদরমোড়া বিছানাটির দিকে। তার সুপ্ত অবদমিত কামনার রিরংসায়, দাঁতের কামড়ে নখের আঁচড়ে সুরিয়ার দেহের গোপন অলংকারগুলিকে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। তার নখের ফাঁকে, ঠোঁটে এবং ছ্যাৎলা ধরা বিসদৃশ দাঁতে রক্তের দাগ লেগে যাবে।

বাতাসে ভিজে গামছা আছড়ে লোকে যেভাবে জলকণা উড়িয়ে দেয়, ঠিক সেইভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নয়নচাঁদ কুভাবনা দোষদৃষ্টিগুলিকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করল। দুহাতের মুঠো খোলা বন্ধ করল বারকয়েক। পা দুটি টানটান করে শিরাগুলিকে আরও বেশী সচল করে নিল। মুখ হাঁ করে শব্দহীন লম্বা শ্বাস নিল, বুকের খাঁচাটিকে ভরাট করার জন্য। চক্ষের পলকে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় যে কোন কাজ করতে হলে, দুহাত এবং পা টিপটপ রাখতে হবে। তার সঙ্গে বুকের খাঁচাটিকে চুরচুর ভরে রাখতে হবে। বাতাসে টান পড়লে দেহ লাট খাবে।

নয়নচাঁদ আপন মনে নিপুণ সতর্কতায় যখন নিজেকে গোছাচ্ছে, ঠিক তখনই, নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে গুটিগুটি পায়ে বাবু নয়নচাঁদের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আচমকা কপালে হাতের ছোঁয়া লাগতেই নয়নচাঁদ ছিটকে উঠে বসল বিছানায়। মূর্তিমান বাবু কলির কেষ্টঠাকুরের মতো পোজ নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখ ফাঁক করে হাসছে। হাসিতে শব্দ নেই। বাবুকে এভাবে হাসতে দেখে নয়নচাঁদ এতটাই ঘাবড়ে গেল যে প্রথম কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিজের চারপাশটুকু সঠিক চিনে নিতে। তারপর কথা বলল, কথা ঠিক নয়, এলোমেলো জড়ানো কিছু শব্দ, আপনি কী করতে বলেন? পাইলে যেতে গিয়ে যদি ....! এইটুকু বলে নয়নচাঁদ নিজেই বুঝতে পারল, সে যা বলছে তার কোন মাথামুণ্ড নেই। উল্টে সে যা করবে ভেবে ছক কষেছে এতক্ষণ, সেইসব ব্যাপারগুলো বলে ফেলছে। আপনা আপনি। সত্যি কথাগুলো পেটের মধ্যে সাবানের ফেনার মতো বুড়বুড়ি কাটছে। বাবু সামনে দাঁড়াতেই গোপন বাক্যগুলি তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। নয়নচাঁদের কপালে বাবু তিনবার চারবার হাত বুলিয়ে দিল

আস্তো করে। তারপর নরম গলায় বলল, একা পথ চিনে ফিরতে পারবি তো? নাকি একটু এগিয়ে দেব?

গঁৎ করে ঢোঁক গিলল নয়নচাঁদ। বাবু বলে কী! সে যাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল, সেই মানুষ তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে! এতক্ষণ নয়নচাঁদ ভাবছিল তারই মাথার মধ্যে সব বেঁকেচুরে উল্টেপাল্টে গেছে। এখন দেখছে বাবুর মাথাটিও 'পুব দক্ষিণ' হয়ে গেছে। চেরা চোখে সুরিয়ার দিকে তাকাল নয়নচাঁদ। পিছন ফিরে ব্লাউজে সেফটিপিন লাগাচ্ছে। এই প্রথম বাবুর জন্য দুঃখ হল নয়নচাঁদের। মানুষটা হাবে মুলাদে ফিনিশ হয়ে গেল। কোথাকার মানুষ,বাড়িতে কে কে আছে, বিয়ে থাওয়া হয়েছে কিনা, ছেলেমেয়ে সময়মত খেতে পায় কিনা, কে জানে! সোমত্ত বউটার হাত দুটি বোধ হয় কাঠির মতো সরু, তাতে ঢলঢল করছে শাঁখা, লোহার নোয়া। চুল উঠে যাওয়া সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সতীত্বের সিঁদুর। বাবুর মুখের পানে চেয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে নয়নচাঁদের মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে সে ফস করে বলে ফেলল, আমাকে পথ চেনাতে হবে না। আমিই বরং আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নয়নচাঁদের কথা বলা তখনও শেষ হয়নি, তার আগেই সুরিয়া ফোঁস করে উঠল, এ কেমন বাতচিত হল, লয়নবাবু? আমার মেহমানকে তুমি লিয়ে যাবে কেন? মাথায় যেটুকু বুদ্ধি জড়ো হয়েছিল, মনে যৎকিঞ্চিত যা সাহস তৈরী হয়েছিল, সুরিয়ার এক ফুঁয়ে সব নিভে গেল। মুখের মধ্যে জিভ লটকে গেল। ঠাণ্ডা স্রোত গলার কাছ থেকে বুকের বাঁ এবং ডান দুদিক দিয়ে নেমে গেল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। স্থানুবৎ নয়নচাঁদ ঘরের দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রাখা জ্বলন্ত হ্যারিকেনের দিকে চেয়ে বসে রইল।

বাবু নরম গলায় ডাকল, বাবা নয়ন, খুব অবাক লাগছে, তাই না?

নয়নচাঁদ আস্তো করে ঘাড় দোলাল, যার অর্থ, হ্যাঁ। সুরিয়ার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল বাবু, শ্রীমতী আমার আগের জন্মের অষ্ট সখীর এক সখী। আমরা একসঙ্গে যমুনায় নৌকো বিহার করেছি। কুঞ্জবনে লুকোচুরি খেলেছি। জোছনারাতে বনে বনে ফুল কুড়িয়েছি। তমালের ছায়ায় বসে সুখ দুঃখের গল্প করেছি। ঝরা পাতা আর ফুলের বিছানায় শুয়ে যৌন সংসর্গ করেছি।

বাবুর দু চোখ অকূল দরিয়া। নেশা জমেছে গলার স্বরেও। কথাগুলো ফুলের পাপড়ির মতো বাতাসে ভাসছে। নাক টানলে ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ মস্তিষ্কে ধরা যাচ্ছে না। নয়নচাঁদ হেটোমেঠো মানুষ। এমন ভাবের কথা কেউ বলে না তার

সঙ্গে। সুরিয়াকে এত কাছ থেকে এমন নিশীথ রমণীর বেশে দেখার অভিজ্ঞতাও তার কাছে অভিনব। কেন কোন রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্তায় সে তার বউয়ের শ্রীহীন রুগ্ন শরীরটাকে হঠাৎই জাপটে ধরে প্রবল আবেগে। তারপর একতরফা নির্মম পাশবিক উন্মত্ততার পর যখন সে বুঝতে পারে অপর পক্ষের কোনরকম আকুলতা নেই, শিহরণ নেই, শীতকালের সাপর মতো নির্জীব একটি শরীরকে নিয়ে সে একাই দুমড়ে মুচড়ে একাক্কার করছে, তখন ধস্ত নয়নচাঁদ, গুটিসুটি নিজের জায়গায় ফিরে যায়। কোনরকম হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয় না সে। লজ্জা বা দুঃখে পীড়িত হয় না। পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা তেমনভাবে মাথায় আসে না তার। তবু কোথায় যেন একটু অভাব বোধ করে। সেটা মানসিক প্রশান্তি বা তৃপ্তির স্বল্পতা নয়। শারীরিক সুখের ঘাটতি।

আজ এই স্বল্পালোকিত ঘরে শরীরী অলংকারে প্লাবিত একটি নারী এবং তার মুখোমুখি অচেনা রহস্যময় একজন পুরুষ দুরূহ সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে। কথার মোহে আবিষ্ট নারী যেন বিস্মৃত হয়েছে তার যাদুকরী আকর্ষণ, প্রলোভনী ক্ষমতা, আগুন আর ধ্বংসের প্রাগৈতিহাসিক ধারাবাহিকতা। ব্রীড়াবতীর ভঙ্গীমায় লাজুক লাজুক মুখে একবার বাবুর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করছে, পরমুহূর্তেই দু ভ্রূর সন্ধিস্থলে এবং কপালে দুটি তিনটি সরু সরু রেখা ফুটিয়ে কাজল পরা দীর্ঘ চোখদুটি সামান্য আনত করে নয়নচাঁদকে দেখছে। সে দৃষ্টিতে ঘৃণা বা অবজ্ঞা নেই। আকুতি বেদনাও নয়। লিপ্সা প্রলোভন ছল কৌশল কিছুই নেই।

নয়নচাঁদের মনে হল, সুরিয়ার সমস্ত দেহটা, কেবল মুখমণ্ডলটুকু ছাড়া, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সে দেখছে তার সামান্য দূরে, আকাশের উজ্জ্বল তারার মতো দুটি চোখ বাঁশের বাঁশির মতো সরু তীক্ষ্ণ নাক, ঝিনুকের মতো চিবুক এবং ঈষৎ পুরু দুটি ঠোঁট, এই সব মিলিয়ে নির্বেদ একটি মুখ নিরালম্ব অবস্থায় বাতাসে ভাসছে।

এই ঘরটির বাইরে আর একটি পৃথিবী রয়েছে। সেখানে সময় আবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির সুধায় সম্পৃক্ত হচ্ছে ব্যস্ত জনপদ, নিবিড় বনভূমি, অতলান্ত সাগর। ক্ষয়াটে চাঁদের ঝিম আলো, হালকা হিমেল বাতাস, কীটপতঙ্গের রকমারি ডাক, বহতা নদীর চোরা স্রোত, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের রহস্যময়তা, পথের বিপজ্জনক বাঁক, শায়িত বিস্তীর্ণ চরাচরের মুগ্ধতা, মানুষের লোভ মোহ হিংসা আর রক্তের পাশাপাশি, স্নেহ ভালবাসার আর্দ্রতা, গৈরিক নির্মোহ বসন, শ্বেতশুভ্র উদারতা সব মিলেমিশে রয়েছে। কাদায় আর চন্দনে।

নয়নচাঁদ অশিক্ষিত, কম অনুভূতিসম্পন্ন এবং আরও কম জানাবোঝা একজন নিতান্তই অকিঞ্চিতকর মানুষ। রূপ রস বর্ণ গন্ধের কোন হেরফের সে বোঝে না। এ

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার, টিকে থাকার অর্থ এবং উপায় বলতে সে বোঝে লাগামছাড়া ছন্নছাড়া ফূর্তি, আমোদ। আর এ সবের জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষটি যা করে, মুহূর্তের ভুলেও এদিক ওদিক না তাকিয়ে, আপন মর্জিতে আপনার পথ ধরে এগিয়ে চলে, নয়নচাঁদও তাই করে। তার ঘরেতে অভাব আছে, টান পড়ে হাঁড়িতে। তার বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের ক্ষোভ আছে, অভিযোগ আছে। নয়নচাঁদ দার্শনিক নয়। আবার তার নিজস্ব দর্শনও আছে। দশ হাজার বিশ হাজার, লাখ দু লাখ জনমের পরে একজন মানুষ আসে পৃথিবীতে। তো সেই মানুষ কী করবে? মস্তি করবে। মস্তি মারবে। স্রিফ খানা-পিনা-শোনা। রোনা মাত। তো সেই মানুষ চলবে কোন পথে? পাগলা রে পাগলা! তুই যে পথে হাঁটবি, সেটাই তোর পথ। কোন কোন রাতে নেশায় টইটম্বুর নয়নচাঁদ বাড়ি ফিরে তার ঘুমন্ত বউকে টেনে তুলে সিনেমার হিরোদের মত হাত পা নেড়ে দেখায়, ঢুক ঢুক পিয়ো। জুগ জুগ জিও। তার গলার স্বর জড়িয়ে আসে। দেহটা দুলতে থাকে। ঝড়ে যেমন গাছ দোলে, ঠিক সেইভাবে। ঘরের মেঝেতে দেওয়ালে ভুতুরে ছায়া পড়ে। তখন তার ছেলেমেয়েগুলির ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে ভীতু ছাগলছানার মতো পিটপিটে চোখে নয়নচাঁদকে দেখে। পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো নয়নচাঁদ বলেই চলে, ঢুক ঢুক পিয়ো। জুগ জুগ জিও।

এই ঘরটি, যেখানে নয়নচাঁদ শুয়ে রয়েছে, তার অচেনা। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে মানুষটি, তাকে সে আদৌ চেনে না। কিন্তু সামান্য দূরে বসে যে নারী, যাকে অপার রহস্যময়ী, প্রাণঘাতিনী বলে ভাবত, এখন এই মুহূর্তে তাকে মোটেই তেমন বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। আর পাঁচজন সাধারণ নারীর চেয়ে তার আলাদা কোন রূপ নয়নচাঁদের চোখে পড়ছে না। ভয় ভয় ভাবটা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কুয়াশা হারিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় বাতাসে, মানুষ তখন রোদের তীব্রতা নিয়ে কথা বলে, আকাশে ভাসমান মেঘেদের দলে জল-মেঘ আছে কিনা, এইসব নিয়ে ভাবে, বেমালুম ভুলে যায় ভোরের কুয়াশার কথা, নয়নচাঁদেরও সেইরকমই হল। সুরিয়া সম্পর্কে যাবতীয় ভয় ভাবনা ভুলে গিয়ে সে আগন্তুক বাবুটিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। তার রিক্সায় ওঠা ইস্তক বাবুর সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে সৃষ্টিছাড়া অভিনবত্ব। কোথাও কিছু নেই, ক্ষ্যাপা পাগলের মতো গলায় গামছা ধরে টান মারছে, লাইন বাজারে যাবে বলে হঠাৎ বলছে, গাড়ি ঘোরাও। সবচেয়ে চমকদার ব্যাপার যেটা তা হল সুরিয়ার মতো ওস্তাদ খেলুড়েকে একদম ন্যাতা বানিয়ে দিয়েছে। কী বলে ঢুকল এখানে, তখন কারা ছিল এই ঠেকের আড্ডায়, তারা স্বেচ্ছায় উঠে গেল নাকি বাবুকে হঠাৎ দেখতে পেয়েই আহ্লাদে

আটখানা সুরিয়া হাঁস মুরগীর মতো হ্যাট হ্যাট করে তাড়িয়ে দিল তাদের, নয়নচাঁদ এসব কিছুই জানে না। এই পর্বে হয় সে জ্ঞান হারিয়েছিল, তা না হলে জ্ঞান ছিল হয়ত, কিন্তু মস্তিষ্ক চোখ এইসব অঙ্গগুলি এমনই সম্মোহিত হয়ে গেছিল যে, পলকহীন চোখ, সচল মস্তিষ্ক, সব দেখেও কিছুই দেখতে পায়নি, অ থেকে ও সব বুঝেও, কিছুই মনে রাখতে পারেনি।

আগন্তুক বাবুটি নয়নচাঁদের ধারণায় যে সে মানুষ নয়। রাম শ্যাম যদু মধুর ভিড়ে মিশে থাকলেও এ বাবুর ঘরানাই আলাদা। নয়নচাঁদ ভারি মাথার মানুষ। নিজেকেই নিজে বোঝাল সে, বাবুর বেলাইনের কাজকর্মগুলিকে সে উদ্ভট, পাগলামি বলে ভেবেছে। সুরিয়ার ঠেককে বাবু বলছিল বেন্দাবন। কতদূর থেকে পায়ের তোড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। সর্বোপরি আগের জন্মে সুরিয়ার সঙ্গে বাবু ফুল কুড়িয়েছে, যমুনা নদীতে সাঁতার কেটেছে, গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলেছে, নামতা পড়ার মতো গরগর করে বলে যাচ্ছিল সব। তখন বাবুর গলার স্বর, বলার ধরণ, সব পাল্টে গেছিল। কথা বলছিল সুরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে, কিন্তু দু চোখের দৃষ্টি যেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছে, এমনি লাগামছাড়া, ধূ ধূ চাউনি।

নয়নচাঁদ স্থির নিশ্চিত হল, আগন্তুক বাবু ছদ্মবেশধারী খুব বড় মাপের একজন গুণীন। ছাপোষা ধুতি পাঞ্জাবীর আড়ালে, বাবুর আসল রূপটি অন্যরকম। বড় বড় ভাঁটার মতো চোখ, বাজপড়ার মতো গলার আওয়াজ, কপালে বুকে রক্তচন্দনের ডোরা। হাঁটু মুড়ে বসে বাবু মড়ার খুলিতে মায়ের প্রসাদ কারণবারি ঢেলে ঢক ঢক করে খায়, বিকট শব্দ করে হাসে। হাত নেড়ে ডাকে বিশাল চেহারার বাঘকে। সেটি গুটিসুটি পায়ে সামনে এসে বেড়ালের মতো ল্যাজ নাড়ে। হালুম হুলুম-র পরিবর্তে চিঁ চিঁ করে ডাকে। স্রেফ হাতের ছোঁয়ায় মানুষকে ইঁদুর, গাছকে পাথর বানিয়ে দেয়। 'আয় আয়' করে বৃষ্টিকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনে। 'যা যা' করে সূর্যকে ঠেলে দেয় মেঘের আড়ালে।

বিয়ের আগে নয়নচাঁদের মনে একবার বৈরাগ্যভাব জেগেছিল। ঠিক কী কারণে মনে নেই। তবে কিছু দিনের জন্য জগৎ সংসারের সব কিছু তার আলোনা মনে হচ্ছিল। এমনকি যুবতী মেয়ে দেখলেও, শরীরে বা মনে কোনরকম উত্তেজনা তৈরী হচ্ছিল না সেইসময়। নয়নচাঁদ সত্যিকারের একজন সাধু যোগী বা ঐ জাতীয় উঁচু জাতের মানুষের সন্ধানে, যে যেখানে বলেছে, ছুটে গেছে। দু চার জনকে যে মনে ধরেনি এমন নয়। তাদের মধ্যে থেকে একজন নয়নচাঁদকে বলেছিল, এ তোর মর্কট বৈরাগ্য। গরম চাটুতে জল পড়লে যেমন অল্পক্ষণ চরবর করে সব থিতিয়ে যায়, তোরও সেই দশা। নয়নচাঁদ

সেই সিদ্ধ পুরুষের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে হতাশ গলায় বলেছিল, আমার তাইলে হবে না, বলছেন? কিন্তু মনে যে বড় অশান্তি। বাড়ি ঢুকলেই মনে হয় বুক গলা কে যেন চেপে ধরছে। শরীর আইঢাই করে। পালাই পালাই মন করে।

— বায়ু বেড়েছে তোর। শুধু বাড়েনি, সেই বায়ু মাথায় চড়েছে। আমলকি বেটে মাথায় চাপড়া করে দিবি। বায়ুনাশ হবে। শরীর মন সব জুড়িয়ে যাবে।

নয়নচাঁদ এ সবের কিছুই করেনি। তার 'অস্থির অস্থির' ভাবটা আপনিই স্তিমিত হয় গেছিল কিছু দিন পরে। তখন ভাতের গন্ধ, নারীর শরীর, আগের মতোই সজীব অর্থময় হয়ে উঠেছিল তার অনুভূতিতে। কিন্তু তারপরেও সুপ্ত কামনার মতো গোপন একটু বাসনা নিজের অজান্তেই মনের কোণে লুকিয়েছিল। যদি সত্যি কোনদিন এমন একজন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সম্মোহনী ক্ষমতায় দুরন্ত নারীকে বশ মানাতে পারে! অশরীরী অপদেবতাদের ধমকে তাড়িয়ে দিতে পারে! তন্ত্র মন্ত্রের জোরে প্রাণহীন দেহকে সচল করতে পারে! নয়নচাঁদ তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। বেশী কিছু নয়, বশীকরণটুকু শিখে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে। নড়া দাঁত আর মুখরা বউ যে কি যন্ত্রণাদায়ক, যারা জানে, তারা জানে। আর এই যাদের সংখ্যাটিও তো কম নয়। অনেক অনেক। আহা এইসব দুঃখী মানুষগুলির কথা ভেবে নয়নচাঁদ যতটা ব্যথিত হয়, ঠিক ততটাই জেদ বাড়ে তার ভেতরে ভেতরে। জাঁহাবাজ মেয়েমানুষগুলিকে ঠিকঠাক মাপে না আনতে পারলে ঘর সংসার বলতে কিছু থাকবে আর! কত্তা গিন্নী মুখোমুখি হলেই, দা কাটারি তুলবে, সকাল না হতেই বাড়িতে কাক চিল উড়বে, সুখ শান্তি সব কাপড় তুলে ছুটবে!

নয়নচাঁদের নিজস্ব দর্শন আছে। আবার সমাজ সংসার নিয়েও সে তার মতো করে একটু আধটু ভাবে। দেশ চালাতে যেমন রাজার প্রয়োজন, সংসারেও একজনকে রাজা হতে হয়। সে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে। নির্দেশ অমান্যকারীকে শাস্তি দেবে। তা না হয়ে যে যার খুশিমত চললে সংসারটা 'হাওড়া হাট' হয়ে যাবে। সবাই রাজা হলে যেমন দেশ চলে না, সবাই মুরুব্বী হলে 'সোনার সংসার' গড়ে ওঠে না। উৎকৃষ্ট যে কোন কিছুর প্রসঙ্গে নয়নচাঁদ 'সোনার' শব্দটি ব্যবহার করে। 'সোনার সংসার', 'সোনার মেয়ে' — ঠিক আছে। স্বপ্নহীন লম্বা ঘুম থেকে উঠে, আরামের হাই তুলে নয়নচাঁদ বলে, 'সোনার ঘুম ঘুমুলাম'। বা ভাঙা ঠাকুরদালানে মদের নেশায় অন্য কোন নেশাড়ুর সঙ্গে ঝগড়ায় মেতে গেলে, নয়নচাঁদ কখনও কখনও দাবড়ে ওঠে, চোপ। শালা গোমুখ্যু। আমার 'সোনার লেকচার' বোঝার ক্ষমতা তোর চোদ্দ গুষ্টির নেই।

অধীত বিদ্যার নাশ নেই। বরং যোগ্য ব্যক্তিকে তা দান করলে, পরম্পরা রক্ষিত হয়। বিদ্যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। নয়নচাঁদ অতশত বোঝে না। মোদ্দা কথা, আমি যা শিকলুম, তা যেন লোকের উবগারে আসে, ক্ষেতি না করে। নয়নচাঁদ ভাঙ্গতে চায় না। জুড়তে চায়। মুখরা, বদরাগী, রে রে মার্কা বউগুলো যদি স্বামীর বশে থাকে, তার কথামত চলে, সংসারে আপনিই শান্তির হাওয়া বইবে। মা লক্ষ্মী থিতু হবে। অভাব অনটন সব দূর হয়ে যাবে। স্বামী তো আর সংসার ছাড়া নয়। বরং সেই হল গে সংসার গাড়ির ইঞ্জিন। গায়ে গতরে খাটছে। ভাবনা চিন্তা, তাও আছে। ওপর থেকে দেখে তো আর সব বোঝা যায় না।

নয়নচাঁদের বউ, ফুলকুমারী বা ফুলু অকারণে দু চার চড় ঘুঁসি খেয়ে নিস্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে, ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই। জন্ম দিয়ে বাপ হয়েচে। ছেলে বউ সব শুক্যে মরচে, হারামখোরের নেশা করতে লজ্জা করে না।

নয়নচাঁদের মাথায় রক্ত লাফিয়ে ওঠে ধাঁ করে। চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মুখ ঘষটে দেয় ফুলুর। ক্ষ্যাপার মতো এটা সেটা হাতের সামনে যা পায়, সেটা তুলে মারতে যায়। আবার কখনও নয়নচাঁদ ফুলুর মুখের পানে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ফুলু একটু সময়ের জন্য থামলে, ঘাড় দুলিয়ে বলে, সিঁদুরটা তুলে ফ্যাল। নোয়াটা ভেঙ্গে দে। ভাব না কেন, আমি মরেই গেছি।

ফুলুর চমকে ওঠাটুকু নয়নচাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না। তখন সে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়, সংসারের গাজ্জেন হওয়ার ঝকমারিটা বুঝবি কি! তোদের চিন্তায় এক এক সময় বুকে হাওয়া ধাক্কা মারে। দিনমানে আঁধার মনে হয়। চোখে সব কালো কালো দেখি।

ফুলু হয়ত এসব কথার জবাব দেয় না। বা জবাব দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পায় না বলে, এমন একটা মুখভঙ্গী করে, যাতে তার বিদ্বেষ অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাস, সব ফুটে ওঠে। ফুলুর সেই বিসদৃশ মুখের পানে চেয়ে নয়নচাঁদের রাগও যেন থমকে যায়। 'গাজ্জেন', 'বুকে হাওয়ার ধাক্কা' এমনি সব ভারি ভারি জুতসই শব্দ ব্যবহার করার পরও যখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে থাকে, তখন চুপ করে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা খুঁজে পায় না নয়নচাঁদ। এ হেন অবস্থায় শিক্ষিত বাবুরা কী করে তাদের মুখরা বউদের সামাল দেয়, নয়নচাঁদ জানে না। আর জানে না বলেই নিজেকে বোকা বুদ্ধিহীন এবং অসহায় বলে মনে হয়। তখনই বশীকরণ বা নারী সম্মোহনের ব্যাপারটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনে পড়ে যায়। এই বিদ্যাটুকু রপ্ত থাকলে, নয়নচাঁদ ফুলুকে কাছে বসিয়ে তার আঘাতের জায়গাগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, নিজের ভাবনাচিন্তার কথা শোনাতে

পারত। তখন ফুলু হয়ত, ওই সুরিয়া যেমন বাবুর মাথার কাছে বসে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে, ওইভাবে নয়নচাঁদের পাতলা ফুরফুরে চুলগুলির মধ্যে সরু চামড়াসার আঙ্গুলগুলি দিয়ে সিঁথি আলবোট সব এলোমেলো করে দিত। বশীকরণ বিদ্যার জোরে নয়নচাঁদও তখন বাবুর মতো করে দুলিয়ে দুলিয়ে বলত, তুমি আগের জন্মে আমার সখী ছিলে। দুজনে বনে বাদাড়ে ফুল কুইড়েছি। পুকুরে সাঁতার কেটেছি। মাঠে ঘাটে শুয়ে সৎসঙ্গ করেছি .... আরও কী যেন সব! বিদ্যেটুকু পুরোপুরি রপ্ত করতে পারলে তখন আরও কত নতুন নতুন ভাল ভাল কথা আপনিই বেরিয়ে আসবে। ভেতর থেকে রাশ ঠেলে দেবে যেন কেউ।

ঠাকুরের কি লীলা! 'দয়া' শব্দটা মাথায় এসেছিল নয়নচাঁদের। অশিক্ষিত হলেও নয়নচাঁদ এটা জানে, ঠাকুর দেবতাদের ক্ষেত্রে 'লীলা'-ই বলতে হয়। সারা জীবনের সেই কাঙ্খিত মানুষটি, যার মুঠোর মধ্যে নয়নচাঁদের গোপন লিপ্সাটুকু ধরা রয়েছে, কেবল একটু আলগা করলেই তা ফুলের রেণুর মত উড়বে, ধূপের গন্ধের মতো বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়বে। আর নয়নচাঁদ ক্ষ্যাপার মতো মুঠোভর্তি রেণু পকেটে ভরবে, বড় হাঁ করে সুগন্ধী বাতাস টেনে নেবে বুকের ভেতরে। কাল মুহূর্তের মধ্যে রিক্সাওলা, একজন 'থাড কেলাস আদমী', নয়নচাঁদ, ভীষণ গোপন কিন্তু ভয়ংকর ক্ষমতাশালী একটি বিদ্যার অধিকারী হয়ে উঠবে।

শরীরের যেখানে যতটুকু সাহস ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে নয়নচাঁদ ডাকল, বাবু? একটা কথা নিবেদন করি।

বাবু আপন ভোলা নয়নে স্থির তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, বল।

— আমি বেশ সম্যক বুঝতে পারছি, আপনি একজন বড়মাপের গুণীন।

— ধ্যাৎ! বলে বাবু সুরিয়ার মুখের দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসল, ক্ষ্যাগা পাগলটা কি বলে দেখ!

— পাগল, মাথার গণ্ডগোল যাই বলেন না কেন, নয়নচাঁদের আড়ষ্ট ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে, আজ আপনাকে ছাড়ছি না! বলতে বলতে নয়নচাঁদ চৌকি থেকে একরকম লাফ দিয়ে পড়ল বাবুর পায়ের ওপর। বাবু যেন খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গীতে দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল, ছাড়, ছাড়। ব্যাপারটা কী হয়েছে, খুলে বলবি তো। তা নয়, 'আমি আপনাকে ছাড়ব না' — শেষের দিকটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মতো করে বলল বাবু।

নয়নচাঁদের দুঃখ হল। আবার আনন্দও হল। খাঁটি মানুষ, যাচিয়ে নেবে না! এসব

বিদ্যার অভিচারণপর্বটুকু যে মারাত্মক কঠিন। কতরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তবে না এই মহাবিদ্যাটুকু দান করবে। তাও সবটাই কি আর একেবারে দেবে! রইয়ে সইয়ে দেবে। আজ একটু। কাল একটু। আর প্রতি পদে পদে পরীক্ষা হবে।

সংসার বউ ছেলে মেয়ে কোন পিছুটানে ভুলবে না সে, দেখা যখন একবার পাওয়া গেছে, তখন শেষ না দেখে ছাড়বে না। স্থির প্রতিজ্ঞ নয়নচাঁদ, গদ্‌গদ গলায় বলল, সারাজীবন দাঁতে করে আপনার জুতো বয়ে বেড়াব। জাহান্নামে নিয়ে গেলে, সেখানেও যাব। শুধু একটু দয়া করে ....! কথা শেষ করতে পারল না। গলা ধরে এল কান্নায়।

— শ্রীমতী? বাবু সুরেলা গলায় ডাকল সুরিয়াকে, কী করি বল তো?

— ভগমান জানে। বলে সুরিয়া লম্বা করে হাই তুলল। ঘুম জড়ানো গলায় বলল, লয়নবাবু, আভি আপনা ঘর যাও। বাবুর সাথে আমার বাতচিত আছে।

— ছিঃ! শ্রীমতী, অমনভাবে বলে না। বাবুর গলায় মৃদু শাসনের সুর, নোংরা আবর্জনার কুয়ো থেকে কেউ যদি পাড়ে উঠতে চায়, তার হাত তো ধরতেই হবে।

— তো ধোর। আমার হাত ধোর। খিলখিল করে হেসে উঠল সুরিয়া।

— তুমি তো পাড়েই আছ। আমার সঙ্গে আছ। লীলাখেলার সঙ্গী হয়ে রয়েছ, সেই গত জন্ম থেকে। কিন্তু বেচারী নয়ন! বাবু সামান্য ঝুঁকে নয়নচাঁদের মাথায় আস্তো হাত বুলিয়ে দিল, ও যে আলোয় আসতে চায়।

বাবুর হাতের স্পর্শে নয়নচাঁদের শরীরের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ হল। তার মনে হল এতদিন সে যেভাবে বেঁচেছিল, সেটা নিতান্তই এলেবেলে ব্যাপার। কুকুর বেড়াল হাঁস মুরগীর মতো খুঁটে খেয়েছে। নিজের বেশীটা, ভালটা, ষোল আনার ওপর আঠার আনা আদায় করবে বলে কানে হাত চাপা দিয়ে দুচোখ বুজে থেকেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি কোনদিকে। আর পেট ভর্তি থাকলে উপরি সুখের নেশায় রোঁয়া ওঠা বেড়ালের মত ছোঁক ছোঁক করেছে। বিশেষ কোন ক্ষমতা, যা থাকলে কিনা মানুষ সমীহ করে, শত্রু বশ মানে, অধরা ধরা দেয়, তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে, নিতান্ত আহাম্মকও 'কী এমন' বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। নয়নচাঁদ অশিক্ষিত গরীব। তার ওপর মাতাল জুয়ারি। স্বভাব চরিত্তিও মাজাঘষা নয়। এতগুলি ঘাটতি সত্ত্বেও সে অন্য লোকের সেলাম চায়। শত্রুর বুকে পা তুলে দাঁড়াতে চায়। দেমাকী সুন্দরী মেয়েমানুষকে চোখের ইশারায় ডাকা মাত্রই সে ভীতু ছাগলের মতো ধীর পায়ে এগিয়ে এসে, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াবে তার সামনে, মন ভাল থাকলে, নেশার মাত্রা চড়ে গেলে, এই জাতীয় ভাবনায় টং হয়ে থাকে।

বাবু যেমন সুরিয়াকে নিয়ে ডান হাত বাঁ হাতে লোফালুফি খেলছে, কাছে ডাকছে, শাসন করছে, আবার সোহাগ করছে, ভাল ভাল কথা বলছে, নয়নচাঁদেরও এইসব বিশেষ মুহূর্তের জন্য বাছা বাছা ডায়লগ আছে। আদরের অদ্ভুত অদ্ভুত ভঙ্গী আছে।

নয়ন? বাবু ডাকল, এবার তুমি বাড়ি যাও।

— আপনি বাবু ....! নয়নচাঁদ কাতর গলায় বলল, এভাব তাইড়ে দেবেন না।

— তাড়াচ্ছি কোথায়? বাবু হাসল এবং অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নয়নচাঁদের বগলের তলা দিয়ে নিজের হাত গলিয়ে দিয়ে তাকে চাগাবার চেষ্টা করল, সংসারী লোকের রাত ভোর হওয়ার আগে ঘরে ফিরতে হয়। তোমার বউ হয়ত! বাবু লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, হতভাগিনী দুয়ারপানে চেয়ে থাকতে থাকতে, একটু সময়ের জন্য দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে, চোখ দুটি বুজেছে, আর ঠিক তখনই তুমি ডাকলে তার নাম ধরে!

নয়নচাঁদ তখনও পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি। তার শরীরের উর্ধাংশ এবং পা দুটি, ইংরাজী এল অক্ষরের মতো দেখতে একটি অবস্থানে। বাবুর মুখে নিজের বউয়ের কথা শোনামাত্রই ফাঁদালো মাপের মাংসবিহীন চওড়া একটি মুখের ছবি মনে পড়ল তার এবং মুহূর্তে চাপমুক্ত স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠল, ওই হারামজাদীর জন্যেই জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল বাবু। নয়নচাঁদ সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল, জালের মধ্যে আটকে গেছি। দয়া করে আপনি একটা উপায় করুন।

— সংসারকে জাল বলে ভাবছিস কেন, পাগল! বাবুর গলায় সুর লেগেছে, সংসার হল গিয়ে কেল্লা। কেল্লার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করাই তো সোজা। খাবার পাবি, সেবা পাবি। তাতে শরীর মন দুই-ই ভাল থাকবে। একটুক্ষণের জন্য চুপ করল বাবু। নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে নয়নচাঁদকে দেখাল, আমিও তো কেল্লার মধ্যে রয়েছি। যখনই মন অস্থির হয়, উড়ু উড়ু ভাব জাগে, কে যেন আপনিই ঠেলে বের করে দেয়। তখন ঘুরতে ঘুরতে, খুঁজতে খুঁজতে ঠিক স্থানটিতে এসে হাজির হই। মনের মানুষের দেখা পাই। কেউ হারায় না। বলে বাবু, "হাত ঘোরালে নাড়ু দেব" পুরোপুরি এ রকমটি নয়, এর কাছাকাছি একটি মুদ্রায় হাত দুটি নাড়ল, লুকিয়ে থাকে। সরে থাকে। আবার ঠিক দেখা হয়।

হাত ঘুরিয়ে চোখ নাচিয়ে হুড়মুড় করে বাবু যা বলল, নয়নচাঁদ তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। কিন্তু এবার যে তাকে যেতেই হবে, বাবু আর সুরিয়াকে ঘরে রেখে, পথে পা বাড়াতেই হবে, এ ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। সুরিয়া ঘনঘন হাই তুলছে। শরীর মুচড়ে এমন একটা ভাব করছে, যেন সামান্য একটু কাত হবার সুযোগ পেলেই, পলকে ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে। আচ্ছা, বাবু তখন কী করবে? নয়নচাঁদের হঠাৎই

মনে হল। ঘুমন্ত সুরিয়ার মাথার কাছে বসে নির্নিমেষ চেয়ে চেয়ে বুকের ওঠানামা, শরীরের ভাঁজ-বাঁক, ঠাকুর ঠাকুর মুখ, এইসব দেখবে? নয়নচাঁদ নিজেকেই নিজে ধমকাল, নুনের পুতুল কখনও সাগর মাপতে পারে? মন এখন পাঁদারে পড়ে। আঁধার থেকে দৌড় শুরু করে, আলোয় পৌঁছতে সময় লাগবে বৈকি! এও এক কঠিন পরীক্ষা। চোখ সু দেখবে, আবার কু-ও দেখবে। ভাল ভাবনা দু পা এগোবে, তো মন্দ ভাবনা হ্যাঁচকা টানে চার পা পিছিয়ে দেবে। মুখ 'হরি-হরি' বলবে, মনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে শয়তান এক নাগাড়ে বলে যাবে, 'হর-হর-হর-হর।'

নয়নচাঁদ শুনেছে, সাধু সন্তর বা অষ্ট সিদ্ধাই, ষোল সিদ্ধাই, মোহিনী বিদ্যার অধিকারী কোন বড় মাপের মানুষের দেখা পাওয়া যত না কঠিন, তার চেয়েও কঠিন তাদেরকে সঠিক চিনে নেওয়া। অবিশ্বাস আসবে, সন্দেহ জন্মাবে, কু-চিন্তা কু-ভাবনারা আড়াল করে দাঁড়াবে। এ সব অতিক্রম করা তো যার তার কাজ নয়। কোন ঘটনার অণুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা বা যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো, নয়নচাঁদের মতো চার ছ পয়সার মানুষের এলেমদারি নয়।

— এখেনে, বুঝলে কিনা, নয়নচাঁদ বোঝাল লয়নবাবুকে বা লয়নবাবু নয়নচাঁদকে, মনে যদি বিশ্বাস এসে যায় যে এই সেই, তার চেয়ে খাঁটি আর কিছু নেই। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস যার জন্মেচে, সে-ই মার দিয়া কেল্লা।

সন্দেহ নেই, বাবুর ক্রিয়া কর্ম স্বচক্ষে দেখে, নয়নচাঁদ মুগ্ধ। আর কথাবার্তা, সে ছাই সবটুকু বুঝুক আর নাই বুঝুক, যে সে লোকের মুখ দিয়ে যে এমন বাক্যি বেরোবে না, এ বিষয়ে নয়নচাঁদ নিশ্চিত। সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে লোকে ছাদে পৌঁছায়। এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে বড় রাস্তার দেখা মেলে। এও যেন সেই রকমই হল। অবিশ্বাস সন্দেহ ভয় ঘেন্না সব ঠেলতে ঠেলতে, আসল জায়গাটিতে পৌঁছানো গেল। নয়নচাঁদ নিজেই খুব অবাক হয়ে গেল। সিঁড়ি টপকানো, এ গলি ও গলি হাতড়ে বেড়ানো, এমন মোক্ষম উপমাগুলি তার মতো ক অক্ষর গোমাংসের মাথায় এলো কেমন করে! দুটো চাইতে চারটে পাওয়া গেলে বা কিছু না চাইতেই আধখানা সিকিখানা পাওয়া গেলে, প্রথমে অবাক, তারপরে অপার আনন্দে মন ভরে যায় যেমন, নয়নচাঁদেরও তাই হল। ভেতরের জমাট অন্ধকারের ওপরে আলো পড়েছে তাহলে! 'উড়ু উড়ু ভাব' সেও বুঝি আর খুব দূরে নয়। তখন নয়নচাঁদ, ওই বাবু যেমন বলল, ঘুরতে ঘুরতে ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে সুরিয়া নয়, সুরিয়ার মতো বা তার চেয়েও সুন্দরী

দেমাকী সর্বনাশী কোন নারী, তাকে দেখা মাত্রই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেকে উজার করে দেবে তার পায়ে। তখন নয়নচাঁদ ছেলেখেলার মতো করে সেই নারীকে নিয়ে আমোদ করবে। সামান্য বেচাল দেখলে ধমকাবে, চোখ বড় বড় করে শাসন করবে। আসক্তি কেটে গেলে, মোহ ছুটে গেলে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

আজ যেমন নিজে সে, তখনও এমনই কেউ ফটিকচাঁদ বা কালাচাঁদ তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাতর গলায় বলবে, দাঁতে করে আপনার জুতো বয়ে বেড়াব। সংসার জালে আটকে গেছি। আমাকে উদ্ধার করুন।

নয়নচাঁদ মোটেই ঘোরপ্যাঁচের মানুষ নয়। তার শরীরে যেমন রাগ আছে, হিংসা আছে, আবার দয়া মায়া ক্ষমা, তাও আছে। চারপাশের মানুষজন বড় কাঁদছে। সব কান্নার আওয়াজ তো আর শোনা যায় না। যত রকম কষ্ট, ততরকম কান্নার ভেদ। বুক ফাটিয়ে বাতাস কাঁপিয়ে হাসছে যে, তার চোখের কোণেও টলটল করছে এক ফোঁটা দু ফোঁটা জল।

বাবুর পা জড়িয়ে থাকা হাত দুটি আপনিই শিথিল হয়ে গেল। নয়নচাঁদ নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াল। নির্ভয়ে বাবুর চোখে চোখ রেখে বলল, ছোট মুখে বড় কথা বলব না বাবু, মনে বড় বল দিলেন আপনি। আর .....!

— আর কী নয়ন? বাবুর দু চোখে খুশি উপচে পড়ছে।

— চারপাশের মানুষজন, নিজের বউ ছেলে মেয়ে, সক্কলকে বড় নোতুন মনে হচ্ছে। এ্যাদ্দিন চোখ দুটি যেন বোজা ছিল। ন্যাবা হলে যেমন হয়, সাদাকে কালো দেখে, সরুকে মোটা মনে হয়, ঠিক তেমনি ঝাপসাপারা দৃষ্টি। আপনি বাবু! নয়নচাঁদ বেশ বুঝতে পারল, বুকের ভেতর থেকে খুশির ঢেউ চলকে উঠছে গলার কাছে। স্বর দেবে যাচ্ছে। শব্দেরা সব জড়িয়ে যাচ্ছে, এর পিঠে ওর পিঠে, আমার চোখ খুলে দিলেন।

— নয়ন? বেশ জোরে ডাকলেন বাবু, তবে কি তুমি ......?

— কী বাবু? বিস্মিত নয়নচাঁদ উৎসুকভরা চোখে বাবুর মুখের পানে চেয়ে একই কথা বলল টেনে টেনে, কী বাবু?

— কিছু নয়। হেসে ঘাড় দোলালেন বাবু, পথ চিনে ঘরে ফিরতে, নিশ্চয়ই আর অসুবিধে হবে না।

নয়নচাঁদ এ কথার কোন জবাব দিল না। সে ধীর পায়ে ঘরটুকু পার হয়ে দরজার

কাছটিতে এসে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল, আবার কবে আসবেন বাবু?

— দেখা হবে। চোখ বুজে ধীর স্থির গলায় বললেন বাবু, আবার দেখা হবে। কোথাও না কোথাও, কোন না কোনদিন ঠিক দেখা হবে।

বাবুর এমন পাশ কাটানো জবাবে নয়নচাঁদের মনে কিন্তু কোনরকম সংশয় তৈরী হল না। কোন প্রশ্ন জাগল না। পরিবর্তে 'দেখা হবে' বাবু যখন বলেছেন, তখন দেখা হবেই। এই রকম একটা মজবুত বিশ্বাসে নয়নচাঁদ এতটাই আপ্লুত হল যে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে সুরিয়া আছে, এটা তার মনে থাকা সত্ত্বেও, সে আর পিছন ফিরে তাকাল না।

ঘরের বাইরে এসে নয়নচাঁদ ওপর পানে চেয়ে দেখল, পশ্চিম থেকে যাত্রা শুরু করে চাঁদ, পুব আকাশের কাছাকাছি চলে এসেছে। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর জন্যেই বোধ হয় চাঁদ তার দ্যুতি হারিয়েছে খানিকটা। আবছা ঘষা ঘষা আলোয়, চেনা চারপাশটাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। নয়নচাঁদ লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। সামান্য দূরে তার রিক্সাটি বড় জামরুল গাছটার গায়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। আলো আঁধারীতে মন হচ্ছে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে একজন মানুষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলেই হয়ত খপ করে নয়নচাঁদের হাত দুটি ধরে কাতর গলায় বলবে, আপনার জন্যেই দাঁইড়ে রইছি বাবু। পথ হাইরে ফেলেছি। দয়া করে পথ দেখান।

আপন মনেই ফিরিক ফিরিক করে কয়েকবার হাসল নয়নচাঁদ। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতেই হয়ত রাত শেষ হয়ে যাবে। পুব আকাশে আলো দেখা দেবে। ছানা-কাটা দুধের মতো ঘোলাটে আবছা আলো।

তিন

ঘটনার প্রকৃতি এবং গুরুত্ব অনুসারে, সময়ের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা। কখনও কখনও সময় দ্রুত ছোটে। মনে হয় ঘটনাটি ভাল করে জানবার বা বোঝবার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেল না। আবার কখনও ঘটনাটি আদ্যন্ত জেনে বুঝে, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে, একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরও মনে হয়, সময় ফুরোচ্ছে না।

আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রিয়লালের অত বড় শরীরটা, ক্রমশ ছোট হতে হতে,

এলোমেলোভাবে ছেঁড়া ছোট এক টুকরো কাগজের মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে। প্রিয়লালকে অনুসরণ করার কোন প্রশ্ন নেই। এ অঞ্চলের প্রতিটি রাস্তাঘাট আমি চিনি। এমনকি প্রতিটি মানুষের মুখ চিনি। তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের নামও জানি। অনেকেই, যেমন প্রিয়লাল একজন, আমাকে 'নীরুদি' বলে ডাকে। শুধু 'দিদি' বলেও ডাকে অনেকে।

প্রিয়লালের ডাকে এখন আমি যে অঞ্চলটায় যাবার জন্য বড় বড় পা ফেলে চলেছি, কিছু বছর আগেও সেখানে শহরের নোংরা আবর্জনা, মানুষের বর্জ পদার্থ ইত্যাদি ফেলা হত। মৃত গৃহপালিত পশুর ভাগাড়ও ছিল ওখানে। ওখানকার বাতাস ছিল দুর্গন্ধে ভরা। আকাশ কালো করে উড়ে বেড়াত শকুনের দল। আশপাশে যে কটি বড় গাছ ছিল, দিনের বেলায় উল্টোমুখ করে বাদুড় ঝুলত গাছগুলির শাখা প্রশাখায়। সংখ্যায় তারা এত অজস্র যে মনে হত বাদুড়গুলিই বুঝি গাছের পাতা। হাওয়া দিলে, পাতলা জ্যালজেলে কাপড়ের মতো দেখতে কালো পাঁশুটে রংয়ের বাদুড়গুলি দুলত। বাতাসে গাছের পাতা দুললে যেমন দেখায়, অবিকল সেইরকম দেখাত। গভীর রাতে শকুনের বাচ্ছার কান্না ভেসে আসত। বুকের দুধ না পেলে বাচ্ছারা যেভাবে কাঁদে, হুবহু সেইরকম শোনাত।

আমার বেশ মনে আছে, কলেজে পড়ি তখন, ভাগাড় অঞ্চলটার যে কোনরকম আলোচনায় শরীরের মধ্যে অদ্ভুত কাঁপুনি হত। এমনকি প্রায়ই রাতে কোন কারণে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, এলোমেলো চিন্তার মধ্যে ওই অঞ্চলটার কথা মনে পড়লেই, আপনিই জানলার দিকে চোখ চলে যেত! তখন পরণের শাড়ি, গায়ের চাদর, মাথার বালিশের ঢাকা, যা পেতাম তাই দিয়ে চোখ কান সব চাপা দিয়ে, পা পালিশটাকে সাপটে ধরে কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে থাকতাম। কেবলই মনে হত এখুনি বুঝি ওঁয়া ওঁয়া করে বাচ্ছা ছেলের কান্না হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। নিশাচর বাদুড়ের দল পথ ভুল করে ঝাঁকে ঝাঁকে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে, খাটের ছত্রী, মশারীর চাল, আলমারি আর বুকসেলফের মাথা, ঘরের মেঝে, দেওয়াল, সিলিং, সর্বত্র ছেয়ে ফেলবে। ঘরটা তখন পিচকালো অন্ধকার হয়ে যাবে।

আমার মনে হয়, ওই অঞ্চলটা সম্পর্কে ঠিক এইরকম বা এতটা না হলেও, বিজাতীয় অল্পস্বল্প ভয় আমাদের প্রতিবেশীদের সকলেরই ছিল। হতে পারে একটা প্রান্তে, কিন্তু অঞ্চলটা যে আমাদের এই শহরেরই একটা অংশ, এটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারতাম না। আমাদের যে কেবল ভয় বা ঘেন্না ছিল তা নয়, যথেষ্ট বিরক্তও বোধ করতাম। আমার বাবা, আর্ট স্কুলের মাস্টারমশাই অলোকেশবাবু, স্টেশন হুইলারের

অসিত পাত্র, মুদির দোকানী তারক মণ্ডল, এমনকি দিনমজুর ভগীরথ, ফোকলা গুঁইরাম, সকলে মিলে বসে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করেছিল যে, পঞ্চায়েত অফিসে মিলিতভাবে আবেদন রাখা হবে, নোংরা আবর্জনা ভরা ঐ অঞ্চলটাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। পরিবেশ দূষণের ভাবনাচিন্তা তেমনভাবে সারগোল তোলেনি তখনও। তা সত্ত্বেও তারক মুদি বলেছিল, শীতকালে উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করলে, ভাগাড়ের দুর্গন্ধ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে চটের বস্তা ফুঁড়ে তা চাল নুন চিনির মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ওসব দ্রব্যসামগ্রী নাকের সামনে তুলে ধরলে 'বমন বমন' ভাব আসে। এতে তারক মুদির বিক্রিবাটা কমে যায়। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফোকলা গুঁইরাম বলেছিল, ভাগাড় অঞ্চলের মাটিতে ফাঁদালো মাপের বড় বড় গর্ত দেখেছে সে। গর্তগুলি থেকে সদ্যজাত শিয়াল ছানা মুখ বার করে এদিক ওদিক তাকায়। ভগীরথ, গুইরামকে সমর্থন করেছিল পাকা চুল ভর্তি মাথা নেড়ে, ও গুলোন হল গেয়ে, শেয়ালদের আঁতুর ঘর। বাবা শিয়ালরা মৃত গরু ছাগল কুকুরদের গলাপচা দেহের অবশিষ্টাংশ দাঁতে ধরে টেনে আনে গর্তগুলির মুখে। সেখানে মা শিয়াল আয়েস করে বসে মাংস চিবোয়। থেকে থেকেই আরামের ডাক ছাড়ে, 'ওয়া-ওয়া' করে। মৃত পশুর দেহের ভাগ নিয়ে শিয়াল শকুনের ধুন্দুমার লড়াই দেখেছিল রাজমিস্ত্রি জামাল শেখ। সেই লড়াইয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে বৃদ্ধ জামাল রীতিমত দৌড়ঝাঁপ করে দেখিয়েছিল, শকুনের তাড়া খেয়ে শিয়ালের দল কীভাবে দৌড়েছিল। উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

কেবল অলোকেশবাবু চোখ সরু করে উদাস গলায় বলেছিলেন, ক্ষুধার মতো একটি প্রাচীন প্রবৃত্তির তাড়নায় ভাগাড়ে লড়াই। চমৎকার ছবি হতে পারে। ইতস্তত ছড়ানো মৃত পশুর কঙ্কাল, গলাপচা মাংসের ডেলা। সেগুলিকে ঘিরে একপাশে ল্যাজমোটা ধূর্ত শিয়াল, অন্যপাশে শ্যেনদৃষ্টি হিংস্র শকুনের দল। পটভূমি জুড়ে রাক্ষস-মুখ কয়েকটি গহ্বর, আর ঝাঁকড়া গাছ দুই তিনটি। সময়টা রাত্রিকাল ধরে নিলে ছবিটা আলাদা ডায়মেনশন পাবে। ক্ষয়াটে সরু একফালি চাঁদ যেন এই লড়াইয়ের সাক্ষী। গাছগুলির মাথায়, ছবিটার কোণের দিকে চাঁদ আস্তো ঝুলছে আকাশের গায়ে।

অলোকেশবাবুর বলা শেষ হওয়া মাত্রই বাবা মুগ্ধ গলায় বলে উঠেছিলেন, ফ্যানটাসটিক। ছবিটার নামকরণ হবে 'প্রাগৈতিহাসিক'।

অলোকেশবাবু মাথা নেড়েছিলেন, মন্দ নয়। আমি ভাবছিলাম অন্য একটা নাম, বলে সামান্যক্ষণ চোখ বুজে থেকে আস্তো করে বললেন, 'অনৈসর্গিক অস্তিত্ব'।

বাবাদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তমত সত্যি সত্যি পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়া হয়েছিল

কিনা বা কোনরকম আবেদন রাখা হয়েছিল কিনা, জানি না। তবে দু চার বছরের মধ্যে নোংরা আবর্জনা, দুর্গন্ধে ভরা অঞ্চলটায় প্রথমে তিনটি চারটি, তারপরে দশ বার ষোল কুড়ি করে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটি ছেঁচাবেড়ার ঘর তৈরী হল। অর্থাৎ ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি পরিবার ঘিরে একটি জনবসতি গড়ে উঠল। মানুষগুলি এল কোথা থেকে, কে-ই বা তাদের বসতি গড়ার অধিকার দিল, সর্বোপরি অমন অস্বাস্থ্যকর, অরুচিকর পরিবেশের মধ্যে পাকাপাকি বাস করার দুর্মতি তাদের হলই বা কেন, প্রথম প্রথম এইসব প্রশ্নগুলি আমাকে, রীতিমত দুশ্চিন্তায় ফেলত। মানুষগুলি যে সহায় সম্বলহীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক দুরবস্থার জন্য কিছু মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে বেঁচে থাকবে, তাদের সন্ততিরা বিষবাষ্পে ভরা পরিবেশের মধ্যে বড় হবে, এটা ভাবতে কষ্ট হত।

বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই লোকগুলো আগে কোথায় ছিল?

বাবা ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিলেন, জানি না।

বাবার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। বলেছিলাম, চারপাশের এত জায়গা থাকতে, ওরা ওখানেই বা ঘর করতে গেল?

এবারও বাবা মাথা দুলিয়ে 'জানি না' বা ঐ জাতীয় কিছু বলতে গিয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এ ব্যাপারটায় সতর্ক হতে হবে, সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, আর তাই হেসে আমার মাথায় আস্তো করে হাত বুলিয়ে দিলেন, সব জায়গায় সবাই থাকতে পারে না। মানায় না।

বাবার উত্তরের চালাকিটুকু ধরতে পেরেছিলাম বলেই, উত্তরটা মনঃপূত হয়নি। বরং সেই মুহূর্তে বাবাকে কিছুটা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বলে মনে হয়েছিল। ঠিক কথা, মানুষগুলি শিক্ষা এবং রুচিতে কোন অংশেই আমাদের ধারে কাছেও নয়। কিন্তু মানুষ তো! নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এই পৃথিবীর আলো হাওয়া মাটি আকাশের ওপর আমার যতটা অধিকার এবং সম্ভ্রম আছে, ওই মানুষগুলিরও ততটাই আছে। কেবলমাত্র আর্থিক রূপরেখার ফারাকে, লক্ষ্ণণ খড়ির দাগ টেনে বলতে পারি না, খড়ির দাগের ওপাশে যারা রয়েছে, তারা মনুষ্যইতর জীব।

একদিন ফার্মসাইড রোড ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অয়নকে প্রশ্ন করেছিলাম, ওখানে কারা থাকে? ওখানে কে এদের নিয়ে এল? কেনই বা নিয়ে এল? — এইসব।

আমার পরপর এতগুলি প্রশ্নে অয়ন কৌতুক বোধ করল। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ বড় বড় করে এমনভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল যে, আমি

অপ্রস্তুত বোধ করলাম, প্রশ্নগুলো কি খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে তোমার?

অয়ন হো হো করে হেসে উঠল, মোটেই নয়।

— তাহলে?

আমি ভাবছি, সোসিও স্ট্রাকচার নিয়ে ভাবনা চিন্তা তো যে সে ব্যক্তি করে না।

অয়নের কথায় মৃদু শ্লেষ ছিল। আমার খারাপ লাগল। আমার কৌতূহল উদ্বেগ যদি সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে ছুঁতে না পারে, সে ক্ষেত্রে নিজেকে শুধু বোকা নয়, নিঃসঙ্গ অর্থহীন মনে হয়।

তাড়াতাড়ি বললাম, প্রসঙ্গটা বাদ দাও।

— তুমি রাগ করছ কেন? অয়ন হাসতে হাসতেই বলল, যে বিষয়টা তোমার আমার নাগালের বাইরে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ আছে? যেমন ধর — পাশ থেকে হঠাৎই ঘুরে আমার সামনে দাঁড়াল অয়ন আমাকে আড়াল করে, মহাকাশে কত রহস্য রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেখানে, তুমি আমি তার কিছুই জানতে পারছি না। তাতে আমাদের লাভ যেমন হচ্ছে না, ক্ষতিও কিছু টের পাচ্ছি না। একটু থেমে বলল, তুমি বা আমি, আমরা কেউই গ্যালিলিও কোপারনিকাস আর্যভট্ট বরাহমিহির নই।

আমি লক্ষ্য করেছি, কোন কোন ব্যাপারে অয়ন কথার মারপ্যাঁচে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী করে, তখন সন্দেহ জাগে মনে, বিষয়টা ও আদৌ নিজে জানে কিনা। আবার এর উল্টোটাও মনে হয়। হয়ত ও জানে, কিন্তু আমার মতো অল্পবুদ্ধি, কমজানা একজনকে সেটা জানানো বা বোঝানো অর্থহীন, দুরূহ কঠিন বলেই, শব্দের কোলাজ, রেফারেন্সের ক্যারিওগ্রাফি তৈরী করে, এক ধরণের চালাকি করে।

নিজেকে হঠাৎই খুব অপমানিত মনে হল। রাগত গলায় বললাম, আমার লাভ ক্ষতির ব্যাপারে তুমি কম চিন্তিত হলে খুশি হই।

অয়ন হেসে বলল, সত্যি? তারপর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গিয়ে থেমে থেমে বলল, দারিদ্র্য নিয়ে কেউ কেউ যেমন বিলাসিতা করে, কোন কোন মানুষ বা সংগঠন দারিদ্র্যের বেসাতি করে। হতভাগ্য কিছু মানুষের অভাব অনটন ওইসব ধূর্ত মানুষ এবং সংগঠনগুলির মূলধন। বুঝতে পারলে না?

আমি 'হ্যাঁ', 'না' কোনও জবাব দিলাম না।

— ধর, তোমার অনেক আছে। দু হাতের মুদ্রায় অয়ন স্তূপের আদল গড়ে দেখাল, আমার কিছুই নেই। তোমার 'আছে' ততক্ষণই সুরক্ষিত, যতক্ষণ আমার 'নেই'। এক্ষেত্রে তুমি তোমার সম্পদ, মানমর্যাদা ইত্যাদি আরও বেশী, আরও বড় করার জন্যে আমাকে

একটি ফুটিংস দেবে। কিন্তু ওই অব্দি। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিরাট দূরত্ব থাকবে। আমি ছাল চামড়া খোসাটুকু পেয়ে তোমার বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে তোমার খাসতালুক আগলাবো।

আমি হেসে ফেললাম, তুমি যে কী বলতে চাইছ ....!

— হাসছ কেন? অয়ন রাগত গলায় বলল, আমি তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

— আমার প্রশ্নের উত্তর! আমি সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম।

— হ্যাঁ। অয়ন বেশ জোরে উচ্চারণ করল, ওই লোকগুলিকে নরকে কারা নিয়ে এল, কেন নিয়ে এল, এইসব জানতে চাইছিলে না?

অস্ফুটে বললাম, হ্যাঁ।

— আমি সেই প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছি। গলাটাকে ঈষৎ ভারি করে বলল অয়ন, তারাই এনেছে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যাদের দরকার ওই নিঃস্ব নির্বোধ মানুষগুলিকে। একটু থেমে বলল, হ্যাঁ, তারাই। অয়নের চোখমুখ হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। টানটান গলার শিরা। শক্ত চোয়াল। নিঃশ্বাস ফেলছে এত জোরে যে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অয়ন কেন যে আচমকা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল! আমার সাদামাটা প্রশ্নকে জটিল জটিলতর করে, এখন সুতোর গিঁট খুলতে না পেরে, আমাকে মিথ্যে ধমকাচ্ছে, হাসছ কেন?

— আমার প্রশ্নটা অত্যন্ত সাদাসাপ্টা। আমি বললাম, কে নিয়ে এলো? কেন নিয়ে এলো?

— আমার উত্তরটাও সহজ বোধগম্য। অয়ন যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। পিঠোপিটি জবাবটা দেবে বলে, ভোট নামক একটি মহার্ঘ বস্তু, সংসদীয় রাজনীতিতে যার মূল্য অসীম, সেই মূল্যসূচকটিতে নিশ্চিত করার জন্যেই ওই লোকগুলিকে ভাগাড়ে এনে বসানো হয়েছে। একটু থেমে লম্বা করে শ্বাস টানল অয়ন, এনেছে তারাই, সোকলড্ জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়।

অয়ন যদিও দাবী করল, তার উত্তরটা সহজবোধ্য বলে, আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা একশো ভাগ পরিষ্কার হল না। আমি এখনও অব্দি কোন নির্বাচনেই ভোট দিইনি। ভোটার তালিকায় আমার নাম নথিভুক্ত হয়নি। কিন্তু আমার বাবা মা একাধিকবার ভোট দিয়েছে। অয়ন যেভাবে বলল, সোকলড্ জনগণের ভোট, তার মানে টোটাল প্রক্রিয়াটির মধ্য গন্ডগোল আছে। অজ্ঞতা এবং ধূর্তমি, দুই-ই আছে। যারা ভোট দিচ্ছে, না বুঝে দিচ্ছে।

বা তাদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। অযোগ্য লোক নির্বাচিত হচ্ছে।

অয়নের বিশ্লেষণ পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না। কারণ, মায়ের কথা বাদ দিলেও, বাবাকে আমার কখনই এমন বিবেচনাহীন, অদূরদর্শী মানুষ বলে মনে হয় না যে, চোখ কান বুজে অ আ ক খ, সে চোর বদমাশ লম্পট ধান্দাবাজ যেমন মানুষই হোক না কেন, বাবা তার অনুকূলে ভোট দিয়ে, নিজর সামাজিক কর্তব্য পালন করবেন। অয়ন যে ভাবে বলল, ভোটযুদ্ধে তারাই প্রার্থী হয়, যারা নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিটুকু সুরক্ষিত রাখার বাইরে কানাকড়িও চিন্তা করে না, আর এদেরকে নির্বাচিত করে সেইসব 'সোকলড্ জনগণ' যারা সব বুঝেও কিম্বা কিছুই না বুঝে একই ভুল করে প্রতিবার।

আমার ধারণা ছিল, সাহিত্যের বাইরে অয়ন অন্য কোন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। সামাজিক অসাম্য অনিয়ম সে তো আছেই। আগেও ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীর আবর্তনের মতোই এটা একটা চিরন্তন ব্যাপার। যারা শিল্প সাহিত্য করে, তারা সমাজ বহির্ভূত জীব নয়। সামাজিক অসাম্য, উঁচু নীচু, ধনী গরিবের ব্যবধান এইসব ব্যাপারগুলি যে কোন সচেতন মানুষকে নাড়া দেয়। শিল্পী মানুষদের একটু বেশী করে দেয়। আমি মানি। কারণ তাদের সেনসিটিভিটি অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী। তারা সহজেই রিঅ্যাক্ট করে। তার মানে এই নয়, দু চার জন স্বার্থান্বেষী মানুষের নিরিখে একটি চালু পদ্ধতিকে ভুল আখ্যা দিয়ে, সেই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী সমস্ত মানুষকে অসৎ এবং নির্বোধ ব্যাখ্যা করা যায়। কবি সাহিত্যিক প্রয়োজনে শোষণে পীড়িত মানুষের স্বপক্ষে কথা বলবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা যদি মনে করেন, তাঁরাই ঠিক কথা এবং শেষ কথা বলছেন, সামাজিক অনিয়ম কেবল তাঁদেরকেই নাড়া দিচ্ছে, আর যে বিপুল সংখ্যক অসাহিত্যিক মানুষজন রয়েছে, তারা চোখ বুজে গতানুগতিক পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে যাচ্ছে মানেই, তাদের মনে কোন প্রশ্ন নেই, চেতনায় কোন নাড়া নেই, তারা সমাজটাকে বদলাতে চায় না, এটা মারাত্মক ভুল ধারণা।

চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।

এই লাইনদুটি অয়ন প্রায়ই বলে। ও ভাবে প্রথমবারের মতো আমি প্রতিবারই ওর বলা শেষ হওয়া মাত্রই 'বাঃ' বলে উঠব। আসলে আমার মনে হয় লিরিক্যাল ব্যাপারটা জোরদার বলেই, লাইন দুটি শুনতে ভাল লাগে। কমিটমেন্টের জায়গাটা মোটেই তেমন বিশ্বাস্য নয়। 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন' বা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত', অয়নের মুখে এতবার শুনেছি যে শেষের দিকে একঘেয়ে লাগত। আমাকে

যেটা সবচেয়ে অবাক করত, তা হল, শিল্পীর দায়বদ্ধতা বলতে অয়ন সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলির স্বপক্ষে লেখালিখিকেই বুঝত। শিল্পীর এথিক্স, অয়নের ধারণায় লড়াই সংঘর্ষ এবং ছিনিয়ে নেওয়া। প্রেম বিরহ আস্তিকতা, অয়নের মতে বড্ড সেকেলে। সাহিত্যের আঙিনায় এখন এগুলি শৌখিন মজদুরী। আবার এই অয়নকেই দেখেছি কোন কোন ভাল লাগার মুহূর্তে আস্তো আমার হাত ছুঁয়ে গুনগুন করে গান গেয়েছে, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণতলে। বা কোন কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে হতাশ গলায় নীচু সুরে বলেছে, নো ওয়ান ক্যান ফাইট উইথ হিজ ফরচুন। যার নিজের মধ্যেই এত কনট্রাডিকশন, সে কোন বিশ্বাসে সমস্ত ভোটদাতাকে 'সোকলড্' বোকা অন্ধ মানুষ বলে ভাবে! সমস্ত ভোট প্রার্থীকেই সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভী বলে মনে করে! আমি ভোটের পক্ষে বিপক্ষে কোনদিকেই নই। তাসত্ত্বেও তো ওই মানুষগুলির কথা আমায় ভাবিয়েছে। আর অয়ন; এই ক্ষয়িষ্ণু মানুষগুলির সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা দূরে থাক, 'সোসিও স্ট্রাকচর' 'মহাকাশের রহস্য', গ্যালিলিও আর্যভট্ট সব চমকানো শব্দের ধাঁধা তৈরী করে, একটা উপসংহার টেনে দিল।

এরপর আমি এতটাই সচেতন হয়ে গেলাম যে সামাজিক কোন ঘটনা, তা আমাকে যতই নাড়া দিক না কেন, মানসিক দ্বন্দ্ব, ঠিক বেঠিকের দোদুল্যমানতায় যতই উতলা হই না কেন, অয়নকে তার ছিটেফোঁটাও জানাতাম না। রাগ বা বিদ্বেষ নয়, আমার মনে হত প্রবহমান ঘটনাবলীকে যে যার মতো করে দেখে এবং বিশ্লেষণ করে। আমার সঙ্গে তার বেশীটা মিল বা অনেকটা অমিল দুই-ই হতে পারে। এ ক্ষেত্রে 'কেন' বা 'কেন নয়' প্রশ্ন করে সে আমাকে তার মতের স্বপক্ষে বা আমি তাকে আমার ভাবনার অনুকূলে আনতে পারি না। বড় জোর উভয় উভয়কে ভাবাতে পারি। একমাত্র দ্বিতীয় তৃতীয় কোন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ধারণার রূপান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু আমি যেটা বিশ্বাস করি, যতদিন সেই বিশ্বাস অক্ষত থাকবে, আমার জীবনাচরণে, সৃষ্টিতে, তার প্রতিফলন থাকবে না কেন?

অয়ন আমায় ভাবতে শিখিয়েছে। আমার রুদ্ধ মনের দরজা খুলে দিয়েছে। নিছক ফ্যানটাসির জগত থেকে আমাকে টেনে মাটিতে নামিয়েছে। বাঁচার এবং বাঁচাবার দায়বদ্ধতা শিখিয়েছে। অয়নের কাছে আমি আকণ্ঠ ঋণী। কিন্তু যে ব্যাপারটায় তার দ্বৈত চরিত্র স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে সরাসরি আক্রমণ করতে না পারি, এড়িয়ে তো যেতে পারি। এই একটি বিষয় বাদ দিলে, অয়নকে ভাল লাগার, তার নিবিড় সঙ্গলাভের আকুতি, এসবের আরও অনেক কারণ আছে। আর আছে বলেই, প্রেরকের ঠিকানাবিহীন অনিশ্চয়তায় ভরা মুখবন্ধ সাদা খামটিকে হ্যাঁচটা টানে ছিঁড়তে পারিনি। অবজ্ঞায়, খুঁজে

নাও পেতে পারি, এমন কোন জায়গায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মতো রেখে দিতে পারিনি।

দ্রুত চলার জন্য ঘামে আমার সারা শরীর ভিজে উঠেছে। 'কী দেখব', 'কী হবে' এমনতর উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে অল্প অল্প। বুকের মধ্যে ঢেউ আছড়াচ্ছে। আবার বেশ টের পাচ্ছি নির্জন দুপুরের মুখবন্ধ সাদা খামটি, তার মৃদু কৌণিক খোঁচায় জানান দিচ্ছে — আমি আছি, উন্মোচনের প্রতীক্ষায়।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, পারিবারিক কোন ঘটনা যখন বাড়ির দরজা ফুঁড়ে সশব্দে আছড়ে পড়ে হাটের মধ্যে, তখন সেটা আর কোন একমাত্রিক ঘটনা থাকে না। বহুজনের মধ্যে হরেক মতামত ঘিরে বহুমাত্রিক চেহারা পায়। আর এই জাতীয় ঘটনাগুলি ঘিরে উপস্থিত মানুষগুলির অবস্থান, বিন্যাস, পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী, এমনকি নিরস্ত করার পদ্ধতিগুলি অব্দি হুবহু না হলেও, একটির সঙ্গে আর একটির পর্যাপ্ত মিল থাকে।

শহরের একটি প্রান্তে মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই বসতি যাদের ঘিরে গড়ে উঠেছে, তাদের অনেকেরই নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। যেদিন যা জোটে, যেমন জোটে, সেইভাবে দিন গুজরান। এদের মধ্যে নয়নচাঁদ রিক্সা চালায়। হোটকুপ্রসাদ লরীর খালাসিগিরি করে। সুখরাম পাড়ায় বাড়ায় ঘুরে বোম্বাই মিঠাই, হাওয়া মিঠাই বিক্রি করে। ঈশ্বরীলাল গ্রাম গঞ্জের হাটে ঝুটো পাথরের গয়না বেচে। কুন্তী, বদনের মা, নারানের বউ, বাবুদের বাড়ি বাসন মাজে, সাবান কাচে। এদের পাশাপাশি মাতন ছোটখাট চুরি করে বেড়ায়। এখানে ওখানে দু একবার ধরাও পড়েছে। কিল চড় ঘুসি খেয়ে মুখখানা তার আগের মতো নেই আর। সঞ্জয় শ্যামলাল নীলকমল, এইরকম তিন চারজন আছে, যারা রেল ইয়ার্ডের কয়লা লোহা, পাকুরের স্টোন চীপস, চোরাকারবারীদের দলে ভিড়ে, রাতের অন্ধকারে অন্যত্র পাচার করে। আর. পি. এফদের কোয়ার্টার গিয়ে টাকার হিস্যা, সস্তার মদের বোতল পৌঁছে দিয়ে আসে।

মূল শহরের বাসিন্দা অর্থাৎ আমাদের তরফ থেকে কোন হুঁশিয়ারী দিতে হয়নি। এরা নিজেরাই, গজ মাইলের হিসাবে যতটা দূরে আছে, মেলামেশার ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বড় দূরত্ব তৈরী করে নিয়েছে আমাদের সঙ্গে। শহরের মানুষজনকে দেখামাত্রই এরা আভূমি নত হয়ে সেলাম ঠোকে না। আবার কুরুচিকর মন্তব্য বা বাজে কোন ঝামেলা তৈরী, এসবও করে না। এরা এদের অশিক্ষা অভাব রুচিহীনতা নিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মধ্যে বিরল একটি প্রজাতির মতো বসবাস করে। ভালবাসা শত্রুতা আত্মীয়তা এদের সব কিছুই এই পঁচিশ ত্রিশটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাইরে থেকে কোন আত্মীয় পরিজন কারোর ঘরে আসে না। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একই চৌহদ্দির মধ্যে চেনা মুখগুলি

হয় পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে কিম্বা হাসছে। তা না হলে গলা ফাটিয়ে এ ওর নামে ও এর নামে পরকীয়া প্রেম, গর্ভপাত, এইসব নিয়ে গুলতানি করছে।

এদের সঙ্গে যে আমার গভীর মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা আছে, তা নয়। আমি এদেরকে চিনি। এরাও আমাকে চেনে। অনেকদিনই আমার মনে হয়েছে, শিক্ষা রুচি এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক অবস্থানে যে মানুষগুলি আমার থেকে কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে, টেনে তুলতে না পারি, তাদের দুঃখ কষ্টের সমব্যথী হয়ে, পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আমার অ্যাসাইনড ডিউটি। নিছক ভাবাবেগ বা বৈপ্লবিক কোন শপথ নয়। যেমন আমি আমার দৈনন্দিন কাজকর্ম করি, অবসর সময়ে কবিতার বই বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন পড়ি, মন ভাল থাকলে, রেল লাইনের পাশ দিয়ে একাই হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরে চলে যাই, ঠিক সেইভাবে আমারই মতো কিছু মানুষ, যারা পিছিয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্যও নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারি। তবেই বোধহয় জীবনে জীবন যোগ করা হয়।

অয়ন বলত, ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন মহাপন্ডিত। চৌকাঠের বাইরে এসে বলতে পারেন না, শুকতারাটি আকাশের কোনখানে তাকে। এমন পন্ডিতের আমার প্রয়োজন নেই। 'আমার' বলতে এখানে সমাজের। অয়ন যেদিন প্রথম এই কথাটি বলেছিল, চমকে উঠেছিলাম। খুব মুভড্ হয়েছিলাম। সত্যি তো যে মানুষ নদীর জোয়ার ভাঁটা বোঝে না, বছরের কোন সময় ধান গর্ভবতী হয় জানে না, প্রাত্যহিক জীবনের অতি সাদামাটা বিষয়ে কোন খোঁজখবর রাখে না, অ্যাকাডেমিক্যালি সে যত বড় পন্ডিতই হোক না কেন, তার পান্ডিত্যে সাধারণ মানুষের কী আসে যায়! পরবর্তী সময়ে মনে হয়েছে আঠার বছরের ধর্মই বুঝি প্রচলিত ধ্যানধ্যারণাকে অস্বীকার করা। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা। যে কোন কোয়ালিটিকে তৃণমূলের অনুকূলে কিনা, এই নিরিখে বিচার করা।

একজন মানুষ তার সমস্ত শিক্ষা চেতনা চিন্তা, সাধারণের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, এমন জায়গায় নামিয়ে আনতে পারে না, এমনভাবে সরলীকৃত করতে পার না, যাতে হেঠোমেঠো মানুষ সবাই তার অর্থ বুঝতে পারে। আর তেমন করবেই না কেন? 'দাস ক্যাপিটাল' বা 'লাইফ ডিভাইন' তো সবার বোধগম্য হতে পারে না। না হলেই বা ক্ষতি কি? যাঁরা এইসব বই পড়ে বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় যত অল্পই হোন না কেন, নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ভূমিকা আছে। প্রয়োজনীয়তা আছে। আর তাই এই স্বল্প সংখ্যকদের জন্য এই রচনাগুলির প্রয়োজন আছে। সমাজের কাছে আমি দায়বদ্ধ মানে এই নয়, আপামর সমস্ত শ্রেণীর কাছে দায়বদ্ধ।

আমার বরাবর মনে হয়েছে, এখন আরও বেশী করে মনে হয়, যতটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে, আমি ততটুকুই করব। যত অল্প যত সীমিতই হোক না কেন, কিছু না করার চেয়ে, ওই অল্পটুকু করা তো ভাল। যুক্তি তর্ক আদর্শ দিয়ে বিচার করলে যে কোন ঘটনার, কোন না কোন, কিছু না কিছু মাইনাস পয়েন্ট বেরোবেই। এখন এই ভেবে যদি মনে করি যে, এটা এই মুহূর্তে করা উচিত হয়, সামাজিক অবস্থার এই এই পরিবর্তন ঘটলে বা ঘটনাপ্রবাহ এই দিকে মোড় মিলে তখন এই জাতীয় কাজকর্ম শুরু করা যাবে, তাহলে আমি তর্কবাগীশ, তর্করত্ন এই ধরনের কিছু একটা হতে পারব। ছাগলের আমড়ার আঁটি চিবানোর মতো এই সেই, এটা সেটা, এইসব কচকচানিতে চোয়াল ব্যথাই সার হবে। যুক্তি তর্ক দিয়ে সব জায়গায় পৌছানো যায় না। ঈশ্বরের যুক্তি আছে। শয়তানেরও যুক্তি আছে। কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, ঈশ্বরের চেয়ে শয়তানের যুক্তির ধার বেশী। অয়ন বলত, যুক্তি ছাড়া কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে কোন কমপ্লিট কাজ করা যায় না।

কয়েক বছর আগে, তখন বয়স অল্প ছিল, অয়নের সান্নিধ্যে সাহচর্যে ঘরের বাইরের পৃথিবীটাকে সবে দেখতে চিনতে শিখেছি, নতুন কিছু শুনলেই মনে হত, 'বাঃ দারুণ তো!' বা 'ঠিকই তো। এমনটাই তো হওয়া উচিত।' যদিও একথা ঠিক, রাতে বিছানায় শুয়ে সদ্য শোনা কথাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ করে যেন ফতনায় টান পড়ত। সন্দেহের সামান্য খোঁচা, তর্কের অল্প একটু অবকাশ, নিজের মনেই তৈরী হত। তখন সেই মুহূর্তে হয়ত জল ন্যাকড়া বুলিয়ে শ্লেটে খড়ির দাগ মুছে ফেলার মত করে, অবিশ্বাসের কাঁটাগুলিকে মুছে ফেলতাম। হয়ত ঠিক তার পরে পরে নয়, বেশ কিছুদিন পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল বা এমন একটি প্রসঙ্গ আমাদের মধ্যে আলোচনা হল, যার ডালপালা বেয়ে মুছে ফেলা অবিশ্বাসের কাঁটাগুলি তীক্ষ্ণ মুখ নিয়ে জেগে উঠল একটু একটু করে। মুখে প্রকাশ করতাম না, কিন্তু মনে মনে অধৈর্য হয়ে পড়তাম। মনে হত চীৎকার করে বলি, নিজের মতামত, আদর্শ, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ধ্যান ধারণাগুলি, আমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে কেন, অয়ন? আমি তো বড় হচ্ছি। চারপাশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়ের বোধগুলি আমার মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। আমি তোমার ডামি হয়ে থাকব কেন? তুমিই বা আমার স্পোকসম্যান হবে কেন? 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' — এটা তোমার ব্যক্তিগত অনুভূতি, একান্ত নিজের মনে হওয়া। এর পিছনে যত জোরালো লজিক থাকুক না কেন, ভরা যুবতীর লাবণ্য উচ্ছল চাঁদকে ঝলসানো রুটি ভাবা আমার কাছে কষ্ট কল্পনা মনে হতেই পারে। 'ঝলসানো রুটি', 'চাঁদ

হল কাস্তে' এমনতর উপমার পরিবর্তে যদি আমি 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি, বেনো জলে ভেসে' — এই লাইনটি পড়ে 'আহা', 'বাঃ' বলে উঠি, তাতে কি প্রমাণিত হয়, আমি মানুষটি মূর্খ বড়। মোটেই সামাজিক নই! ক্ষুধার প্রতীক, লড়াইয়ের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার না করে, কেউ যদি চাঁদকে মনোময় মুহূর্তের অনুষঙ্গে একটু অন্যরকম বর্ণনায় আঁকেন বা বুড়ি টুড়ি বলে ভিন্ন কোন মাত্রার সংযোজন ঘটাতে চান, মুহূর্তে সেই কবি বা শিল্পী জনগণ-বিরোধী, ব্রাত্য, অদূরদর্শী, এই ধরনের বিশেষণের শিরোপা পাবেন? তাঁদের সৃষ্টি জীবন বিচ্ছিন্ন, অ-দায়বদ্ধ, শৌখিন মজদুরি বলে গণ্য হবে?

নিজের কাছে সৎ থাকার চেয়ে বড় কোন জোর নেই। গান্ধীজির 'মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ' পড়ে, একটা সত্যে পৌঁছোতে পেরেছি, তা হল, নিজে যেটা বিশ্বাস করি, আমার জীবনাচরণে যেন তার প্রতিফলন থাকে। আমার ভাবনার সঙ্গে, যাপনের অমিল মানেই হিপোক্র্যাসি। তুমি আমার চোখের মণি, আমার হৃদয়। মাস্ট আই মিট ইউ টুমরো, প্রোভাইডেড ইফ ইট ইজ নট রেনিং। কপটতা কী গভীর নিষ্ঠুরতা, ষড়যন্ত্র, যা অবিশ্বাস, অপারগতার চেয়েও ভয়ংকর। এটা বোঝানোর জন্য গল্পচ্ছলে উপমাটি অয়ন শুনিয়েছিল আমায়।

আমি জানি সমাজ ব্যবস্থাটিকে আমূল বদলে দেব, এত বড় ক্ষমতাশালী আমি নই। সমস্ত বৈষম্য, ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে প্রতিটি মানুষকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দেবার মতো ইউটোপিয়ান চিন্তাও আমি করি না। আমি যেটা পারি, আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সাহায্যের হাতটুকুকে বাড়িয়ে দিতে পারি, অন্তজ মানুষটির দিকে। যদি সে সত্যি পাড়ে উঠতে পারে, নিশ্চয়ই জানব, আমার সহযোগিতা এবং তার ভিতরের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, এই দুই মিলেমিশে মানুষটির উঠে আসা।

এর পিছনে সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা, নীতি আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভবিষ্যত ফলশ্রুতির স্থায়িত্ব, এ সবের কোন আবশ্যিকতা, যোগসূত্রতা আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রিয়লালের মনে হয়েছে, নয়নচাঁদ তার বউয়ের ওপর যে শারীরিক নির্যাতন করছে, একমাত্র আমিই পারি সেটা থামাতে। প্রিয়লালের এমন মনে হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। আমাকে ওদের কাছের মানুষ বলে ভেবে থাকতে পারে। বা ওদের অশৌখিন পরিবেশে আমার উপস্থিতি একটা অন্যরকম মাত্রা সংযোজন করবে, যা দেখে নয়নচাঁদ ঘাবড়ে যাবে, ভয় পাবে বা এসব কিছুই নয়, প্রিয়লালের হঠাৎই মনে হয়েছে 'নীরুদিকে ডাকলে কেমন হয়!' — এই ভেবে ছুটে এসেছে। কেন, কী কারণ, অতশত নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়? ভাববই বা কেন? আমার মতো একটি নারী, সে দোষী নির্দোষী যাই

হোক না কেন, আক্রান্ত হয়েছে, নিপীড়িত হচ্ছে, এটা শোনার পর, জানার পর, টিকিধারী পণ্ডিতদের মতো, নারী কুলটা না পরগামিনী, স্বামীর বাধ্য না স্বৈরাচারী, এ নারী সমাজের কোন শ্রেণীকে রিপ্রেজেন্ট করছে, স্বামীর এই বেপরোয়া বিদ্বেষ এবং প্রহারের পিছনে আর্থ সামাজিক কোন কারণ নিহিত আছে কিনা, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এই ঘটনাটির মধ্যে ক্লাস স্ট্রাগলের কোন আভাস আছে কিনা, এত কিছু বিচার বিবেচনা করে, শিখিতে গাঁদাফুল গুঁজে, নৈঋতে মেঘ দেখে, তবেই পা বাড়াব, আমি এ পাঠশালার পাঠক্রমে বিশ্বাসী নই।

চার

ভোররাতে বাড়ি ফিরে নয়নচাঁদ ঘাড় গুঁজরে সেই যে শুয়েছিল, তার বউ ফুলু, কয়েকশবার ঠেলাঠেলি করেও শেষ দুপুরের আগে তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। নেশার ঘুমের সঙ্গে, অচৈতন্যের মতো এই দীর্ঘ ঘুমের এতটাই আকাশ পাতাল ফারাক যে একসময় ফুলু রীতিমত ভয় পেয়ে গেছিল। এ ঘুম আদৌ ভাঙ্গবে তো? শেষে নিরুপায় হয়ে ফুলু, এক বালতি জল এনে, প্রথমে নয়নচাঁদের মাথায়, তারপরে তার সারা শরীরে ঢেলেছে হুড়হুড় করে। জল-দাওয়াই-এ নয়নচাঁদ এক ঝটকায় উঠে বসে, বিশ তিরিশ সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ফুলুর মুখের পানে। তখন তার চোখের দৃষ্টিতে একটা পাগল পাগল ভাব ফুটে উঠেছিল। বউয়ের মুখের দিকে এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন নিবিড়ভাবে আগে কোনদিন তাকায়নি নয়নচাঁদ। ভাল লাগার পরিবর্তে ফুলু ঘাবড়ে গেল। হাতে ধরা পলিথিনের বালতিটা আপনিই খসে পড়ল মেঝেতে। অন্যদিন নেশা ছুটে গেলে ঝিম মেরে বসে থাকে নয়নচাঁদ। মেলাতলার ঘাড় নড়বড়ে বুড়োর মতো মাথাটি ঝুলতে থাকে বুকের কাছে। তখন ফুলু, খ্যানখ্যেনে গলায় নয়নচাঁদের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে থাকে। নেশার মাথায় ঝাঁটা মারে। হাতের ইশারায় খোলা দরজা দেখিয়ে সোজা শ্মশানঘাটে যাবার কথা বলে চীৎকার করে। নিজের কপাল চাপড়ে আত্মহত্যার আগাম জানান দেয়। কখনও আবার ভাতের হাঁড়িটি শব্দ করে মাটিতে বসিয়ে ঝামরে ওঠে, তিল তুলসি দিয়ে পিন্ডি রেঁধে রেখেছি। আরাম করে গেলো। নয়নচাঁদের মাথার মধ্যে পিঁপড়ের সারি হেঁটে বেড়ায় সুরসুর করে। চোখের সামনে আবছা একটা পর্দা ঝোলে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেও কোন জলজলে ভাব টের পায় না। যেটা বলবে ভাবে, পুরোপুরি বলে উঠতে পারে না। মাঝ রাস্তায় খেই হারিয়ে যায়।

আজ কিন্তু এ সবের কিছুই বোধ হলো না। জলের ঝাপটায় ঘুম ভেঙ্গে যেতেই,

নয়নচাঁদ সটান উঠে বসল বিছানায়। বউয়ের দাঁত উঁচু, থুতনিবিহীন চওড়া মুখটা দেখেই চিনতে পারল, এই সেই মেয়েমানুষ, জীবনে যে তাকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। নোংরা আবর্জনা ঠেলে আলোর দিকে ঘুরতে পারছে না, তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অন্যদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে সব কিছু ঠিক ঠিক বুঝে নিতে, চারপাশটুকু চিনে নিতে নয়নচাঁদের খানিকটা সময় লাগে। তখন দৃষ্টিতে সব কিছু ধরা পড়ে না। মাথাটার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে থাকে। শরীরে কোন বল থাকে না।

কিন্তু আজকের দিনটা তো অন্যদিনের মতো নয়। গতকাল রাতে নয়নচাঁদ এক ফোঁটা মদ খায়নি। কোন বেচাল করেনি। কারোর সঙ্গে ওপর নীচ কথা কাটাকাটি হয়নি তার। যা সে স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন, এমন অদ্ভুত আশ্চর্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সারাটা রাত কেটেছে তার। তার মনের গভীরে যে ভয় এবং কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে, কুলুকুলু স্রোতস্বিনীর মতো এমন একটি আকাঙ্খা লুকিয়ে ছিল, সে কি ছাই নিজেই জানত! মনের মধ্যে সলতেটুকু উসকে দেওয়া মাত্রই, জমাট অন্ধকারের ওপর আলো পড়ল। তখন ভয় উড়ে গেল ফুরুৎ করে চড়ুই পাখিটি হয়ে। মনের মধ্যে যেখানে যত পাপ ময়লা ছিল আপনা থেকেই পালাই পালাই শুরু করল। বাবু যেন দুহাতে কচুরিপানা ঠেলে সরিয়ে পানার নীচের টলটলে জল দেখিয়ে বলল, নে ডুব দে।

চার রাস্তার মোড়ের সেপাই যেমন বাঁশিতে ফুর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ করা মাত্রই, হাঁ হাঁ করে ছুটে আসা বাস লরী সব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন অন্ধ মানুষ, অথর্ব বৃদ্ধ, সদ্য হাঁটতে শেখা দুধের শিশুটিও নিশ্চিন্ত মনে রাস্তা পার হয়ে যায়, বাবুও ঠিক ওই সেপাইয়ের মতো হাতের একটু ছোঁয়ায় মন্দ ভাবভাবনাগুলিকে থামিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে দিল। ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে নয়নচাঁদ দেখতে পেয়েছে লাল টকটকে সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে, তার শরীর কেঁপে উঠল। ঠিক ভয় নয়, আবার আনন্দও নয়, একটি অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন।

গতকাল রাতে যখন সে বাড়ি ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছিল, তখন পুব আকাশের সীমানা পেরিয়ে, পশ্চিমের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চাঁদ। সদ্য ঘুম ভেঙ্গে নয়নচাঁদ দেখছে পশ্চিম আকাশে কাল যেখানে সে চাঁদকে দেখেছিল, আজ সেখানে সূর্য দাঁড়িয়ে। চরাচর ছেয়ে গেছে গাঢ় গোলাপী আলোয়। আর সেই আলোর রেণু এসে পড়েছে তার বউয়ের মুখের ওপর।

এত দীর্ঘ সময় সে ঘুমিয়েছিল। যখন চাঁদ সূর্য নিজেদের অবস্থান বদল করে নিয়েছে! কালনিদ্রা মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। নয়নচাঁদ কিন্তু কিছুই ভোলেনি। পরিবর্তে বাবুর সব কথার অর্থ, যা সে সেই মুহূর্তে বুঝতে পারেনি, ধরতে পারেনি, এখন সেই সব জটিল জটিল বাক্যগুলি জলের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে। 'কেল্লা' মানে 'সংসার'। সংসারের মধ্যে থেকে যা কিছু করতে হবে। সময়ে খাওয়াটি জুটবে, ঘুমোবার বিছানাটি পাওয়া যাবে। আবার মনে 'উড়ু উড়ু' ভাব জাগলে দু চার দিনের জন্য সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়েও পড়া যাবে। ফিরে এসে দেখবে, সব ঠিক ঠিক নিয়মেই চলছে। বউ ছেলে মেয়ে আগের মতোই অনুগত। বরং তোমার অনুপস্থিতিতে দুর্ভাবনায় তাদের চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। কোন কথা না বলে, তুমি চুপচাপ বসে থাকলেও তারা ভুলেও রা কাটবে না মুখে। তোমাকে আড়াল আবডাল থেকে দেখবে। পারলে তোমার পায়ে মাথা কুটে দিব্যি করিয়ে নেবে, আর তুমি কখনও এভাবে তাদের চিন্তায় ফেলবে না।

এই যেমন ফুলু, এমন কাতর চোখে নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছে যেন নয়নচাঁদ একবার তার নাম ধরে ডাকলে, সে হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করবে। ছেলেমেয়েগুলি ভয়ে ঘরেই ঢুকছে না। এমনকি নয়নচাঁদের বুড়ি মা, দিনরাত নাকী সুরে বিনবিন করে কেঁদে যাওয়া যার কাজ, সেও কেমন চুপ করে গেছে। অসময়ে বাড়ি ঢুকে, দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থেকে এবং ঘুম ভেঙ্গে উঠে, প্রতিদিনের পরিচিত গতের বাইরে, একটু অন্যরকম আচার আচরণ করে, নয়নচাঁদ এমন একটা আবহাওয়া তৈরী করে ফেলল, কিম্বা আপনা আপনি যেটা হয়ে গেল, তাতে তার খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রইল। সিদ্ধ পুরুষদের এক কাঁচ্চা কৃপা লাভ করলে, কী না হয়। চোখের চাউনিতে ধার আসে। খইয়ের দানার মতো চড়বড় করে বোল ফোটে মুখে। যে সে বাক্যি নয়। তখন এক কথার যোল ধারা অর্থ হয়। উজির বাদশা মাপের লোকও সেই কথার যাদুতে আটকা পড়ে।

অন্যদিন নয়নচাঁদ ব্যোম ভোলার মতো বসে থাকলে, ফুলুর মুখ নর্দমা হয়ে যায়। দুম দুম পা ঠুকতে ঠুকতে ঝাঁটা হাতে এমন বিক্রমে তেড়ে আসে, যেন ঠিকমত এক ঘা বসিয়ে দিতে পারলে, নয়নচাঁদ আরশোলা উচ্চিংরের মতো হাত পা উল্টে চিত হয়ে পড়ে, দু চারবার নড়াচড়া করে স্থির হয়ে যাবে। কোন যাদুবলে আজ সব উল্টে গেছে। ফুলুর চিল চীৎকার নেই, মায়ের বিনবিনে কান্না নেই। ছেলেমেয়েগুলির ছায়া দেখা যাচ্ছে না।

নয়নচাঁদের মনে হল, নতুনভাবে কিছু শুরু করতে হলে, এই মুহূর্তটিই যথার্থ, যথাযথ। বাড়ির লোক জানুক, এতদিন তারা যে মানুষটিকে ছেলে, স্বামী এবং বাবা বলে

জেনে এসেছে, আসলে সে এসবের উর্দ্ধে। সংসারে আছে, তাই সাংসারিক সম্পর্ক ধরে কিছু পরিচয়। এগুলি খোলস। আপনিই খসে যাবে। তখন কেউ ভাববে নয়নচাঁদ মানুষের বেশ ধরে সংসারে রয়েছে। আসলে সাধু দরবেশ। কেউ বলবে, সংসারে সং সেজে রয়েছে। গোড়া শক্ত হয়ে গেলে তো ছাগলে মুড়োতে পারবে না।

দু চোখ বুজে বাবুর মুখটা একবার স্মরণ করে নিল নয়নচাঁদ। তারপর তার মুখের পানে অপলক চেয়ে থাকা তার বউ, ফুলুকে ডাকল, শ্রীমতী, কাছে এসো। এই ঘরটা হল গে বাগান। এখেনে গাছে গাছে অনেক ফুল ফুটে আছে। এসো আমরা দুজনে ফুল কুড়োই।

কথা শেষ করে নয়নচাঁদ হাসি হাসি মুখ করে দু হাত সামনে বাড়িয়ে ধরল। চোখের ইশারায় ফুলুকে তার কাছে এগিয়ে আসতে বলল। আপ্লুত হওয়ার পরিবর্তে ফুলু এতটাই ভয় পেল যে সে প্রথমে মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ লম্বা একটি আওয়াজ করল, চিঁ-ই-ই। তারপর দৌড়ে পালিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই নয়নচাঁদ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ফুলুর পরণের শাড়ি টেনে ধরল, পালাচ্ছ ক্যান? তুমি তো আমার সখী।

নয়নচাঁদের চোখেমুখে কোন যৌন হিংস্রতা নেই। সে কথা বলছে ধীর গলায়। থেমে থেমে। বরং কদাচিৎ যা দেখা যায়, সেই বিরল হাসিতে সারা মুখ ছেয়ে রয়েছে। হাসির দৌলতে শ্বাস পড়ছে ধীর লয়ে।

নয়নচাঁদের এই অভাবনীয় পরিবর্তনে, তার বউয়ের খুশি হওয়ার কথা। স্বামীর সোহাগ কোন স্ত্রী না চায়? বেয়ারা স্বামীর অন্যরকম আচরণে স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগতে পারে। অবিশ্বাস আসতে পারে। তা বলে ভয়! ফুলুর ক্ষেত্রে কিন্তু শেষেরটিই হল। সে মনে মনে ভাবল, নয়নচাঁদের নেশার মাত্রা অন্য সব দিনের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। মাথার ভেতরের তারগুলি সব জড়িয়ে পাকিয়ে গেছে। আর তা না হলে নয়নচাঁদ নির্ঘাৎ কোন ডাকিনী যোগিনী টাইপের মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে, সেই সর্বনাশী রাক্ষুসী সোহাগ করার ছল করে জলজ্যান্ত মানুষটার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। দু পেয়ে নয়নচাঁদ চার পেয়ে জন্তু হয়ে গেছে।

ভয়ের দোসর কান্না। ফুলু ধরা গলায় বলল, তোমার এমন সব্বোনাশ কে করল?

নয়নচাঁদ মুচকি হেসে ঘাড় দোলাল, সব্বোনাশ বলছ কেন শ্রীমতী? বল, এমন উবগার কে করল। কে আমায় ঠিক ঠিক সব চিনিয়ে দিল। পথ বাতলে দিল। একটু থেমে বলল, সে কি যোদো মোদো মার্কা যে সে মানুষ! সে হল গেয়ে ...।

নয়নচাঁদের চোখ দুটি আধ বোজা অবস্থায়। হাসি উপচে পড়ছে ঠোঁট বেয়ে, চিবুক

বেয়ে। মাথাটি আপনা আপনিই দুলছে অল্প অল্প। সে খেয়াল করেনি, নিশ্বাসের ছোঁয়া পাওয়া যায়, ফুলু তার এতটা কাছে চলে এসেছে। আচমকা সরু হাড় সর্বস্ব হাত দুটি দিয়ে ফুলু নয়নচাঁদের দুটি পা জড়িয়ে ধরে ককিয়ে কেঁদে উঠল, তোমার এমন দশা কে করল!

নয়নচাঁদ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, ঠিক কথা। কিন্তু সেটা তো মাতালের ঘোর নয়। সে তো চার আনার মদ গিলে দশ আনা বাওয়ালি করছে না। সূর্যের আলোক ছটায় ফুলের পাপড়ি মেলার মতো নতুন নতুন ভাবের উদয় হচ্ছে তার মনে। কেউ যদি সেটাকে মাতালের প্রলাপ বলে মনে করে, সে ক্ষেত্রে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। মুহূর্তে নয়নচাঁদ রেগে উঠল। মশা মাছি তাড়ানোর মতো করে, হাতের ঝটকায় ফুলুকে ঠেলে দিল, ভাগ। সেই ঠেলায় ফুলু একটু কাত হয়ে গেল। গলাটাকে বিকৃত করে নয়নচাঁদ বলল, মনের মধ্যে গু গোবরের মানজা দিচ্ছে, একটু চুপ করে থেকে বলল, ভাল কথার নাগাল পাবি কি করে?

হতছেদ্দার ভঙ্গীতে ঠেলে দেওয়ার ব্যাপারটা ফুলুর খুব মনে লাগল। আজ অব্দি সে নয়নচাঁদের বহুমুখী অত্যাচারও কম সয়নি। সারাদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে এই অভাবের সংসারটিকে মূলত সে একাই টেনে নিয়ে চলেছে, ভাবনায় চিন্তায়। গায়ে গতরে। কোন কোন রাতে ভরপুর মাতাল স্বামীর যৌন সংসর্গের নামে শারীরিক নিপীড়নটুকু ছাড়া, মনে রাখার মতো কোন ঘটনাই নেই তার জীবনে। ফুলু মোটেই নষ্ট চরিত্রের মেয়ে নয়। বরং কোন কোন অলস মুহূর্তে চোখের পাতা বন্ধ করে সে একটি ভিন্ন স্বাদের জীবনের ছবি আঁকে মনে মনে। তার স্বপ্নের জগতে এই বস্তিটার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। সেখানে ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো কয়েকটি মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি দেওয়া। সবুজ মাঠ। মাঠ ভর্তি ফসল। গরু ডাকে হাম্বা করে। উঠোনে ধান খুঁটে খায় পায়রার দল। মাটির দাওয়ায় চালের গুঁড়ো বেটে আলপনা দেয় তার মেয়ে। তার ছেলে বাপের হাতে দড়ি দড়া বাঁখারি এগিয়ে দেয়, জীর্ণ গোয়াল ঘরটির মেরামতির কাজে। হাঁটুভর জল একটি নদী দেখতে পায় ফুলু। অন্য বাড়ির মেয়ে বউদের সঙ্গে সেই নদীর জলে আদুল গায়ে হাঁটু ডুবিয়ে বসে এ ওর গায়ে জল ছেটায়। হি-হি করে হাসে। কিন্তু কেউ কোন খারাপ কথা বলে না।

ফুলু তার এই গোপন স্বপ্নের কথা কাউকে বলে না। বললেই বা শুনছে কে? তার বিশ্বাস, আজ না হোক কাল বা তারও অনেক পরে, এমন একটা দিন আসবে, যখন এই অঞ্চলটার চেহারা আমূল বদলে যাবে। তখন এখানকার ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। স্কুলে যাবে। পুরুষ মানুষগুলি নেশা করবে না। অকারণে বউদের ওপর শারীরিক

নির্যাতন করবে না। চীৎকার করে খারাপ খারাপ কথা বলবে না কেউ। কীভাবে এমন সব ঘটবে, তা ফুলু জানে না। এমনকি সেদিন সে নিজেও যে বদলে যাবে অনেকখানি, এর জন্য কেউ তাকে শুধরে দেবে, নাকি কালবৈশাখীর মতো আচমকা প্রলয়ংকর কিছু ঘটবে, শুকনো পাতার মতো যা কিছু খারাপ, ক্ষতিকর সব উড়ে পুড়ে যাবে সেই ঘটনার তোড়ে — ফুলুর ছোট মাথা সমাধানের সূত্র খুঁজে পায় না। এমনটা হলে বেশ হয়। হয়ত হবেও একদিন, এই বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে ধরে, ফুলু খারাপ কথা শোনে। খারাপ কথা বলে। নয়নচাঁদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। আবার নয়নচাঁদকে তেড়েও যায়, ঝাঁটা উঁচিয়ে ধরে।

নয়নচাঁদের কাছে যেমন, ফুলুর কাছেও তেমনি, অন্য দিনগুলির তুলনায় আজকের দিনটি অন্যরকম। নয়নচাঁদের হাবভাব, চোখের চাউনি, মুখের ভাষা, এমনকি ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গীটি পর্যন্ত সব কেমন দুর্বোধ্য, অচেনা। নয়নচাঁদও যতই ভাবছে, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। ফুলুর মধ্যে আজ কোন ঝাঁঝ নেই। আবার সোহাগী গদগদ ভাবও নেই। বিয়ের প্রথম প্রথম ছাড়া স্মরণাতীত কালের মধ্যে সে ফুলুকে কাঁদতে দেখেনি। নয়নচাঁদের ভালমন্দ নিয়ে এমন অসহায় বিচলিত হতেও দেখেনি। তার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেটে এমন একটা ভাব করছে, যেন সত্যি সত্যি নয়নচাঁদের সর্বনাশ হয়ে গেছে!

নয়নচাঁদের আফশোস হল, মেয়েমানুষটা পাঁকেই পড়ে রইল। চাইছেও ওখানেই থাকতে! টেনে তুললেই তো হল না। তোমার যেমন, তার মনটিরও তো তেমনই রদ বদল হওয়া চাই। বাবুর মুখের পানে সুরিয়ার অপলক চেয়ে থাকা, বাবুর ডাকে নরম সুরে জবাব দেওয়া, এই দুটি বিষয় মনে পড়তেই নয়নচাঁদের মন খারাপ হয়ে গেল। আড়চোখে ফুলুকে দেখল। লাট খাওয়া ঘুড়ির মতো মেঝেতে পড়ে রয়েছে। হাড় কখানির ওপর চামড়ার পাতলা আস্তরণ মাত্র। খাঁজ ভাঁজ উঁচু নীচু, কিচ্ছু নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার ধকলে পিঠের শিরদাঁড়াটির ওঠানামা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নয়নচাঁদের মনে যেটুকু বৈরাগ্যভাব জেগেছিল, মুহূর্তে উবে গেল কর্পূরের মতো। এইসব হাঁড়ি ডেকচি লটবহর নিয়ে চলা তো দূরের কথা, একটি পা ফেলাও সম্ভব নয়। ভুল করে ভোর হচ্ছে ভেবে, সূর্যোদয় দেখবে বলে, কেউ যদি হাঁটতেই থাকে, হাঁটতেই থাকে এবং হঠাৎ বুঝতে পারে, সময়টাকে চিনতে পারেনি, আসলে রাত্রি গভীর, তখন না পারে সে সামনে পা বাড়াতে, না পারে পিছন ফিরে ঘরে ফিরতে। নিশীথ রমণীর কুহক ফাঁদে আটকে পড়া মানুষটি তখন দিশেহারার মতো আচরণ করে। নয়নচাঁদের ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরুর ব্যাপারটা সত্যি হলেও, গহিন রাতকে ভোর ভাবার মতো

কোন ভুল ঘটেনি। ফুলু যে কখনও সুরিয়া হতে পারে না, এ বিশ্বাসটি তার খাঁটি। তবু তার মনে হয়েছিল দোমড়ানো মোচড়ানো ফুলুকে যদি খাড়া করে দাঁড় করানো যায়, হাত ধরে দু পা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, ব্যাপারটা পাঁচজনের নজরে না এলেও, কোন ক্ষতি নেই। নিজের ওপর বিশ্বাসটুকু তো বাড়বে।

শাসন তর্জন গর্জন জোর আব্দার যেমন, ভালমন্দ, লাভ ক্ষতির যাচাইটুকুও তেমনই আপনার জনের ওপর করাই ভাল। হল তো ভাল। না হল, না হল। জবাবদিহি করা, দোষী সাব্যস্ত হওয়া, এসবের ভয় ভাবনা নেই।

নয়নচাঁদের পোড়া কপাল। ফুলু সেই যে কাঁদতে শুরু করেছে, থামার কোন লক্ষণ নেই। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ভাল কথায় বোঝাতে গেলে, বুঝবে তো নাই, উল্টে নয়নচাঁদকে ভুল বুঝে, হঠাৎই হয়ত মাদী বেড়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে গর্জে উঠবে। চেল্লামেল্লি করে লোক জড়ো করে দেবে।

নতুন পথে পা বাড়িয়ে অনেক দূর যেতে হবে নয়নচাঁদকে। চুপিসারে, কাউকে কিছু না জানিয়ে। তার চারপাশ ঘিরে যারা রয়েছে, তারা তো পাঁকের মধ্যে ডুবে এ ওর পা ধরে টানছে। আর ভাবছে বেশ আছি। খাসা আছি। নয়নচাঁদের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিছু ঘণ্টা আগে সেও ওই মানুষগুলির মতো কিলবিলে পোকামাকড়টি হয়ে, ছোট্ট একটি পরিধির মধ্যে হাত পা নাড়ছিল। শুঁড় পাকাচ্ছিল।

নয়নচাঁদ বেশ জোর গলায় ফুলুকে ধমকে উঠল, ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না। যা বলছি, মন দিয়ে শোন। তাতে তোর উবগার হবে। ফুলু ড্যাবডেবে চোখে নয়নচাঁদের মুখের পানে তাকাল, খ্যাপা পাগলের মতো চেল্লাচ্ছ কেন? ঘরের মধ্যে বাগান এল কমনে? একটু থেমে গলাটাকে সামান্য নামিয়ে বলল, আমি তো বে করা বউ। নাকি লাইন বাজারের মাগী? যে সুখি সুখি বলছ?

— কী? কী? নয়নচাঁদ তেড়ে এল, লাইন বাজার, মাগী, এসব কী কথা? মুখ তো নয় যেন গুয়ের ডাবা।

— বেশ তো। ফুলু সোজা হয়ে বসল, মরতে এখেনে এলে কেন? ঝিমধরা গলাটাকে রীতিমত চড়ায় তুলে বলল, সারারাত যেখানে ফুত্তি মারলে, সেখেনে বাজ্যে করতে দিল না বুঝি?

নয়নচাঁদকে পিছন থেকে কে যেন ঘা মারল অতর্কিতে। সু-ডাকের যে এমন কু-সারা হতে পারে, তার ধারণার মধ্যে ছিল না। সে লাফ দিয়ে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আর একটি বাক্যি খসালে জিব ছিঁড়ে নোব।

ন্যাতার মতো পড়ে থেকে ফুলু এতক্ষণ যেন অভিনয় করছিল। আসলে সে যে মোটেই ঘাবড়ে যায়নি, ভয় পায়নি, এটা বেশী করে ভাল করে বোঝাবার জন্যই, 'তবে রে' বলে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক এমন দেখতে লাগল, যেন মনোমত একটি হাতিয়ার খুঁজে পেলে, সেটির জোরে এখনই নয়নচাঁদকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। তার আগেই নয়নচাঁদ ফুলুর চুলের মুঠি খামচে ধরে এমন জোরে ঠেলে দিল যে, টাল সামলাতে না পেরে ফুলু ঘরের দরজা ফুঁড়ে উঠোনে এসে আছড়ে পড়ল। দুজনের রাম রাবণের যুদ্ধ, এ অঞ্চলে হামেশাই দেখা যায়।

দেখার মতো বা শোনার মতো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু নয়নচাঁদের বিক্রমে ফুলু রীতিমত আওয়াজ করে যেভাবে উঠোনে এসে পড়ল ধপ করে, তাতে অতি বড় অভ্যস্ত চোখ, সটে পড়া কানও চমকে উঠবে। হাত দুটো বেঁকেচুরে একটি পিঠের নীচে অন্যটি পেটের ওপরে। চোখ দুটি খোলা এবং স্থির। মুখ অল্প ফাঁক। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। দেহটি এমন স্থির। পরনের লুঙ্গিটি কষে বেঁধে, নয়নচাঁদও তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তারপর কোনরকম বোঝাবুঝির আগেই সজোরে লাথি চালাল ফুলুর পিঠ লক্ষ্য করে। বড় মাছের ফুট কাটার মতো ফুলু গপ্ করে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। চোখ দুটি বুজে গেল আপনা থেকে। কোনরকম প্রতিরোধ নেই, পালাবার চেষ্টা নেই, এসব দেখেও নয়নচাঁদের রাগ কিন্তু কমল না। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সে ফুলুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে লাগল, মুখে মুখে চোপরা? ভাল কথা মনে ধরে না? যেটুকু যোগাড় যন্তর হয়েছিল, গুচ্যেছিলাম, পাঁক ঢেলে দিল সব ময়লা করে। — নয়নচাঁদ চীৎকার করে এমনভাবে বলতে লাগল, যেন ফুলু সব শুনছে। এখুনি উঠে বসে, হয় পাল্টা চেঁচাতে শুরু করবে, তা না হলে নিজের দোষ অন্যায় বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়বে কান্নায়। নয়নচাঁদের মতো ফুলুও যদি গলা চড়িয়ে সমান তালে চেঁচাত, ব্যাপারটা মোটেই বেমানান হতো না। ইতিমধ্যে চার পাশের যে মানুষগুলি ছুটে এসে ভিড় করেছে, ঘটনাটা তাদের কাছেও অভিনব আনকোরা ঠেকত না। এক্ষেত্রে নয়নচাঁদ একাই চেঁচাচ্ছে হাঁ হাঁ করে এবং এমন তীব্র উত্তেজনাতেও সে কিন্তু কাঁচা খেউর করছে না। বরং তার কথায় ভদ্দরলোকের পালিশ রয়েছে। শোনাচ্ছেও নতুন নতুন এবং সে যে বেশ কষ্ট থেকেই এসব কথা বলছে, গলার স্বরেই তার ছোঁয়াচ রয়েছে। এদিক ওদিক থেকে যারা দৌড়ে এসেছে, তারা অবাক হয়ে দেখল নয়নচাঁদ তার বউয়ের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে। একনাগাড়ে বকে যাচ্ছে। আবার থেকে থেকেই বাঁ হাতে নিজের

কপাল চাপড়ে বিড় বিড় করছে, বাবু বলেছিল, নয়ন, ঘরে পৌছে দিয়ে আসি। তখন বুঝিনি। পাড়ে এসে নৌকো ডুবে গেল।

গিরিধারী ভঞ্জ এ অঞ্চলের সবথেকে বয়স্ক লোক। সে তার অশক্ত হাতে নয়নচাঁদের কাঁধ খামচে ধরে টানল, বউটা যে মরে যাবে রে! এমন লিদ্দয়ের মতো মারে!

— মরুক। নয়নচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে গর্জে উঠল। চারপাশের মানুষজন একটু ছেৎরে গেল। অতিরিক্ত কাঁদলে যেমন চোখ দুটি লাল টকটকে জবা ফুলের মতো হয়ে ওঠে, নয়নচাঁদের দু চোখ তেমনি রক্তবর্ণ। উত্তেজনায় ঘাড়ের কাছের একটি শিরা দপদপ করছে। চামড়া ফুঁড়ে সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফুলু ঘাড় মুখ গুঁজরে এমনভাবে পড়ে রয়েছে যেন সে সত্যি মরেই গেছে। শাড়ি এলোমেলো হয়ে গেছে। ব্লাউজের সেফটিপিন খুলে গিয়ে বুকটা উদোম হয়ে গেছে। রং কানাইয়ের বউ হঠাৎ ককিয়ে উঠল, মেয়েটা মরে গেল নাকি লো? এট্টুস জল নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। নয়নচাঁদ চাপমুক্ত স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠল, মায়া দেখাতি আসবে না কেউ। মায়া হল গে মহাপাপ। 'পাপ' শব্দটির সঙ্গে কমবেশী সকলেই পরিচিত। কিন্তু 'মায়া' জিনিসটা কি। কেউ বুঝতে পারল না। নারান হাঁসদা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'তোমার বউ তুমি ঠ্যাঙাচ্ছ। এ হল গে আইন। ল্যায্য বিষয়। কিন্তু আমাদিগের মায়া বলে গাল পাড়ছো ক্যান? হাজত পুলিশ হলে কেউ সাক্ষ্য দেবে না।

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। নয়নচাঁদ রুক্ষ্ম গলায় বলল।

তারপর সে সত্যি সত্যি কতটা হিম্মৎ রাখে বা রাগটা তার কোন পর্যায়ে চলে গেছে এটা দেখাবার জন্যই যেন ফুলুর দেহটা মাটি থেকে টেনে তুলে প্রথমে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। সেটা অসম্ভব বুঝে মেনি বিড়ালের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো করে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কয়েক পা নিয়ে গিয়ে দূরছাইয়ের ভঙ্গীতে ঠেলে দিল। অসমতল মেঝেতে জলের ঘড়া যেমন উল্টে পড়ে ঢুস করে, ফুলু সেইভাবে পড়ে গেল। যেন তার চোখ জড়িয়ে গেছে ঘুমের আঠায়। স্থান কাল ভুলে সে শুয়ে পড়ল। মুহূর্তে তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

নয়নচাঁদ কড়া চোখে তাকাল। তাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মুখের দিকে। ওয়াক করে থুথু ফেলল এক দলা। নয়নচাঁদের এমন মারকাটারি চেহারা এ তল্লাটের কেউ দেখেনি আগে। তার ক্রোধ যে কেবল ফুলুকে ঘিরে তা নয়। যারা ছুটে এসেছে, তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে,তাদের ওপরও তার ভীষণ রাগ। তার সঙ্গে ঘৃণা বিদ্বেষ। থুথু ফেলার মধ্যে দিয়ে সে সেটাকে আরও প্রকট ও নগ্ন করে দিল। ছোটরা না পারলেও,

বয়স্করা ব্যাপারটা ধরতে পারল। কিন্তু নয়নচাঁদের 'রণং দেহী' মূর্তির সামনে কেউ মুখে 'রা' কাটবার সাহস করল না। আবার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়ায়, বউটা হঠাৎ উঠে বসে পাল্টা ঘা মারে কিনা বা সত্যি সত্যি একটা অঘটন কিছু ঘটে যাক, আর পুলিশ এসে নয়নচাঁদকে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাক, এরকম কোন একটি সমাপ্তির ঔৎসুক্যে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত একটি পুরুষ এবং নারীকে ঘিরে একদল মানুষ কী হয় কী হয় উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় চারপাশ জুড়ে খাবলা খাবলা অন্ধকার। এতগুলি মানুষের ছায়া। দলছুট একটি কাক এলোমেলো উড়ে উড়ে তারস্বরে ডাকছিল কা কা করে।

প্রিয়লাল যে কারোর সাথে কোনরকম আলাপ আলোচনা না করেই আমায় ডাকতে এসেছে, সেটা বুঝতে পারলাম, ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা দেখে। দু'চার জনের কপালে ভাঁজ পড়ল। কয়েকটি মাথা পরস্পরের এতটা কাছাকাছি এমন ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে দাঁড়াল যে, মিলিতভাবে একটা বড় মাথার মতো দেখাতে লাগল। অল্প বয়সী কয়েকটি মেয়ে সরে গিয়ে আমায় জায়গা করে দিল যেন সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখাটা আমার খুব জরুরী। ভালভাবে ইনভেস্টিগেশনের জন্য খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখা আমার একান্ত দরকার। তা না হলে অনুসন্ধানী রিপোর্টে ফাঁক থেকে যাবে। সমস্ত জায়গাটা হঠাৎই খুব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রিয়লালকে দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য! যে আমায় ডেকে নিয়ে এল, যার কথার ওপর ভরসা করে আমি ছুটে এলাম, এভাবে তার বেপাত্তা হয়ে যাওয়াটা মোটেই ঠিক কাজ হয়নি। সত্যি সত্যি কী হয়েছে, কতটা হয়েছে, আমি এসবের কিছু জানি না। যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা যে অনভিপ্রেত এবং ইনহিউমেন একটি ব্যাপার, এই ভেবেই ছুটে এসেছি। ছোট মেয়েগুলি যেভাবে পথ করে দিল, সেই পথেই সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। একটি মেয়েমানুষ যার পরণের পোষাক বেসামাল, দেহটি এমনই নিস্পন্দ যে জীবিত না মৃত আচমকা দেখলে বুঝে ওঠা ভার, ঘাড় মুখ গুঁজরে পড়ে রয়েছে এবং একটি পুরুষ যেন একা কুম্ভ এইরকম দর্পিত ভঙ্গীতে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, থেকে থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। পুরুষটি যে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে এবং উত্তেজনায় ছটফটিয়ে মরছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে তার চোয়ালের দৃঢ়তা, আগুন ঝরা দৃষ্টি এবং দ্রুত শ্বাস ফেলার জন্য বুকের ওঠানামা, ঘাড় গলার টানটান শিরা, এইসব দেখে।

আমার খুব অবাক লাগল, চারপাশ ঘিরে মানুষগুলি এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

ঠিক মনে হচ্ছে পুরুষটি একটি হিংস্র বন্য জন্তু শিকার করে এনে তার বাড়ির উঠোনে ফেলেছে। চারপাশ থেকে মানুষ ছুটে এসে অবাক চোখে শিকারী এবং শিকারকে দেখছে। শিকারীর সাহস এবং শৌর্যকে বাহবা দিচ্ছে মনে মনে।

নয়নচাঁদের বউয়ের পরণের শাড়িটি হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। বুকের কাপড় সরে গেছে। ছেঁড়া জ্যালজেলে ব্লাউড ফুঁড়ে সদ্য কিশোরীর বুকের মতো অপুষ্ট দুটি বুক দেখা যাচ্ছে। যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি পুরুষ মানুষ রয়েছে। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কয়েকজন যেমন, তেমনই কয়েকজন সদ্য যুবতীও রয়েছে।

আমি জানি পারিবারিক কলহের এমনতর বহিঃপ্রকাশ বা একতরফা নির্যাতন, এ অঞ্চলের প্রায়শই ঘটনা। এদের বিবাদ বিসম্বাদ এমনকি সাধারণ আলাপ আলোচনাও এমন মাত্রায় বা উপস্থাপনায় যে একজন নারীর শারীরিক গোপনীয়তা এদের কাছে মোটেই তেমন দ্রষ্টব্য বিষয় নয়। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কয়েকজন যেমন, তেমনই কয়েকজন সদ্য যুবতীও রয়েছে।

তাহলেও একজন পরাস্ত মানুষ এতটাই ক্লিন্ন অসহায় হতে পারে না যে, তার একান্ত গোপনীয়তাগুলিও বাজারের সবজির মতো প্রদর্শিত হবে এবং অন্যেরা সেগুলি দেখার সুযোগ পাবে।

আমি নয়নচাঁদের বউয়ের এলোমেলো শাড়িটি ঠিক করে দিলাম এবং এটা করতে গিয়ে দেখলাম, বউটির পিঠে লম্বা একটি দাগ পড়েছে। গুরুতর প্রহারের চিহ্ন। ডান চোখের নীচে একটি জায়গা সরু হয়ে চিরে গেছে এবং সেখানে একসারি ছোট ছোট রক্তের বিন্দু। শ্বাস পড়ছে ধীরে এবং এতটাই ক্ষীণ যে তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। একমাত্র নাকের সামনে হাত রাখলে বাতাসের হালকা স্পর্শ টের পাওয়া যাচ্ছে। একপাশে কাত হয়ে থাকা মাথাটা হাত দিয়ে সরিয়ে সোজা করতে গিয়ে দেখলাম, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। দাঁতগুলিতে রক্তের ঈষৎ আবছা লাল দাগ। তার মানে অতর্কিত আক্রমণে দাঁতের চাপে জিভ কেটে গেছে। কিম্বা হয়ত এপিলেপটিক কোন ট্রাবল আছে মেয়েটির। হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই, উত্তেজনার উত্তুঙ্গে এপিলেপসি কামড় বসিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত ও পা টেনে দেখলাম। এক হাতের আঙ্গুলগুলি মুড়ে গিয়ে শক্ত মুঠি হয়ে গেছে। অন্য হাতটির এবং পা দুটির আঙ্গুলগুলি বেঁকে আধমোরা হয়ে গেছে। হাত পায়ের শিরা টানটান হয়ে এমন উঁচু হয়ে উঠেছে, ঠিক মনে হচ্ছে চামড়ার আস্তারণ ফুঁড়ে সেগুলি জ্যামুক্ত তীরের মতো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

— প্রিয়লাল ? প্রিয়লাল ? আমি গলা তুলে ডাকলাম। ডাকটা আমার নিজের কানেই বেশ জোর শোনাল। তার মানে চারপাশের মানুষজন এতটাই নিশ্চুপ। আমি মোটেই খুব দৃঢ় নই। বরং যে কোনরকম অন্যায় অসঙ্গতির মুখোমুখি দাঁড়ালে, প্রতিবাদ প্রতিরোধ, কীভাবে করব, কতটা করব, এসব ভাবনা চিন্তার আগেই কান্না পাকিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। যদিও আমার চোখে জল আসে না। গলা ধরে যায় না। এসব ক্ষেত্রে দু চারটি হাত যদি এগিয়ে আসে সহযোগিতার জন্য, নিদেনপক্ষে কয়েকটি জোরালো কণ্ঠস্বর শুনত পাই আমার সমর্থনে, মুহূর্তে চার্জড হয়ে যাই। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কান্না পায়, সে কি আমি একা, এইরকম ভাবনাজনিত ভয় থেকে ? তাহলে আমি এই জাতীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি কেন বারবার ? এমন তো নয়, ভয় পাওয়াটাই আমার অবচেতন মনের সুপ্ত আকাঙ্খা। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার নিজের মনেই সংশয় তৈরী হয়। হয়ত সেক্ষেত্রে আমি একশভাগ সফল। তার পরেও হয়। তখন আমি আদ্যন্ত ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করি। কোনরকম প্রগলভতা বা অহৈতুকী উচ্ছ্বাস বা অবচেতন মনের তাড়নায় আমি এগিয়ে ছিলাম কি। নাকি নিজেকে সাহসী প্রতিপন্ন করার জন্য, জনপ্রিয় করে তোলার গোপন ইচ্ছায়, বিপদগ্রস্ত হতে পারি জেনেও অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম! যেমন অশরীরির অস্তিত্বে বিশ্বাসী কোন মানুষ ভয় পেতে পারে, এমনকি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে জেনেও পোড়ো জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ি, নির্জন নিষ্পত্র চরাচর বা লাশকাটা ঘরের সামনে দিয়ে অনায়াসে হেঁটে চলে যায়। আমার ব্যাপারটাও সেইরকম কিছু কি। প্রত্যেকটি ঘটনার নিজস্ব চরিত্র আছে। সেইমত মূল কারণটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারলে ঘটনার গভীরে যাওয়া সুবিধাজনক নয়। সমাধান সূত্রও মিলে যায় সহজেই। তখন ঘটনাটিকে দিনের আলোর চেয়েও স্বচ্ছ, পাখির পালকের চেয়েও হালকা মনে হয়। এর উল্টোটাও হয়। ঠিকমত ধরতে না পারলে ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, ঠিক বেঠিকের দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। যাই হোক না কেন, দূরে থেকে শুধুমাত্র সংবাদ বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পর্যালোচনার পরিবর্তে, অকুস্থলে হাজির হয়ে ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ানোকে আমি শ্রেয়, যথোচিত মনে করি। নিজের বিচার বিবেচনা, তর্ক বিশ্লেষণে ভুল থাকতেই পারে। আন্তরিকতায় যেন ঘাটতি না থাকে।

নয়নচাঁদ আমার কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ সরু করে আমাকে দেখছে। বাকিরা একবার আমার দিকে, পরমুহূর্তেই নয়নচাঁদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আমি ফুলুর বেসামাল পোশাক যথাসম্ভব ঠিকঠাক করে দিয়ে, নয়নচাঁদকে বেশ কড়া গলায় বললাম, মেয়েটার যদি কোন বিপদ হয়, পারবে, সামাল দিতে ? আমার এ কথার

কোন জবাব না দিয়ে, নয়নচাঁদ এমন নির্লিপ্তের মতো মুখ করে তাকাল যেন সে এসবের বিন্দু বিসর্গ জানে না। অন্যদের মতো সেও ছুটে দেখতে এসেছে ব্যাপারটা কী হয়েছে!

— ও যদি। বলে ফুলুকে দেখিয়ে বললাম, তোমার নামে থানায় গিয়ে নালিশ করে, কী শাস্তি হতে পারে, জান?

— আমার? নয়নচাঁদ বুকে হাত ঠেকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, আমার হবে কেন? একটু চুপ করে থেকে বলল, দোষ তো ওই করেছে। ভাল কথা বললুম, শুনল না। উল্টে খারাপ খারাপ কথা বলল।

— তার জন্যে এমন নির্দয়ের মতো মারতে হবে? আমি জেরার ভঙ্গীতে বললাম, মেয়েমানুষ না হয়ে, অন্য কেউ হলে গায়ে হাত তুলতে সাহস পেতে?

— কী যে বলেন! ছ্যাৎলা ধরা দাঁত বার করে নয়নচাঁদ এমনভাবে হাসল যেন আমি তার সঙ্গে মজার কথা বলছি, অন্য কেউ হলে তো এতক্ষণে ফরসা করে ছেড়ে দিতাম। নেহাত মেয়েমানুষ বলে, ভাল কথায় বুঝুতে গেছিলাম ...।

হঠাৎ আমার খুব রাগ হয়ে গেল। দুর্বল কমজোরীর ওপর আঘাত হেনে কেউ যদি শ্লাঘা বোধ করে, তাকে নির্বোধ ভাবতে কষ্ট হয়। শয়তানের শয়তান ভাবলেও, কম ভাবা হয়েছে মনে হয়।

— একে ঘরে নিয়ে যাও। আমি কড়া গলায় বললাম, হেমেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।

নয়নচাঁদ যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এক চুল নড়ল না। ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা, তারাও ক্যালেন্ডারের ছবির মতো স্থির।

— কী হল? আমি আবার বললাম, ঘরে নিয়ে যাও।

— ও ঘরে আমি আর ঢুকব না। নয়নচাঁদ ডান হাতটি নাড়ল সজোরে, পাপের সংসারে আর ঢুকছি না।

— তার মানে? সত্যি সত্যি খুব অবাক হয়ে গেলাম, কী করবে? কোথায় থাকবে?

— সে কি বলা যায়? বলে নয়নচাঁদ দার্শনিকের ভঙ্গীতে করতল ঘোরাল, মন যেখেনে টানবে।

যদিও গলাটাকে সরু করে বললাম, বাঃ! চমৎকার! কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট সাবধান হয়ে গেলাম, হেঁয়ালীর ছল করে নয়নচাঁদ কোন কুমতলবের আভাস দিচ্ছে না তো! তাড়াতাড়ি বললাম, সে না হয় না গেলে। কিন্তু তোমার বউ ছেলেমেয়ে, এদের ভার কার ওপর চাপিয়ে যাচ্ছ?

আমার প্রশ্নে নয়নচাঁদ একটু থমকে গেল। তার সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি যে বিশ্বাস করব, মেনে নেব, এতটা সে আশা করেনি। ফলে আমার পাল্টা প্রশ্নের জবাব দিতে তার অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল।

ছোট একটি মেয়ে পলিথিনের মগে করে জল নিয়ে এল। আমি ফুলুর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলাম বেশ কয়েকবার। তাতে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। কিন্তু বন্ধ দু চোখের পাতা খুলল না। ঘরে নিয়ে গিয়ে কোমরে কাপড়ের ফাঁস আলগা করে একটু রিল্যাক্সড্ ভাবে শুইয়ে দিলে উপকার হবে। চামচ বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে বন্ধ দাঁতের পাঁটি খুলে দিতে হবে। হাত আর পায়ের আঙ্গুলগুলো বার কয়েক খোলা বন্ধ করে দিতে পারলে, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে। দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসবে।

রং কানাইয়ের বউ নিশিকে ডাকলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুলুকে মাটি থেকে তুলে ধরবার জন্য। নিশি ভয়চকিত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। এবার আমি রূঢ় গলায় বললাম, কী হল? শুনতে পাচ্ছ না? আমার কথা শেষ হবার আগেই নিশি হঠাৎই পিছন ফিরে ভিড় ভেদ করে দৌড়তে শুরু করল। এই প্রথম উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে একটু সোরগোল উঠল। একটি পুরুষ গলা উঁচু পর্দায় বেজে উঠল, ই ব্যাপারে আমাদিগের কেউ যাবে না।

কথাটা কে বলল দেখার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি একদম খেয়াল করিনি নয়নচাঁদ আমার ঠিক পিছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এত জোরে নিশ্বাস ফেলছে যে সাপের ছোবলের মতো হিস হিস করে আওয়াজ হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পেষার জন্য রগের আর গলার শিরা টানটান হয়ে উঠেছে। মুখের অনেকটা গভীরে চোখ দুটো। অতটা ভেতরে বলেই, দৃষ্টিতে শ্বাপদের হিংস্রতা ফুটে উঠেছে।

যেন কোন গোপন কথা বলছে, এমনি ভঙ্গীতে চাপা গলায় করে নয়নচাঁদ বলল, আপনি এখেনে এলেন ক্যান?

— সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে?

— ছিঃ! কী যে বলেন! নয়নচাঁদ এমনভাবে হাসল যেন আমার প্রশ্নে সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

— তাহলে?

— তাহলে বুঝুন,পষ্ট কথার কষ্ট নেই। যদি বলি নীরুদি আমার বউটারে আপনার বাড়ি নিয়ে যান, খেতে পরতে দিন, শাড়ি, ব্লেআউজ দিন, আপনি কি রাজী হবেন?

— ভারি সুন্দর কথা বল তো তুমি। শরীরের ভেতরে যতটা শ্লেষ এবং ঘৃণা জন্মেছিল, সবটা উগরে দিলাম, একজন পুরুষ মানুষ হয়ে এইসব কথা বলতে লজ্জা করে না?

— অই তো! নয়নচাঁদ খিক খিক করে হাসল, লজ্জার কথা বললুম কোথায়! পাঁচজনকে শুধোন, যা বলছি তার মধ্যে ল্যায্য বই আর কিছু আছে কিনা!

কখনও চাপা গলায়, কখনও একটু হেসে হাত পা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে নয়নচাঁদ এমনভাবে কথা বলছে যেন সে একজন দক্ষ পালাকার। আর চারপাশের মানুষজন, এমনকি আমিও তাদের মধ্যে একজন, ভিড় করে দাঁড়িয়ে তার পালা গান শুনছি।

এতদিন আমার ধারণা ছিল যে কোন ঘটনার সূত্রপাত যেখানে, ঘটনাটির মোকাবিলার সম্ভাব্য উপকরণগুলিও সেখানেই থাকে। বাইরে থেকে কোনরকম বল প্রয়োগ করে বা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাটির মধ্যে ইনভলভড্ হয়ে গিয়ে কেউ যদি মনে করে, পূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বা ঘটনাটির ন্যায়সঙ্গত সুষ্ঠ মীমাংসা করবে, তাহলে বুঝতে হবে আউটসাইডার মানুষটি নির্বোধ। আমি ছুটে এসেছি মানে এই নয়, আমি একাই সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে পারব। সেখানে যাদের মধ্যে ব্যাপারটি ঘটেছে বা ঘটছে, ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা তাদের কাছেই সবচেয়ে বেশী জরুরী। আমি পজিটিভ ক্যাটালিস্ট হিসাবে সমাধান পর্বটিকে একটু ছোট করে দিতে পারি। আমার যুক্তিতর্ক দিয়ে কেন করা উচিত বা কতদূর করা যেতে পারে, এই সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি। ভাবিয়ে তুলতে পারি। নিছক বাইরে থেকে ঘা মেরে বা ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ফোড়াটা তখনই নির্মূল হতে পারে, যদি ওপরে তোপমারির চাপান দেওয়ার সাথে সাথে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়। যাতে শেকড় বাকরগুলি আর নতুন করে চাড়াতে না পারে। যে মানুষগুলি স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা যদি একটু নড়ে চড়ে উঠত, আমি জানি, নয়নচাঁদের এই দর্পিত উদ্ধত ভঙ্গী চুপসে এতটুকু হয়ে যেত। এমন অবস্থাও আসে কখনও কখনও, যখন তাড়া খাওয়া বাঘ, বেড়ালের মতো সিঁটিয়ে যায়। হালুম হুলুম ভুলে, মিউ মিউ করে ডাকে।

এই প্রথম নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। বেশ বুঝতে পারলাম, আর কিছুক্ষণ সময় এখানে থাকলে, আমার আচার আচরণ, কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ফুটে উঠবে। নয়নচাঁদ কি এ অঞ্চলে খুব প্রভাবশালী মানুষ? চেহারা দেখলে তো কখনই মনে হয় না, অতি ছোট মাপের মস্তান, পালোয়ানকে টক্কর দিতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রতিবেশীদের চেয়ে কয়েক ধাপ উঁচুতে, এমন নয়। তবে কেন তার এই অন্যায় কাজটির কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না? এমন তো নয়, এ তল্লাটে যে কোন-ঘটনার এমনিই সূত্রপাত হয়, আবার

আপনা আপনিই মিটে যায়! একজন লোক তার বউয়ের ওপর একতরফা শারীরিক অত্যাচার করছে, তার পিছনে লোকটির ফেভারে যে কারণই থাকুক না কেন, লোকটিকে কেউ বাধা দেবে না, বউটিকে রক্ষা করার জন্য একটি হাত এগিয়ে আসবে না, যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটির মীমাংসার চেষ্টা করা হবে না, এ তো মধ্যযুগীয় বর্বরতা। যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নেওয়া যায়, এ বস্তির প্রতিটি মানুষ আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি বা এই ধরণের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা এখানে শয়ে শয়ে ঘটছে, তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। সময় এগোচ্ছে। সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এরপরেও এ ধরণের ঘটনা ঘটবে কেন? বা ঘটলেও সেটাকে থামানোর পরিবর্তে প্রশ্রয় দেওয়া হবে কেন?

গলাটাকে সামান্য চড়িয়ে বেশ মেজাজের সঙ্গে বললাম, এতদিন তোমাকে ভাল বলে জানতাম নয়ন। এই অব্দি বলে উপস্থিত মানুষগুলির তাকালাম, তোমাদের লজ্জা করছে না? হাঁ করে দেখছ কী?

মৃদু শোরগোল উঠল। ফিসফিসে গলায় এ ওকে, ও তাকে কথা চালাচালি করল। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। পরিবর্তে এমন করুণ মুখ করে আমার দিকে তাকাতে লাগল যেন মানুষগুলি আমার কথা সব বুঝতে পারছে, কিন্তু বাকশক্তি না থাকার জন্য উত্তর দিতে পারছে না। আমি মাঝবয়সী একটি লোককে হাতের ইশারায় ডাকলাম, আমার সঙ্গে একটু ধর তো। একে ঘরে নিয়ে যাই।

লোকটি ভয়চকিত দৃষ্টিতে নয়নচাঁদের মুখের দিকে তাকাল। আর আশ্চর্য নয়নচাঁদ হঠাৎই ফিরিক করে হেসে বলল, বড়দের কথা অমান্যি করতে নেই। যা, ধর।

আমরা দুজনে মিলে ধরে ফুলুকে ঘরে এনে শোয়ালাম। আমাদের পিছন পিছন আরও কয়েকজন ঘরে এসে ঢুকল। আলো বাতাস চাপা ছোট্ট ঘরটা অন্ধকার দেখাতে লাগল।

— ঘর থেকে বেরোও তো সব। আমি বললাম, দরজাটা হাট করে খুলে দাও।

নয়নচাঁদের গলা শুনতে পাচ্ছি, ঘরের মধ্যে ভিড় পাতলা কর। ও দিককার জানলার চটটা তুলে দে। দখিনে হাওয়া ঢুকবে।

কিছুক্ষণ পরিচর্যার পর ফুলু চোখ মেলে তাকাল। ভাসা ভাসা দৃষ্টি। মেঝেতে হাতের চাপ দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। গভীর ঘুমের জের না কাটলে, ঘুম ভাঙ্গা মানুষ যেমন আচরণ করে, ফুলুও সেইরকম করতে লাগল। অল্প অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লান্তি অবসাদ কাটাতে চাইল, টলমল শরীরে বেশ কয়েকবার উঠে বসার চেষ্টা করল এবং অসংলগ্ন

কথাবার্তা বলল কয়েকটি। যেমন ভাতের হাঁড়ির ফ্যান উতলে যাচ্ছে। বিন্দু বলছিল এ সপ্তার ক্রাচিন আজকে দেবে। কৈরীতে 'দাদাভাই' সিনেমা এয়েচে।

ফুলুর এমন এলোমেলো কথা শুনে দু চার জন মুখ টিপে হাসতে লাগল। বয়স্ক একটি মহিলা, বাচ্চা ছেলেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে, ফুলুর বুকে পিঠে হাত বোলাতে লাগল। আর একই কথা বারবার বলতে লাগল, ঠিক বলেচো। তাই তো, খুব সোন্দর সিনেমা।

ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। উঠোন জুড়ে দু জন তিনজন চারজন মানুষের ছোট ছোট জটলা।যে কোন রকম অঘটনের পর যেমন বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়ে মানুষ একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করে, সমাধানসূত্র বাতলায়, এখন আবহাওয়াটা ঠিক সেইরকম।

— নয়নচাঁদ বেহিসেবীর মতো মদ গিলেছে।

— বাড়ি ফেরার পথে খারাপ হাওয়া ওর গায়ে লেগেছে।

— বউ তো নয়। যেন রাক্ষুসী।।

— মুখে মুখে চোপা করলে, ঠান্ডা লোকেরও মাথা গরম হয়ে যায়।

— রিক্সার জমা বাকি পড়েছে অনেক টাকা। নয়নের মাথার ঠিক নেই।

— রতনের বাবা জ্যান্ত ধরে মড়ায় ছাড়ত। মুখে টুঁ শব্দটা করতাম না। তবে না রাগ পড়ত।

— বছর বিয়োনী মেয়ে। শরীরে কিছু আছে?

— রাগ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।

— যার পাঁঠা, সে ন্যাজে কাটবে না মুড়োয় কাটবে, তার ব্যাপার। তাতে আমাদের কী?

— তাহলেও, বউটা যদি মরেই যেত!

— নয়নের মাথায় শয়তান ভর করেছে। গায়ে অসুরের পারা শক্তি। কে সামনে যাবে?

এই পাঁচ মিশেলী মন্তব্যের ভিড়ে নিজের মনেই সংশয় তৈরী হচ্ছিল। ইন ডিটেলস্ না জেনে ঘটনার আবর্তে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হল? যে মানুষগুলি এখন বিভিন্ন রকম মতামত দিচ্ছে, এতক্ষণ তারা চুপ করে ছিল কেন? আমি কত দূর যেতে পারি, এটা দেখার জন্যই নিশ্চুপ ছিল? নাকি এই জাতীয় ঘটনাগুলি ওরা যেভাবে মোকাবিলা করে, আজও সেইভাবেই করত, যদি না আমি হঠাৎ করে এসে হাজির হতাম। অসহযোগিতার ভাণ

করে ওরা আমার ক্ষমতার দৌড় যাচাই করছিল? তারপর যখন দেখল, একা নিঃসঙ্গ অবস্থাতেও আমি চুপিসারে সরে গেলাম না, ভিক্ষে চাওয়ার মতো করে ওদের কাছে হাতজোড় করে বললাম না, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তোমরা বা আমি যেমন যেমন বলছি ঠিক তেমনটি কর, তখন ওদের ভুল ভাঙ্গল!

আমার নিজেকে কিন্তু বেশ হালকা মনে হচ্ছে। আমি না এলে কী হত, সেটা বড় কথা নয়। অবস্থাটা যেদিকে গড়াচ্ছিল, যে কোন কারণেই হোক না কেন, তার গতিমুখ ঘুরে না গেলে, ভীষণ ক্ষতিকর, নৃশংস ঘটনা ঘটে যেতে পারত। ভবিষ্যতে এই ধরণের কিছু ঘটলে নিছক 'কী হচ্ছে' দেখার জন্যও একটি মানুষও ঘর ছেড়ে বেরোত না।

অয়ন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, যে মানুষ একা শাবলের ঘা মেরে পাহাড় ভাঙ্গার কথা ভাবে, সে ইডিওলজিক্যালি নির্বোধ।

আমি বলেছিলাম, খামোকা একা একটি লোক পাহাড় ভাঙ্গার কথা ভাববেই বা কেন?

— ভাবে। অয়ন হেসে বলেছিল, এমন অনেক লোক আছে, যারা ভাবে, নিরলস একক প্রচেষ্টায় যে কোন কাজ করা যায়। কথাটা আমার গায়ে লেগেছিল। যেহেতু আমি প্রায়শই বলতাম, দল, সংগঠন, অনুকূল পরিস্থিতি, এতকিছু চিন্তাভাবনা না করে, নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী যদি মনে হয় করা উচিত, নির্দ্বিধায় করব। সেই 'করা'-টাকেই অয়ন পাহাড় ভাঙ্গার রেফারেন্স দিয়ে ব্যঙ্গ করল। অয়নের কথার জবাবে অনেক কিছু বলার ছিল। বলতে পারতামও। চুপ করে রইলাম। শুধু অয়ন যখন আবার বলল, ইমোশান আর ইডিওলজি তো এক নয়।

আমি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলাম, ইমোশান ছাড়া কোনও কাজও হয় না।

আমার দিক থেকে যেমন নিজেকে ঠিক মনে হয়, আবার অয়নের কথাটাও ফেলনা নয়। বড় কিছু করতে গেলে সেখানে ইডিওলজিক্যালি ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। যেহেতু আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই, বিশেষ কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী নই, সে কারণে কোন ব্যাপার বা ঘটনা আমার বিশ্বাসে অন্যায় অযৌক্তিক মনে হলে, আমি সেখানে ছুটে যাই। বিশাল একটা পাথর শুধু নাড়িয়ে দিলেই তো হলো না, সেটা গড়িয়ে পড়লে তার ভার একা বইতে পারব কিনা, এ ব্যাপারটা না বোঝার মতো নির্বোধ আমি নই।

নয়নচাঁদ বসে রয়েছে একটি জামরুল গাছের গোড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে। পা দুটি সামনে ছড়ানো। দুটি হাত আস্তো ঝুলছে। মাটি ছোঁয়নি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে এখানে যে হুলস্থূল কাণ্ডটা ঘটে গেল, সে তার বিন্দু বিসর্গ জানে না। উপস্থিত মানুষজন যা

নিয়ে আলোচনা করছে, মতামত ব্যক্ত করছে, সে সবের কিছুই তার কানে ঢুকছে না। সে আনমনা আলাভোলার মতো বসে রয়েছে। চোখ দুটি আধ বোজা। যদিও নয়নচাঁদের সঙ্গে কোনরকম কথাবার্তা বলতে আমার একটুও ইচ্ছে করছিল না, তবু মনে হল ও যা করেছে সেটা যে একশভাগ অন্যায়, এ ব্যাপারটা ওকে ভালভাবে জানানো দরকার। শুধু কথায় চিড়ে ভেজার লোক নয়নচাঁদ নয়। আমি জানি। প্রয়োজনে নরম গরম শব্দ ব্যবহার করে, ওকে একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া দরকার। যস্মিন দেশে যদাচার। 'বাবা-বাছা'-য় কাজ না হলে ধরকাটারি, মারকাটারি করতেই হবে।

আমাকে দেখতে পেয়েই নয়নচাঁদ তাড়াতাড়ি ছড়ানো পা দুটি গুটিয়ে নিয়ে হেসে বলল, নীরুদি, বাড়ি যাচ্ছেন? আমি 'হ্যাঁ', 'না' কোনও জবাব দিলাম না। ধীর পায়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াতেই ও ঝট করে উঠে দাঁড়াল। দু হাত কচলে বিনীত গলায় বলল, মনে কিছু করবেন না। মিছিমিছি আপনাকে দৌড়ে আসতে হল। বলে হেঃ হেঃ করে হেসে বলল, নিজের বড় লজ্জা করছে।

— শোন। আমি আঙ্গুল তুলে বললাম, আর কোনদিন যদি এ ধরনের কিছু কর, আমি কিন্তু ...।

— কিন্তু চেষ্টা যে আমাকে চাইলে যেতেই হবে। নয়নচাঁদ নীচু গলায় থেমে থেমে বলল, বাবু বলেছিল সংসারের মধ্যে থেকেই খানাতল্লাসি চালাতে হবে। সংসার হল গে কেল্লা। এখেনে পেট ভাতের চিন্তা নেই। সেবা টেবাও পাওয়া যায়। একটু থেমে হতাশ গলায় বলল, সখী বলে ডাকলুম, তো নোগরা ব্যাখ্যানা করে আগড়াম বাগড়াম বকতে লাগল। মেজাজ চইরে দিল। আমার মুখের দিকে স্থির চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর দুহাত জড়ো করে কাঁচুমাচু গলায় বলল, যথার্থ হিসেব করে বলুন, দু-চার ঘা দিয়ে আমি কি খুব অন্যায় করেছি?

সত্যি বলতে কি, আমার নিজের মধ্যেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এখানে যা যা ঘটেছে, একজন নিতান্ত আনাড়ি লোকও নির্দ্বিধায় সে সম্পর্কে তার মতামত জানাতে পারবে। অবশ্যই সে ক্ষেত্রে রায়টা নয়নচাঁদের বিপরীতে ও তার বউয়ের অনুকূলে যাবে। কিন্তু এখন নয়নচাঁদ যে সব কথাবার্তা বলছে, তা শুনে মনে হচ্ছে ঘটনার গভীরে আরও অনেক কাহিনী আছে। সঠিক এবং নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে পৌছতে গেলে, নয়নচাঁদ কী বলতে চাইছে, সেটা জানাও একান্ত জরুরী।

'বাবু' ব্যক্তিটি কে। নয়নচাঁদ তার বউকে খামোকা সখী বলে ডাকতেই বা গেল কেন! বা খানাতল্লাসি বলতে নয়নচাঁদ কী বলতে চাইছে, সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। নয়নচাঁদের

মতো একজন অশিক্ষিত লোক যদি সংসারকে তুলনা করে সুরক্ষিত কেল্লার সঙ্গে, স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, এমন বোধোদয় নিশ্চয়ই তার আন্তর্মানসিক পরিবর্তনের কোন লক্ষণ নয়। অন্য কারোর দ্বারা সে প্রভাবিত হয়েছে। কিছুটা বুঝে বা একেবারেই না বুঝে, সে সেই ব্যক্তির মতো করে আচার আচরণে, কথাবার্তায় নতুনত্ব আনতে গেছে। বিপত্তির সূত্রপাত সেখানেই।

কিন্তু এই বাবুটি কে? নয়নচাঁদের মতো একজন হেটোমেঠো মানুষ তার সন্ধান পেল কেমন করে? নয়নচাঁদের কথাগুলি শুনে তো মনে হচ্ছে, বাবু ব্যক্তিটি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তিনিই বা হঠাৎ করে নয়নচাঁদের মতো একজন হাড়হাভাতে মানুষকে ধরে গুরু গম্ভীর জ্ঞান উপদেশ দিতে যাবেন কেন? আর নয়নচাঁদ, যে নেশাভাঙ করে, বউ ছেলেমেয়েকে গরু ছাগলের মতো পিটিয়ে সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পায়, তার মনের মাটিটি কখনই এমন উর্বর হতে পারে না যে, ভাল কথা, সৎ উপদেশের বীজ সেখানে পড়া মাত্রই তা অঙ্কুরিত হয়। কাফকার মেটামরফেসিসের মতো নয়নচাঁদ রাতারাতি ভিন্ন রুচির ভিন্ন স্বভাবের মানুষে রূপান্তরিত হবে, এটা ভাবা যায় না। এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কাহিনী আছে।

আমি আস্তো করে জিজ্ঞেস করলাম, বাবু কে?

— সে আপনি চিনবেন না। নয়নচাঁদ ঘাড় নাড়ল, তাকে চেনাও যে সে লোকের কম্ম নয়।

কৌতূহলের সঙ্গে আমার হাসিও পেল। 'যে সে লোকের' দলে যে নয়নচাঁদ পড়ে না, সেটা তার চোখমুখের ভঙ্গীমা, স্বর ক্ষেপণের আত্মম্ভরিতায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। হাসি চেপে গলাটাকে যথাসম্ভব ভারি করে বললাম, সে না হয় হল। তিনি থাকেন কোথায়? আমাদের আশেপাশেই?

— উঁহু। বলে নয়নচাঁদ মাথা দোলাল। তারপর যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা, চোখ সরু করে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি চিনতে পারছেন না?

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা, তিনি কে? কার কথা বলছ তুমি?

— আমার বিশ্বাস হয় নীরুদি। বলে চোখ বুজে অল্প অল্প মাথা দোলাল নয়নচাঁদ, বাবু আসলে সাধু সন্নিসে মানুষ। ভদ্দরলোকের মতো ধুতি পাঞ্জাবী পরে। সিগ্রেট খায়। এগুলো আসলে বেশ। যাতে চট করে কেউ ধরতে না পারে। আমিই কি ছাই প্রথমে ধরতে পেরেছিলাম। আত্মতৃপ্তির শব্দহীন হাসি নয়নচাঁদের মুখ জুড়ে।

— কেমন করে ধরলে? আমি খুব সহজ গলায় প্রশ্নটা করলাম। ইচ্ছে করেই। যাতে নয়নচাঁদ বুঝতে না পারে আমার উদ্দেশ্যটা কী।

— সে এক বিত্তান্ত নীরুদি। এই দেখুন। নয়নচাঁদ তার ডান হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে পড়েছে।

— ওমা! তাই তো! আমি স্তম্ভিত হওয়ার ভান করলাম, বল না, কী বৃত্তান্ত বলছিলে!

— যেখেনে সেখেনে যখন তখন বলা যায়! নয়নচাঁদের গলায় মৃদু অনুযোগের সুর। একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবু বলেছে আবার দেখা হবে। কোথাও না কোথাও ঠিক দেখা হবে।

নয়নচাঁদ আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না। আমি লক্ষ্য করলাম, নয়নচাঁদের চোখমুখে অন্য রকম ছায়া ঘনিয়েছে। অনেকটা ঘোর লাগার মতো। তার মানে বাবুর কথা বলতে গিয়ে সে এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়েছে, এমন গদগদ ভাব জেগে উঠেছে যে আমার প্রশ্নের উত্তরটা ঠিকঠাক শুরু করেও, খেই হারিয়ে ফেলেছে, নিজের অজান্তেই। বুঝলাম বাবু ব্যক্তিটি নয়নচাঁদকে বেশ ভালরকম নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসের জায়গাটিতে পাকাপোক্তভাবে নিজেকে এসট্যাবলিশ করেছে। বুদ্ধির দৌড়ে নয়নচাঁদ একজন শিক্ষিত মানুষের চেয়ে এগিয়ে না পিছিয়ে বলতে পারব না। কারণ অ্যাকাডেমিক্যালি শূন্য, এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রখর বুদ্ধিমান। আবার লেখাপড়া জানা নির্বোধ মানুষেব সংখ্যাও হাতে গুনে বলার মতো নগণ্য নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, নয়নচাঁদের মতো যে মানুষগুলি স্ট্রাগল ফর এক্সজিসটেন্স-এর লেভেলে রয়েছে, তাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

— আর যদি কোনদিন বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা না হয়? সচেতনভাবেই নেগেটিভ প্রশ্ন দিয়ে আমি কথোপকথন শুরু করলাম। আমার কথায় নয়নচাঁদের চমকে ওঠার কথা ছিল। তাকে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখাল না। বরং খুব ধীরস্থির গলায় থেমে থেমে বলল, তা কখনো হয়!

— ধরো! আমি বললাম, অনেক বছর পরে দেখা হল। তখন কেউ কাউকে চিনতে পারলে না।

— এটিও হবার নয়। নয়নচাঁদের গলায় বিশ্বাসের সুর ভরা, আমি ভুলে গেলেও, বাবুর ভুল হবে না। বাবু যে আমাদের মতো লোকেদের নদ্দমার পাঁক থেকে তোলবার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে।

এবার ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হল। পেশাদার গুরুরা যে জাতীয় কথাবার্তা

বলে তাদের পসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, বাণিজ্যের পথ সুগম করে, নয়নচাঁদের বাবুও সেই একই কৌশলে ব্যবসার জাল ছড়িয়েছে। গুরু শুঁড়ি বাড়ি গেলেও, তিনি নিত্যানন্দ রায়। অন্ধ বিশ্বাসটুকু পুরিয়ার মতো করে একবার গিলিয়ে দিতে পারলে, গুরুর নিজের অবস্থান সুরক্ষিত হয়। ক্রিয়াকর্ম প্রশ্নাতীত পর্যায়ে উন্নীত হয়।

— আচ্ছা ধর, বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হল। তোমায় চিনতেও পারল। আমি বললাম, কী হবে তাতে?

উত্তেজনায় নয়নচাঁদের দু চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, দেখা হবে বলছেন?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ। হতেই পারে।

— সত্যি বলুন দেখা হবে? তিন সত্যি?

এবার বাস্তবিক একটু অস্বস্তিতে পড়লাম। এমন নয় তো, নয়নচাঁদ ভেবে নিয়েছে, বাবু আমার বিশেষ পরিচিত। আর সেই কারণেই আমি বলছি 'দেখা হতেই পারে'। বা আমি যখন বলছি, তখন সে কথার নড়চড় হবে না। আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে চিনচিনে ব্যথার মতো ভয় চারিয়ে যেতে লাগল, বুকের ডান এবং বাঁ, দু দিকেই। নিজেকে যথাসম্ভব স্টেডি রাখার চেষ্টা করলাম, তুমি নর্দমার পাঁকে পড়ে রয়েছ, এমন ভাবছ কেন?

— তা নয় তো কী? মনমরা গলায় বলল নয়নচাঁদ, খাচ্ছি দাচ্ছি, হুল্লোড় করছি। একটু থেমে বলল, কী হল তাতে?

— সবাই তো তাই করে।

— এটা কিন্তু বিবেচনার কথা হল না। নয়নচাঁদের মনমরা গলা মুহূর্তে ভারিক্কি হয়ে শোনাল, বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ইস্তক ভাবতাম, ওইটাই ঠিক। আপনি যা বললেন। বাবু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, দ্যাখ, জীবনের আসল কম্মটি কী!

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ মাঝে মধ্যে এমন কিছু মন্তব্য করে বা গুরুগম্ভীর গলায় এমন কিছু কিছু কথা বলে, শুনলে মনে হয়, জীবনচর্চার মধ্যে দিয়ে ভাবনা চিন্তা এবং উপলব্ধির এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে, যেখান থেকে সে এই জাতীয় মন্তব্য করছে বা কথাবার্তা বলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটা হয়ও হয়ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা যা বলে, তার সম্যক অর্থ না বুঝেই বলে। কোন একজনের কাছ থেকে যেটুকু শোনে, তোতা পাখির মতো হুবহু তাই আওড়ায়। জীবনের উদ্দেশ্য, বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়, এমনি সব জটিল, মতান্তর সাপেক্ষ বিষয়গুলি নিয়ে যদি এ টু জেড সব শ্রেণীর মানুষ ভাবনা চিন্তা করত, তাহলে হয় পৃথিবীটা দার্শনিকদের মেন্টাল অ্যাসাইলামে পরিণত হোত, তা না হলে অসাম্য অসঙ্গতিতে ভরা এই পৃথিবীটার চেহারাই

বদলে যেত। মন্ত্রী, সরকারী অমলা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, উকিল, মাসের শেষে ধার না করে উপায় নেই এমন কেরানীকুল, প্রাইভেট অফিসের নিরাপত্তার অভাব সংক্রমণে আক্রান্ত সেলস্‌ম্যান, রিসেপসানিস্ট, এমন কি জাতীয় দলের প্রতিনিধি খেলোয়াড় পর্যন্ত, সকলেই স্ব স্ব গুরুর শরণাপন্ন হন, বিপদে এমন কি সম্পদেও। আর এইসব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কমজোরী গুরুর, সবচেয়ে উপযুক্ত শিষ্য হল, তার চেয়েও কম জানা বা কিছুই না জানা যে মানুষটি, সে। নয়নচাঁদের ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়েছে। বাবু ব্যক্তিটি বুঝে নিয়েছে, নয়নচাঁদ আদ্যন্ত ভুলে ভরা একটি মানুষ। কোনরকমে উদরপূর্তি এবং মোটা দাগের শারীরিক আমোদের বাইরে, সে অন্য কিছু নিয়ে ভাবে না। যে মানুষ দুধের স্বাদ জানে না, তার কাছে চুন গোলা জল, দুধ মনে হতেই পারে। সংসার বলতে যে অপটু স্বাস্থ্যের সন্তান উৎপাদনে সক্ষম একজন নারী এবং হাঁস মুরগীর ছানাদের মতো পিঠোপিঠি কয়েকটি রুগ্ন ছেলে মেয়েকে বোঝে, 'কেল্লা' তার কাছে অবধারিতভাবেই একটি নতুন মোহ, ভিন্ন উন্মাদনা। আজন্ম পাঁক ঘেঁটে, পাঁকের মধ্যে থেকে যে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিতান্ত ভান করেও কেউ যদি তাকে আপলিফট্‌মেন্টের প্রতিশ্রুতি দেয়, ব্যাপারটা অবশ্যই তার কাছে রোমাঞ্চকর, মনে ধরার মতো একটি ঘটনা। কোন প্রশ্ন নেই, যাচাই নেই, যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই, 'পিতা বলিলেন, পুত্র শুনিল' — এইরকম একটি অবস্থায় যা হওয়ার, তাই হয়েছে। বাবুর কথাবার্তায় নয়নচাঁদ মোহাবিষ্ট। নেশাগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন। তার এই ঘোর ভাবটা কাটতে কিছুটা সময় লাগবে। এমনও হতে পারে ঘটনা পরম্পরায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, বাবু সম্পর্কে তার যাবতীয় আকর্ষণ হারিয়ে যাবে। বাবুর কথাগুলি তখন তার, সোনার পাথরবাটির মতো অলীক, অসম্ভব মনে হবে।

সে যা হবে, তা হবে। আপাতত নয়নচাঁদকে বোঝানো দরকার যে সে একজন অসহায় দুর্বল মেয়ে মানুষকে অহেতুক প্রহার করে ঠিক কাজ করেনি এবং তার প্রতিবেশীরাও ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। সর্বোপরি মেয়েটির সত্যিই যদি কোন বিপদ ঘটে যেত, থানা পুলিশ লকআপের ফাঁসে তার দুর্দশার শেষ থাকত না।

— *তুমি হেমেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।* আমি আবার বললাম, *নিজে না* যাও, কাউকে দিয়ে ডাকতে পাঠাও। এবার নয়নচাঁদ চুপ করে রইল। যেন আমার প্রস্তাব ঠিক না বেঠিক, এটা নিয়ে সে সত্যি সত্যিই ভাবছে।

ভব পাগলার বিধবা দিদি, যার চলন বলন, হাসি কান্না সব কিছুতেই মানুষ একটু অন্যরকম ইঙ্গিত পায়, সে রীতিমত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, নীরুদি আপনি চলে যাচ্ছেন?

ভিড়ের মধ্যে এই মহিলার মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ল না। চোখের কোলে মোটা গাঢ় দাগ, কালচে বাদামী রংয়ের। পুরু ঠোঁট। তাতে শুকিয়ে যাওয়া লিপস্টিক। মসৃণ নয়। কেমন খাপছাড়া। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা বিবর্ণ। আলগা শরীরকে প্রকট করে তোলবার জন্য মাপে ছোট ব্লাউজ টানটান বুকে এবং পিঠে। তলপেটের অনেকটা নীচে শাড়ির ফাঁস। আমি নিজে সাজগোজের ব্যাপারে মোটেই ফ্যাসানেবল নই। সময়ের তালে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পোশাকের ব্যাপারে একটুও আধুনিক নই। আবার এ ব্যাপারে তেমন পিউরিটানও নই। কে কিভাবে নিজেকে সাজাবে, আকর্ষণীয় করে তুলবে, সম্পূর্ণভাবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আধুনিকতা মানে তো কেবল সাজসজ্জার অ্যাট্রাকশন নয়। আচার ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা, রেডি উইট, আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ভঙ্গিমা, টোটাল রিপ্রেজেনটেশন। ভবর দিদির ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলি নিতান্তই অপ্রযোজ্য। কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার এমনটা হয়। ভুল পোশাক পরিহিত কোন মানুষের মুখোমুখি হলে, মনে হয় তার ঘাটতিগুলো তাকে ধরিয়ে দিই। বুঝিয়ে দিই। তাকে যে মানাচ্ছে না, প্রকাশ ভঙ্গীতে ভুল থেকে যাচ্ছে, সুন্দরের পরিবর্তে অসুন্দর প্রকট হয়ে উঠছে, এটা হয়ত সে নিজেও ধরতে পারছে না। মজা করার জন্যই কিছু মানুষ আড়ালে মুখ টিপে হাসছে, কুৎসিত মন্তব্য করছে। আর সামনা সামনি দেখা হলে মিথ্যে করে বলছে, সুন্দর দেখাচ্ছে বা দারুণ মানিয়েছে। নির্লজ্জ মিথ্যাটুকু সে ধরতে পারছে না।

চোখের ইশারায় ভবর দিদিকে, শাড়ির আঁচলটা বুকে পিঠে জড়িয়ে নিতে বললাম। প্রথমে একটু অবাক হলেও, পরমুহূর্তেই সে আমার ইঙ্গিতটা ধরতে পারল এবং দেহের অনাবৃত অংশটুকু ঢাকতে গিয়ে টেনেটুনে শাড়িটাকে এমনভাবে জড়াল, মুণ্ডুটুকু বাদ দিলে, গণেশ ঠাকুরের কলা বউয়ের মতো দেখাতে লাগল। যে ব্যস্ততায় দৌড়ে এসেছিল তার বিপরীত মন্থরতায় স্থির দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের পানে চেয়ে।

— কিছু বলছিলে? আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল ভবর দিদি, হ্যাঁ। একটু থেমে বলল, আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

— সেই রকমই ভাবছিলাম। আমি বললাম, আর একটু অপেক্ষা করি। দেখি ডাক্তারবাবু কী বলেন।

— আমি ডেকে আনব ডাক্তারবাবুকে?

— তুমি যাবে? আর কেউ নেই? আমার গলার স্বরে নিশ্চয়ই বিস্ময় বা অবিশ্বাসের

সুর ছিল, যা ভবর দিদির বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জবাবটাও দিল তাই খানিকটা অভিমানের ঢঙে, ক্যান আমি গেলে ডাক্তারবাবু আসবে না?

— আলবাৎ আসবে। রেগে ওঠার মতো কোন কারণ ছাড়াই নয়নচাঁদ হঠাৎই চীৎকার করে উঠল, 'বলবি গিয়ে' — ভবর দিদির উদ্দেশে বলল, অ্যাকসিডেন্ট কেস। রুগীর এখন তখন অবস্থা। না এলে বহুৎ ঝামেলা হবে।

ভবর দিদি আর তিলমাত্র অপেক্ষা করল না। যেন নয়নচাঁদের আদেশটুকু শোনার জন্যই সে অমন ব্যাগ্রতায় ছুটে এসেছিল। 'আমি চলে যাচ্ছি কিনা' জানতে চাওয়াটা একটা কথার কথা মাত্র। ওদিকে ঘরের মধ্যে হাতপাখা নাড়ার একটানা শব্দ। জল চাপড়ানোর থপ থপ আওয়াজ। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মৃদু গুঞ্জন, শুইয়ে দাও। ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দাও। পাখাটা একটু জোরে নাড়া। মাথায় বেশী করে জল ঢাল। এমনি সব টুকরো টুকরো সংলাপ।

নয়নচাঁদ কেবল একবার ঘরের দিকে চেয়ে পর মুহূর্তেই ভবর দিদির চলার পথের পানে তাকিয়ে রইল। পিছন থেকে ভবর দিদিকে একটি অল্পবয়সী কুমারী মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। শাড়িটাকে সে আবার আগের মতো করেই পড়ে নিয়েছে। তাতে কোমর এবং পিঠের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ভবর দিদি যতক্ষণ না খানার খোলের মোড়টুকু ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, নয়নচাঁদ ঠায় সেদিকে চেয়ে রইল। নয়নচাঁদের দৃষ্টিতে কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। নিরাসক্ত চোখে লোকে যেমন ঘুড়ি ওড়া দেখে বহতা নদীর ঢেউ দেখে বা ঠিকমত কিছুই দেখছে না, এমনিই চেয়ে আছে, নয়নচাঁদের হাবভাবও অনেকটা সেইরকম।

— নয়ন। আমি খুব নীচু গলায় এমন আস্তো সুরে ডাকলাম, যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সাড়া দিতে গিয়ে সে বুঝতে পারে, ভবর দিদির পানে তার অমন নির্ণিমেষ চেয়ে থাকার ব্যাপারটা আমি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছি। যাতে সে লজ্জা পায়, সেজন্যই নরম করে ডেকেছি। আমার সমস্ত ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে, নয়নচাঁদ বেশ সাবলীল গলায়, ঘাড় না ঘুরিয়েই জবাব দিল, বলুন। সব শুনছি।

— ডাক্তারবাবু যদি চেম্বারের রুগী ফেলে আসতে না চায়!

— আসবে। রহস্যজনক হাসি নয়নচাঁদের ঠোঁটের কোণে, যে ডাকতে গ্যাছে, সে বড় সোজা লোক নয়।

নয়নচাঁদ কী ইঙ্গিত করছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। তার তাতেই সারা শরীর রাগে রি রি করে উঠল। অপদার্থ বীরপুঙ্গব নিজের স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করে। অন্য মেয়েমানুষের শরীরী সম্পদের সম্মোহিনী ক্ষমতা ব্যাখ্যা করে রসিয়ে রসিয়ে। মূলত এও এক ধরণের

অবদমিত যৌনলিপ্সা। মনে হল নয়নচাঁদের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলি, একজন নপুংসক তোমার চেয়ে বেশী পুরুষ।

আমি যখন মনে মনে এতটাই ফুঁসছি নয়নচাঁদ হঠাৎই খিক করে হেসে বলল, এট্টুস ভুলের জন্যে দেখুন তো, সবাইকে কী দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে।

— তাহলে স্বীকার করছ, ভুল করেছ? সামান্য এই কথাটুকু বলতে গিয়ে নিজেই টের পেলাম গলার সুরটা স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না। নয়নচাঁদ হয়ত এই ব্যাপারটা খেয়ালই করল না। বরং বেশ সহজ করেই বলল, ওইটি বলা যাচ্ছে না। ভুল আমি করেছি, না ও করেছে।

— তুমি একটি আস্ত শয়তান। শুধু রেগে গেলে হয়ত এ কথাটা বলতে পারতাম না। মনে হল নয়নচাঁদ তার বউয়ের মতো আমাকেও দুর্বল প্রতিপক্ষ ভেবে, কথার মারপ্যাঁচ কষছে। ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। আমার এই কথায় নয়নচাঁদের রেগে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। পরিবর্তে যেন বেশ মজা পেয়েছে এমনি সরস গলায় জবাব দিল, কে সাধু, কে শয়তান, তা কি চট করে বোঝা যায়? একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবুরেও কি আমি প্রথম চিনতে পেরেছিলাম! সুরিয়ার ঠেকে — বলে হঠাৎই কপালে হাত ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যে প্রণাম ঠুকল কে জানে, না যাওয়া ইস্তক দুজনের কাউকেই চিনতে পারিনি।

— সুরিয়ার ঠেক! সত্যি আমার খুব অবাক লাগছিল, ওখানে তোমার যাতায়াত আছে নাকি?

— সাত জন্মে নয়।

— তাহলে?

— টেনে নিয়ে গেল আমার কপাল। সামনের চুল উঠে যাওয়ার দৌলতে বিস্তৃত কপালে আস্তো করে চাপড় মারল নয়নচাঁদ, অমন রাক্ষুসী মেয়েমানুষ, বাবুর সামনে দেখুন নীরুদি, চুপসে এই টুকুস হয়ে গেল। বাবু বলল সুখী কাছে এস। মনে কর এ ঘরটা বেন্দাবন। আমরা ফুল কুড়োব। সৎসঙ্গ করব। দুজনে হাসব। কাঁদব। বাবু যেমন যেমন বলে রাক্ষুসী তেমন তেমন করে। একে বলে অষ্ট সিদ্ধাই। যত জাঁহাবাজ মেয়েছেলে হোক না কেন, এ বিদ্যের এমন জোর, ওঠ বললে ওঠে। বোস বললে বসে।

— আর? আর কী? আমার সত্যি খুব আগ্রহ হচ্ছিল, বাকীটুকু শোনার।

— হেঃ হেঃ। নয়নচাঁদ ঘাড় বেঁকিয়ে হাসল, আর কী! নিজে চোখে না দেখলে আমিই কি বিশ্বাস করতাম!

— সেটাই তো জানতে চাইছি। আর কী দেখলে?

— সে এক লম্বা ফিরিস্তি। বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ওই দেখুন। নয়নচাঁদ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনপানে তাকাল, এমন প্যায়দা পাঠিয়েছেন, ডাক্তারবাবুকে পাকড়ে নিয়ে আসছে। আমি বলেছিলাম না। ঠোঁট বন্ধ করে শব্দহীন হাসতে লাগল নয়নচাঁদ। হেমেন ডাক্তার, চামড়ার মাঝারি মাপের একটি হাতবাক্স, যার মধ্যে ডাক্তারি সরঞ্জাম থাকে, সেটি দোলাতে দোলাতে ভবর দিদির পিছন পিছন আসছেন। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু, তুমি এখানে?

— খুব অবাক লাগছে তাই না? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

— শোন। ডাক্তারবাবু হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। তারপর গলাটাকে যথাসম্ভব নীচু করে বললেন, তোমার মতো মেয়ের এখানে আসাটা ঠিক কাজ হয়নি। এই সব ছোট লোকদের ব্যাপারে নিজেকে জড়ানো মোটেই ভাল নয়। নেহাৎ পেশায় আমি ডাক্তার তাই...। অসম্পূর্ণ কথাটুকু হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে দিলেন, পেশাগত কারণে উপায়হীন, তাই তাঁকে আসতে হয়েছে।

বয়স্ক মানুষ যখন ছেলেমানুষের মতো কোন মন্তব্য করেন, তখন মনে হয়, হয় মানুষটি ভাবনা চিন্তায় অনেকটা পিছিয়ে আছেন, আর তা না হলে আশপাশের সবার থেকে নিজেকে ভিন্ন গোত্রীয়, ভিন্ন মাপের মানুষ বলে মনে করেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাঁড়িয়ে এখন যদি কেউ, 'খারাপ জায়গা', 'বাজে ব্যাপার', বা 'যতসব ছোটলোক' এই জাতীয় মন্তব্য করেন, তিনি যেই হোন না কেন, রক্তমাংসের মানুষ বলে ভাবতে কষ্ট হয়। মুশকিলটা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই কেউ কারোর পিঠ নিজে দেখতে পাই না। অন্যে আমার পিঠ দেখে। আমি তার পিঠ দেখি। আমাদের প্রত্যেকের পিঠ পুরোনো আমলের ট্রানজিস্টার রেডিওর পিছনের ঢাকনার মতো। ঢাকনা খুললে দেখা যাবে, ভিতরে ধুলোর আস্তরণ, মাকড়সার জাল, ত্যালাপোকা আর ইঁদুরের নাদিতে ভর্তি। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লিমিটেশন আছে। তা সত্ত্বেও নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা, সবার উর্দ্ধে প্রমাণ করার মধ্যে দিয়ে কোন কোন মানুষ কী যে তৃপ্তি পায়, কে জানে! আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারি, আমার কথার মধ্যে বা কাজের মধ্যে আত্মগরিমার নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটছে, নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করি। আত্মশুদ্ধি কেবলমাত্র সেল্ফ রিয়ালাইজেশনের মধ্যে দিয়েই হতে পারে।

যেমন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের জবাবে 'খুব অবাক লাগছে?' বলাটাও আমার ঠিক কাজ হয়নি। যেন আমার মতো একজনের এই অস্বাস্থ্যকর, অরুচিকর জায়গায় আসাটা সত্যিই অবিশ্বাস্য, তবু আমি এসেছি। পরোক্ষে নিজের হাইট এবং

ডাইমেনশনটা বোঝানোর এও এক চতুর কৌশল। প্রয়োজনীয় কথাটুকু আমাকে বলে দিয়ে, ডাক্তারবাবু 'কই', 'কোথায়' বলতে বলতে নয়নচাঁদের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি গলা উঁচু করে ডাকলাম, ডাক্তারবাবু, একটু দাঁড়ান। আমি আসছি। নয়নচাঁদ যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তার মধ্যে কোন উৎকণ্ঠা, ব্যস্ততা কিছুই নেই। চোখমুখ ভাবলেশহীন।

— নয়ন? আমি ডাকামাত্রই নয়নচাঁদ মাথা তুলে তাকাল।

— তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। এইটুকু বলে আমি ঘরের দিকে এগোলাম। মেঝেতে পড়ে থাকা ফুলুকে ঘিরে তখনও কয়েকজন এলোমেলো কথাবার্তা বলছে। তার মধ্যে বিলাপ বা সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই।

— তোমরা সব বেরোও তো। আমি বললাম, ডাক্তারবাবু দেখবেন।

রুটিন চেকিংয়ের পর হেমেন ডাক্তার তাঁর চামড়ার হাত বাক্স থেকে বেছে বেছে একটি সাদা এবং একটি হলুদ বড়ি বার করলেন। আমাকে বললেন, একটু জল দাও তো। আমি এদিক ওদিক চেয়ে একটি মাটির কলসি দেখতে পেলাম, টিনের থালা ঢাকা দেওয়া। পাশে মাথা ভাঙ্গা পলিথিনের গ্লাস। রীতিমত বলপ্রয়োগ করে ডাক্তারবাবু ফুলুর চোয়াল চেপে ধরে মুখ হাঁ করালেন। আমি বড়ি দুটি খাইয়ে দিলাম।

— বেশী করে জল দাও। ডাক্তারবাবু বললেন।

হাতবাক্স গোছাতে গোছাতে ডাক্তারবাবু হাসলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। একটু থেমে বললেন, আমি না এলেও ঠিক হয়ে যেত। এসব এদের জলভাত। শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর গলাটা কেমন বিকৃত শোনাল।

— বড় কোন দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারত। যদি আমি না ...! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আবার সেই একই ভুল করতে চলেছি। আমার উপস্থিতি যে কতটা জরুরী ছিল বা আমার অনুপস্থিতিতে কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যেতে পারত, আর একটু হলেই আত্মপ্রচারের এই লিপ্সাটুকু গড়িয়ে নেমে আসছিল দু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

— কী বলছিলে? যদি তুমি না ...! ডাক্তারবাবু স্থির চোখে আমার মুখের দিকে চাইলেন। প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম, ভয়ের কোন কারণ নেই বলছেন?

— বললাম তো। ডাক্তারবাবুর গলায় এবার সামান্য ঝাঁঝ, এদের রেসিসট্যান্স আমাদের ঘরের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী। দেখছ না। — বলে ডাক্তারবাবু চোখ সরু করে অল্প একটু হাসলেন। ইঙ্গিতময় হাসি, হাড় সর্বস্ব অ্যানিমিক শরীর, তার ওপর আবার প্রেগন্যান্ট।

আমি এতটাই চমকে উঠলাম যে বোকার মতো বলে বসলাম, আমি তো খেয়াল করিনি। কী হবে?

— তুমি তো ডাক্তার নও। আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটা বেশ জোরেই দিলেন। তারপর মাথা নীচু করে চৌকাঠ পার হবার সময় আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটা দিলেন অপেক্ষাকৃত খাটো গলায়, কী আর হবে! কাজ করতে করতে ব্যথা উঠবে। হসপিটালে যাবে। বাচ্ছা হবে। নো ফরসেপ। নো সিজার। ইভিন নো রেস্ট।

শুরু থেকেই সমস্ত ঘটনাগুলি এতটাই একপেশে যে নয়নচাঁদের ফেভারে মুহূর্তের জন্যও ছিটেফোঁটা দয়া বা করুণা জাগেনি আমার মনে। এখন এই মুহূর্তে যখন ডাক্তারবাবু বললেন, ফুলু প্রেগন্যান্ট, রাগে অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ সত্যিই কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে জানি না, কিন্তু রাগে আমার সারা শরীরে এমন তোলপাড়ানি শুরু হল যে মনে হল উপযুক্ত একটা অস্ত্র পেলে, তা দিয়ে নয়নচাঁদকে আমি খুনও করে ফেলতে পারি। স্ত্রীর মর্যাদা ইজ্জত বা তার সম্পর্কে প্রগাঢ় সহানুভূতি, এ সব দূরে থাক, যে কোন মেয়েমানুষকেই নয়নচাঁদের মতো পুরুষ তেলচিটে মাথার বালিশ বা ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চটী বলে মনে করে। যেমন খুশি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘরের বাইরে এলাম। উঠোনে লোকজনের জটলা অনেকটা পাতলা হয়ে গেছে। নয়নচাঁদ আবার আগের মতো বসে পড়েছে জামরুল গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে। অবাক ব্যাপার, নয়নচাঁদ একাই বসে রয়েছে। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে না হোক, নিছক খেজুরে কথাবার্তা বলার জন্যও একটি লোকও তার ধারে কাছে ঘেঁসেনি। সত্যি বলতে কি নয়নচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে ভাবতেই, আমার গায়ের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। কোন কারণ ছাড়াই যে তার বউকে মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, তার একবারের জন্যও মনে পড়ল না, বউয়ের গর্ভে অনাগত যে শিশুটি বেড়ে উঠছে, সেটি তারই ঔরসজাত। ফুলু যদি সত্যি সত্যিই মরে যেত, তার গর্ভস্থ শিশুটিরও অকালমৃত্যু ঘটত। বা এলোমেলো আঘাতে মায়ের পেটের মধ্যে উল্টোমুখে শুয়ে থাকা বাচ্ছাটির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারত। চারিত্রিক গুণাবলীর কোন পর্যায়ে পৌঁছালে একজন মানুষ ভগবান হতে পারে জানি না। কিন্তু শয়তানের বাড়া হতে গেলে সেই মানুষটির স্বভাব চরিত্র, বুদ্ধি, মেজাজ কী রকম হতে পারে বা হওয়া উচিত, নয়নচাঁদকে দেখে তার সম্যক উপলব্ধি হতে পারে।

যদিও আমি নিজেই বলে গেছিলাম নয়নচাঁদকে, অনেক কথা আছে, একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করছিল। আমি অন্যমনস্কের ভান করে

তার সামনে দিয়ে চলে এলাম। আমি জানি যে আমার ঘাড় গোঁজ করে বড় বড় পা ফেলে চলে আসার মধ্যে ভিতরের তীব্র অসন্তোষ এতটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, উপস্থিত একজনও আমাকে 'নীরুদি' বলে ডাকতে সাহস করল না। নয়নচাঁদকে টপকে কয়েক পা এগিয়েছি, আচমকা ডাক শুনতে পেলাম, নীরুদি, কী সব কথা আছে বলছিলেন। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নয়নচাঁদ। দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে আড়ষ্টতা। হাত দুটি এমনভাবে জোর করেছে যেন আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরেই সে লজ্জায় এবং অনুতাপে ভেঙ্গে নুইয়ে পড়েছে।

— তোমার মতো লোকের সঙ্গে আর কোন কথা থাকতে পারে না। থেমে থেমে স্পষ্ট উচ্চারণে বললাম।

— কেন? বিস্মিত গলায় বলল নয়নচাঁদ, আমি কী করলাম?

— কী করনি বল তো? আমি ধমকে উঠলাম, সত্যি সত্যি তুমি মানুষ কিনা, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। রেগে যাওয়া বা অপমানিত বোধ করার পরিবর্তে নয়নচাঁদ আস্তো করে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ল যেন সে মেনে নিচ্ছে আমার কথা। যখন কোন মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটে, তখন কথার পরিবর্তে ভাবের প্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে। নয়নচাঁদের চোখমুখের চেহারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল। একসময় মনে হল কান্না আটকাবার জন্য সে ঘন ঘন ঢোঁক গিলছে। ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপছে। কোন মানুষ যদি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, মনস্তত্ত্ববিদেরা কী বলবেন জানি না, আমার মনে হয় ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা যেতেই পারে।

হাউ মেনি টাইমস্ এ ম্যান শুড ফরগিভ হিজ ব্রাদার?

আমার বেশ মনে আছে টানা তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর, চতুর্থ দিন সকালে আকাশের বুক চিরে কাঁচা সোনা রংয়ের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে বৃষ্টিস্নাত সবুজ গাছপালার ওপর। বাগানে জমে থাকা জলের ওপর। বারান্দায়, সীমানার পাঁচিলে। বাবা ডাকলেন, মামন? শোন একবার। আমি চৌকির বিছানায় বসে স্কুলের পড়া তৈরী করছিলাম। বাবার ডাক শুনে দৌড়ে এলাম, আমায় ডাকছ? বাবা আমার হাত ধরে আস্তো টান দিলেন, একটা চমৎকার দৃশ্য দেখে যাও। বারান্দার ঠিক নীচেই, জবা গাছের গোড়ায় জল জমে রয়েছে। আর সেই জমে থাকা জলের মধ্যে ছোট্ট একটি ব্যাঙ তুরুক তুরুক করে লাফাচ্ছে। অত ছোট লাফে জল ছেড়ে কিছুতেই উঁচু পাড়ের নাগাল পাচ্ছে না। আর জলের কিনারে মাটির পাড়ে বসে বেশ বড় মাপের একটি গিরগিটি স্থির চোখে ব্যাঙটির লাফালাফি দেখছে। থেকে থেকেই গিরগিটিটি ঢোঁক গিলছে। গলার মাংসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

পুঁচকে একরত্তি ব্যাঙটির জন্য আমার খুব দুঃখ হল এবং এতটাই যে চোখে জল এসে গেল। ব্যাঙটি লম্বা লাফ মেরে জল ছেড়ে পালাতে পারছে না। তার লাফের যা বহর, তাতে কোনরকমে পাড়ে উঠলেই, সেখানে রাক্ষুসে গিরগিটিটি বসে আছে গপ করে গিলে ধরবে বলে। গিরগিটি ব্যাঙ খায় কিনা জানি না। তবু মনে হল গিরিগিটিটি নিশ্চয়ই ছোট্ট ব্যাঙের লাফ দেখতে বেশ মজার, এই ভেবে স্থির চোখে তাকিয়ে নেই। আহা, খাদ্য বেচারী জানেই না, খাদক সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বাবাকে বলাম, একটা থান ইঁট ছুঁড়ে গিরগিটিটাকে মেরে দাও না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, মিছিমিছি মেরে ফেলব ক্যান?

— দেখছো না? আমি ভিজে গলায় বললাম, ব্যাঙটাকে খাবে বলে কেমন হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

— তা বলে মেরে ফেলতে হবে! ঠোঁট চেপে হাসলেন বাবা, তাড়িয়ে দিলেই তো হয়। এই অব্দি বলে বাবা হঠাৎই চটাস চটাস শব্দ করে বার দুই তিন তালি বাজালেন। গিরগিটিটি চমকে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখেই মুহূর্তে ছিটকে সরে গেল খানিকটা দূরে। সেখান থেকে ঘাড় উঁচু করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবা হো হো করে উঠলেন, দ্যাখো মামন, দ্যাখ। এখন আমরা ওর প্রতিপক্ষ। কমজোরী ছোট্ট ব্যাঙটার তুলনায় আমরা অনেক সবল। এখন ও আমাদের ভয় পাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই এখন আমরা ওকে মেরে ফেলতে পারি।

— তাই দাও না। আমি সোৎসাহে বললাম।

— অহেতুক মেরে ফেলব? বাবা মুচকি মুচকি হাসছিলেন, ও তো আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে। একটু থেমে বললেন। ও তো হেরে গেছে। অনায়াসেই ওকে ক্ষমা করা যেতে পারে।

— আবার যদি এগিয়ে আসে? আমি বললাম।

— আর আসবে না। দেখবে? বলে বাবা আগের চেয়েও আরও জোরে দু তিনবার তালি বাজালেন। আর সত্যি সত্যি চক্ষের নিমেষে গিরগিটিটা কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমার কাঁধে আস্তো করে হাত ছুঁইয়ে বাবা, যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন এমনি আবছা গলায় থেমে থেমে বললেন, চার আনা শাসনে যদি কোন কাজ হয়, অহেতুক বার আনা করতে যাব কেন? আলাপ আলোচনায় যদি কোন সমস্যা মিটে যায়, অহেতুক রক্তপাত ঘটাব কেন? বা কোন দোষী মানুষ যদি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাকে ক্ষমা করব না কেন? একশবার করব।

— এ-ক-শ বার? আমি অবাক গলায় বললাম।

— একশ কেন? এবার বাবা বেশ জোর দিয়েই বললেন, কোন মানুষ যদি সত্যি অনুতপ্ত হয়, তাকে হাজার বার ক্ষমা করা যেতে পারে।

কথা বলতে বলতে আমরা দুজনেই খেয়াল করিনি, কখন বারান্দা ছেড়ে ভিজে মাটিতে নেমে এসেছি। বৃষ্টি ধোওয়া একটি রক্তজবার গায়ে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে বাবা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, তাঁর কথার সুরে এতটাই আত্মমগ্নতা, হাউ মেনি টাইমস্ এ ম্যান শুড ফরগিভ হিজ ব্রাদার? জান? একটু চুপ করে থেকে বললেন, থাউজ্যান্ড টাইমস্।

নয়নচাঁদের করুণ চোখ মুখের দিকে চেয়ে আমার হঠাৎই মনে হল, বহু বছর আগে যেমন, হুবহু সেই গলায় সেই সুরে আমার কানের কাছে মুখ রেখে বাবা ফিসফিস করে বলছেন, এ ম্যান শুড ফরগিভ হিজ ব্রাদার থাউজ্যান্ড টাইমস্।

উত্তেজনার মাথায় নয়নচাঁদকে 'মানুষ নয়' বলাটা আমার ঠিক কাজ হয়নি। ওপর থেকে দেখলে যাদের নিপাট ভদ্রলোক বলে মনে হয়, তাদের মধ্যেও 'মানুষ নয়' এমন জনদের সংখ্যা মোটেই দশ বিশ নয়। দশ বিশের কয়েকশ গুণিতক।

নয়নচাঁদকে ইশারায় ডাকলাম, শোন। সে খুব ধীর পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। নয়নচাঁদের মুভমেন্ট, চোখমুখের ইম্প্রেশন, এসব দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না, মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে এই জড়সড় নিপাট শান্তশিষ্ট মানুষটি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল। সময়ের সামান্য হেরফের হলে, দিনদুপুরে এক দঙ্গল মানুষের মধ্যেই সে সীমাহীন একতরফা অত্যাচারে তার জলজ্যান্ত বউকে মেরে ধরে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিত।

— মনে আছে তো? আমি বললাম। যেন নয়নচাঁদ বেহিসেবী এবং ভুলো। প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে না দিলে সে বারুইপুর ব্যারাকপুর এক করে ছেড়ে দিতে পারে। 'মনে আছে তো' বলতে নয়নচাঁদ কী বুঝল কে জানে! খুব নির্বিকার গলায় বলল, উড়ু উড়ু ভাব কখন আসে, নীরুদি? রাগ নয়। এবার আমার সত্যি অবাক হবার পালা। এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম, নয়নচাঁদ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে সে কী অন্যায় করেছে। তার চোখমুখের ভাব বদল দেখে আমার তেমনই মনে হচ্ছিল। অপরাধবোধে অনুতপ্ত মানুষ অনেক সময়েই স্বীকারোক্তি দিতে পারে না। লজ্জা এবং সংকোচে ভেতরের মুচরে ওঠা ভাবটিকে কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারে না। তখন সে আনমনার মতো চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন মানুষ যেমন মেলাতলার সব ভুলে গেলেও, কড়াইয়ের গরম তেলে জিলিপির প্যাঁচ মারার কায়দাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না বা ভুলতে চায় না, নয়নচাঁদেরও সেইরকম

রয়েছে। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরেও সেসব ছেড়ে, বাবুর আলটপকা বুঝতে-না-পারা কিছু কিছু শব্দ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এখন আমি যদি বলি, ঘরের চেয়ে বাইরের মজার জেল্লা বেশী হলে, মনে উড়ু উড়ু ভাব আসে। কথাটা একশ ভাগ সত্যি হলেও, নয়নচাঁদ কিছুতেই মানতে চাইবে না। সুরিয়ার ঠেকের মৌতাত তো বাড়িতে মিলতে পারে না। সুরিয়ার দেহের বিদ্যুৎ চমকের কাছে, হাড় সর্বস্ব কঙ্কালসার ফুলুর শরীর তো মরা জ্যোৎস্নার চেয়েও মরা। মনে মনে যা ভাবছি, কিছুতেই এসব কথা মুখে বলতে পারব না। দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, সেটা তোমার ওই বাবুই বলতে পারেন।

— তা বটে। নয়নচাঁদ এমনভাবে ঘাড় দোলাল, যেন উত্তরটা তারও জানা ছিল।

— ওই ভাবটুকুনের জন্যেই বসে আছি। নয়নচাঁদের গলায় সন্তুষ্টির আবছা আভাস, তখন ঠিক জায়গাতে গিয়ে পৌঁছব। সেখেনে রাজা উজির হোমরা চোমরা, এমনকি রাক্ষুসী মার্কা মেয়ে মানুষগুলো অব্দি, আমার কথায়, ওঠ বললে উঠবে। বোস বললে বসবে।

— তোমার বাবু বুঝি এইসব বলেছে? হেসে হেসে বললেও আমার কথার শ্লেষটুকু নিতান্ত আনতাবরি লোকও ধরতে পারবে, এমন হয় নাকি?

— হয়। নীরুদি হয়। উত্তেজনায় দ্রুত চোখ পিটপিট করল কয়েকবার, একে বলে বশীকরণ বিদ্যে। একবার শিখে নিতে পারলে ...! সন্তুষ্টি এবং গর্ব দুই মিলেমিশে গেলে চোখমুখের অভিব্যক্তি, গলার স্বর যেমন হয়, নয়নচাঁদের ক্ষেত্রেও তেমনটি হল। চোখ বুজে অল্প অল্প মাথা নাড়ল। আঙ্গুলে আঙ্গুল ঘষে টুস্কি বাজাল এবং 'নিতে পারলে' এই শব্দ দুটি এমন খেলিয়ে উচ্চারণ করল যে, সেটা শোনাল, নি-তে-এ-এ পারলে এ-এ-এ...।

বুঝলাম নয়নচাঁদের কাঁধ থেকে ভূত নামানো মোটেই খুব সহজ কাজ নয়। তার মানে আমি হেরে গেলাম। নয়নচাঁদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি নিজেই জড়িয়ে পাকিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এখন আমায় হয় মরীয়া চেষ্টা করতে হবে যাতে নয়নচাঁদকে বোঝাতে পারি সে অন্যায় করেছে, পাপ করেছে। আর তা না হলে 'যা হচ্ছে হোক' এইরকম বীতশ্রদ্ধ ভাব নিয়ে এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে। মূলত যা আমার পরাজয়। আমার অপারগতা। এই প্রথম নিজের মনে দ্বন্দ্ব তৈরী হল। তবে কি এখন থেকে যে কোন কাজ করার আগে তার প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতা এবং নীতিগত দায়বদ্ধতা যা আমাতে বর্তায়, এসবগুলি ভাবতে হবে। নাকি এতদিন যে ধ্যানধারণা নিয়ে চলেছি অর্থাৎ অন্যায় অবিচার দেখলেই তার প্রতিবাদ করব, তা আমার ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার ভুক্ত হোক ছাই না হোক, সেইভাবেই চলব।

কোন এলিটিয় ধারণা থেকে নয়, এমনিই মনে হল, নয়নচাঁদের মতো একজন ভোঁতা মাপের, বর্বর চরিত্রের মানুষ, কথার মারপ্যাঁচে আমাকে দাবিয়ে দেবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। পরাজয়ের গ্লানি থেকে এক ধরণের জেদ জন্মায়। যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেও 'সব বিপদে পাশে থাকেন না', এইরকম ধারণায় পাশে সরিয়ে রেখে একরোখার মতো নিজেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

— নয়ন শোন। রীতিমত ধমকের সুরে বললাম। যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলি আমার কথা শুনতে পায়, যদি আর কোনদিন এই ধরণের অসভ্যতা কর, আমায় ছুটে আসতে হয়! উপস্থিত মানুষজনের চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখার জন্য একটু থামলাম। তারপর গলাটাকে আরও উঁচু পর্দায় চড়িয়ে বললাম, জানবে সেদিন তোমার কপালে অনন্ত দুর্গতি। নয়নচাঁদ বড় বড় চোখ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন আমার কথাগুলি সে বুঝতে পেরেছে। অনুতাপ বা ভয় না হোক, একটু আধটু লজ্জা পেয়েছে। সংকুচিত গলায় থেমে থেমে বলল, আমি কথা দিচ্ছি নীরুদি, আর আপনাকে আসতে হবে না।

আনন্দ নয়, শ্লাঘা অনুভব করলাম, ঠিক বলছ?

— ঠিক। নয়নচাঁদ সজোরে ঘাড় নাড়ল।

— তোমরা সব শুনলে তো? উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশে গলাটাকে বেশ চড়িয়েই বললাম,নয়ন আর এ ধরণের কাজ ...!

— উঁহু। আমার কথার মাঝেই নয়নচাঁদ হাত তুলে বলল, ধারণ ধারণ বলা যাচ্ছে না। এই নোগরা জঞ্জাল থেকে আমাকে বেরোতেই হবে। জীবনের সন্ধানটি করতেই হবে। আর একবার ভাল কথায় বুঝুন। তাতে কাজ না হলে জাল ছিঁড়ে একাই বেইরে পড়ব। স্বর্ণলতা, বলিদান বা মাধবীকঙ্কন নাটকের চরিত্রের মতো একটানে অনেকক্ষণ কথা বলল নয়নচাঁদ, বাবুর দয়ায় যখন চোখের ন্যাবা ভাবটুকু কেটে গেছে, তখন আর মরতে এখেনে পচব ক্যান?

গুড বেটার বেস্ট যেমন হয়, পাজী বদমাস হারামজাদা না হওয়ার কোন কারণ নেই। নয়নচাঁদ সুপারলেটিভ ডিগ্রির অধিকারী। একে সাইজে আনা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু কঠিন এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ। নয়নচাঁদকে মডেল হিসাবে ধরে আমি সমাজ পরিবর্তনের কাজ শুরু করতে পারি না। আর আগেই বলেছি, আমি মোটেই এত বড় ক্ষমতাধারী নই, যে দশ দিনে দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পারব। পারলাম না, ব্যর্থ হলাম, এ ধরণের হীনমন্যতায় মোটেই আক্রান্ত নই। বরং নয়নচাঁদের ব্যাপারে ছুটে আসাটা জমা

খরচের তালিকায় জমার ঘরে একটি নতুন অভিনব অভিজ্ঞতা। এখন থেকে নিজের সঙ্গে নিজেকে আর একটু বেশী করে কথা বলতে হবে। একপেশে ধারণার পরিবর্তে যে কোন ঘটনাকে ডান এবং বাঁ, দুদিকে দিয়েই ভাবতে হবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে নিজের কাছে যেটি অপরিহার্য, একান্ত পালনীয় বলে মনে হবে, সেটিই করব। তবে হ্যাঁ, হার জিত যাই হোক না কেন, চট করে ভুলে না গিয়ে কাঁধ থেকে ময়লা ঝাড়ার মতো আঙ্গুলের টোকায় সেটিকে ফেলে না দিয়ে, ঘটনার গভীরে যেতে হবে।

অয়ন বলত, অনেক বড় ঘটনার মূল কারণটি নিতান্তই সাদমাটা তুচ্ছ এমন হতেই পারে। আবার তুচ্ছ ঘটনার পিছনে দুরভিসন্ধিমূলক গভীর কারণ থাকতে পারে। অয়ন যদিও যে কোন ঘটনার কারণ বলতে আর্থ সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টি বুঝত। মানসিক দীনতা বা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বা শুধুমাত্র শারীরবৃত্তিয় রিপুর তাড়নাতেও যে মানুষ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে, এ ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে চাইত না। যে কোন রচনাই হোক না কেন, ঘুরে ফিরে সেটা গরুর রচনা হতেই হবে, অয়নের বিশ্লেষণ ছিল ঠিক এই রকমই। মুহূর্তের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে যে কোন মানুষ তার আজন্ম লালিত শিক্ষা রুচির বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে পারে, সাধু শয়তান বা শয়তান সাধু হতে পারে, অয়ন কিছুতেই এটা মানত না। আমার প্রায়শই মনে হত একটু বেশী পড়াশুনা করলে কোন কোন মানুষের মধ্যে হয়ত তার অজান্তেই অহমিকা জন্ম নেয়। তখন সে ভাবে যে কোন ঘটনা সে যে চোখে দেখছে বা যেভাবে ভাবছে, সেটাই অভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত।

আজ যদি আমার জায়গায় অয়ন থাকত, আমি স্থির নিশ্চিত, নয়নচাঁদের এমন আচরণের কারণ হিসাবে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করত। আর এখান ওখান থেকে কোটেশন আওড়ে, রেফারেন্স দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে এমন তালগোল পাকিয়ে দিত, তখন মনে হত, সত্যি ওই ঠিক বলছে। ওর তুলনায় আমি কত কম জানি বলেই হয়ত ঘটনার নিউক্লিয়াসে না গিয়ে সারকামফারেন্সে কারণ খুঁজছি। এখনও আমার যেমন স্থির বিশ্বাস 'বাবু' নামক লোকটির কথার মোহে নয়নচাঁদ আকৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে আর্থ সামাজিক তুলনামূলক অবস্থানের কোন মামলা নেই। আর এও জানি, নয়নচাঁদের মতো জুয়াড়ী মাতাল যেমন চট করে মজেছে, তেমনি হঠাৎ মোহহীন হয়ে পড়তেই পারে। দার্শনিকেরা যেভাবে পৃথিবীটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, তার একশ ভাগ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কল্পনার কিছু মিশেলও আছে তাতে। আর আছে বলেই, অনেক ঘটনার কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা মেলে না।

এই যেমন আমার হাত কয়েক তফাতে নয়নচাঁদ জড়োসড়ো হয়ে সংকুচিত ভঙ্গীতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন অন্যায়কারীর সব দায়ভার সে মেনে নিয়েছে। কে বাবু, কী দুচারটে বস্তা পচা বাক্য আওড়ে, নয়নচাঁদের মতো একটি নীরেট, পোকায় কাটা মানুষের মনের মধ্যে বৈরাগ্যভাব জাগিয়ে তুলল, রূঢ় বাস্তবের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনভাবেই মানা যায় না। মেলানোও যায় না। কিন্তু ঘটেছে তো তাই। এর পিছনে যুক্তিসম্মত কোন লজিক, গাণিতিক ঐকিক নিয়ম, এমনকি ইকোয়াল বা ইকুইভালেন্ট টু, এই জাতীয় কোন সমাধান সূত্রও নেই। নিছকই একটি কাকতালীয় ব্যাপার। যেমন দুঃসহ গরমের দিনে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। তার কোন প্রস্তুতি নেই। কন্টিনিউটিও নেই। বয়ে গেল, ক্ষণিকের জন্য হলেও আরাম বোধ হল। ব্যাস, এই অব্দি।

মনে মনে ভাবলাম, ঘটনাটি যত দূর এগিয়েছে বা আমি যতটুকু দেখলাম, জানতে পারলাম, এই অব্দি থাক। এর মধ্যে আর ইনভলভড্ না হলেও চলবে। আমি তো হারিনি। মূলত একার চেষ্টায় নয়নচাঁদকে থামিয়েছি। ফুলুকে নিদারুণ প্রহারের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। হেমেন ডাক্তারকে ডেনে এনে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছি এবং আপাতত নয়নচাঁদ যে আবারও এই ধরণের শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটাবে না, এ বিষয়ে তার আশ্বাস আদায় করেছি। সে আবার 'বুঝুবে' ফুলুকে। একবার কেন, প্রয়োজনে হাজার বার বোঝাক। ভাল কথায় না হোক, ধমক ধামক দিয়েও সে যদি ফুলুকে কিছু বোঝাতে চায়, বিশ্বাস করাতে চায়, করুক না। প্রহারের চেয়ে তো ভাল। আর এখানেই আমার জিৎ।

'যাচ্ছি' বা 'চলি' এই জাতীয় কিছু না বলেই আমি নয়নচাঁদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। প্রতিদিনের মতো আজও এই অঞ্চলটা একই রকম লাগছে। খালি গা, খালি পা কয়েকটি শিশু ফাটা চুপসে যাওয়া একটি রবারের বল নিয়ে খেলছে। কানাই ধারার বউ দাওয়ায় বসে বাচ্ছাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। কে যাচ্ছে, কে আসছে, সেদিকে তার কোন হুঁশই নেই। বটগাছের নীচে বাঁশের মাচায় বসে মাঝবয়সী তিনটি লোক জড়ানো গলায় গল্প করছে। জনমজুর সুকুমারের বোন আনি, ফ্যারফ্যেরে একটা শাড়ি পরে, রং চংয়ে গেঞ্জি গায়ে কান ঢাকা চুল একটি ছেলের সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে হেসে হেসে গল্প করছে। অন্য সময় হলে আনি আমায় অবশ্যই ডেকে জিজ্ঞেস করত, ক্যামন আছেন? আজ সে আমায় দেখেও দেখল না। ছেলেটি এ অঞ্চলের নয়। গোগ্রাসে আনিকে দেখছে। কলতলায় খাবার জল নেওয়ার জন্য যে যেমন পেরেছে, বালতি হাঁড়ি পলিথিন জার

নিয়ে লাইন দিয়েছে। বংশগোপালের বুড়ো বাপ জুবড়ে বসে পেটে মাথায় জল থাপড়াচ্ছে। পদন পিসি মুখ ভর্তি গুড়াকু নিয়ে আমায় ডাকল, বাড়ি চললে দিদি? মিটমাট হল? আমি সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে ঘাড় কাত করে অল্প একটু হাসলাম। প্রিয়লালের বউ কলতলায় দাঁড়িয়েছিল। যেন আমাকে দেখিয়েই পিছন ফিরে দাঁড়াল। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্যই হঠাৎ করে প্রিয়লালের কথা মনে পড়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওর বউকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয়লাল গেল কোথায় বল তো? সেই তো আমায় ডেকে নিয়ে এল ...।

প্রশ্নটা যেমনই হোক না কেন, উত্তরটা প্রিয়লালের বউ যেন আগেভাগে তৈরী করে রেখেছিল, পরের বোয়ের কষ্ট দেখে সোয়াগ উতলে উঠল! ওকালতি ধরতে এখেনে সেকেনে বাবু ঘোড়ার পারা দৌড়তে লাগলেন। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎই ঝনঝন করে বেজে উঠল, অমন পরসুয়াগী ব্যাটাছেলের মুখে মারতে হয় তিন ঝ্যাঁটার বারি। প্রিয়লাল তার বউকে ভয় করে কিনা জানি না। তাকে যে আর দেখা গেল না, তার কারণ কি তবে এই? মুখরা বউ, নড়া দাঁতের মতোই অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। দুঃসহ ভয়ের কারণ।

পাঁচ

নতুন করে আর কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করল না। প্রিয়লালের বউকে থামিয়ে দেওয়াটা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। হয়ত সেটা উচিতও ছিল। আর পাঁচজন আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করতে পারে। মনে করতে পারে পরস্ত্রীর সম্পর্কে প্রিয়লালের 'সুহাগে'র পিছনে আমার মদত রয়েছে। তা না হলে প্রিয়লাল খামোকা আমাকেই বা ডাকতে যাবে কেন! কিন্তু যে জায়গাটায় নিজে সৎ, সেখানে কম্প্রোমাইজই বা করতে যাব কেন? যুক্তি দিয়ে বা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ভুল ভাঙ্গাতেই বা যাব কেন? প্রিয়লালের বউ সব জানে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে না জানুক, কে দোষী আর কে দোষী নয়, এটুকু তার জানা। তারপরেও একজন মহিলা হয়ে আর একটি মহিলাকে অপমানিত হতে দেখে, নির্যাতিত হতে দেখেও, তার মধ্যে কিভাবে পরকীয়া পিরিতের ইঙ্গিত পায়, কে জানে! যদিও জানি আমার সম্পর্কে এই ভুল ধারণাটুকু প্রিয়লালের বউয়ের মনে থেকে যাওয়া মানেই, আমার ক্ষতি। মিথ্যে বদনাম। আর অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কোন রকম বিচার বিবেচনা না করেই চট করে একটি সিদ্ধান্তে পৌছে যায়। তবু ভাবলাম, যা ভাবছে ভাবুক। অন দি স্পট সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। হয়ত উচিতও নয়।

সময়ের চেয়ে বড় বিচারক কেউ নেই। প্রিয়লালের বউয়ের ভুল ধারণা আপনা থেকেই ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এর উল্টোটা হয়, হোক না। কাকে কার কান নিয়ে গেল, তা শুনে তো আর সব সময় কাকের পিছনে দৌড়নো সম্ভব নয়। এড়িয়ে যাওয়া বা গুরুত্ব না দেওয়াও এক ধরনের প্রোটেস্ট।

আসার সময় একরকম দৌড়তে দৌড়তে এসেছিলাম। এখন ফিরছি ঠিক তার বিপরীত চালে। ছোট ছোট পা ফেলে, ধীর গতিতে। এখন কোনো তাড়া নেই। বুকের মধ্যে 'কী দেখব' বা 'কী হবে' এ জাতীয় উৎকণ্ঠার ঝড় নেই। কাউকে অনুসরণ করে পথ চলারও কোন প্রশ্ন নেই। দিন ফুরিয়ে আসছে। চারপাশের আলো ম্লান হয়ে গেছে। জাগতিক শব্দাবলীর সুর ও সুরের তীক্ষ্ণতা দুই-ই পাল্টে গেছে। মন্দীভূত হয়েছে। উগ্রক্ষত্রী পাড়ার বিশাল মাঠটি, পোয়াতী গাভীর মতো গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘাস আর বিক্ষিপ্ত বুনো ঝোপের মধ্যে থেকে নিশাচর কীটপতঙ্গেরা ডাকতে শুরু করেছে। লম্বা একসারি শামুকখোল পাখি মালার মতো ভাসতে ভাসতে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে চলে যাচ্ছে। পাখিগুলি এমন কিছু উঁচু দিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু আলোর স্বল্পতার জন্য মাঠে তাদের ছিঁটেফোঁটা ছায়াও পড়ছে না। অনেকটা দূর দিয়ে একা একটি কিশোর সাইকেল চালিয়ে চলে যাচ্ছে। চারপাশে বড় বেশী চুপচাপ বলেই হয়ত, আস্তো করে বাজানো সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ছেলেটি নিশ্চয়ই মনে মনে বা গুনগুন করে একটি ছন্দের গান গাইছে। ঘন্টিটা তার তালে তালে বাজাচ্ছে। টানা একটানা নয়। থেমে থেমে। নীচু পর্দার আবহ সংগীতের মতো শোনাচ্ছে। মাঠটির মাঝ বরাবর নিঃসঙ্গ ভূতের মতো একা দাঁড়িয়ে লতাপাতার ঝোপ গায়ে বিশাল একটি পাকুর গাছ। পাকুর গাছের নীচে ঘন কালো ছায়া। গাছটির ডালপালা ভেদ করে সূর্যের আলো চারপাশের মাটিতে ঠিকমত পৌঁছায় না। বাধাপ্রাপ্ত হয়। গাছের নীচের মাটিতে আস্তো চাপ দিলাম। অল্প ভিজে, স্যাঁতসেঁতে ভাব। মাঠটিকে আড়াআড়ি পার হলে আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথটা একটু ছোট হয়। প্রায়শই আমি করিও তাই। আজ মনে হল ওভাবে নয়, সরাসরি মাঠের বুক চিরে সোজা পথে হাঁটব। তাতে একটু সময় বেশী লাগবে। তা লাগুক। আমি গা ছাড়ার মতো করে তাড়াহীন একটি মানুষের মতো মন্থর পায়ে মাঠটি পার হতে লাগলাম। প্রকৃতি এমন কিছু রসস্থ নয়। রোজ যেমনভাবে সন্ধ্যাটি নামে, আজকের সন্ধ্যাবতরণ উনিশ-বিশ অন্যদিনের মতোই। এ মাঠটিও ঠিক এইরকম সময়ে, আজই আমি প্রথম পেরিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু হঠাৎ কী যে হল, শরীরটা অল্প কেঁপে উঠল বার দুই। কোনরকম ভয় নয়। শরীরের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এসে গেল হঠাৎ করে। কেন জানি না

নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। ভীষণভাবে অয়নের কথা মনে পড়তে লাগল। মুখবন্ধ সাদা খামটির কথা ভুলেই গেছিলাম। এখনও সেটা খুলে দেখার কোন তাগিদ বোধ করলাম না। শুধুমাত্র আমার পাশে পাশে অয়নের শরীরী উপস্থিতির আকাংখায় সত্যি খুব কষ্ট হতে লাগল।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আমার মনের বন্ধ জানলাগুলো যখন অয়ন এক এক করে খুলে দিচ্ছিল, আর সেই খোলা জানলা দিয়ে হুড়মুড় করে রোদ হাওয়া বৃষ্টি ঢুকে পড়ছিল, অয়নকে আমিই বলেছিলাম, আমরা দুজনে মিলে নতুন কিছু করতে পারি না? অয়ন অবাক চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, নতুন কিছু মানে?

— কোন চ্যারিটেবল কাজকর্ম?

— যেমন?

— গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো। দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য ...।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই অয়ন অল্প হেসে বলেছিল, চ্যারিটেবল সোসাল ওয়ার্ক!

যদিও অয়নের বলার মধ্যে মৃদু শ্লেষের ছোঁয়া ছিল এবং আমি সেটা ধরতেও পেরেছিলাম, তবু মনে হয়েছিল ব্যাপারটা ও যেভাবেই নিয়ে থাকুক না কেন, ওকে পাশে না পেলে আমি কিছুই করতে পারব না। তাই আমার অসম্পূর্ণ কথাটুকু শেষ করব বলে আবার বলতে শুরু করেছিলাম, বা ধর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড অনাথ শিশু, যাদের কেউ নেই ...!

— বুঝেছি। অয়ন এবার বেশ গলা ভারি করে হাত তুলে আমাকে থামতে বলল। আমার খুব অবাক লাগল। আমার ধারণা চিল চিন্তা ভাবনায় অয়ন আর পাঁচটি ছেলের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। পিছিয়ে পড়া দুর্বল কমজোরীদের জন্য তার মমত্ব আছে। তাদের বেটারমেন্টের জন্য কিছু করার ব্যাপারে সে যথেষ্ট আগ্রহী এবং আমার পরিকল্পনায় সে উৎসাহ বোধ করবে।

— কী বুঝেছ, বল? আমিও গলাটাকে যথাসম্ভব ভারি করে থেমে থেমে বললাম। তার কথায় এবং আচরণে আমি যে আঘাত পেয়েছি সেটা বোঝাবার জন্যই আবার বললাম, বল, কী বুঝেছ?

আমরা দুজনে খুব ধীর পায়ে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। চলতে চলতেই কথা বলছিলাম। অয়ন আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে সোজা চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল, এসব করে সত্যি কিছু হয়?

— তার মানে? আমি বললাম, কিছুই হয় না?

— না। অয়ন চোখ বুজে মাথাটাকে এপাশ ওপাশ দোলাল, আত্মসন্তুষ্টি আছে। একটু থেমে বলল, যারা করে, তারাও এটা জানে। কোন ইমপ্যাক্ট নেই।

— কী বলছ? অয়নের ওপর বাস্তবিক রাগ হচ্ছিল, একজন মানুষ যদি এক আনা উপকৃত হয়, তার কোনও ইমপ্যাক্ট নেই?

— আমার আপত্তি ওইখানেই। নিজের যুক্তিকে এসট্যাবলিশ করার জন্য অয়ন 'ওইখানেই' শব্দটি একটু বেশী জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করল, হোয়াই একজন? হোয়াই নট অল?

রাগ বা বিস্ময়ের পরিবর্তে এবার আমার হাসি পেল। বললাম, তুমি নিজেকে কী ভাব জানি না। আমি মোটেই অমনিপোটেন্ট নই। মিথ্যে ফ্যানটাসি আমার ভাল লাগে না। অয়ন আমার কথার কোন জবাব দিল না। চুপচাপ আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আমি খুব সাবধানে ঘাড় কাত করে দেখলাম, অয়নের মুখটা থমথম করছে। রাগে কিম্বা দুঃখে। রেগে ও যেতেই পারে। কিন্তু দুঃখ পাওয়ার মতো কোন কথা আমি বলিনি। অয়ন ওর বিশ্বাসের কথা বলেছে। আমিও যা বিশ্বাস করি, তাই বলেছি। আমার কথায় অয়ন দুঃখ পেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ, এসব তো অয়নই আমায় শিখিয়েছে। এখন যদি ও ভাবে যে আমি ওর মতের বিরোধীতা করছি মানেই, ওকে অগ্রাহ্য করছি, সেটা তো ওর ভুল ধারণা। ও আমায় বুঝিয়েছে, ইনার পার্টি স্ট্রাগল, সুস্থতার লক্ষণ। তাই যদি হয়, তবে ব্যক্তিমতপার্থক্যও স্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

বন্ধুত্বপূর্ণও না হোক, ঝগড়া করতে করতেও পথ চলা যায়। কিন্তু এইরকম চুপচাপ পথ চলা অসহ্য।

— ঠিক আছে। হাত নেড়ে এমনভাবে বললাম, যেন আমি ভুল বলেছি স্বীকার করছি, বা অয়ন ভুল বলছে বুঝতে পেরেই প্রসঙ্গটাকে পাশে সরাতে চাইছি।

— এখন বল? আমি বললাম, বিকেলে ঠিক আসছ তো? নাকি গত পরশুর মতো আমি বসেই আছি, বসেই আছি ...! অয়ন ফিক করে হেসে ফেলল, সত্যি বসেছিলে, আমার আসার পথ চেয়ে?

— কেন তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি অনুযোগের সুরে বললাম।

— ভাবতে ভী-ষ-ণ ভাল লাগছে।

কেন জানি না, মনে হল, অয়নের বলার মধ্যে মিথ্যে রয়েছে। চালাকি রয়েছে। গলাটাকে গম্ভীর করে বললাম, আসতে না পারার জন্য তোমার এতটা ভাল লাগবে ...!

— উঁহু। উঁহু। অয়ন আঙ্গুল তুলে নিষেধের ভঙ্গীতে আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল, বক্তব্যকে বিকৃত কোর না। আমি না বোঝার ভান করলাম, তুমি তো তাই বলতে চাইছ!

— মোটেও না। অয়ন বেশ শব্দ করে স্ট্যান্ড ফেলে, সাইকেলটাকে দাঁড় করাল। তারপর খুব অল্প সময়ের জন্য স্থির চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, একটু আগে বললাম না, কোন কোন কাজে আত্মসন্তুষ্টি আছে। কোন ইমপ্যাক্ট নেই। একটু চুপ করে থেকে বলল, বলার ক্ষেত্রেও একইরকম। তুমি তোমার মতো করে বলে আনন্দ পাচ্ছ, ইমপ্যাক্ট নীল।

তার মানে পুরোনো ব্যাপারটা এখনও ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। উদাহরণটা ঠিক মানানসই টু দি পয়েন্ট হল না, জেনে বুঝেও উত্তরটা এইভাবেই দিল। রাগ ধরে রাখতে পারলাম না এবং আমার বলার মধ্যে তার প্রকাশও ঘটল, জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না অয়ন। তার উল্টো ছিরি হয়।

— কেন? কী বলতে চাইছ? আমার কথায় অয়ন বেশ ঘাবড়ে গেছে মনে হল।

— মাইলস্ টু গো। আমি বললাম, সমস্ত পথটা যে দুজনে পাশাপাশি হাঁটব, এমন তো না'ও হতে পারে।

— ও হো। অয়ন হাসবার চেষ্টা করল, দ্যাটস এ গুড সাইন। তবে! বলে অল্প একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে খুব সাবধানে আগুন জ্বালল। লম্বা টান দিয়ে গলগল করে অনেকটা ধোঁয়া ছাড়ল, তোমার কথামত যদি এমনটা হয়, দেখবে কোন কোন ঘটনার ইনভলভ্‌মেন্টের পর তোমার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগবে আদৌ কি কোন সমাধান হল? বা ইনডিভিজুয়ালের জন্য কিছু করলে, টোটাল কোন ইমপ্যাকট তৈরী হয় কি? শুধুমাত্র একজনকে ধরে নাড়া দিলে, সেই ঝাঁকুনি অন্যদের গায়েও লাগে কি?

সেদিন আমি অয়নের এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি বা যৎকিঞ্চিত পারতাম ইচ্ছে করেই সেটুকুও দিইনি। অয়ন আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়াশুনো করেছে। শুনেছি কলেজে একটি উগ্র রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ছেলেদের সঙ্গে ওর মেলামেশাটাও গভীর। সর্বোপরি অয়নের মতো করে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে বলতেও পারব না। এরজন্য আমি কোন সময়েই হীনমন্যতা বোধ করিনি, আজও করি না। কারণ পড়াশুনা কম জানার যেমন কিছু অসুবিধা আছে, আবার বেশী জানারও বেশ কিছু চালাকি আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, যেখান সেখান থেকে লাইন কোট করে, সাত সতেরো রেফারেন্স

টেনে বিপক্ষকে পাজল্ করে দেওয়া। লেখাপড়া জানা সোকলড্ বুদ্ধিমান লোকেরাই খুব সহজে 'না' কে 'হ্যাঁ' বা 'হ্যাঁ' কে 'না' করতে পারে।

আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, অয়নের বলার মধ্যে জটিলতা ছিল সত্যি, যেটাকে আমার অনেক সময় চালাকি, কখনও বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া মনে হয়েছে, এ সবের আড়ালে কিছু নিষ্ঠুর সত্যিও ছিল। যেমন শুরু করে শেষ পর্যন্ত নয়নচাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের আসল কারণ কী, আমি পুরোপুরি ধরতে পারিনি। বা আজ নয়নচাঁদকে থামাতে পারলাম মানে এই নয় যে আগামীকালই ওই বস্তির দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ মানুষটি একই রকম বা এর চেয়েও নিষ্ঠুরতম কান্ড কারখানা ঘটাবে না। সব থেকে বড় কথা, নয় নয় করে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় ওই বস্তি অঞ্চলে থেকে ঘটনাটির অনেকটাই দেখে এবং কিছুটা শুনেও মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে আমি ঘটনাটির ইনস্ অ্যান্ড আউটস্ সব কিছু জানতে পারলাম না। সময় এত দ্রুত ছুটল যে, ভালভাবে সব কিছু বুঝে ওঠার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেল না। বাবু লোকটি কে? কীভাবে নয়নচাঁদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হল! এর মধ্যে সুরিয়ার অনুপ্রবেশই বা কেন ঘটল? তার চেয়েও দুর্বোধ্য ব্যাপার যেটা, সুরিয়ার ঠেকে কী এমন ভেলকিবাজি দেখাল বাবু যে, নয়নচাঁদের মতো ভীতু ঠাণ্ডা প্রকৃতির একটি মানুষ অমন চণ্ডাল-রাগী হয়ে উঠল এবং মোটা দাগের ভোঁতা বুদ্ধির নয়নচাঁদের মনে সংসার সম্পর্কে বিতৃষ্ণভাব জাগল! এখন মনে হচ্ছে প্রশ্নগুলির উত্তর আমার জানা খুব জরুরী। কিন্তু এই ব্যাপারে কে-ই বা আমায় সহযোগিতা করবে! আমার মতো অনেকেই আদ্যন্ত ঘটনাটি খুব কাছ থেকে দেখল। তাদের কারোর মনেই এই ধরণের বা এর কাছাকাছি দশটা বিশটা না হোক আধখানা সিকিখানা প্রশ্নও উঁকি মারেনি। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তা না হলে 'বাবু' 'সুরিয়া' এইসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করত। নয়নচাঁদ যে হঠাৎ করে সংসার সম্পর্কে এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে যে বউ ছেলেমেয়ে ছেড়ে ছুড়ে সে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছে, এই ব্যাপারটা এরা কেউই ধরতে পারেনি। নয়নচাঁদের কথাবার্তা শুনেও কিছুই মালুম হয়নি এদের। সবল মারবে, দুর্বল পড়ে পড়ে মার খাবে, চীৎকার চেঁচামেচি, কাঁচা নোংরা খিস্তির চাপান উতোর চলবে, তারপর একসময় আপনিই সব থেমে যাবে, এই রেওয়াজেই অভ্যস্ত এই বস্তির মানুষজন। ঘটনার মূল কারণ কী, ঘটনার ট্রেন্ড কোনদিকে, প্রকৃত দোষী কে, নেপথ্যে অন্য কোন কাহিনী বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন ভূমিকা আছে কিনা, এত কিছু ভাববার বুদ্ধি দূরদর্শিতা ধৈর্য এবং সময় কিছুই এদের নেই। এরপর আবার কোনদিন এই ধরণের বা এর চেয়েও ভয়ংকর কোন কাণ্ড ঘটলে, তখন সেখানে আমি বা

আমার মতো কেউ না থাকলে, এরা নিজেদের মতো করে অবস্থার মোকাবিলা করবে বা কিছুই না করার জন্য করুণতম সমাপ্তির নিশানায় ঘটনা গড়িয়ে যাবে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মাঠ পার হচ্ছিলাম। আচমকা কে যেন ডাকল নীরুদি? ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখি প্রিয়লাল। অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কি তবে আমার পিছন পিছন আসছিল! বিড়ালের মতো শব্দহীন পায়ে! অন্যমনস্কতার জন্য আমি ছিটেফোঁটা টেরও পাইনি।

— চমৎকার লোক তুমি! আমি বললাম, আমাকে ডেকে নিয়ে এসে, নিজেই হাওয়া হয়ে গেলে? প্রথম কয়েক মুহূর্ত প্রিয়লাল কোন জবাব দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন নিজের অন্যায়টুকু সে বুঝতে পেরেছে। আর তাই লজ্জা পেয়েছে।

— কী হল? আমি আবার বললাম, বললে না তো কোথায় গেছিলে?

এবার প্রিয়লাল আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তারপর নীচু গলায় থেমে থেমে বলল, পঞ্চায়েত অফিসে, নিখিলদাকে ডাকতে গেছিলাম।

— নিখিলদা? আমি ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ ওনাকে ডাকতে গেলে কেন?

— হাজার হোক প্রধান তো। প্রিয়লালের গলায় গদগদ ভাব, তাই ভাবলাম উনি যদি একবার আসেন ...। প্রিয়লালের কথায় খুব রাগ হল। এতক্ষণ আমি যা ভাবছিলাম, তা ঠিক নয়। আমাকে ডাকার পরেও প্রিয়লালের মনে হয়েছে, পঞ্চায়েতবাবুকে ডেকে আনা দরকার। তার মানে আমার ওপর কোনরকম ভরসাই রাখেনি। বা যতক্ষণ না প্রধান সাহেব আসেন, ততক্ষণ আমি যেন কোন রকমে অবস্থাটা সামলে রাখি এইরকম একটি পরিবর্ত ভাবনা নিয়ে প্রিয়লাল আমার কাছে ছুটে এসেছিল। এই দুয়ের বাইরে আরও অন্য কারণও থাকতে পারে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে প্রিয়লালের ফেভারে অন্য কোন কারণ আমি ভাবতে পারলাম না বা ভাবতেও ইচ্ছেও করল না।

— পঞ্চায়েতবাবু এলেন না? ইচ্ছে করেই আমি গলাটাকে ভারি করে বললাম।

— জরুরী একটা মিটিং চলছিল। প্রিয়লাল হাসবার চেষ্টা করল, অবিশ্যি তারই মধ্যে আমাকে চোখের ইশারায় বলল, বস। একটু জিরিয়ে নাও। তারপরে শুনছি।

— কতক্ষণ বসেছিলে? প্রিয়লালের গলার স্বরে যে মিথ্যে এবং তারই সঙ্গে ভয়ের ছোঁয়া রয়েছে, আমি টের পেলাম।

— তা ধরুন না কেন, ঘন্টাখানেক। এবার আমি ইচ্ছে করেই শব্দ করে হাসলাম, তারপরেও এলেন না?

— না মানে! প্রিয়লাল যে রীতিমত বেকায়দায় পড়েছে, তার চোখমুখের চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব শুনেটুনে আমায় বলল, সোয়ামী স্ত্রীতে ওরকম হয়েই থাকে। কালই দেখবি, গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। তখন তুই আমি আঁটি হয়ে গড়াগড়ি খাব।

— মন্দ বলে নি। প্রিয়লালকে বোকা বানাবার জন্য সমর্থনের ভঙ্গীতেবললাম, এই যে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলে, মাঝ থেকে আমি ওদের কাছে তো বটেই, আরও অনেকের কাছেই খারাপ হয়ে গেলাম। প্রিয়লাল বোকার মতো হেঃ হেঃ করে হাসল। হাসি থামিয়ে বলল, ভাগ্যিস আপনি এয়েছিলেন। তা না হলে ...!

— কী হত? আমি আস্তো করে জিজ্ঞেস করলাম।

— নয়নচাঁদ আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করত। ওর মাথায় নির্ঘাৎ কোন অপদেবতা ভর করেছে। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তবে মেয়েমানুষের জান তো! কই মাছের মতো। গরম কড়ায় তখনও লাফায়।

প্রিয়লালের বলার মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষ ফুটে বেরোচ্ছে। যেন ফুলু মেয়েমানুষ না হলে কখন শেষ হয়ে যেত। আর প্রিয়লালের বিচারে সেটিই যথার্থ ছিল। রুই মাছের মত জান নিয়ে ফুলুর বেঁচে থাকাটা মোটেই শোভন, যুক্তিযুক্ত হয় নি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি প্রতিটি পুরুষ নারীকে তার প্রতিপক্ষ মনে করে। প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মানের পরিবর্তে পুরুষ সব সময়ই নারীকে দুর্বল, কম ওয়াকিবহাল বলে মনে করে। আর এসব ক্ষেত্রে পুরুষ একজন যথার্থ ডিকটেটরের মত আচরণ করে। প্রিয়লাল আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। কোন কথা বলছে না। অথচ ঠোঁট নড়ছে। অর্থাৎ অনুচ্চারিত স্বরে কিছু বলছে। যা শুনলে আমি লজ্জা পাব বা রেগে যাব, এই জাতীয় কিছু। একজন অকৃতকার্য প্রতিযোগী যখন তার হারের কারণগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করে, তখন নিজের ঘাটতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারোর অসহযোগিতা বা অন্যায়কে জুড়ে নিতে পারলে, কিছুটা স্বস্তি পায়। যেমন আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আগাপাশতলা সমস্ত ব্যাপারটা প্রিয়লাল জানত। পরিণাম কী হতে পারে, এটাও তার অনুমানে ছিল। হন্তদন্ত ছুটে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়াটা, তার একটা ছল মাত্র। আর সেইজন্যই ঘটনাস্থলে পৌছেই সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। নিখিলবাবুকে ডাকতে যাওয়াটা সত্যি নাও হতে পারে। নিখিলদার রাজনীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। নিখিলদার মতো পাওয়ার মোর পাওয়ারের সওয়ারীও নই। আবার আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত কোন মনোমালিন্যও

নেই। ইগোর ব্যাপারটা, পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে, নিখিলদার থাকতে পারে। আমার কিছুই নেই। তাই ইগোর প্রশ্নও নেই।

তুমি কি আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছ? আমি হেসে হেসে বললাম, ডেকে নিয়ে এসেছিলে, তাই? যতটা আশা করেছিলাম, প্রিয়লাল মোটেই তেমন অস্বস্তি বোধ করল না। বরং খুব সহজ গলায় বলল, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে! বেশ শব্দ করে শ্বাস ফেলল, বাঁচা গেল। বলুন, নীরুদি? প্রিয়লালের এই কথার প্রত্যুত্তরে কোন জবাব দেওয়া যায় কিনা বা দেওয়া উচিত কিনা, ভেবে উঠতে পারলাম না। ঘটনার সঙ্গে যার কোন ইনভলভ্‌মেন্ট নেই, আমাকে ডেকে আনা এবং আর একজনকে ডাকতে যাওয়া ছাড়া যার কোন্ ভূমিকা নেই, সে যদি বয়স্কা মেয়েকে পাত্রস্থ করার পর মেয়ের বাবার মতো হাঁফ ছেড়ে বলে, আঃ! বাঁচা গেল! ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও হাসি তো পায়ই না, রাগ করতেও ইচ্ছে করে না। নির্বোধ এবং অজ্ঞরা এই একটি জায়গাতেই জয়ী। তার ভাল লাগা বা মন্দ লাগায় অপর কেউ রিঅ্যাক্ট করে না বলেই, আনন্দ বা বিষাদটুকু সে হোলসেল কনজিউম করে।

আমি চলে যেতে পারব। প্রিয়লালকে বললাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

— চলেন না। প্রিয়লাল আস্তে করে বলল, সন্ধের সময় স্টেশনের কালির চায়ের দোকানে এসে আমরা একটু গল্পটল্প করি। একটু থেমে বলল, চেম্বার ফেরতা এক এক একদিন ডাক্তারবাবুও এসে বসে। গল্প করতে করতে রাত দশটা এগারটা বেজে যায়।

ডাক্তারবাবু বলতে যে হেমেন ডাক্তার, সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। কারণ আমাদের শহরে বয়স্ক এবং আদ্যিকালের এল.এম.এফ ডিগ্রিধারী ডাক্তার একমাত্র উনিই। বাকিরা যাঁরা সদর হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত, রুগীর ভিড়ে তাঁদের দমফেলার সময় নেই। হসপিটালে যুক্ত থাকার সুবাদে প্রাইভেট তাঁদের চেম্বারে রুগীর গাঁদি লেগে থাকে সর্বক্ষণ। আর নয়নচাঁদ, প্রিয়লালের মতো গরীব গুর্বো মানুষেরা এই সমস্ত এ বি সি ডি ই এফ ডিগ্রিধারী ডাক্তারবাবুদের কাছে যায় না। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা, তার সঙ্গে দেহের এখান সেখানের ছবি তোলার ব্যাপারে, দিন আনি দিন খাই মানুষগুলির অনীহা এবং তার সঙ্গে ভয়। মূলত যার উৎস কিন্তু টাকাপয়সার অভাব। এদের কাছে হেমেন ডাক্তারই ভগবান। ধুতির সঙ্গে হাফ সার্ট গুঁজে, রিক্সার ফুটবোর্ডে বা সাইকেলের কেরিয়ারে বিবর্ণ মোটা সেলাই করা চামড়ার ছোট সুটকেসটা নিয়ে আসছে দেখতে পেলেই, বস্তির বুড়ো বুড়ি থেকে শুরু করে করে কচিকাঁচা সকলেই রীতিমত হৈ চৈ শুরু করে দেয়। আনন্দের সঙ্গে যেখানে স্বস্তি এবং ভরসা মিশে থাকে, সেখানে উচ্ছ্বাসের ধরণটা ঠিক পরিশীলিত

নয়, বরং একটু লাগামছাড়া হয়ে যায় কখনও কখনও। তখন হেমেন ডাক্তার বড় জোর ধমকের সুরে বলে ওঠে, কী হচ্ছে কী? তোদের চিল্লামিল্লিতে রুগী যে হার্ট ফেল করবে।

বস্তির মানুষেরা জানে হেমেন ডাক্তার তাদের আপনজন। তাদের অপরিচ্ছন্ন অপরিসর ঘরে আরাম করে বসে চা-টা খায়। বিনি পয়সায় ওষুধ দেয়। রাত বিরেতে যে কোন সময়ে ডাকলেই আসে।

তুলনায় আমি এই মানুষগুলির এতটা আপনজন নই। আজ এই ঘটনাস্থলে এসে পড়া, নিতান্তই একটি কাকতালীয় ব্যাপার। শুধু নয়নচাঁদ কেন, বাকীরাও আমার উপস্থিতি কতটা মেনে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না।

প্রিয়লালকে বললাম, তুমি এগিয়ে যাও। আমি এখন বাড়ি যাব না। প্রিয়লাল মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, মাঠটুকুন পার করে দিই। এবার আমার সত্যি সত্যি হাসি পেল, আমি কি ছোট মেয়ে যে ভূতের ভয় পাব?

— না, মানে ...! প্রিয়লালের গলায় আড়ষ্টতা, সনঝে হয়ে গেছে। কত রকম খারাপ লোকটোক ...!

— বাজে বোকো না তো। আমি বিরক্ত বোধ করলাম, এ অঞ্চলে সকলে আমায় চেনে। যা বললাম, তাই কর।

প্রিয়লাল আর কোন কথা বলল না। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। আর সামান্য কিছু পথ হেঁটে গেলেই মাঠটা শেষ হয়ে যাবে। আধ খাওয়া চাঁদ আকাশের বুক জুড়ে। আর তার চারপাশে এখানে ওখানে জ্বলছে তারার দল। কত লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে ঐ তারাগুলি। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি। কত দূর থেকে চাঁদের ক্ষয়াটে আলো এসে পড়েছে মাটির পৃথিবীতে। এ সবই আমার জানা। আগেও বহুবার দেখেছি ঐ চাঁদ আর তারাদের। আলো আঁধারীতে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে, আজ সব কিছুই কেমন অদ্ভুত নতুন এবং বিস্ময়কর বলে মনে হতে লাগল। যেন আজই প্রথম আবিষ্কার করলাম, এক পা দু পা করে চাঁদ কেমন এগিয়ে আসছে পশ্চিম থেকে পূবের দিকে। তারারাও যেন তাদের অবস্থান পাল্টাতে চাইছে। আমার দৃষ্টি যতদূরে পৌঁছচ্ছে তার চেয়েও দূরে অন্য গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা ধূমকেতু — এমনি কত কি আছে! মহাকাশে কত রহস্য রয়েছে। প্রতিনিয়ত কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেখানে। আমি সে সব কিছুই দেখতে পাই না। জানতেও পারি না। কত অসংখ্য বস্তু সেখানে ছুটে বেড়াচ্ছে। কখনও একে অপরকে টানছে বা প্রতিক্রিয়ায় নিজেই দূরে সরে যাচ্ছে। হয়ত মাটির পৃথিবীর মতো সেখানেও প্রত্যেকের নিজস্ব সীমারেখা আছে। তীব্র টানাপোড়েন চলেছে। একটির সঙ্গে

আর একটির। কোন কোন নক্ষত্র তাই হারিয়ে যায়। দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। কখনও কখনও তারা খসে পড়ে। ক্ষ্যাপা পাগলের মতো দিশেহারা ধূমকেতু নেমে আসে মহাকাশ ছেড়ে।

আমার শরীরের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ হতে লাগল। দুঃখ নয়, কষ্ট নয়, লজ্জা-ভয়, তাও নয়, বরং বনস্থলির ওপর কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে যেমন ধীর লয়ে, ঠিক সেইভাবে সুখানুভূতিতে ছেয়ে যেতে লাগল আমার শরীর, মন। দূরের আকাশ জানে না, আমরা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত কী ঘটে যাচ্ছে। ভাঙ্গছে, আবার জুড়ছেও। দু চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা এলেন। কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বললেন, ঘুমোবে তো সবাই। শুধু তোমাকেই ঘুমোনোর আগে আযোজন পথ পার হতে হবে।

বাবার গলার স্বর, স্বরক্ষেপণ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। চমকে উঠে চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। প্রাকৃতিক কিছু শব্দ ছাড়া, ব্যাপ্ত চরাচর জুড়ে, আর কোন শব্দ নেই। ভাঙ্গা চাঁদের আলোয় চারপাশ জুড়ে অদ্ভুত রহস্যময়তা। জীবনে আজ আমার দ্বিতীয় মাহেন্দ্রক্ষণ, যা কদাচিৎ আসে। বুকের মধ্যে থেকে মুখবন্ধ সাদা খাম বার করে, খুব সাবধানে আঠা দিয়ে মোড়া মুখটিকে ছিঁড়লাম, একটু একটু করে। বড় সাদা কাগজের এপিঠ ওপিঠ জুড়ে ঠাসবুনোট একটি চিঠি। স্বল্পালোকে পড়া যাচ্ছে না। কেবল বেশ বড় অক্ষরে তিনবার চারবার বুলিয়ে বুলিয়ে মোটা করে লেখা হয়েছে — ভোরের শিশির, মামন, তোমাকে।

এখন আমি কী করব? দমবন্ধ করে এক দৌড়ে মাঠের বাকী অংশটুকু ছুটে পার হয়ে কোন বড় আলোর নীচে দাঁড়াব! নাকি রাতের বেলায় বুকের নীচে বালিশ দিয়ে, টেবিল ল্যাম্পের ঘেরা আলোর নীচে রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ব চিঠিটি! একবার শুরু থেকে। আবার একবার শেষ থেকে। দূরপাল্লার একটি থ্রু গাড়ি ছুটে আসছে তীব্র হর্ন বাজাতে বাজাতে। সিগন্যালের আলোটিও পাল্টে গেছে। লাল থেকে হলুদে। শব্দের ধকলে কাঁপছে চারপাশ। ভয় পেয়ে চমকে উঠে তারস্বরে ডাকতে শুরু করেছে রাতচরা পাখির দল। বেশ বুঝতে পারছি আমার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চারদিক কেমন আবছা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে' — অয়ন এইটুকু
বলে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। ব্রীড়াবতী
নারীর মতো আমি লাজুক গলায় বলেছিলাম, 'আর
এই বাংলার ঘাস রবে বুকে।'

সেদিনই সেই একবার মাত্র অয়ন তীব্র আশ্লেষে আমাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে। আর তুমি রবে আমার বুকে।

ছয়

বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের বাড়ির চেহারাটা আমূল পাল্টে গেছে। ছোট বাগানটা আগাছায় ভর্তি। সীমানার পাঁচিলের গা ঘেঁসে আকন্দ, ফণীমনসা, আর মুথা ঘাসের জঙ্গল। কুয়োতলায় বাঁধানো অংশটুকু খাবলা খাবলা হয়ে উঠে গেছে। আর সেই সব অসম গর্তে এখন বারমাস জল জমে থাকে। জমা জলে ব্যাঙাচির মতো দেখতে এক ধরণের পোকা খেলে বেড়ায়। ছোট জল মাকড়সা ছোটাছুটি করে। বারান্দার গ্রীলের রং উঠে জং ধরা লোহা বেরিয়ে গেছে। এমনকি উঠোনে জামাকাপড় মেলবার জন্য দড়ি বাঁধা খুঁটি দুটির একটি হেলে পড়েছে। দড়িটা মাটির অনেক কাছাকাছি নেমে এসেছে। ঘরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে এখানে সেখানে। খাট আর কাঠের আলমারির পালিশ উঠে কেমন ম্যারমেরে দেখতে হয়ে গেছে। দেওয়ালে টাঙানো আরশিটার পারা চটে যাওয়ার জন্য তার সামনে দাঁড়ালে আবছা অস্পষ্ট দেখায় মুখের ছবি। একজন মানুষের অবর্তমানে সবকিছু এমন বেসামাল হয়ে যেতে পারে, ভাবতেই কেমন অবাক লাগে!

শুধু কি বাড়িটা, বাড়ির মানুষগুলিও কেমন বিশৃঙ্খল, আত্মকেন্দ্রিক এবং আনমনা হয়ে গেছে। বাড়ির প্রতি টান, পরিজনের জন্য সামান্য ভাবনাচিন্তা, এখন সব কেমন অলীক মনে হয়। আমার ছোট বোন অনু কলেজে পড়ে। ও এবং ওর কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি লিটল ম্যাগাজিন করে। বিক্ষিপ্তভাবে আমি ম্যাগাজিনটির দু চারটি সংখ্যাও দেখেছি। দুর্বোধ্য কিছু কবিতা এবং 'অন্য রকম গান' এই শিরোনামে বাংলা ইংরাজী ফরাসী মিশ্রিত উদ্ভট একটি লেখা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলির মধ্যে কখনও সখনও একটি দুটি পঙক্তি বা বিশেষ কোন প্রতীক কিম্বা রূপক, অনেক সময় মোহময়ী কিছু শব্দ, মনকে টানে। অর্থাৎ কোন কোন লেখার প্রসাদগুণ আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে, প্রথমে খটকা লাগে, এ লেখা কাদের নিয়ে। কাদের জন্য লেখা! সময়ের প্রতিফলন নেই, চারপাশে যা সব ঘটছে, তার থেকে যেন বহু লক্ষ যোজন মাইল দূরে বসে এইসব কবিতাগুলি লেখা হয়েছে। অনু বলে, এখনকার কবিরা কুমুদরঞ্জন বা বিহারীলালের মতো লিখবেন না নিশ্চয়ই। সময় যত দ্রুত পাল্টাচ্ছে, কবিতা তার চেয়েও

আরও জোরে ছুটছে। কবিতা বুঝতে গেলে পাঠককে শিক্ষিত হতে হবে। আধুনিক কবিতা রূপচাঁদ পক্ষীর গান নয় যে যেই শুনবে, সেই তার অর্থ বুঝতে পারবে, 'আহা' 'ওহো' করবে। অনুর বন্ধুগুলিকেও কেমন গোলমেলে বলে মনে হয়। তারা আমাকে 'নীরুদি' বলে ডাকে। আবার আমার সামনেই অবলীলায় যৌন বিষয়ক আলোচনা করে। মদ্যপানের স্বপক্ষে সওয়াল করে। এতদিন যাঁদের শ্রদ্ধা করে এসেছি, আদর্শ বলে ভেবেছি, তাঁদের সম্পর্কে 'দালাল', 'মুখ্যু', 'সারমেয় শাবক' এইসব শব্দ ব্যবহার করে। প্রথম প্রথম অনুর বন্ধুদের কথায় আমি কখনও কখনও প্রতিবাদ করতাম। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, তারা যা ধারণা করছে বা বলছে, আদৌ সেটা ঠিক নয়। ছেলেগুলি দু'একদিন যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল, কেন তারা এমনটি ভাবে। একদিন একটি ছেলে, প্রকাশ না কী যেন নাম, দুম করে বলে বসল, কবিতা অনুভবের এবং বহুমাত্রিক। একই কবিতা বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হবে। আবার এমনও হতে পারে, কবিতাটির আদৌ কোন অর্থই নেই। কেবল শব্দের জাগলারি।

— আচ্ছা, আমি বললাম, ধর সাধারণ একজন পাঠক, তার কাছে কবিতাটির কোন অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না, ছন্দ খুঁজে পাচ্ছে না, এমনকি ব্যবহৃত শব্দগুলির কেরামতিও সে ধরতে পারছে না, তখন সে কী করবে?

— কবিতা পড়বে না। প্রকাশ বেশ স্মার্ট গলায় জবাব দিল, সে 'কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি' পড়বে বা সেটাও ভাল না লাগলে হিন্দী সিনেমার গান গাইবে, বেসুরো গলায়, বা ক্যারাম খেলবে, লুডো খেলবে। আর তা না হলে এফ. এম. এ — ফোন করে বোকা বোকা প্রশ্ন করবে। পুরোনো গান শুনতে চাইবে।

প্রকাশের উত্তরটা আমাকে কোনভাবে ইমপ্রেস করল না। বরং নিজেকে কেমন ছোট মনে হতে লাগল। যেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি একদম বেমানান। সমাজ, আর্থসামাজিক বিন্যাস এগুলি যে কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা বুঝি আমার মতো অজ্ঞের বোঝার ক্ষমতা নয়। যেন চিন্তা-ভাবনা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, সব বিষয়েই আমি ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর গণ্ডীতে আটকে রয়েছি। আদ্যিকালের বুড়ির মতো, যে প্রসবকালে ধাই-মাকে খোঁজে। কাঁচি, ছুরির বদলে বাঁশের চ্যাচারির ব্যবহারই যে সঠিক, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। যে জেগে ঘুমোয়, তাকে তো জাগানো যায় না। অনু আর তার বন্ধুরা ধরেই নিয়েছে আমি সেকেলে। সাহিত্য বিষয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করাটা আমার মানায় না। মনে মনে ওরা হয়ত বিরক্তও বোধ করে। যুক্তি দিয়ে যেখানে নিজেকে এসট্যাবলিস করা যায় না, সেখানে নিশ্চুপ নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। শেষ কথা

বলবে তো সময়। যেটুকু থাকার করতলে থাকবে। বাকীটুকু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আপনিই গলে বেরিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমি বা অনুরা যে কেউই সত্যি হতে পারে।

আমাদের দুই বোনের পর ভাই। ও সবার ছোট। এগার ক্লাসে পড়ে। চেহারা দেখলে বোঝা যায় না ও অনুর ছোট। বাবার মতো দোহারা গড়ন সিদ্ধার্থর। বেশ লম্বা। কাঁধ আর হাতের কব্জিও মজবুত চওড়া। আবছা দাড়ি ও গোঁফের রেখা। তা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থের মুখে কৈশোরের রমনীয় লাবণ্য। জোড়া ভ্রূর জন্যই এমন একটা শান্ত-শান্ত, নিষ্পাপ দেখতে লাগে ওর মুখখানা যে প্রায়ই মনে হয়, ছেলেবেলার মতো করে ওর গাল টিপে আদর করি। ও যখন ঘুমোয়, চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের ওপর হাত দুটি জড়ো করে, হঠাৎ দেখলে আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ঠিক মনে হয় এই পৃথিবীর সমস্ত পাপী, অনাচারী, কালিমামাখা মানুষগুলির হয়ে ও পরম পিতার কাছে ক্ষমা চাইছে, দু হাত জড়ো করে। আমি তখন খুব সাবধানে ওর মাথার কাছে বসে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করি। আস্তো করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ মেলে আমাকে দেখে, এতটাই চমকে উঠেছিল যে সটান উঠে বসে বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ফ্যালফ্যাল করে। আমার মুখের পানে নিষ্পলক চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। যেন অনেককাল ধরে ও ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে কিছুই চিনতে পারছে না। বুঝতে পারছে না। আমি হেসে বললাম, তুই যখন ছোট ছিলি, বাবাও এক একদিন এইভাবে তোর মাথার কাছে বসে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিত। সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে তুই এমন অকাতরে ঘুমোতিস যে টেরই পেতিস না। বাবার কথা বলার জন্যই বোধহয় সিদ্ধার্থ হঠাৎই কেঁদে ফেলল। তারপর বাচ্চারা ভয় পেলে বা দুঃখ পেলে যেভাবে মাকে আঁকড়ে ধরে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, অবিকল সেইরকমভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মায়ের পরিবর্তে বাবার সঙ্গে যেমন আমার ছোট থেকেই অধিক ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা, সিদ্ধার্থর ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। ও বরাবরই মাকে বেশী পছন্দ করে। ও যখন এইট নাইনে পড়ে, তখনও দেখেছি গলা জড়িয়ে ধরে মায়ের গালে গাল ঘষতো আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়ানো গলায় বলত, বুড়ি, সত্যি করে বল, তুমি আমায় কতটা ভালবাস? মা তখন মোটেই বুড়ি হয়ে যায়নি। তবু সিদ্ধার্থর মুখে 'বুড়ি' ডাকটা শুনে মায়ের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগত। তাই সিদ্ধার্থর আদরের জবাবে চাপা আনন্দে ফিসফিস করে বলত, তুই যখন বুড়ো হবি, তখন বুঝবি।

আমি আর বাবা কতদিন এইরকম ব্যাপার স্যাপার দেখে মুখ টিপে হেসেছি। বাবা

তো আমায় বা আমি বাবাকে কোনদিন এতটা নিবিড়ভাবে জাপটে ধরে আদর করিনি। ভাল লাগার মুহূর্তে বড় জোর বাবা আমার হাত ধরে কাছে টেনে বলেছেন, বস। পাশাপাশি চলতে চলতে আস্তো করে আমার কাঁধে মুখ রেখে বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন দুবার তিনবার। দূরতম আকাশ বা ডালপাতার ভারে নুয়ে পড়া কোন গাছের দিকে চেয়ে বলেছেন, লাইফ ইজ এ লং কনভারসেশন। লং ওয়ে। মামন, আকাশ ফুঁড়ে তোমার মাথা চলে যেতে পারে দূরতম কোন নক্ষত্রের ছায়াপথে। আবার বিনম্রতায় ওই গাছটির মতো অবনত হয়ে পড়তে পার। তোমার মাথা ঝুঁকে নেমে আসতে পারে মাটির কাছাকাছি।

তখন যেমন আজও তেমনি মনে হয়, বাবার মধ্যে অন্য একটি মানুষ লুকিয়েছিল। যে মানুষটি আদ্যন্ত রোমান্টিক, বিনম্র এবং বাঁধা-বাঁধন হারা। কিন্তু সাংসারিক চাপে, সামাজিক দায়বদ্ধতার পরাকাষ্ঠায়, ভিতরের বাউল মানুষটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারল না। ক্লান্ত, অবসন্ন এবং পীড়িত মানুষটি ক্ষয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে। এর জন্য কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। বেপরোয়ার মতো দড়িদড়া ছিঁড়ে বেরোবার সাহসও দেখাতে পারেনি কোনদিন। এমনকি নিজের ভাগ্যকেও দোষারোপ করতে শুনিনি কোনদিন। মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়াটাই যেন ছিল বাবার জীবনাদর্শ। কিন্তু আমি তো জানি বাবা আসলে কবি ছিলেন। আউল বাউল মন ছিল তাঁর। আর প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত আত্মীয়তা ছিল। সাদামাটা দৃশ্য যা দেখেও অন্যে দেখে না, অনামী কীটপতঙ্গের চলাফেরা, তাদের ডাক, যা অন্যে খেয়াল করে না, শোনে না, বাবার চোখে এমনই সব সাধারণ প্রাকৃতিক বিন্যাসও অন্যরকম মাত্রা পেত। অখ্যাত প্রাণীকূলের বিরামহীন একটানা ডাকের মধ্যেও বাবা সুরের বৈচিত্র খুঁজে পেতেন। আর তাই কোন কোন মুহূর্তে অবগুণ্ঠিতা মোহময়ী প্রকৃতির সান্নিধ্যে জাগতিক অবস্থান বিস্মৃত হয়ে, নিজেকে উজাড় করে দিতেন। ছোট্ট পানসিতে ওঠবার জন্য আকুল স্বরে ডাকতেন — 'সঙ্গে কে কে যাবি আয়।' বাবার সে ডাক কেউ শুনতে পেত না। কারণ এ ডাক ছিল নিরুচ্চার। সুবেদী মানুষের মনে যে কোন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এমন বিচিত্র অবিশ্বাস্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যা একমাত্র উপলব্ধি দিয়ে ছোঁয়া যায়। অনুভব করা যায়। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বা কোনরকম যুক্তি দিয়ে তার তল পাওয়া যায় না।

এখন ভাবলে অবাক লাগে, অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই বাবার থেকে দূরে থাকত। বাবা কোনদিন ওদের শাসন করেননি। জোর করে নিজের পছন্দ বা অভিমত কিছুই চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। আমাকে যেমন, ওদের দুজনকেও তেমনি নরম গলায়

ডাকতেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। আদরও করতেন। তারপরেও বাবাকে কেন ওরা 'পর পর', 'দূর দূর' ভাবত কে জানে। আমার তুলনায় দুজনেরই বয়স কম ছিল, এটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কোন বাচ্ছা আদর ভালোবাসা চায় না! বোঝে না! আমার মনে হয় ছোট থেকেই অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই বাবাকে আর অন্য সব বাবাদের সঙ্গে মেলাতে পারত না। না কথাবার্তায়। না আচরণে। ছোটদের মনও তো এক বিচিত্র কর্মশালা। সেখানে ভালবাসা অবিশ্বাসে বা নিবিড়তা দূরত্বে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ঘটনা বা যুক্তিযুক্ত কোন কারণ না-ই থাকতে পারে। আমি কিন্তু ছোটবেলো থেকেই বাবার মনের নাগালটি ধরতে পেরেছিলাম। বাবা তিন ভাইবোনের কারোর প্রতিই কোনরকম পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। তারপরেও তিন ভাইবোনের মধ্যে দুজনের কাছে বাবার কথাবার্তা, কাজকর্ম সব কিছুই অদ্ভুত মনে হত। আমার মনে হয় অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই অতি ছোট বয়স থেকেই অবয়োসিত দক্ষতায়, অন্তত আমার থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েছিল।

কানাঘুসো শুনতে পাই, সিদ্ধার্থ এমন একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত যে দলটির মূল আদর্শই হল জাত্যাভিমান। সিদ্ধার্থ বিশ্বাস করে অতীত দিনের মতো ভারতীয় সভ্যতা এবং কৃষ্টি তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমের দেশের যেসব মানুষেরা ভোগবাদে ক্লান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তারা নাকি শুধুমাত্র মানসিক শান্তির খোঁজে আমাদের দেশে ছুটে আসছে। দলে দলে। সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সিদ্ধার্থদের সংগঠনের মধ্যে এরকম কয়েকজন বিদেশী অনুরাগী আছে। তারা নাকি প্রতিমাসে ডোনেশন দেয়। যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র এসব সাধনা করে। দু একজন সাহেব মেম গেরুয়া পোশাক পরে। তাদের মাথার চুলে বটগাছের শিকড়ের মতো জটা। বিশেষ গোপন অনুষ্ঠানে গেরুয়াধারী সাহেব মেমরা মড়ার খুলি হাতে নৃত্য করে। তখন তাদের চোখ ঠিকরে আগুন বেরোয়। নৃত্য থেমে যাওয়ার পরেও সারা শরীর দুলতে থাকে।

সিদ্ধার্থর মুখেই এসব শুনেছি। এমনিতে সিদ্ধার্থ কম কথা বলে। বাড়ি, বাড়ির লোকজন সম্পর্কে উদাসীন। কে খেল কে খেল না, কার শরীর খারাপ, ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিনা এব্যাপারে তার কিছু করণীয় আছে কিনা, এসব সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর করে না। উৎসাহ দেখায় না। এমনকি মা, যাকে সে সবথেকে ভালবাসত, ছায়ার মতো যার পিছন পিছন ঘুরতো, সেই মায়ের অপ্রকৃতিস্থ ভাবলেশহীন চোখমুখের দিকে চেয়েও সিদ্ধার্থর কোন ভাবান্তর হয় না। কেমন নির্লিপ্তের মত আমাকে বা অনুকে বলে, কে খেতে দিবি? আমি একদিন ইচ্ছে করেই, মূলত ওর মনোভাব যাচাই করার জন্যই

বলেছিলাম, মাকে বল না। এই সেদিনও তো মা খেতে না দিলে রাগে গরগর করতিস।

— সেদিন আর আজ তো এক নয়। সিদ্ধার্থ কেমন দায়সারা জবাব দিল, খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দে। যেন সত্যিই ওর পেটের মধ্যে খিদের ঘূর্ণি উঠেছে। আর তাই মা দেবে না আমরা দুই বোনের মধ্যে যে কেউ একজন দেবে, সেটা বড় কথা নয়।

আমি জানি সিদ্ধার্থ এখন মাকে ঠিকমত সহ্য করতে পারে না। বাবা মারা যাওয়ার পরে পরেই মা কেমন হয়ে গেল। অত সাধের পান খাওয়া বন্ধ করল। মাথায় চিরুনি দেওয়া বা রোজ স্নান করার ব্যাপারটা প্রায়ই ভুলেই যেতে লাগল। অর্ধেক দিন রাতে খায় না। জিজ্ঞেস করলে একই জবাব দেয়, শনি মঙ্গলবার পালন করি। সেদিনটা হয়ত শনি বা মঙ্গল কোনটাই নয়।

মাঝে মাঝে নিজের ওপর খুব রাগ হয়। হয়ত রাগ নয়, অভিমান। মা ঠিকমত খেল কিনা, সময়ে শুতে গেল কিনা, মায়ের অস্বাভাবিক আচার আচরণগুলি আগের তুলনায় বাড়ছে না একই রকম আছে, এই সব কিছুর প্রতি নজর রাখা যেন আমার একারই কর্তব্য। অনু এবং সিদ্ধার্থ যে যার জগত নিয়ে রয়েছে। এ বাড়িতে ওরা দুজন যেন পেয়িংগেস্ট। বাবা আচমকা মারা যাওয়ার পর অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই প্রতিটি ব্যাপারে আমার ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, অতি অকিঞ্চিতকর কোন কাজ করবে কি করবে না, এ বিষয়ে আমার মতামতকে এমন প্রাধান্য দিত যে অবচেতনে আমার মনে একটা শ্লাঘা তৈরী হয়েছিল। বাবার অবর্তমানে আমি-ই যে এ বাড়ির যথার্থ গার্জেন এইরকম একটা ভাব তৈরী হয়েছিল। একরকম ঠিকই করে ফেলেছিলাম, ওরা দুজন বড় হয়ে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার নিজের সমস্ত ইচ্ছা, আশা আকাঙ্খা দূরে ঠেলে দিয়ে, কেবল ওদের ভালর জন্যই কাজ করে যাব। এমনকি সে সময়ে অয়নের কথাও বিশেষ মনে পড়ত না। আমার জীবনের একটি অধ্যায়ে অয়নের যে বিশেষ অবদান রয়েছে, স্বার্থপরের মতো আমি সেটাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতাম না। অয়নকে ঘিরে আমার নিজের যে স্বপ্ন, কল্পনা-বিলাস ছিল, আমার কাছে এই ব্যাপারটাও কেমন জোলো, আত্মকেন্দ্রিকের মতো মনে হত। অসুস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন মা, অপরিণত বয়সের দুটি ভাই বোনের মাথার ওপরে আমি, এই ভাবনাতে অসম্ভব তৃপ্তি পেতাম। বাবার মতো করে না হোক, বাবার জায়গাটিতে আমি, এটা ভাবতেই শরীরের মধ্যে অদ্ভুত থ্রিলিং হোত। কর্তব্য মধ্য আকাশের সূর্যের মতো। পশ্চিমে ঢলে পড়লেই সূর্যের প্রখরতা কমে যায়। রাত্রির আগমন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। অনু এবং সিদ্ধার্থ যখন আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, অনু কলেজে ভর্তি হল, সিদ্ধার্থ

সিঁড়ি টপকানোর মতো করে সেভেন এইট নাইন পার করে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল, পরম তৃপ্তিতে বুক খালি করে শ্বাস ফেললাম, আঃ! সবার অজান্তে বাবা তাঁর দুটি নাবালক সন্তানের বড় হয়ে ওঠার ব্যাপারে যে গুরুভার দায়িত্ব আমার কাঁধে দিয়ে গেছিলেন, তার অনেকটাই যেন সফল হল। আমি তবে ঠিক পথেই চলেছি।

কিন্তু আশ্চর্য, পা টলমল শিশু যেমন নিজের পায়ের জোরে যখন দৌড়তে শেখে, তখন বাড়ির লোকের সামান্য অসাবধনতায় খেয়াল খুশিমত পুকুর পাড় বা জনবহুল রাস্তার দিকে ছুটে যায় দিশাহীনভাবে, অনু এবং সিদ্ধার্থ, দুজনেই ঠিক সেইভাবে নিজেদের খুশিমত রাস্তায় বড় বড় পা ফেলে চলতে শুরু করল। আমার সতর্কতা, সাবধানবাণী বা ছোট বাচ্ছার পিছনে 'ধর ধর' করে ছুটে যাওয়া, এ সবের কোন প্রশ্নই রইল না। ওরা ধরেই নিল, দিদির কর্তব্য দিদি করেছে। এটুকু করতে দিদি বাধ্য ছিল। এখন দিদি অস্তাচলগামী সূর্যের মতো। রোদের তেজ কমে গেছে। ম্লান আবছা হয়ে এসেছে আলো। রাত্রি আসন্ন। অর্থাৎ এখন যেমন খুশি, যেদিকে খুশি যাওয়া যায়।

প্রায়ই রাতে টিউশন সেরে বাড়ি ফিরে আমি মাকে জিজ্ঞেস করি, অনু এখনও ফেরেনি? বা সিদ্ধার্থ কোথায় গেছে, জান? কিছু বলে গেছে? যদিও জানি আমার এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর মা কোনমতেই দিতে পারবে না। এমনকি আমার জিজ্ঞাসা করার মধ্যে যে সত্যি সত্যি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বা যথার্থতা রয়েছে, সে ব্যাপারেও মায়ের কোন অনুভূতি নেই। এতসব জেনেও প্রশ্নগুলি আমি মাকে-ই করি। মা ছাড়া দ্বিতীয় আর কান ব্যক্তিই তো নেই বাড়িতে। অনু এবং সিদ্ধার্থের ওপর যত রাগ করি না কেন, যত বিরক্তই হই না কেন, ওদের দেখতে না পেলে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তখন নিজেকে বেশ নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়। এমন নয় যে রাতের বেলায় গোল হয়ে আমরা একসঙ্গে খেতে বসি। বা আমি ওদের বা ওরা আমাকে সারা দিনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার কথা বলাবলি করি। ঘটনাটা দুঃখের হলে তিনজনেই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠি। অনু, অনুর ঘরে বসে রেডিও শোনে বা টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কোন বই পড়ে। আর সিদ্ধার্থ হয় শুয়ে থাকে পাশ ফিরে। তা না হলে জানলা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বা ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছোট ছোট পা ফেলে পায়চারি করে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এই সময়ে সিদ্ধার্থর চোখ দুটি আধবোজা থাকে। অনুচ্চ গলায় নিশ্চয়ই কিছু বলে। ঠোঁট নড়ে বিড়বিড় করে। কোন কোন দিন দেখি চৌকির ওপর কাত হয়ে শুয়ে গল্পের বই, খবরের কাগজ এইসব পড়ে। আমার পায়ের শব্দে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিয়েই মুহূর্তে পড়াশুনায় মন দেয়। প্রথম প্রথম

মনে হত আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওর কনটিনিউটি, অ্যাটেনশন এসব নষ্ট হয়ে যাবে বলেই, সিদ্ধার্থ আমায় দেখেও দেখে না। ব্যাপারটা যতদিন বিশ্বাস্য মনে হয়েছে, তাতে আমার ভালই লাগত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছি, পড়াশুনো করছিস। বিরক্ত করব না।

একদিন সিদ্ধার্থ নিজে থেকেই আমাকে ডাকল, দিদি, আমার ঘরে এসো তো একবার।

আমি বললাম, কিছু বলবি?

— জরুরী কিছু কথা আছে। সিদ্ধার্থ গম্ভীর গলায় বলল, খাওয়া-দাওয়া সেরে এস।

সত্যি বলতে কি, আমার নিজের মনেই অদ্ভুত কৌতূহল এবং সংশয় তৈরী হল। কী এমন জরুরী কথা যা সবার সামনে বলা যায় না! সিদ্ধার্থ কি অয়নের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করবে আমাকে? জানতে চাইবে, অয়নের সঙ্গে এখনও আমার কোন যোগাযোগ আছে কিনা বা থাকলে সেটি কোন পর্যায়ে বিলং করছে। নাকি সাম্প্রতিক কোন ঘটনায় আমার ইনভলভ্মেন্টের ব্যাপারে ওর কাছে কেউ কোন অভিযোগ করেছে! বিরূপ মন্তব্য করেছে! সে বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দেবে বলেই, সবার আড়ালে ওর ঘরে আলাদা করে ডাকল, 'জরুরী কথা আছে'।

সিদ্ধার্থকে আমি, বলতে গেলে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। এখনও অব্দি এমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, যার জন্য আমার ওপর ওর রাগ অসন্তোষ জমে থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি ওর চালচলন, পারিবারিক দায়িত্ব, কর্তব্য এসব বিষয়ে সরাসরি ওকে কোন প্রশ্ন করিনি। কোনও অভিযোগও করিনি। আমার মন খারাপ, কৌতূহল সংশয় উদ্বেগ সব কিছুই নিজের মধ্যে আটকে রেখেছি। ও যেটুকু যা বলেছে, চুপ করে শুনে গেছি। পাল্টা কোন প্রশ্ন করিনি। কোনও অভিযোগও করিনি। অতিরিক্ত কিছু জানতে চাইনি। আর অয়ন যখন নিয়মিত আমাদের বাড়ি আসত, সিদ্ধার্থ তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। পরবর্তী সময়ে স্কুলের বন্ধুবান্ধব বা পাড়ার অতি উৎসাহী কোন মানুষ হয়ত অয়নের সম্পর্কে বা আমার সঙ্গে অয়নের ঘনিষ্ঠতা, মেলামেশা এইসব বিষয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কিছু কথা বলে থাকতেই পারে। তাতে হয়ত সিদ্ধার্থর খারাপ লেগেছে। কষ্ট হয়েছে। ও তাই অয়নের সম্পর্কে লেটেস্ট খবরটুকু জানবে বলেই শুধু আমাকেই ডাকল। একান্ত নিরিবিলিতে। খাওয়া দাওয়া সেরে। তার মানে হাতে অনেকক্ষণ সময় নিয়েই ও কিছু বলবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। বা নিজের বিষয়ে কিছু হলে, বেশ তোড়জোড় করে রীতিমত নান্দীমুখ করে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করবে। আমার

মতামত চাইতে পারে। আবার নাও পারে। তবে জানতে চাওয়া বা জানানো এর যে কোন অধ্যায়টি যে বেশ গুরুতর, সেটা বোঝানোর জন্যই 'জরুরী কথা' বলল। আর খাওয়া দাওয়া সেরে মানেই হল, বাড়ির অন্যরা তখন ঘুমিয়ে পড়ুক বা না পড়ুক, যে যার বিছানায় শুয়ে পড়বে। অনু হয়ত টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কিছু পড়াশুনার কাজ করতে পারে। সিদ্ধার্থ জানে, অনু যখন কিছু পড়ে, তখন তার নিমগ্নতায় আশপাশের সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থর ডাকটা যেন খুব ক্যাজুয়ালি, এইরকম ভঙ্গীতে শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে ওর ঘরে ঢুকলাম, কি বলবি? বল।

মা ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। মা তো সন্ধ্যে থেকেই ঘুমোয়। ম্যাজিটল, এপিলেক্স এই জাতীয় ওষুধ খাওয়ার জন্য সারাদিনই মা একরকম ঘোরের মধ্যে থাকে। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকলে মা নাকি বেশ আরাম পায়। ডাক্তারবাবুও বলেছেন, মাকে যতদূর সম্ভব দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা এইসব থেকে দূরে রাখতে হবে। সবসময় হালকা কথাবার্তা, ছেঁদো আলোচনা আর হাসিঠাট্টার মধ্যে রাখতে পারলে, মায়ের সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। ডাক্তারবাবুর নির্দেশগুলি আমি বুঝি। সেইমত চেষ্টাও করি। কিন্তু অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেরই গা-ছাড়া ভাব। যেন মায়ের সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ব্যাপারে ওদের কোনরকম আন্তরিক আগ্রহ নেই। তাই প্রচেষ্টাও নেই। অনুর ঘরের আলোটা নেভা। তার মানে অনু আজ কিছু পড়ছে না। কিন্তু চুপচাপ শুয়ে ও যে এখনও জেগেই আছে, এ ব্যাপারে আমি একশভাগ নিশ্চিত। হয়ত ওর বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে কোন সমস্যা তৈরী হয়েছে। যা নিয়ে ও গভীরভাবে ভাবছে। বা ওদের পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাটি কীভাবে আকর্ষণীয় করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। এমনও হতে পারে, নতুন কোন ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে। এটি আমার অনুমান। সেই ছেলেটি সম্পর্কে ও বিশেষভাবে ভাবছে। কারণ অয়ন যখন এ বাড়িতে নিয়মিত আসত, অনু তখন সেভেন এইটে পড়ে। অয়নের সঙ্গে আমার মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা ও কেবল বুঝতই না, নিজের মতো করে উপলব্ধি করতে পারত। একদিন রাতের বেলায় বিছানায় আমার পাশে শুয়ে ফস্ করে বলেছিল, দিদি তোর ঘুম আসছে না কেন? অয়নদার কথা ভাবছিস বোধহয়? সেই মুহূর্তে আমি অনুর ওপর ভীষণ রেগে গেছিলাম। মনে হয়েছিল, ও ওর মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রাগের মাথায় অত্যন্ত কড়া ভাষায় দু'চার কথা বলেছিলাম। কী বলেছিলাম, ইনডিটেল্‌স মনে নেই। তবে অস্বীকার করব না, অনুর প্রশ্নে আমি সত্যি শিহরিত হয়েছিলাম। ঘরের বাতাসে ধুনোর গন্ধ টের পেয়েছিলাম। একজনের ভালবাসা

যদি দ্বিতীয়জনকে কৌতূহলী করে তোলে বা যদি তা অন্য কারোর মনে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে ভালবাসা যেন যথার্থ স্বীকৃতি পায়। ভোরের শিশিরের মতো, পাপড়ি মেলা ফুলের মতো স্বচ্ছ পবিত্র মনে হয় তখন নিজেকে।

একবার মনে হল, অনুর ঘরের আলোটা জ্বেলে দেখি ও জেগে রয়েছে কিনা! নিতান্ত মজা করার জন্যও ওকে জিজ্ঞাসা করি, কিরে কার কথা ভাবছিস? পরমুহূর্তেই মনে হল, ছিঃ! ছিঃ! এসব কী ভাবছি! সম্মানে কতোটা জানি না, বয়সে তো আমি অনুর চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। বয়সোচিত ব্যবধানটুকু মেনে নিলে, এমন প্রশ্ন, কৌতূহলের এমন নির্লজ্জ প্রকাশ, আমায় মানায় না।

সিদ্ধার্থ খুব ঠাণ্ডাভাবে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? নিজে একটু পিছিয়ে গিয়ে আমার বসার জায়গা করে দিল। সিদ্ধার্থর ঘরটা আমাদের অন্য দুটি ঘরের তুলনায় ছোট। মাঝারি একটি জানলা। তাও উত্তরদিকে। শীতকালে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে। গরমের সময় বাইরে ঝড় বয়ে গেলেও সিদ্ধার্থর ঘরে এক ফোঁটা হাওয়াও ঢোকে না। আমার বেশ গরম লাগতে লাগল। যদিও সময়টা এমনকিছু দুঃসহ গরমের নয়, বরং বাতাস এখন বেশ রসস্থ। সিদ্ধার্থ ঘাড়টা সামান্য কাত করে এমন পলকহীন চেয়ে রয়েছে আমার মুখের পানে, যেন আমি-ই কিছু বলব। ও সেটা শুনবে বলে অধীর আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। নৈঃশব্দ যখন খুব জমাট নীরেট হয়, তখন ক্ষণকালকে পক্ষকালের মতো দীর্ঘ মনে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ঘামে আমার ব্লাউজ ভিজে যাচ্ছে। দুঃসহ পরিবেশটা এখনি না ভাঙতে পারলে, এরপর অতি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও জিভ জড়িয়ে যাবে। শাড়ির আঁচলে ঘনঘন মুছতে হবে কপাল চিবুক গলার ঘাম। একই প্রশ্ন করলাম, সহজতা ফিরিয়ে আনার জন্য সামান্য হেসে, কী বলবি? বল।

— মনে হচ্ছে! বলে সিদ্ধার্থ নিজেই হেসে উঠল, তুমি খুব হাইলি টেনস্‌ড হয়ে রয়েছ?

— কই! না তো! আমি রীতিমত মাথা নেড়ে বললাম, তুই কি চীফ জাস্টিস নাকি কোন রাষ্ট্রপ্রধান, যে কথার ডিপ্লোম্যাসিতে আমি ঘাবড়ে যাব?

সিদ্ধার্থ কোন জবাব দিল না। ঠোঁট বন্ধ করে একটু হাসল। তারপর হঠাৎ করে বিছানা থেকে নেমে উত্তরের খোলা জানলাটা ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করে দিল। খোলা দরজাটা আড়াআড়িভাবে ভেজিয়ে দিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায় বসল। আমার মুখোমুখি।

একটা কথা জানতে চাইছিলাম। সিদ্ধার্থ বেশ সহজ গলায় বলল, তুমি নাকি আজ

বিকেলে বস্তি অঞ্চলে গিয়েছিলে? সামান্য থেমে বলল, এইসব আগলি ব্যাপারের সঙ্গে জড়াচ্ছো কেন?

ওঃ! জরুরী কথা তাহলে এই! নিজেকে সত্যি খুব হালকা মনে হতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল শরীরের ঘাম, মুখের ভেতরের শুকনো ভাব, সব, সব কেটে গেল। কেবল একটা বিষয়েই অবাক লাগল, এত দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল কেমন করে! আর সিদ্ধার্থ যখন ব্যাপারটিকে আগলি বলে উল্লেখ করল, তার মানে ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া অন্যরকমভাবে বাতাসে ছড়িয়েছে। যারা ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখেছে বা দেখেছে এমন কারোর মুখ থেকে শুনেছে যারা, তারা কেউ-ই আমার উপস্থিতিটুকু সদর্থক বলে মেনে নেয়নি। আমি জানি না আমার সম্পর্কে অপবাদ রটিয়েছে যারা, তারা কারা! আর অবাক কাণ্ড, সিদ্ধার্থ, যে আমাকে আজন্ম দেখছে, সেও কোনরকম ভাবনাচিন্তা না করে, আমার সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলেই, একতরফাভাবে সেইসব নিন্দুকদের কথায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল যে, বস্তি অঞ্চলে যাওয়াটা আমার ঠিক হয় নি। একদল নপুংসক দর্শকদের সাক্ষী রেখে মধ্যযুগীয় পন্থায় একটি নিষ্ঠুর মানুষ -পশু একজন অসহায় নারীকে মারতে মারতে প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল। আমি সেই অন্যায় অত্যাচার থেকে নারীটিকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেছি। এর মধ্যে দোষ অন্যায়ের কী আছে! আর ঘটনা যেটি ঘটেছিল, সেটি আগলি হতে পারে, সময়মত বাধা না দিলে আগলি ব্যাপারটি যে ট্র্যাজিক এন্ডে গিয়ে দাঁড়াত, সেটি কি কাম্য ছিল! নাকি অচ্ছুৎ, বাজে ব্যাপার, এইসব সাত পাঁচ ভেবে, নিশ্চুপ থাকার মধ্যে আমার ব্যক্তিত্বের অন্যরকম প্রকাশ ঘটত! শুনেও না শোনার ভাণ করে, দেখেও না দেখার ছল করে নিজেদের সরিয়ে রাখল যারা, তারা কি খুব সুবিবেচক, বাস্তববাদী! এতদিন সিদ্ধার্থকে জানতাম, আত্মকেন্দ্রিক বলে। আজ তাকে নতুন করে চিনলাম। মোস্ট ইমপ্র্যাকটিক্যাল।

— তোকে কে বলল? আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম। সিদ্ধার্থ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, শুনলাম, অনেকেই দেখেছে।

— অনেক মানুষ যা বলে, সেটাই বুঝি সত্যি হয়?

— না। তা নয়!

— তাহলে! আমি লক্ষ্য করলাম, সিদ্ধার্থর চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব। ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমি যে পাল্টা আক্রমণ করব, এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ও আন্দাজ করতে পারেনি।

— বল তো? আমি হেসে বললাম, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না পৃথিবী সূর্যের

চারদিকে ঘোরে? কোনটা সত্যি? একটু হেসে বললাম, চার্চের পাদরিরা যা বলে সেটা সত্যি, নাকি কোপারনিকাস, জিওদার্নো ব্রুণো পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেটা এসট্যাবলিশ করেন, সেটা সত্যি?

আমার প্রশ্নে সিদ্ধার্থর জেরবার হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য! ও হঠাৎ করে রেগে গেল আমার ওপর, বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক বিন্যাস মিলিয়ে মিশিয়ে তুমি সমস্ত ব্যাপারটাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলছ।

— মোটেই নয়। আমি বেশ সুদৃঢ় গলায় বললাম, যেটা সত্যি তার স্বপক্ষে একটি মানুষ দাঁড়ালেও সেটা সত্যিই। বাকী পৃথিবীটা অন্যদিকে দাঁড়িয়ে 'মিথ্যে, মিথ্যে' বলে চীৎকার করলেও, সত্যিটা সত্যিই। ল অফ গ্র্যাভিটেশনের মতো এটাও ল অফ ইউনিভার্সাল ট্রুথ।

সিদ্ধার্থর ধারণা ছিল ওর সংগঠনে যে ধরণের আলোচনা হয় তা পড়ে শিখে এবং শুনে ও খুব বড় মাতব্বর হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে আমি যে আমার কাজের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে পারি, জোরের সঙ্গে দু'চার কথা বলতে পারি, এ বিষয়টা ও ধারণার মধ্যেই আনতে পারেনি। কারোর থেকে, সে বয়সে এবং সম্মানে যত বড়ই হোক না কেন, কৈফিয়ৎ চাইবার জন্য বা তাকে অপদস্ত করার জন্য যখন কোন মানুষ নিজেকে একশভাগ যোগ্য বলে ভাবতে শুরু করে, তখন পাল্টা ধাক্কা, যত মৃদু নিরুচ্চারই হোক না কেন, তাকে বেমক্কা টলিয়ে দেয়। এক শ্রেণীর মানুষ, যারা কোনদিন হারতে হতে পারে, এমন ধারণা করে না, মৃদু বাতাসও তাদের কাঁপিয়ে দেয়। তখন হয় তারা 'বাবা', 'বাছা' বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চায়। তা না হলে যুক্তিহীন, আবোল তাবোল বকে, বিপক্ষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দেয়। সিদ্ধার্থ কিন্তু এ দুয়ের কোন পথেই পা বাড়াল না। পরিবর্তে স্থির গলায় থেমে থেমে বলল, ভুলে যেও না, আফটার অল তুমি একজন মেয়েমানুষ। তোমার নামে বাজে একটা রিউমার ছড়িয়ে গেলে, সেটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

এবার আমি হেসে ফেললাম, চিন্তা ভাবনায় তুই যে এতটা পিছিয়ে আছিস, জানতাম না। স্ক্যান্ডালের আবার জেনডার আছে নাকি? আর যদি থাকেও, তাতে কী এসে যায়!

— গুজব ছড়াতে তো বেশী সময় লাগে না। বোঝা যাচ্ছে সিদ্ধার্থ ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াস। অপবাদ, তাও আবার নিজের দিদির নামে, এটা ও কিছুতেই মানতে পারছে না।

— তুই নিশ্চিত হলি কী করে? আমি বললাম, অপবাদের বদলে প্রশংসাও তো জুটতে পারে।

— প্রশংসা? সিদ্ধার্থ দু চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, নিন্দা করাই যাদের কাজ, তারা কোন দুঃখে প্রশংসা করতে যাবে?

— আরে বাবা তারও তো কিছু কারণ থাকতে পারে।

— নাই থাকতে পারে। নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া ডিউটি ফ্রি মালের মতো। সহজেই ছড়ানো যায়। অনেক মানুষ তা কিনতেও পারে।

— কিনুক না। আমি বেশ বিরক্ত বোধ করলাম, দুর্বলেরা বলবে। অক্ষমেরা শুনবে। কেউ যদি মনে করে, দড়িকে সাপ বলবো, আর কিছু নির্বোধ মানুষ সেটাকে মেনে নেয়, তার মানে কি দড়িটা সত্যি সত্যি সাপ হয়ে গেল?

সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল ওর নিজের কথার জালে ও নিজেই জড়িয়ে পড়ছে। মানুষ যখন যুক্তিতে পিছিয়ে পড়ে, তখন সে প্রথমে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, তা না হলে অপ্রাসঙ্গিক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। সিদ্ধার্থরও হয়েছে সেই দশা। কোনরকমে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে ও নিজের যুক্তিতে অবিচল থাকার চেষ্টা করল। ওর মতপ্রকাশের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, রাগ বিদ্বেষ বা কোনরকম অনুযোগ অভিযোগ কিছুই নেই। যেন 'জরুরী কথা' বলে ও যে আমাকে ডেকেছিল, সেটা নিতান্তই একটি সাদামাটা কথা। ও যা শুনেছে, সেটা জানাবার জন্যই আমাকে ডেকেছে। এর মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। এমনকি দুঃখ বা লজ্জা পাওয়ার মতো কোন ঘটনাই আদৌ ঘটেনি। লোকে যেমন 'শুনেছিলাম' বা 'মনে হল' এইভাবে কোন কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করে, আমাকে 'জরুরী কথা' বলে ডাকার ব্যাপারটাও সেইরকমই কিছু। আমি জানি এরপরেও আমি যদি ব্যাপারটার কার্যকারণ, ফলশ্রুতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে বোঝাতে যাই, ও হয়ত বিরক্ত বোধ করবে। জয়ী দল দ্রুত মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যায় বা পরাজিত দলকে বোকার মতো মাঠের মাঝখানে জড়িয়ে পাকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে, দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে মাঠ পরিক্রমা করে। এখন এই ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দুজনে। সুতরাং সুবিবেচক শিষ্টাচার পদ্ধতি যেটা, তা হল সিদ্ধার্থকে আর একটি কথাও না বলে বা ওকে একটি কথাও বলার সুযোগ না দিয়ে, ঘর ছেড়ে আমার চলে যাওয়া। ওর মাথায় আস্তো হাত বুলিয়ে বললাম, শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।

দরজার কাছাকাছি গিয়ে আবার একবার ঘুরে দাঁড়ালাম, আমিও যথেষ্ট বড় হয়েছি, সিদ্ধার্থ। উচিত অনুচিত বোধটা আমার নেহাৎ দুর্বল নয়। আমাকে আমার মতো করে ভাবতে দে না!

ঘরের বাইরে এসে গ্রীলঘেরা বারান্দা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বাতাবী লেবুর মতো দেখাচ্ছে দূর আকাশের চাঁদটাকে। বাগানের গাছগুলির নীচে থোকা থোকা অন্ধকার। আবার তার গায়েই সবুজ ঘাসের ওপর চাঁদের আলো। ঠিক যেন ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত পাশাপাশি, গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে।

আচমকা কী যে হল, দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল জলে। আজ যেমন সিদ্ধার্থকে, ঠিক একই রকম ভাবে অয়নকেও বলেছিলাম, নিজের মতামত আমার ওপর চাপিয়ে দিও না অয়ন। আমি বড় হয়েছি।

এখন রাত কটা, কে জানে! আমার ঘরে কোন দেওয়াল ঘড়ি নেই। ঘড়ির টক্ টক্ আওয়াজ, কখনও কখনও মনে হয় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। বা কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি হয়ত, পেণ্ডুলাম তার সীমায়িত দূরত্বে বৈচিত্র্যহীন একটানা একইরকম আওয়াজে দুলে চলেছে। বেজে চলেছে। চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। তখন মনে হয়, সময় কি সত্যি এতটা জরুরী! অন্তত আমার জীবনে। আমি তো আমার মতো করে অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। ভাবনার সঙ্গে সময়ের যোগসূত্রতাও ছিল। আজ অব্দি সব কিছু কি ঘটেছে, ঠিক ঠিক সময়ে!

সাদা খামটি, যার মধ্যে একরাশ উচ্ছ্বাস ভালবাসা বা এক বুক উদ্বেগ বিষণ্নতা জমে রয়েছে, শেষ দুপুর থেকে এখনও পর্যন্ত আমি সেটি পড়ে দেখার সময়টুকুও পেলাম না। ঘটনা পরম্পরায় এমনভাবে সময় দ্রুত পার হয়ে গেল যে পড়ে ওঠার ফুরসতটুকু পেলাম না।

মাংগীলাল বলত, সময়ে চাষ না করলে, তার দুঃখ নাকি বারমাস। এখানে 'চাষ' মানে নিশ্চয়ই 'কৃতকর্ম'। আবার বাবা বলতেন, ঠিক ঠিক সময়ে, ঠিক ঠিক কাজ করার মধ্যে, আর যাই থাকুক, কোন শিহরণ নেই। রোমাঞ্চ নেই। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ একমাত্র যন্ত্রই করতে পারে। একজন মানুষ যখন যন্ত্রের মতো হয়ে যায়, তখন সে দায়িত্বশীল, দূরদর্শী হতে পারে, কিন্তু কখনই রোমান্টিক বা বোহেমিয়ান হতে পারে না।

বাবা ঠিক এইভাবেই বুঝিয়েছিলেন, ঈশান কোণে মেঘ দেখে যে মানুষ ছাতাটি সঙ্গে নিতে ভোলে না, সে বিবেচক, বাস্তববাদী। কিন্তু যে মানুষটি 'যা হবে হোক' এইরকম ভেবে বেপরোয়ার মতো বেরিয়ে পড়ে, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামলে হয়ত সে ঝাঁকড়া কোন গাছের নীচে বা অন্য কারোর বারান্দায় উঠে দাঁড়ায়। তারপরেও বৃষ্টি পড়ে চললেও, সে ভিজতে ভিজতে, জল ঠেলতে ঠেলতে গন্তব্যে পৌঁছায়।

বাবার ধারণার এই দ্বিতীয় মানুষটি অনেক বেশী অ্যাডভেনচারাস। জীবনকে

উপভোগ করতে জানে। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে জানে।

এখন মনে হয় বাবা এবং মাংগীলাল দুজনের কথাই ঠিক। পুরোপুরি নয়। আংশিক ঠিক। সামান্য খুঁত না থাকলে যেমন ডাকসাইটে সুন্দরী মনে হয় না, সামান্য ভুলচুক না ঘটলে যেমন পরিপূর্ণতার আস্বাদ মেলে না, পরিপূর্ণ মানুষ বলতেও তাই-ই বোঝায়। চিন্তায় সামান্য ঘাটতি, কাজকর্মে একটু অসংলগ্নতা, সময়ের হিসাবে হয় একটু এধার বা ওধার, এইরকম প্লাস মাইনাস এবং যে কোন ব্যাপারে একশভাগ নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, প্রকৃত অর্থে এমন মানুষকেই রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। সাধারণভাবে আমরা 'ভালমানুষ' বলতে বুঝি দেবতার চেয়েও ভাল এবং 'মন্দমানুষ' মানেই শয়তানের অধম। সত্যি সত্যি তাই কি হয় কখনও! যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, সংকট নেই, চিন্তার বহুমুখীনতা নেই, মুহূর্তের জন্য হলেও মানসিক দৌর্বল্য নেই, তাকে কী বলা যাবে! নিখাদ মানুষ! আমি কিন্তু এমন খাদহীন একজন মানুষও আজ অব্দি দেখিনি। বরং ভুলভ্রান্তি করতে করতে একের পর এক ঠোক্কর খেতে খেতে যে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, উপযুক্ত কাজটুকু অনেক দেরীতে হলেও যথাযোগ্য সদিচ্ছা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে করে, তাকে আমার বেশী প্র্যাকটিক্যাল বলে মনে হয়। আবার অশিক্ষিত মাংগীলালের কথাটাও তো ফেলনা নয়। মাংগীলাল সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস কিছুই পড়েনি। কিন্তু সে তার লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গাটিকে চিনেছে। কোনটা ঠিক, কখন ঠিক বা কেন ঠিক, এইসব কূটকচালি প্রশ্নের যুক্তিসম্মত উত্তর মাংগিলাল নিশ্চয়ই দিতে পারবে না। কিন্তু বুকের ভেতরে যেমন কখনও কখনও ঢাকঢোল কাঁসরের আওয়াজ শোনা যায়, কানের পর্দায় জলস্রোত ধাক্কা মারে সোঁ সোঁ শব্দে বা নীল আকাশ নেমে আসে দু চোখের পাতায়, তখন ভাষা শব্দের জাল বুনে তাকে সঠিকভাবে অব্যর্থ নিশানায় ব্যক্ত করা বা নিজের অনুভূতি এবং উপলব্ধিটুকু মার্জিত ভঙ্গীতে যথার্থ ব্যঞ্জনায় বর্ণনা করা নাই-ই যেতে পারে। তার মানে তো এই নয়, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পিছল মাটিতে সাবধানে পা টিপে টিপে এসে যে মানুষটি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করল, বুক খালি করে তার 'মনে হওয়া'কে ব্যক্ত করল, কেন তার মধ্যে যুক্তির বিন্যাসের অভাব ও প্রকাশভঙ্গীর আড়ষ্টতা বা প্রতি পদে পদে রেফারেন্স নেই কেন, এই অজুহাতে মানুষটিকে সেকেলে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ভবিতব্যে বিশ্বাসীরা আরও স্পষ্ট করে অশিক্ষিত, নির্বোধ, কখনই এমন বলা যেতে পারে না।

মাঝে মাঝে কোন কোন দিন হয়ত হঠাৎই মনে হল, বড় করে একটি টিপ পড়ি কপালে। সরু করে চোখে একটু কাজলের রেখা টানি। চুলটাকেও বাঁধি একটু অন্যরকম

করে। তখন আয়নার মধ্যে 'আমি'কে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করি। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। দু চোখের পাশে সূর্যের ছটার মতো চারটি পাঁচটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু গালেও যেন সামান্য কোঁচ পড়েছে। বয়স কামড় বসিয়েছে সারা মুখমণ্ডল জুড়ে। তখন ঠিক দুঃখ হয় না, আক্ষেপ আফশোস এসবও নয়। তবু অজান্তেই বুক ঠেলে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে আসে। সময়ে চাষ করিনি। এখন অসময়ে ফসল রুইতে এসে দেখছি, মাটির উর্বরতা কমে গেছে। এখন আমি যেভাবেই নিজেকে সাজাবার চেষ্টা করি না কেন, নিজের দৃষ্টিতেই তা বেমানান ঠেকে। তখন টিপের পাতা, কাজল পেন্সিল, চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা সব পাশে ঠেলে রাখি।

অনু একদিন আড়াল থেকে আমার এমন কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করে হেসে বলেছিল, সাঁঝবেলাতে সাজতে বসেছো? অনুর কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল। খারাপ লেগেছিল। বয়স এবং সম্মানে দু হিসেবেই ও আমার ছোট। তবু নিষ্কর্মার মতো হেসে বলেছিলাম, দুপুর গড়িয়ে গেছে, তাই বলছিস? অনু দরজায় হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন আমি কোন অপরাধ করছিলাম। ওর চোখে সেটা ধরা পড়ে গেছে। ও এখন ওর মতো করে আমাকে জেরা করবে। কৈফিয়ৎ চাইবে। পারলে কথার হেঁয়ালীতে খানিকটা মজাও করবে। হাত আয়নাটিকে মেঝেতে উপুর করে রাখতে রাখতে আমি আবার বলেছিলাম, এখন তবে কী করা উচিত বল তো? আমি যেন সত্যি সত্যি জানতে চাইছি আমার করণীয় কী এখন, এ ব্যাপারে অনুর পরামর্শ চাইছি, এমনি তৃপ্তিতে অনু ঠোঁট টিপে হাসল অল্প। তারপর পেশাদার আবৃত্তিকারের মতো করে বলল, এখন সব পাখি ঘরে ফেরে। সব নদী। ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন। থাকে শুধু অন্ধকার। মুখোমুখি বসিবার ...! এই অব্দি বলে ও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হঠাৎই খিলখিল করে হেসে বলল, বাকিটা তোমার জানা।

অনু আর দাঁড়ায়নি। দৈববাণীর মতো জীবনানন্দের অমোঘ কয়েকটি ছত্রের উল্লেখ করে, একরকম দৌড়ে পালিয়ে গেছিল। যেভাবে কোন গূঢ় তত্ত্বের আংশিক উল্লেখ করে, গুরুদেব সমবেত ভক্তদের ওপর তাঁর অকথিত উপসংহারটুকুর ভার দিয়ে মিটমিট করে হাসেন, ভাবখানা 'তোমরা জান' বা 'তোমাদের জানা উচিত', অনুর আচরণও অনেকটা সেইরকম। আমার মুখোমুখি বসে, পাখিদের ঘরে ফেরা, নদীর মহাদেবের জটা হইতে আসিয়া মহাদেবের জটায় প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ শুরু থেকে আবার শুরুতেই ফিরে আসার মতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে, সে যে কে, এটুকু উহ্য রেখে অনু যেন আমায় দ্বিগুণ লজ্জায় ফেলল।

অয়ন যে আর আসে না। কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও তার সঙ্গে আমার সম্পর্কে যে ভাঁটার টান পড়েছে, অনু নিশ্চয়ই জানে। বুঝতে পারে। আর সেইজন্যই আমার একাকীত্বকে আরও একটু স্পষ্ট করে মনে করিয়ে দেবার জন্যই হেসে বলল, বাকিটা তোমার জানা।

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীর বুকে। আজ যারা চোখে অন্ধ, তারা বেশী করে দেখে'।

হয়েছিল কি, এগ্রিকালচারাল ফার্মের ভিতরের সরু বাঁধানো রাস্তাটা ধরে আমি আর অয়ন পাশাপাশি হাঁটছিলাম। তখন বিকেল পুরোপুরি শেষ হয়নি, আবার সন্ধ্যার আগমনও তেমন জোরালো নয়। সরু পথটির দু পাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। দিন দু'তিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। ধানগাছের গোড়ায় জল জমে রয়েছে। জমা জলে জলজ পোকারা খেলে বেড়াচ্ছে। দাদুর ডাকছে গলা ফুলিয়ে। আবছা আলোয় সব দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করে প্রথমে তিনটি চারটি, তারপরে ঝাঁকে ঝাঁকে ধূসর রংয়ের পেঁচা উড়ে এল। রাতের পেঁচাকে এত কাছ থেকে এমন দলবদ্ধভাবে আগে কোনদিন দেখিনি। স্বভাবতই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম, অয়ন দেখ দেখ ...।

অয়ন বলল, কী?

— কোথায় ছিল বল তো, এরা? আমি পেঁচাগুলির দিকে আঙ্গুল তুলে অয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম।

— ছিল কোথাও। অয়ন হেসে বলল, আশেপাশেই ছিল।

— আমার খুব অবাক লাগছে। ভাললাগার আবেগে আমি এতটাই আপ্লুত যে পক্ষীকূলের জেনারাইজেশনের জন্য বলে ফেললাম, 'এখন তো সব পাখিদের ঘরে ফেরার সময়। রাতের অন্ধকারে এরাই শুধু রয়ে গেল'! একটু চুপ করে বোকার মতো প্রশ্ন করলাম, অন্ধকারে শিকার খুঁজতে এদের অসুবিধা হয় না?

— অসুবিধে? বলে অয়ন হো হো করে হেসে উঠেছিল, কিছু মানুষ আছে যেমন রাতের অন্ধকারে বেশী করে দেখে, ঘোর অমানিশার উল্লাসে ফেটে পড়ে, পক্ষীকূলের মধ্যেও তেমনি কয়েকটি আছে যারা দিনের আলোর চেয়েও রাতে স্পষ্ট করে দেখে। রাতেই তারা আহার্য সংগ্রহ করে।

— ধর যদি ঝড়জলের রাত হয় বা কোন কারণে চাঁদ সে রাতে সারাক্ষণই ঘন কালো মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রইল! আমি এমনভাবে প্রশ্নটা করলাম, যেন আমি একটি কৌতূহলী মেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইছি বা ইন্টারভিউ বোর্ডের

চেয়ারম্যান আমি, অয়নের মতো একজন পরীক্ষার্থীকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করছি।

— আঃ! বলে অয়ন একটি বিরক্তিসূচক শব্দ করেছিল, সত্যি সত্যি অদ্ভুত আঁধার যেদিন আসবে, সেদিন রাতচরা নয়, দিনের আলোতেও কিছুই দেখাতে পায় না যারা, তারা সেই অদ্ভুত রাতের আঁধারে বেশী করে চোখে দেখবে। কথা শেষ করেই অয়ন জীবনানন্দ আওড়ে উঠেছিল, অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা।

আমি কোন রাজনীতি করি না। কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিই আমার তেমন আস্থা নেই। পার্টি সংগঠন আর গণ সংগঠনের ফারাক বুঝি না। মোদ্দা কথা যেটা বুঝি, যাতে সকলের ভাল হয়, পুরোপুরি একশভাগ না হোক, নব্বই পঁচানব্বই ভাগ সুযোগ সুবিধা যেন সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, শিশুরা হাসতে পারে, বেকারত্বের যন্ত্রণায় কাউকে আত্মহত্যা না করতে হয়, এইরকম ফান্ডামেন্টাল কিছু কিছু ব্যাপারে, দলমত নির্বিশেষে সকলে একাত্ম হয়ে কাজ করলে, অনেক সমস্যার সমাধান হয়। অনেক বাধা অসুবিধাকে টপকে যাওয়া যায়। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষ তো অনেক বড় ব্যাপার। আমি আমার চারপাশের অসামঞ্জস্যগুলিকে যদি দূর করতে পারি, তাতেও অনেক কিছু হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, মূলত যারা কিছু করে না, আন্তরিকভাবে করার ইচ্ছাও নেই, তারাই যে কোন ঘটনার হাজার রকম ব্যাখ্যা করে। যে কোন কাজের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে জল ঘোলা করে।

এই যেমন আজ বিকেলের ঘটনাটা, মোটেই আর্থসামাজিক বৈষম্য বা শ্রেণীগত ফারাক ইত্যাদির কারণে ঘটেনি। এটি নিছকই একটি মানবিক ব্যাপার। একজন হাত পা ছুঁড়বে, হুংকার ছাড়বে, আর তার চেয়ে কমজোরী ভয়ে কাঁপবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে, পরাজয় স্বীকার করবে বা নির্যাতিত হবে, সৃষ্টির গোড়া থেকেই এটা চলে আসছে। আজও চলছে। প্রতিরোধ দৃঢ় হলে হয়ত এই ধরণের ব্যাপার স্যাপার সংখ্যার অনুপাতে কমবে এইমাত্র। তার মানে এই নয়, এই প্রথাটি, প্রতিরোধে এবং আরও বেশী বড় প্রতিরোধে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মনীষীরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করে থাকুক না কেন, দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত মানুষ কোনদিনই এক হবে না। সমস্ত বৈষম্য দূর হয়ে গিয়ে, অভাব অভিযোগ শোষণ অত্যাচার সব ধুয়ে মুছে যাবে না। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোন নক্ষত্রের কয়েক হাজার কোটি বছর পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো এটি একটি দুরূহ কল্পনা মাত্র। হলে ভাল হয়। এ নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু

যা হবার নয়, প্রশ্ন সেখানেই। কোশ্চেন অফ মিনিমাইজেশন না টোটাল অ্যাবলিশন। আমি প্রথমটির পক্ষে। সাধ্যমত চেষ্টা করব। সে চেষ্টার পিছনে দ্বিতীয় কোন অসৎ উদ্দেশ্য যেন না থাকে। কোনরকম মিথ্যাচারণ না থাকে।

যে কোন কাজ আমি আমার বিশ্বাস থেকে করি। আমার বিশ্বাসে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু চালাকি থাকে না। নিজেকে ডিগনিফায়েড করার গোপন ইচ্ছাও থাকে না। বস্তিতে ছুটে গেছি ভেতরের তাগিদে। আমি তো নির্বাচনে প্রার্থী হব না যে মাস রিলেশন গড়ে তোলার জন্য যে কোন গোলমালের কথা কানে শোনামাত্রই, সকলকে পিছনে ফেলে আগেভাগে নিজে ছুটব।

কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এতদিন যেটাকে সর্বৈব যথার্থ বলে আঁকড়ে ধরেছিলাম, পরিবেশ দূষণের মতো আমার সেই বিশ্বাস এবং ধারণার গায়ে কালো ছোপ পড়েছে। একটু আধটু ক্ষতও সৃষ্টি হয়েছে তাতে। রাজনীতিকরা বলেন, কে আমার আমার শত্রু আগে সেটা নির্ণয় করা দরকার এবং তার জন্য প্রয়োজনে ছোট শত্রুর সঙ্গে সমঝোতাও করা যেতে পারে। আমার বড় শত্রু নিশ্চিতভাবেই সেইসব নিন্দুকেরা, যারা বস্তি অঞ্চলে আমার উপস্থিতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, কুৎসা করছে, সুচতুরভাবে ভুল ইঙ্গিত ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে, যাতে তার ঢেউ এসে আমার বাড়িতেও আছড়ে পড়ে। সিদ্ধার্থ যেমন বলল, 'আগলি ব্যাপার ... লোকে বলাবলি করছে ... আফটার অল তুমি একজন মেয়েমানুষ' — কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কার সঙ্গে সমঝোতা করব! এইসব নিন্দুকদের, সুবিধাবাজদের মোকাবিলা করব!

'ভোরের শিশির, মামন, তোমাকে' — এমন নস্টালজিক সম্বোধন যে চিঠির, তার শরীরটি কিন্তু কঠিন কঠোর লড়াই, লড়াইয়ের পদ্ধতি, তার তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, ইত্যাকার বিষয়ের এক জটিল বুনোট। একটি মাত্র চেনা বাক্য, উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে। তার মানে শেখরকাকু যেমন বলেছিলেন, কর্মস্থলে কাজের চাপে অয়ন চিঠি লেখার সময় পায় না, সেটি সঠিক তথ্য নয়। এমনও হতে পারে, অয়নের বাড়ির লোকজনও তেমনই জানে। বিশ্বাস করে। কিন্তু চিঠিটি পড়ে মনে হচ্ছে, প্রবাসে অয়ন, সংসদীয় রাজনীতিতে অবিশ্বাসী, এমন একটি নিষিদ্ধ দলের সর্বক্ষণের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করছে। চাকরির ব্যাপারটি যেটি সে আমাকে বলেছিল, তার বাড়ির লোকজনকেও বুঝিয়েছিল, সেটি সঠিক নয়। আমার থেকে, নিজের বাড়ির থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য, সক্রিয়ভাবে নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা।

অয়নের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই তেমন কিছু আহামরি নয়। বাড়ির

বড় ছেলে হিসাবে সাংসারিক বোঝা দায়িত্ব নেওয়ার ভার, অবশ্যই তার ওপর বর্তায়। সেসব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, বৃহত্তর লড়াইয়ে নিজেকে যুক্ত করার মধ্যে নিশ্চয়ই ভেতরের তাগিদ, মহতী স্বপ্ন থাকতে পারে। কিন্তু যে তার নিজের পারিবারিক কর্তব্যের প্রতি চোখ বুজে থাকে, নিজের চারপাশটুকুকে সঠিকভাবে না চিনে, না জেনে, সেখানকার সমস্যাগুলিকে পাশে ঠেলে রেখে, বৃহত্তর পরিধি ছুঁতে যায়, আদৌ কি সে কোনদিন তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে! মাস লিডার হওয়ার মতো কোন ক্যারিশ্‌মা তার আছে, আমি বিশ্বাস করি না। নিজে যেটা বিশ্বাস করে, তার বাইরেও যে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন মত, ভিন্ন কোন পথ থাকতে পারে, এটা অয়ন মানতেই চায় না। নিজেকে ও যে মাপেরই ভাবুক না কেন, তার ওজন আয়তন পরিমাপ করবে তো অন্যজন। যারা তার চারপাশে রয়েছে। হঠাৎ করে রাতারাতি কেউ তো আর লেনিন, মহাত্মা বা মাও জে ডং হয়ে ওঠে না। তার জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তুতি থাকে। হার জিত, এগোনো পিছোনোর মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা থাকে। মানুষকে নিয়ে, মানুষের ভালোর জন্য কিছু করা তো আর শনিপূজা বা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মতো ঠুনকো ব্যাপার নয়। যেমন তেমন হল বা কিছুই হল না, রাজনীতি মোটেই তেমন শিকড়হীন ব্যাপার নয়। পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ সর্বঅর্থে একজন পরীক্ষিত, ঘা খাওয়া বা ঘা দেওয়া মানুষ। মত বিনিময়, সহনশীলতা এগুলিও আবশ্যিক ক্যারেকটারইস্টিকস্‌।

আমি যতদিন যেভাবে অয়নকে দেখেছি, তাতে কোনদিনই তাকে অন্যের প্রতি দরদী, সহমর্মী বলে মনে হয়নি। বরং তার কথা এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণে চোখে পড়ার মতো ফাঁক লক্ষ্য করেছি। অন্য কোনজন যে তার চেয়েও ভাল করে, বেশী করে কোন ব্যাপার বুঝতে পারে, কোন ঘটনার সঠিক কারণ এবং যথাযথ সমাধানসূত্র দিতে পারে, এটা অয়ন কিছুতেই মানতে চাইত না। এমনকি যে আমি, তার বুকের কাছের, মনের অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিলাম, সেই আমার মতামতকেও অয়ন নিজের পছন্দমত না হলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মতো অগ্রাহ্য করত। চোখমুখের অভিব্যক্তিতে তার অসন্তোষ জানিয়ে দিত। যে কোন বিষয়ে আমি যে তার চেয়ে কম জানি, কম বুঝি, এটা প্রমাণ করার জন্য হঠাৎ এমন হো হো করে হেসে উঠত যেন আমার অনভিজ্ঞতাকে ছেঁড়া টুকরো কাগজের মতো উড়িয়ে দিয়ে সে শুধু মজাই পেত না, আমাকে ছোট প্রমাণ করে সে গর্ব বোধ করত। চোখের আভাসে অয়নের অন্তরাত্মা ফুলের রেণুর মতো ছড়িয়ে পড়ত। বাতাসে ফুঁ দিয়ে অয়ন সেই রেণুকে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে চাইত। ভাবখানা শুধু আমি নই, আমার মাধ্যমে অয়নের এই গোপন পর্বটুকু যেন অনেকেই জানুতে পারে।

অয়ন আমায় তার চাকরির কললেটার দেখিয়েছিল। কললেটার পাওয়া মানেই তো নিশ্চিতভাবে চাকরি পাওয়া নয়। ইন্টারভিউ ভাল না হওয়ার জন্য বা মেডিক্যালী আনফিটনেসের জন্য, হতে হতেও চাকরী না'ও হতে পারে। অনেকগুলি 'যদি'-র পর্ব থাকে মাঝে।

কললেটারটি জামার বুকপকেট থেকে বার করে অয়ন বলল, চাকরিটা হয়ে গেল। তবে এখানে নয়। অনেক দূরে। সামনের সপ্তাহেই রওনা হব। অয়নের কথার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সুরকে ছাপিয়ে, রাজ্য জয় করার মতো অহমিকা প্রকট হয়ে উঠছিল।

আমার খুব অবাক লাগছিল। অয়ন চাকরি পেয়েছে, এটা তো সুখের কথা। আনন্দের কথা। অন্তত আমার নিজের দিক দিয়ে বিচার করলে, এই ধরণের সংবাদে সকলের চেয়ে আমার বেশী খুশি হওয়ার কথা। কারণ অয়নের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষার সঙ্গে আমার ভালমন্দ যে অনেকখানি জড়িয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাটুকু মুঠোর মধ্যে এসে গেলে যে কোন ধরণের সিদ্ধান্তের মোকাবিলা করা যায়।

কিন্তু আশ্চর্য, অয়নের চোখমুখের অভিব্যক্তিতে এখন নির্লজ্জ দাম্ভিকতা প্রকাশ পাচ্ছিল যেন আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে হারিয়েই তার কললেটার পাওয়া। আমার বিস্ময়টুকু গোপন রেখে, সহজ গলায় বললাম, সত্যি তুমি চলে যাবে? কষ্ট হবে না?

— কষ্ট? বলে অয়ন চোখ বড় বড় করে এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল যেন 'কষ্ট' শব্দটির সঙ্গে সে আদৌ পরিচিত নয়। বা শব্দটি তার চেনা হলেও, এক্ষেত্রে তার কী কারণ থাকতে পারে, এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

— তুমি কি ভেবেছিলে, সারা জীবন আমি এভাবেই কাটিয়ে দেব? অয়ন বলল, আমার ভবিষ্যত নিরাপত্তা থাকবে না, সংসার আমার থেকে কোন রিটার্ন পাবে না, বন্ধুরা সকলেই ওয়েল এসট্যাবলিসড্ হয়ে যাবে, আর আমি নিষ্কর্মার মতো ঘুরে বেড়াব?

— আমি কি তাই বলেছি? রাগ নয়, কষ্টে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে যাচ্ছিল। 'কষ্ট হবে না' এমন সোজা কথাটা না বোঝার মতো নির্বোধ অয়ন নয়। ও ইচ্ছে করেই, আমাকে দুঃখ দেবে বলেই, আমরা কথার অন্যরকম অর্থ তৈরী করে, পরোক্ষে নয়, বরং খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল, আমার আকুলতা, আমার একাকীত্ব, অয়নের ওপর আমার নির্ভরশীলতা কোন কিছুই ওকে স্পর্শ করে না। বরং এখন কথা বলতে গিয়ে যদি অমার গলা ধরে যায় বা কথার আড়ষ্টতায় আমি তোতলাতে শুরু করি, সেটা ওর কাছে খুব মজার ব্যাপার হবে। অপরকে 'ছোট', 'হেয়' প্রতিপন্ন করার মধ্যে অয়ন অদ্ভুত তৃপ্তি পেত। আমার ধারণা ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অয়নের বাস্তব

চৈতন্যবোধ হবে। তখন নিজেকে সবার চেয়ে বড়, সবার থেকে আলাদা এই জাতীয় ইগোগুলি আপনিই খসে যাবে। তা নাহলে আমি-ই বা ওর হাত ধরে দীর্ঘপথ চলব কেমন করে?

চিঠিতে অয়ন লিখেছে, জনগণ, একমাত্র জনগণই বিশ্ব ইতিহাস প্রণয়নের চালিকা শক্তি। জনগণই আসল বীর। সে তুলনায় আমরা প্রায়শই শিশু-সুলভ এবং অজ্ঞ।

যদি এই কথাগুলি ওর আন্তরিক বিশ্বাস থেকে লিখে থাকে, তাহলে বলব, এতদিনে ওর সত্যি বেধোদয় হয়েছে। আসলে আমি তো ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ও যা বলে, কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত আচরণ করে। ওর যদি বিশ্বাস জন্মে থাকে যে 'জনগণই আসল বীর' তাহলে আর একটি প্রশ্নও গায়ে গায়েই এসে পড়ে, জনগণ বলতে ও কাদের, কোন শ্রেণীর মানুষকে বুঝেছে? যারা শুধুমাত্র ঝাণ্ডা উঁচিয়ে মিছিল মিটিংয়ে যায় বা কারখানার গেটে বসে শ্লোগান দেয় একমাত্র তারাই জনগণ? বিশ্ব ইতিহাস প্রণয়নের চালিকা শক্তি? নাকি এদের ছাড়াও যে বিরাট সংখ্যক মানুষ পড়ে রইল, যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু কোন না কোনভাবে সামাজিক নিপীড়নের শিকার, অর্থনৈতিক চাপে ন্যুব্জ বা নির্যাতিত হয়েও প্রতিরোধে অক্ষম, তারাও 'জনগণ'-র অন্তর্ভুক্ত?

পৃথিবীর সব দেশে সব কালে শোষণ এবং শাসনের প্যাটার্নটা তো এক নয়। সেই হিসাবে নির্যাতন এবং নির্যাতিতের পদ্ধতিএবং চেহারাটাও এক নয়।

অয়ন যেমন লিখেছে, যে কোন মূল্যে সমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রমিক এবং কৃষকদের অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বিন্যস্ত করতে হবে। বন্দুকের নলই শক্তির একমাত্র উৎস।

অয়ন অ্যাগ্রেসিভ, একরোখা এটা জানতাম। কিন্তু চিন্তাভাবনায় সে যে এতটা এক্সিট্রিমিস্ট, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেও, কোনদিন তা মনে হয়নি। চিঠিটা পড়ে এখনও আমার মনে হচ্ছে, অয়ন যা লিখেছে, মনেপ্রাণে ততোটা দুঃসাহসী ও নয়। শুধুমাত্র গোলাগুলির বিনিময়েই যদি সব সমস্যার সমাধান হোত, তাহলে আলাপ আলোচনা, অবস্থান ধর্মঘট অনশন এসব অস্ত্রগুলি তো এতদিনে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হত। শুধু আমি কেন, সবাই তো দেখছে, সংবাদপত্রে পড়ছে, দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য এককালের মহাযোদ্ধারা এখন মানবশৃঙ্খল রচনা করেন। শান্তির জন্য ফুটবল খেলার আয়োজন করেন বা দৌড়ান এবং তাঁদের চেয়েও উগ্রপন্থীরা এখন কথায় কথায় আলোচনার টেবিলে বসেন। পালা করে ঘেরাও করেন। আমরণ অনশন করেন। ফলের রস খেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন।

অয়ন লিখেছে, খণ্ডযুদ্ধে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান বেশী হবে অথবা লাভ

লোকসান সমান সমান হবে। যে লড়াইয়ে জিততে পারব না, সে লড়াই করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে হঠকারিতা। তার মানে আজ আমার জীবনে যে ঘটনাটি ঘটে গেল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, অয়ন উপস্থিত থাকলে নির্ঘাত বলতো, এটা তোমার হঠকারিতা। লাভ লোকসান সমান সমান হয়েছে, নাকি আমার জয় কিম্বা পরাজয় হয়েছে, এ হিসেব কে করবে? আর লড়াই, সে যে মাত্রার, সে পরিমাপেরই হোক না কেন, তাতে হার-জিতটাই বড় কথা? আমি যে এগিয়ে গেলাম, ভয় সংকোচ দূরে ঠেলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম, তার কোন মূল্য নেই? অর্থহীন? নিছক হঠকারিতা? এতদিন তো এটাই জানতাম প্রয়োজনে পিছিয়ে এসে, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে, পাল্টা আরও বড় আঘাত হানার জন্য নিজেকে তৈরী করা যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল। আর পীড়াপীড়ি করা এক্ষেত্রে একটি হাস্যকর সংযোজন। অন্যায় দেখেও যে চোখ বুজে থাকে, তাকে আর যাই হোক না কেন, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধদলে কোনমতেই ভেড়ানো যায় না। এটা সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত তাগিদ। মাঠে নামছি মানে এই নয়, জয়ী হয়েই ফিরব আমি। জয়ের আকাঙ্খা নিশ্চয়ই থাকবে। আপ্রাণ লড়েও যদি খেলাটি গোলশূন্য ভাবে শেষ হয় বা বিপক্ষের অনুকূলে দুই এক বা তিন দুই ফলাফল হয়, তখন পরাজিত দলটিকে 'হঠকারী' বলে অভিহিত করা হবে? আগে যেটা প্রায়শই মনে হত, আজ চিঠি পড়েও সেই একই কথা মনে হচ্ছে, নিজের ক্ষমতা এবং পারদর্শিতা সম্পর্কে অয়ন 'যা নয়' নিজেকে এখনও সেইরকম ভাবে। সিদ্ধার্থ যেমন, অয়নও তেমনি, তার সংগঠনের লোকজন তাকে যেমন শেখায়, সে সেটা একশ ভাগ বিশ্বাস করে।

চিঠিটি অয়ন এমনভাবে লিখেছে যেন আমি তার সহযোদ্ধা। সে যে মত এবং পথে বিশ্বাসী, আমিও তাই। পাছে আমার মনে কোন সংশয়, প্রশ্ন বা দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, এইরকম আশংকায় সে আমায় সচেতন করে দেওয়ার জন্য পার্টি সংগঠনের গোপন নির্দেশাবলী, ইস্তাহারের মূল কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতেই, এতদিন পরে দীর্ঘ একটি চিঠি পাঠিয়েছে। কেবলমাত্র সম্বোধনটুকু ছাড়া গোটা চিঠিটিতে এমন একটি শব্দও নেই, যা পড়ে মনে হতে পারে, অয়নের সঙ্গে আমার একটি স্বপ্ন দেখার সম্পর্ক ছিল।

বাবা আমার জীবনে প্রথম পুরুষ যিনি বৃহত্তর পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিলেন।

বাবা ছিলেন আউল-বাউল-পাগল কবি স্বভাবের মানুষ। সঠিকভাবে সংসারী হওয়ার কোনরকম যোগ্যতাই ছিল না তাঁর। এখন মনে হয়, বাবা ছিলেন সর্ব অর্থে রাইট ম্যান, বাট অল অ্যালন্‌গ ইন রং প্লেস। বুকের ভেতরের জমে থাকা অব্যক্ত আর হতাশার কথাগুলি, আমার মতো একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বলে নিজেকে হাল্কা করতে চাইতেন। আমি

বুঝলাম কি বুঝলাম না, আবেগ অনুভূতিকে সঠিকভাবে ছুঁতে পারলাম না হয়ত,. সেসব দিকে বাবার কোন খেয়ালই ছিল না। তিনি তাঁর মতো করে আমাকে বলে যেতেন।

অয়নের সান্নিধ্যে এসেই প্রথম বুঝতে শিখলাম যুক্তি এবং আবেগের ফারাক।

আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ যেমন সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন করে, অয়ন আমায় বুঝিয়েছিল, তোমার বাবার মতো আপনভোলা কবিস্বভাবের মানুষও তেমনি যেদিকেই তাকান, যা দেখেন, তার মধ্যেই সুন্দরের দর্শন পান। 'কেন', 'কোথায়', 'কীভাবে' এসব প্রশ্ন মাথায় আসে না।

হাজার হোক বাবা তো, খারাপ লেগেছিল। যদিও তখন আমার নিজের মধ্যেই ভাঙ্গনের খেলা শুরু হয়েছে। সত্যি তো, সব কিছুই যদি সুন্দর হবে, তাহলে তো কোন মানুষেরই অসুখী হওয়ার কথা নয়। অথচ সমান অধিকার, ন্যায্য পাওনার জন্য, পৃথিবীর মাটি তো কয়েক হাজার বার রক্তাক্ত হোল! তার মানে অয়ন যে কথাগুলি বলে, তার মধ্যে সারবত্তা আছে। নীল আকাশ, ভরা গাভীর মতো মেঘ, সবুজ বনস্থলি বা ঘুঙুর পায়ে কিশোরী, যার শাড়ির রং চালধোয়া জলের মতো, শুধুমাত্র এই কটি উপকরণ নিয়ে এত বড় পৃথিবীটা নয়। অয়ন এই কথাগুলিই বলত।

কলেজের পিছনের গঙ্গার ঘাটে আমরা প্রায়ই বসতাম দুজনে। পাশাপাশি নয়। মুখোমুখি। জলের ঢেউ এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটের সিঁড়িতে লাগত। একটি বহু পুরোনো বটগাছ ছিল। আমরা যেখানে বসতাম, তার থেকে হাত বিশেক দূরে। ডালপালার ভারে গাছটি গঙ্গার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। অনেক ঝড় ঝাপটাতেও কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। কোন কোন দিন দেখতাম মাছধরা নৌকা, গাছটির মোটা একটা ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে, জেলেমাল্লারা নৌকায় রান্না করত। গলুইয়ের ওপর রেখে মশলা পিষত আধলা ইঁট দিয়ে। গরম ভাতের গন্ধ, মশলার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসত। অয়নকে দেখতাম, আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে উঠে গিয়ে নৌকার মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে গল্প করতে শুরু করত। একদিন আমিও সাহস করে চুপিচুপি অয়নের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন বয়স্ক মাঝি আমায় দেখে হেসে বলেছিল, কী দ্যাখছেন মা জননী? আমাদিগের আন্নাবান্না? আমি বললাম, কী রান্না হচ্ছে তোমাদের আজ?

— কী আর অইব? ভাত আর চুনামাছের ঝোইল। খাবা নাকি?

অয়নকে বললাম, আমার হাতটা ধর একটু।

অয়ন অবাক গলায় বলল, হঠাৎ করে হাত ধরব? কেন?

— নৌকায় উঠতাম একবার। তুমিও এসো না।

মুহূর্তে অয়নের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

আমার খুব অবাক লাগল। বললাম, কী হল?

অয়ন প্রথমে মাথা নেড়ে বলল, কিছু নয়। তারপরেও আমি কিছু বলছি না দেখেই, থেমে থেমে বলল, 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়েছ? 'পদ্মা নদীর মাঝি'?

আমি বুঝতে পারলাম, নৌকায় ওঠার ব্যাপারে আমার উৎসাহটি ওর মনোমত হয়নি। ও হয়ত ভেবেছিল আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই শ্রমজীবি মানুষগুলি সম্পর্কে অন্য অনেক প্রশ্ন করব ওকে। জানতে চাইব এদের সোসাল স্ট্যাটাস, স্ট্রাগল ফর সারভাইভাল, এইসব ভারি ভারি কথাবার্তা। আর অয়ন ভ্রূ কুঁচকে হাত পা নেড়ে আমার কথার জবাব দেবে। সাদামাটাভাবে যেটা বলা যেত, বোঝানো যেত, ইতিহাস অর্থনীতি সমাজনীতি এইসব মিলিয়ে মিশিয়ে একটি জটিল আবহ তৈরী করবে। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকব। যা থেকে ও বুঝে নেবে, ওর ব্যাখ্যায় আমি চমৎকৃত । পরিবর্তে নিতান্ত বাচ্চার মতো আদুরে গলায় আমি ওকে ডাকলাম, তুমিও এসো না।

আমি যে এখনও কতটা অপরিণত, এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন অয়ন বলল, অমুক বইটা পড়েছ? তমুকটা?

কষ্ট নয়, সত্যি সত্যি আমার খুব রাগ হল। সব ব্যাপারে এত সিরিয়াস হলে একান্তে নদীর ঘাটে এসে বসে গল্প করাই বা কেন? আর সব ব্যাপারে মাস্টারী করার ব্যাপারটা আমি-ই বা মানছি কেন?

— পড়িনি। বেশ জোরেই বললাম, না পড়লেও ক্ষতি নেই।

— ওই তো। বলে অয়ন হাসল। হাসিটাও খুব সহজ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, দারিদ্র্যের বিলাসিতা করা ব্যাপারটা বোঝ?

— তার মানে? আমি বললাম।

— করে। কেউ কেউ করে। অয়ন হেসে মাথা দোলাল, এই যেমন এখন তোমার হঠাৎ মনে হল, নৌকায় উঠে গরীব মাঝিদের রান্নাবান্না দেখার নাম করে 'সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে' নিজেকে মিশিয়ে দেবার একটু অভিনয় করি।

— অভিনয়? রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল, কী বলছ তুমি?

— ঠিকই বলছি। অয়ন বেশ সহজ গলায় বলল, এটার মধ্যেও পরোক্ষে 'আমায় দেখুন' এইরকম একটি গোপন ইচ্ছে কাজ করছে।

— সব ব্যাপারকে তুমি এত সারকাসট্রিক্যালি দেখ কেন, বল তো?

— দেখি। দেখতে হয়। বলে অয়ন একটু হাসল। তারপর আমার হাত ধরার পরিবর্তে

উল্টোদিকে মুখ করে চলতে শুরু করল, গ্রামে পিকনিক করতে গেলে, কেতাদুরস্ত বাবুরা যার তার মাটির দাওয়ায় নির্দ্ধিধায় বসে পড়ে। রাস্তা ছেড়ে আলপথ ধরে হাঁটে। যেন হেটো মেঠো মানুষগুলির সঙ্গে শহুরে বাবুর কতই না আত্মীয়তা। জলকাদা ভেঙ্গে আলপথ ধরে বাবুমশাই যেন প্রায়ই ঘুরে হেঁটে বেড়ান। ব্যাপারটা কি সত্যি তাই? চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে অয়ন আমার মুখের দিকে চাইল, তোমার আজকের ইচ্ছেটাও ওই রকমই। এরপর বাড়িতে, বন্ধুমহলে, চেনাজানা লোককে বলবে, মাঝিরা এই রাঁধে, এইভাবে রাঁধে, আধলা ইঁট দিয়ে তরকারির মশলা থেঁতো করে। আরও কত কী বলবে!

— আর যদি সত্যি সত্যি কাউকে না বলি?

— অন্যকে না বললেও ঘুরতে ফিরতে নিজেই নিজেকে বাহবা দেবে। জীবনে জীবন যোগ করতে পেরেছ, এইরকম ভাবনায় তৃপ্তি পাবে।

— তোমার কথা সত্যি ধরে নিয়েই বলছি, আমি বললাম, আমি যে মাঝিদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাগ্রহে ওদের নৌকায় উঠতে চেয়েছিলাম, এটা তো মিথ্যে নয়।

— ঘটনাটা মিথ্যে, আমি তো একবারও বলছি না। অয়নকে বেশ সিরিয়াস মনে হল, আমি বলছি ঘটনাটা আকস্মিক। আন্তরিক নয়। এ পার্ট অফ্ হিপোক্রাসি। তুমি নিজে বুঝলে বা অন্যকে বোঝাতে চাইলে, মেলামেশার ক্ষেত্রে তোমার কোন সীমারেখা নেই।

— তোমার কী মনে হল, সত্যি তাই?

— তা নয় তো কী? অয়ন বেশ জোরের সঙ্গে বলল, হঠাৎ হুজুগের মতো কিছুক্ষণের জন্য একটু উন্মাদনা।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল অয়ন। লম্বা করে ধোঁয়া ছেড়ে নাটকীয় গলায় বলল, যখন তুমি কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করবে অবশ্যই তাকে অনুশীলন করবে এবং অবশ্যই তা সৃজনশীল হতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সবুজ ঘাসে ছাওয়া এক টুকরো জায়গা দেখলে যেমন মনে হয় একটু বসি বা কোন পুকুরের টলটলে জল দেখলে, আঁজলা ভরে সেই জলের ঝাপটায় চোখ মুখ ঘাড় ভিজিয়ে নিতে ইচ্ছে করে, নৌকায় চড়ার ব্যাপারটাও ঠিক ওরকমই একটি হঠাৎ মনে হওয়া।

আমি তো প্রায়ই দেখি, বটগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা দুটি তিনটি, কোন কোন দিন তারও বেশী পরপর সার দেওয়া নৌকা। মাঝিরা কলবল করে কথা বলে। রান্না করে। আজ যেমন করছিল। জাল বোনে। বেসুরো গলায় গান গাইতেও শুনেছি। আজ হঠাৎই মনে হল, নৌকায় উঠে দেখি একটু। ভাললাগা তো এমনই মুহূর্তের ব্যাপার। তার আবার

কোন পূর্ব প্রস্তুতি, পরবর্তী কর্মসূচী, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, এসব থাকে নাকি! অয়ন এমনভাবে বলল, 'নিয়মনীতি উদ্ভাবন', 'অনুশীলন', 'সৃজনশীল', যেন এখন থেকে গঙ্গার ঘাটে এলেই আমার কাজ হবে নিয়ম করে নৌকায় ওঠা, শুধু ওঠা নয়, নৌকার মানুষগুলির সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং কিসে, কীভাবে ওদের আরও ভাল হয়, ওদের অসংগতিগুলি দূর করা যায় বা ভুলচুক যেটুকু এখনও ওরা করে চলেছে, সে ব্যাপারে ওদের সতর্ক করা, সৃষ্টিশীল করা। এসবই আমার নৌকায় ওঠার একমাত্র শর্ত এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

নিজের মতো করে যে দুনিয়াটাকে ভাবতে শিখেছে, তার কাছে সংবেদনশীলতা, মুহূর্তের উচ্ছ্বাস বা আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণ, এসব আশা করা ভুল নয়। রীতিমত অন্যায়।

তারপরের দিন অয়ন যখন বলল, চল গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসি। আমি বেশ দৃঢ়ভাবে বললাম, না। কোথাও বসব না। অয়ন অল্প হেসে বলল, বুঝেছি। একটু চুপ করে থেকে বলল, যে বই দুটোর কথা কাল বললাম, লাইব্রেরী থেকে এনে পড়ে নিও। উপকার হবে।

— বই পড়ে কী হবে? আমি যেন সত্যি খুব অবাক হয়েছি ওর কথায়, চোখমুখে এমনিভাব ফুটিয়ে তুললাম, বই পড়ে সবটুকু রিয়েলাইজ করার ব্যাপার আছে না। একটু থেমে বললাম, তুমি যখন পাশেই রয়েছ, বই পড়ে বুঝতে গিয়ে বাজে সময় নষ্ট করব কেন!

আমি ভেবেছিলাম, অয়ন হয়ত দপ্ করে জ্বলে উঠবে রাগে। ও কিন্তু কিছুই বলল না। এমনকি আমার মুখের দিকে তাকাল না অব্দি। আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। দুজনেই নির্বাক। পুরনো লঞ্চঘাটের গা ঘেঁষে যে ইঁটপাতা রাস্তাটা একটি বস্তির মধ্যে দিয়ে সটান গিয়ে মিলেছে বড় রাস্তার সঙ্গে, অয়ন হঠাৎই তার সাইকেলের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সেই রাস্তাটায় ঢুকল। ওর দেখাদেখি আমিও অপরিসর, নোংরা রাস্তাটায় ওর পিছন পিছন চলতে লাগলাম। রাস্তাটার দুপাশে কাঁচা নর্দমা, আর নর্দমার কোল ঘেঁষে ছোট ছোট ঘর। মাটির দেওয়াল। মাথায় টালি। শূকর ছানা, মুরগী, রাস্তার কুকুর এবং উলঙ্গ শিশুর দল মিলেমিশে চরে বেড়াচ্ছে। তারস্বরে রেডিও বাজছে একটি ঘরে। আর তার সামনেই মিউনিসিপ্যালিটির টাইম কলের সামনে একদঙ্গল মেয়েমানুষ, কে আগে জল নেবে, এই নিয়ে বিশ্রীভাবে চীৎকার করছে। কুৎসিত তাদের অঙ্গভঙ্গী। মুখের ভাষা অশ্রাব্য। আমাকে আর অয়নকে দেখে মেয়েমানুষগুলি ঝগড়া থামিয়ে এমন হাঁ করে চেয়ে রইল আমাদের দিকে যেন তাদের পাড়ায় আমরা রাজকীয় অতিথি। আমাদের মতো পরিচ্ছন্ন, সভ্য, ভদ্র মানুষ যে এ পথে চলতে পারে, এটা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। কমবয়সী ভাল স্বাস্থ্যের

একটি মেয়ে কলতলা জুড়ে বসে আদুল গায়ে স্নান করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখেই, মেয়েটি কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে পাশে রাখা একটি বড় ডেকচি দিয়ে তার বুকদুটিকে আড়াল করল।

অয়ন লক্ষ্য করেছে কিনা জানি না, মেয়েটির অমন আচরণে আমার দু'কান গরম হয়ে উঠল। ভীষণ রাগ হল অয়নের ওপর। জেনে বা না জেনে কেন ও এ রাস্তায় ঢুকল!

নীচু গলায় অয়নকে বললাম, হঠাৎ এ রাস্তায় ঢুকলে কেন?

— এমনি, অয়ন নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, ইচ্ছে হল।

— তুমি বুঝি এইপথে প্রায়ই আস?

— কেন বল তো? চলতে চলতেই অয়ন জিজ্ঞেস করল, কোনরকম খারাপ ধারণা মনে এসেছে বুঝি?

— না। আমি বেশ স্পষ্ট করেই বললাম, এ পথটাকে অ্যাভয়েড করা যেতে পারত।

— ওইজন্যেই তো এলাম। বলে অয়ন একটু থামল, একই শহরে তোমার পাশাপাশি এরাও রয়েছে, জানতে না নিশ্চয়ই?

আমি কোন জবাব দিলাম না। কারণ অয়নের গলার স্বর বলে দিচ্ছে, তার কথায় কোন প্রশ্ন নেই। আছে তির্যক শ্লেষ। তার সঙ্গে কিছুটা ব্যঙ্গ।

অয়ন খুব ধীর পায়ে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমিও, হয়ত সেই জন্যেই গলিপথটা বেশ লম্বা মনে হচ্ছিল। বড় রাস্তায় বাস লরি রিক্সার হর্ণ, মানুষের কোলাহল সব শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু গলির পথটা যেন শেষ হচ্ছে না।

দরজার পরিবর্তে চটের বস্তা ঝুলছিল একটি নীচু মাটির ঘরের সামনে। কাঁচা নর্দমার নোংরা জল, বর্জ পদার্থ, নর্দমা উপচে প্রায় ঘর ছুঁই ছুঁই। চটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী একটি লোক জড়ানো গলায় বিশ্রী বিশ্রী কথা বলছিল। ঘরের মধ্যে যে আছে, তাকে উদ্দেশ্য করে। অয়ন আচমকা লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ উঁচু গলায় বলল, কেমন বীরপুরুষ দেখ, মামন! সকাল না হতেই আকণ্ঠ গিলে এসে, বউ ছেলেমেয়ের ওপর হম্বিতম্বি করছে। যেন বউ ছেলেমেয়ে ওর পোষা মুরগী। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে অয়নকে দেখল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, সেলাম সাহাব। অয়নের পাশে আমাকে দেখে দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাল, নমস্তে মাইজি।

— কেমন শেয়ানা দেখেছ? অয়ন হেসে বলল, একটু পরে ওখানেই শুয়ে পড়বে। বমি করবে। ওর বউ ওকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াবে। বমি পরিষ্কার করবে।

আমার খুব অবাক লাগছিল। একটি লোক নেশার ঘোরে যেখানে সেখানে ঘাড় গুঁজে

পড়ে থাকতে পারে। তা বলে কোন কারণ ছাড়াই বউবাচ্চাদের সঙ্গে যা খুশি আচরণ করবে! যা মনে হবে, তাই করবে!

অবাক কাণ্ড, অয়ন তার কথা বলা শেষ করেই আবার চলতে শুরু করল। তার মানে ও জানে এরপরে লোকটা কী কী করবে। লোকটার বউ মাতাল স্বামীর জন্য কী করবে, সব ওর জানা। এ পথে আজ আমি নতুন। ফর মাই কাইন্ড ইনফরমেশন, ও যেন প্রয়োজনীয় কথাগুলি আমাকে জানিয়েই এগিয়ে গেল।

বড় রাস্তায় পৌঁছে নিজেকে বেশ হাল্কা লাগতে লাগল। সিগারেট কিনবে বলে অয়ন একটি গুমটির সামনে দাঁড়াল। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে আমি খুব নিবিড়ভাবে অয়নকে লক্ষ্য করলাম। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে যখন, আগুনের আলোয় আজই প্রথম দেখলাম অয়নের দু চোখের নীচে হালকা খয়েরী ছোপ। নাকটাও কেমন অস্বাভাবিক লম্বা মনে হল। অত্যাচারী শাসকদের মতো নাকটি তীক্ষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ ধারাল নাকটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চিবুকটাকেও কেমন সরু ছুঁচলো মনে হল।

কেন যে অয়নের মুখের এইসব অসংগতিগুলো হঠাৎ করে আজই চোখে পড়ল! মন খারাপ হয়ে গেল। হয়ত অরুচিকর নোংরা গলিপথ ধরে হেঁটে আসতে হল বলেই গলিপথ, সেখানকার মানুষগুলির অবচেতন প্রভাবে অয়নের শারীরিক অসংগতিগুলো চোখে পড়ল। আজই প্রথম।

সিগারেট ধরিয়ে অয়ন ফিরে এল। আস্তে করে বলল, চল। এবার আগে পিছে নয়, পাশাপাশি দুজনে চলতে লাগলাম। বড় রাস্তায় উঠেই অয়ন আবার মৌন। যেন গলিপথটুকু পার হওয়ার সময়ে ও যা বলার বলে দিয়েছে। যা দেখাবার দেখিয়ে দিয়েছে। এবার চিন্তাভাবনা প্রশ্ন করার পালা আমার। অয়ন এবং আমার মেলামেশার ব্যাপারটা আশপাশের সকলেই কম বেশী জানে। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে চলতে ফিরতে, গঙ্গার ঘাটে বসে গল্প করতেও দেখেছে অনেকেই। প্রথম প্রথম আমার লজ্জা সংকোচ হত। তখন অয়ন একঘেয়ে বকবক করলে, রাগ হত। বিরক্ত লাগত। কেবলই মনে হোত ও কেন বোঝে না, সহজ হতে, সামাজিক লজ্জা ভাঙ্গার জন্য একজন পুরুষের চেয়ে, একজন নারীর অনেক বেশী সময় লাগে! পুরুষ মানুষ যত সহজে দ্বিধা সংকোচ, সন্দেহ এবং চোখের অনুশাসনকে উপেক্ষা করতে পারে, একজন মেয়েমানুষের ক্ষেত্রে সেটা অনেক কঠিন। বিলম্বিত লয়ে ঘটে।

এখন আবার ব্যাপারটা একেবারে উল্টোরকম মনে হয়। পাশাপাশি দুজনে হেঁটে চলেছি। অথচ কেউ কোন কথা বলছি না। ঠিক যেন আমি অয়নকে অনুসরণ করছি মাত্র।

বা কোন কারণে আমাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ হয়েছে, আর তার জন্য আমি এতটাই দায়ী দোষী যে নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে সেটা ভাঙ্গার জন্য অয়নের পাশেপাশে নীরবে হাঁটছি। মনে মনে বা খুব অনুচ্চ গলায় ওর করুণা চাইছি। ওর অনুগ্রহ পাবার জন্য অপরাধীর মতো ওর গায়ে গা লাগিয়ে চলেছি।

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। কারণ অকারণ ছাড়াই এই লাইনটি অয়ন প্রায়ই বলে। হঠাৎ করে লাইনটি মনে পড়ে গেল। অয়ন কি তবে আমাদের দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ককে 'গভীরতর অসুখ' বলে মিন করতে চায়? কিন্তু তার পরের লাইনটা, যা অয়ন কখনই বলে না, 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে', সেটা যে আরও অমোঘ সত্য! নাকি ও নিজেকে 'পৃথিবীর' মতো মহান, গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে! পরোক্ষে যার সারার্থ দাঁড়ায়, ও আমার সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করুক না কেন, ক্রমাবনতিতে আমাদের সম্পর্ক যে স্তরেই পৌছাক না কেন, তার জন্য একশভাগ দায় আমারই এবং সেটা মেনে নিয়ে, আমি তবুও ঋণী অয়নের কাছে, এই অনুগ্রহে নতজানু হয়ে থাকতে হবে! আমার হাসি পেল। কোন কোন ধর্মীয় গুরু নিজেকে 'জন্মসিদ্ধ', 'যুগাবতার' বা 'বুদ্ধ', 'যীশু', 'চৈতন্য' বলে ঘোষণা করে। আর অন্ধ বিচারবোধহীন অনুগামী ভক্তরা সেটা বিশ্বাস করে। তখন ধূর্ত গুরুর চেয়ে নির্বোধ শিষ্যদের জন্য আমার করুণা হয়।

আমি অয়নের কাছে ঋণী। কিন্তু এতটা ঋণী নই, যে কারণে আমাকে ও প্রতিনিয়ত ছোট করতে পারে। ভালবাসার নাম করে অনুগ্রহ দেখাতে পারে। ওর নিজস্ব বিশ্বাস অবিশ্বাস জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। আমি মোটেই তেমন অসহায় নই। নির্বোধ তো নয়-ই।

যে মানুষ আত্মসম্মানবোধ খুইয়েছে, এ পৃথিবীতে তার হারানোর কিছু নেই। কোন কোন দিন অলস দুপুরে বসে, অয়নের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি থেকে আজ অব্দি ভাবতে থাকি যখন, তখন আলাপ এবং পরবর্তী মেলামেশার নীট ফল শূন্য বলে মনে হয়। ভালবাসা তো পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। অয়ন আমায় অনেক দিয়েছে। পরিবর্তে ওকে দেওয়ার কোন সুযোগ আমায় দেয়নি। শুরু থেকেই ও ধরে নিয়েছে, ওর মতো করে আমি চলব। কথা বলব। এমনকি আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনাগুলি পর্যন্ত ও-ই ছকে দেবে, আমার হয়ে। পুরনো ভৃত্যের মতো আমি ওর ভালমন্দ যে কোন কাজে ওর বশংবদ হয়ে থাকব। নতুন যা কিছু দেখাবে, শোনাবে, নিজস্ব ধ্যানধারণার নিরিখে আমি কোনমতেই সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারব না। দ্বিতীয় কোন ভাবনা মনে এলেও কোনমতেই সেটা প্রকাশ করতে পারব না।—

আত্মসম্মানবোধ এক ধরণের জেদ যা মানুষকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যোগায়। আমি ইচ্ছে করেই সামান্য পিছিয়ে গিয়ে অয়নকে ডাকলাম, শোনো।

অয়ন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পিছিয়ে এল না। 'অ্যাটেনশন প্লীজ'-র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েই রইল। তখন আমি কয়েক পা এগিয়ে ওর কাছাকাছি গিয়ে আস্তো করে বললাম, একটু আস্তে চল। আর যদি তোমার অন্য কোন কাজের তাড়া থাকে, তাহলে এগিয়ে যেতে পার।

আমার কথায় অয়নের চোখেমুখে কিন্তু এতটুকু অস্বস্তির ছাপ পড়ল না। বরং বেশ সহজভাবেই জবাব দিল, এগিয়ে যাবার হলে তো অনেক আগেই এগিয়ে যেতে পারতাম।

— আমার পাশাপাশি গেলে তোমার জাত যাবে না। এমন কড়া এবং ট্যারাব্যাঁকা কথাও কিন্তু আমি হেসেহেসেই বললাম।

— জাত আবার কারো যায় নাকি? অয়ন মজা করার গলায় বলল, জাত খোয়াতে হয়। ওপরে ওঠার মতো, নীচে নামারও কিছু প্রক্রিয়া আছে। পদ্ধতি আছে। ঘটনার পরম্পরা আছে।

বুঝলাম কথার দৌড়ে আমি অয়নের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। তার চেয়ে যেটা করতে চাইছি, যে বিষয়ে অয়নের মতামত জানতে চাইছি, সরাসরি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করাটাই বাঞ্ছনীয়। কোনরকম ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলাম, অমন একজন বীরপুরুষকে একটু ধমকও দিলে না তো? উল্টে সেলাম নিলে। অয়ন যেন আমার কথা ধরতেই পারছে না, এমনি বোকা বোকা গলায় বলল, কার কথা বলছ বল তো?

— বুঝতে পারছ না? আমি চাপা স্বরে কিন্তু বেশ কড়াভাবেই বললাম, তার মানে এই ধরণের সম্মান প্রদর্শনে তুমি বেশ আনন্দ পাও বল?

সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু মাটিতে ফেলে দিয়ে, চটি দিয়ে রগড়াল অয়ন। তারপর আমার কথার জবাবে যেন একটা দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করবে, তার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে মুখ ফাঁক করে অনেকখানি হাওয়া ভরে নিল বুকের খাঁচায়। স্থির চোখে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আস্তে করে বলল, বাড়িওলা ভাড়াটের সম্পর্কটা বোঝ?

তার মানে অয়ন মূল প্রশ্নটি থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে। ভিন্ন উপমা টেনে, কথার জাল বুনে ও নিজের অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইছে। আমারও কেমন জেদ চেপে গেল। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ও আমাকে বোকা বানানোর আগে, আমি-ই ওকে পাল্টা প্রশ্ন করে হেলিয়ে দেব।

— সোজা কথার সোজা উত্তরই এক্সপেক্টেড। আমি বেশ বিরক্তিকর গলায় বললাম,

হ্যাঁ কি না, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাইছি না।

— আমি-ও তো সেটাই বলতে চাইছি। অয়ন নিজেকে সপ্রতিভ প্রমাণ করার চেষ্টা করল, একটু ভেঙ্গে না বোঝালে, ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে না। অযথাই একটু মাথা নাড়ল অয়ন। যেন মুখে যেটা বলল, সেটা যথেষ্ট মনে না হওয়াতে শরীরী অভিনয়ে ওর বক্তব্যকে এসট্যাবলিস্ করার চেষ্টা করল।

— তুমি আমাকে কী ভাব বলতো? আমি রীতিমত ফুঁসে উঠলাম, তুমি কি আমাকে এতটাই নির্বোধ মনে কর যে আই-র পরে অ্যাম বসে, সেটুকুও জানি না? নাকি এতটাই অজ্ঞ ভাব যে, কোন প্রশ্নের কোন উত্তরটা যথার্থ, বিশ্বাসযোগ্য হয়, সেটুকুও বুঝি না?

সাত

সেদিনই প্রথম অয়নকে দেখেছিলাম, আর কোন কথা না বলে, প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা না করে, চুপ করে থেকেছিল এবং সামান্যক্ষণ পরেই একজন অনুতপ্ত মানুষের মতো কাতর গলায় বলেছিল, প্লীজ, তুমি অতটা উত্তেজিত হোয়ো না। চ্যাপটারটা এখানেই ক্লোজ করে দাও।

অয়নের কথায় এমন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল, যা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার যা কিছু জানা, দেখা, বিচার করা, সবই তো ওর কাছ থেকেই শেখা। ঠিক যেন গুরু শিষ্যের কাছে তর্কযুদ্ধে হার স্বীকার করে নিচ্ছে বা পুরোনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী কোন পিতামহ তার আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক পৌত্রীর পায়ের কাছে নিজের যাবতীয় গরিমা অহংকার বিশ্বাস অবিশ্বাস ধ্যানধারণাকে নামিয়ে রেখে আকুল সুরে বলছে, দয়া করে চুপ করো। আমাকে আর লজ্জা দিও না।

আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার ভালও লাগছিল। জিতেছি বলে নয়। প্রাচীরের গায়ে পালটা ধাক্কা দিতে পেরেছি। হয়ত সেই ধাক্কায় পাঁচিলটা ভেঙ্গে পড়ল না। কিন্তু তার গা থেকে পলেস্তারা খসে পড়ল। দু চারটে ইঁটও যেন একটু নড়ে গেল। জোড়ের মুখে এতটুকু হলেও চিড় ধরল।

অয়ন লিখেছে, শত্রুকে কখনও দুর্বল ভাবলে চলবে না। আবার তার পরের লাইনেই লিখেছে, শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই হল মৃত্যু।

জানিনা, এতদিন পরে হঠাৎ করে এমন বারুদঠাসা একটি চিঠি অয়ন কেন আমায় পাঠাল। ও কি ধরেই নিয়েছে, আমি ওর চিঠি পড়েই, ওর মতো করে জগৎ সংসারকে বিশ্লেষণ করব। যে কোন সমস্যার মোকাবিলা ওর নির্দেশিত পদ্ধতিতেই করব। বা আমার

মতবিরোধী, শত্রুভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গে ও যেমন করার কথা লিখেছে, সেইরকম আচরণ করব।

ভুল, ভুল। আদ্যন্ত ভুল। আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আমার মতো করে পথ হাঁটছি এখন। অনেক দূরে বসে, অনেক অনেকদিন মেলামেশা না করে, অয়ন হয়ত ভেবেছে, আমি বুঝি এখনও নবম শ্রেণী। এখনও শাড়ি।

জানলা দিয়ে অল্প একটু হাওয়া এল। আর তার সঙ্গে মৃদু গা শিরশিরানি ভাব। হাওয়ার ধাক্কায় চিঠিটা বিছানা থেকে এলোমেলো উড়ে গিয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ল। কিন্তু বিছানা থেকে নেমে চিঠিটা কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করল না। নির্বিকার চুপ করে শুয়ে রইলাম। একবার মনে হল চিঠিটা না কুড়িয়েই ঘরের আলোটা অন্তত নিভিয়ে দিই। পরমুহূর্তেই মনে হল, রাতের গভীর অন্ধকার আমায় জাপটে ধরবে। পুরনো স্মৃতি, ফেলে আসা মন-ভালো ও মন-খারাপের মুহূর্তগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে। তখন হয়ত আমার কান্না পাবে। বুক ঠেলে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে আসবে আপনিই। উত্তেজনায় ঘাড় কিম্বা রগের শিরা দপদপ করবে। ঝাপসা চোখে চেনা ঘরটাকেও অচেনা লাগবে। যেদিকে তাকাব, বর্ণহীন ম্যাড়মেড়ে মনে হবে এ ঘরের আসবাব। দেওয়ালে ঝোলানো নৈসর্গিক ক্যালেন্ডারটাকেও মনে হবে ছিরিছাঁদহীন এক খাবলা রংয়ের জটলা। তার চেয়ে এই ভালো। বাল্বের উজ্জ্বল আলোয়, মন খারাপ, ভয়, আড়ষ্টতা সব ঢাকা পড়ে গেছে।

সারাটা দিন আজ ভারি অদ্ভুত কাটল। পরস্পর বৈপরীত্যে ভরা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল, সন্ধ্যে পার হয়ে সময় মধ্যরাত ছুঁয়ে গেল। সবার অজান্তে ডাকপিওন মুখবন্ধ সাদা খামটি বাগানের ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেল। মুখবন্ধ খামটি হাতে নিয়ে বাবার কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর পিছিয়ে গিয়ে, বাবা যেভাবে বলতেন, ঠিক সেইভাবে, 'কে লিখেছে' এবং 'কী লিখেছে' এই দুইয়ের দোলাচলে এক মহিলারী ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ। তারপর বেশ কিছুক্ষণ খেলা করলাম নিজের সঙ্গে। মুখবন্ধ খামটি ছিঁড়ে ফেলার সঠিক মুহূর্তটির অপেক্ষায় সময়ের ফিতে ধরে রোদের দৈর্ঘ্য মাপলাম অনেকক্ষণ। এর মাঝেই প্রিয়লাল এল ছুটতে ছুটতে। আমিও আগেপিছু চিন্তাভাবনা না করেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম। চিঠিটা ব্লাউজের নীচে বুকের মধ্যে রয়ে গেল। বস্তি অঞ্চলে নয়নচাঁদ একাই নাটক করছিল। বীরের ভূমিকায়। দর্পিত ভঙ্গীতে। দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে আমিও অবাক হয়ে দেখতে পারতাম। অন্যরা যেমন মূক বধিরের মতো নয়নচাঁদের মাথা দোলানো অভিনয় দেখছিল। বুকের ভেতর থেকে কে যেন ঠেলা দিল। দর্শকদের ঠেলে সরিয়ে আমিও নয়নচাঁদের বিপরীতে

মঞ্চে এসে দাঁড়ালাম। দর্শকরা আমার ভূমিকায় খুশি হল কি হল না, সেসব কথা মনেই এল না।

তারপরেও সিদ্ধার্থ, যে আমায় আজন্ম দেখছে, খুব কাছ থেকে দেখছে, সে-ও আমার কাজের তির্যক সমালোচনা করল। পাল্টা আমিও অনেক কথা বললাম। আমার কাজের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করলাম। সিদ্ধার্থকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সত্যি সত্যি ও কতটা বুঝেছে বা বিশ্বাস করেছে জানি না। অন্তর থেকে বলছি, আমি কিন্তু কোনরকম 'অ্যাক্টো' করিনি। যা করেছি, মানবিক তাগিদে করেছি। তার মধ্যে কোনরকম ছলচাতুরি ছিল না। অসততা ছিল না।

যে ভয়ে ঘরের আলো নেভাইনি, তা সত্ত্বেও সেটাই হল। কান্না পাক দিয়ে এল গলার কাছে। শ্লেষ্মার মতো জড়িয়ে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। বিছানায় উঠে বসলাম। একটু আরাম পাব এইরকম ভেবে কোনরকমে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিলাম।

এ বড় ভীষণ সময়। আমার পাশে একজনও নেই, যাকে মন খুলে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাগুলি বলতে পারি। বোঝাতে পারি। আমার কথা পুরোপুরি মানুক না মানুক, অন্তত আমাকে রিয়েলাইজ করার মতো একটি সুবেদী হৃদয় আমার পাশে নেই।

অয়ন যদি থাকত, হয়ত এক ফুঁয়ে ও আমার সব কথাকে উড়িয়ে দিত। কিন্তু তারপরেও বন্যার পরে, পলিমাটির স্তরের মতো, রাগ-দুঃখ-মান-অভিমানের অধঃক্ষেপটুকুও তো থাকত! সেটুকু অতিক্রম করার জন্যও তো আমি মনে মনে কথা সাজাতাম। যুক্তির অনুসন্ধান করতাম। একরাশ রাগ কিম্বা উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে উপযুক্ত মুহূর্তটির অপেক্ষায় পল অনুপল সময় গুণতাম।

অয়ন? অনেক দূরের থেকে, তুমি কি আমার এই নিদারুণ একাকীত্বের কোন স্পন্দন অনুভব করছ? তোমার চিঠিটির প্রতি ছত্রে ছত্রে আমার মনে যত প্রশ্ন এবং অবিশ্বাস এসে থাকুক না কেন, বিশ্বাস করে। তারপরেও বলছি, তুমি যেখানেই থাকো, ভাল থেকো। নিজের বিশ্বাসে অবিচল থেকো। বুড়ি চাঁদ বেনোজলে ভেসে গেছে। পৃথিবীটা বড় সেকেলে পুরোনো পঙ্গু অথর্ব হয়ে গেছে। একটা প্রবল ঝাঁকুনি দরকার। সে যদি বন্দুকের নল বা সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে হয়, তাই হোক না। তবে কার্তুজগুলো যেন তাজা থাকে। আর লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে প্রলোভনের হাতছানিতে পালিয়ে না যায় কেউ। তখন একদিন হয়ত দেখব, জঙ্গীর আত্মসমর্পণের মতো তুমি তোমার বন্দুকখানি মাটিতে নামিয়ে রেখে আমাকেই জিজ্ঞেস করছ, তবে কি সংসদীয় পথ বা অসহযোগ আন্দোলন, ঘেরাও

বিক্ষোভ অনশন, এই সবের মধ্যে দিয়েই ধাপে ধাপে এগোতে হবে?

বিশ্বাস কর অয়ন, যদি আমার মত এবং বিশ্বাসের অনুগামী তুমি হও, আমি তাতে বিন্দুমাত্র শ্লাঘাবোধ করব না। আবার আমার যদি কোনদিন মনে হয়, আমার বিশ্বাসে ফাঁক আছে, নিশ্চিত সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই, পরিবর্তে তুমি ঠিক পথে হাঁটছ, আমি সমস্ত হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে, তোমার কাছে ছুটে যাবো। নিঃসংকোচে বলব, তোমায় হাত বাড়াতে হবে না। আমিই হাত এগিয়ে দিলাম। তুমি আমার হাত ধরো, অয়ন।

নিজের সঙ্গে একান্তে এইসব আলাপ আলোচনা করে, যেন খানিকটা আরাম পেলাম। রাত শেষ হতে বোধহয় আর দেরী নেই। যেসব পাখিরা ভোরের জানান দেয়, তারা ডাকতে শুরু করেছে। বিছানা থেকে নেমে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। রুলটানা খাতা থেকে খুব যত্নে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে, বড় বড় অক্ষরে লিখলাম, আলোর পথের দিশারী, অয়ন, তোমাকে —

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে, এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা।
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

কয়েক লাইন বাদ দিয়ে, ইচ্ছে করেই নীলের পরিবর্তে সবুজ কালির কলমটা টেনে নিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম —

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে

হয়ত গভীর আবেগে নিমগ্ন আচ্ছন্নতায় লিখছি বলেই, মাত্র এই ক'টি ছত্র লিখতে নিজেই খেয়াল করিনি অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। হঠাৎ মাথা তুলে দেখি জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটাকে ছানা কাটা দুধের মত দেখাচ্ছে। ইঁট পাতা গলির রাস্তায় একটি রিক্সা যাচ্ছে ঝকর ঝক আওয়াজ করতে করতে। তার মানে রাত ফুরিয়ে গেল। এই ভেবেই কেমন একটা জেদ চেপে গেল। চিঠিটা শেষ করতেই হবে। মনোযোগী ছাত্রীর মতো টেবিলে ঝুঁকে পড়ে যেন একটি অক্ষরও ছোট বড় না হয়, একটি বানানও ভুল না হয়, এমনি নিবিড় মনস্কতায় চিঠির উপসংসারটুকু লিখলাম —

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।

আট

বেশ কিছুদিন হল, শচীন ডাক্তারের চেম্বারে রুগীপত্র আসে না বললেই চলে। সকাল থেকে শচীন ডাক্তার চেয়ারে বসে ঢোলে। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যে দু চারজন বেঁচেবর্তে আছে, আগের মতো তারাও আর নিয়মিত আসে না। ঘরভাড়া বাকী পড়েছে একবছরের ওপর। মালিক ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে। শচীন ডাক্তার হাত পাখা নেড়ে হাওয়া খায়। ঢুলুনি এলে হাত থেকে পাখা খসে পড়ে। শচীন ডাক্তারের বয়স যত না হয়েছে, তার চেয়েও তাকে বয়স্ক অথর্ব দেখায়। ইদানীং চোখে কম দেখে। দু ফোঁটার জায়গায় চার ফোঁটা ওষুধ দেয়। এমন ডাক্তারের কাছে কোন রুগী আসবে! চেম্বারের পাশেই সরকার বুকস্টল। সব সময়েই খদ্দেরের গাঁদি লেগে আছে। মালিকের ছোট ছেলেটি এখন দোকানে বসে। বয়স কম। দেখতেও ভাল। কথা বলে একটু টেনে টেনে। মেয়েলী ঢংয়ে। স্কুল কলেজের মেয়েরা সবসময়ে ভিড় করে আছে সরকার বুকস্টলে।

মেয়ে দেখলে চনমনিয়ে ওঠার বয়স শচীন ডাক্তারের নয়। নাড়ি টিপে দেখার ছল করে, মেয়েদের হাত ধরে থাকার মতো কোন দুর্নামও তার নেই। মোটের ওপর চিকিৎসাটা শচীন ডাক্তার জানে। ওষুধের অন্যায্য দামও নেয় না। তা'ও রুগীপত্র আসে না। অথচ একসময়ে এ তল্লাটে অসুখ বিসুখের জন্য সবাই প্রথমে শচীন ডাক্তারের কাছেই আসত। ওষুধে কাজও হোত। কোন রোগের ধারণধারণ বুঝতে না পারলে অকপটে বলত, এ আমার বিদ্যের বাইরে। বড় কোন এ্যালোপাথির কাছে যাও। কেন যে হঠাৎ করে কমতে কমতে রুগীর সংখ্যা প্রায় শূন্যে পৌছাল, এ রহস্যটা সে কিছুতেই ধরতে পারে না। এমন নয় যে বড়সড় ডিগ্রীধারী অন্য কোন ডাক্তার এসেছে এলাকায় বা শচীন ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় কারোর ক্ষতি হয়েছে! হঠাৎ করেই রুগীর আকাল।

শচীন ডাক্তারের দুই ছেলেই চাকরি করে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বহু বছর আগে। সে মেয়েই এখন রীতিমত সংসারী। বউ মারা গেছে বছর সাত আট। সংসারে সে যে কোণঠাসা অবস্থায় আছে তা নয়। বরং দুই ছেলে এবং তাদের বউয়েরা শচীন ডাক্তারকে বেশ আরামেই রেখেছে। সংসারে খাইখরচও দিতে হয় না তাকে। সারা মাসে বিশ তিরিশ টাকা যা রোজগার করে, সেটা নিজেরই থাকে। নেশা বলতে নস্যি। দু টাকায় দিন চারেক চলে যায়।

মাস ছয়েক হল শেফালীকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শচীন ডাক্তার। মেয়েটি বড়ই অভাবী। ভদ্র বিনয়ী সৎ সর্বোপরি বেশ ঠান্ডা প্রকৃতির। মেয়েটির রোজগারের টাকায় নাকি সংসার

চলতো। শচীন ডাক্তার যেদিন শেফালীকে না আসার কথা বলল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেকি কান্না! শচীন ডাক্তারের চোখেও জল এসে গেছিল। কিন্তু সে-ই বা কী করবে। শেফালীর মাইনের টাকা তো আর ছেলেদের কাছে হাত পেতে চাওয়া যায় না। নিজেরও জমানো পুঁজি নেই, যা থেকে ভর্তুকি দিয়েও, শেফালীকে কাজে রাখা যেত! ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে, মেয়ের বিয়ে দিতেই জমানো পুঁজি শেষ।

শেফালীর কান্না দেখে শচীন ডাক্তারের মন এতটাই খারাপ হয়ে গেছিল যে দুদিন চেম্বারমুখো হয়নি। ডাক্তারের কাছে থেকে থেকে শেফালীও অল্পস্বল্প ডাক্তারি শিখে ফেলেছিল। চেম্বারের টেবিল বেঞ্চ পরিষ্কার করা, প্রতিদিন পুরনো জল ফেলে মাটির কলসীতে টাটকা জল ভরা, কাজ বলতে তো এই। নিজের চেষ্টাতেই ডাক্তারবাবুর দেখে দেখে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিগুলি চিনতে শিখেছিল। কোন ওষুধটা লিকুইড আর কোনটা গ্রানিউলস্ হবে তাও তার মুখস্থ হয়ে গেছিল। শেষের দিকে তো শচীন ডাক্তার ছোট টুকরো কাগজে ওষুধের নাম লিখে শেফালীকে বলত, ওষুধটা তৈরী করে দাও। আর কীভাবে খাবে, সেটাও বুঝিয়ে দিও।

শেফালীর গায়ের রং ফর্সা কিন্তু কেমন অ্যানিমিক ফরসা। আর চেহারাটা এতই রোগা যে পিছন থেকে পাশ থেকে হঠাৎ দেখলে ছেলে বলে মনে হোত। বয়স এমন কিছু নয়। কিন্তু শরীরে মেয়েলী লক্ষণের এতটাই ঘাটতি যে শচীন ডাক্তার নিজেই একএক সময় ভাবত, এ মেয়েটাকে বিয়ে করবে কে? কী দেখেই বা করবে? শারীরিক ঘাটতিটুকু যে টাকাপয়সা দিয়ে পুষিয়ে দেবে সে জোরও নেই। এক একদিন শেফালীকে আড়চোখে দেখে শচীন ডাক্তারের বুক কেঁপে উঠত। তার নিজের মেয়েটার শারীরিক অবস্থা যদি এমনটি হোত! সে নিজে কীভাবে মেয়েকে পাত্রস্থ করত! তবে একটা ব্যাপারে খুব বাঁচোয়া ছিল। শেফালীর স্বাস্থ্য যদি চোখে পড়ার মতো হোত বা মেয়েটি কইয়ে বইয়ে বাচাল প্রকৃতির হোত, শচীন ডাক্তারের চেম্বারে উটকো রুগীর ভিড় বাড়ত। তারা তো আসলে কেউ-ই রুগী নয়। লোফার ইতর জাতীয় কিছু ছেলে। মাঝবয়সী বা বয়স্ক দু চারজন বিকৃত পুরুষ মানুষের জটলা হোত চেম্বারে। তাতে আখেরে ডাক্তারের কোন লাভই হোত না। পরোক্ষে চেম্বারটি অসামাজিক চ্যাংরা কিছু ছেলে এবং ডাক্তারের বন্ধুদের মধ্যে থেকেও দু চারজনের গুলতানি করার, চোখের আরাম করার, অশ্লীল রসিকতা এবং সাজানো বিকৃত গল্প করার একটি আখড়া হয়ে উঠত। শাপে বর হয়েছে। হয়ত একটি মেয়ের যৎসামান্য হলেও, রোজগারের পাকা একটি ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ ঘটতে পারত। এ অঞ্চলের উঠতি মস্তান কোন ছেলের খপ্পরে পড়ে হয়তো শেফালীর

জীবনটা তছনছ হয়ে যেত। আশপাশের বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর যোগাড় করে চেম্বার নয়, মধু চক্র, এই অপবাদে এস.ডি.ও. সাহেবের কাছে শচীন ডাক্তারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এমনি কারণ দেখিয়ে এস.ডি.ও. সাহেব চেম্বারটিকে তুলে দেবার নির্দেশ দিতেন। সে বড় লজ্জার ব্যাপার হোত। পাবলিক সব খায়। সুতরাং শচীন ডাক্তার চেম্বারের আড়ালে মেয়েদের দেহ খাটিয়ে পয়সা তোলে, এমন দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ত দ্রুত।

তাহলেও পায়ের তলায় যার পেরেক বিঁধেছে, সেই-ই জানে, কোথায় বিঁধেছে এবং তাতে কতটা লাগছে! শেফালীকে ছাড়িয়ে দেবার পর থেকে শচীন ডাক্তারের বুকের মধ্যেও একটি কাঁটার খোঁচা সব সময় বেঁধে। একটি মেয়ে যার রোজগারে একটি সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এবং মেয়েটি বেশ কয়েকবছর ধরে এক জায়গায় একইরকম কাজ করতে করতে, অন্য কোন কাজ শেখার চেষ্টাও করেনি, পরোক্ষে ভেবেছে ঠিকমত লেগে থাকতে পারলে, ডাক্তারবাবুই তার একটি হিল্যে করে দেবে, সেই মেয়েটিকে আগে ভাগে বিন্দু বিসর্গ কিছু জানতে না দিয়েই, শচীন ডাক্তার তাকে হুট করে ছাড়িয়ে দিয়েছে। পরদিন থেকে মেয়েটি কী করবে, কীভাবে তাদের দিন চলবে, এসব ব্যাপারে ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে আলোচনা দূরে থাক, ভাববার মতো একটু সুযোগ সময় কিছুই দেয়নি। এটা আইনত অন্যায় এবং একজন মানুষ হিসেবে এমন হৃদয়হীন অবিবেচকের মতো কাজ করাটাও শচীন ডাক্তারের উচিত হয়নি। সংবেদনশীল এবং বিবেকবান মানুষের বড় বিপদ, প্রতিমুহূর্তে তাকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কত মানুষই তো আছে নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী যে কাজটি করে সেটিকে সর্বোচ্চ বলে মনে করে। কৃতকর্মের পর্যালোচনা দূরে থাক, সে ভাবে, সে যা করেছে বা যেভাবে করেছে তার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং উত্তম পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। একটি কাজ করে, সেই ব্যক্তি নতুন আর একটি কাজের সন্ধান করে। পুরোনোটিকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখা, ঠিক বেঠিক বিচার করা, এসব তার ধাতে নেই। ইদানীং শচীন ডাক্তার প্রায়ই ভাবে সংবেদনশীল মানুষের বেশীদিন বাঁচতে নেই। তাতে সেই মানুষটির ক্ষয় তো হয়ই, সাথে সাথে পৃথিবীর ভারসাম্যও ব্যাহত হয়। কেন, কীভাবে, এমন সব কুটকচালি প্রশ্নের উত্তর কোন সুবেদী মানুষই ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে না। বা করলেও অন্যে সেটা মানতে চায় না। বিশ্বাস করতে চায় না।

শচীন ডাক্তারের সমস্যাটা এইখানেই। তার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে, এত গভীরে গিয়ে ভাবনাচিন্তা করত না। ডাক্তারি তো মূলত ব্যবসা। ব্যবসায় মালিক কর্মচারীর অবস্থানের ফারাক তো থাকবেই। আর মালিক তার ইচ্ছানুসারে কর্মচারীকে রাখতে পারে। তাড়াতে পারে। প্রয়োজনে কর্মচারী বদলও করতে পারে। _

শচীন ডাক্তার কখনই মন থেকে মানতে পারে না, ডাক্তারি করা আর মুদির দোকানদারি করা এক ব্যাপার। ডাক্তারের সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। ডাক্তার মানুষ একটু নরম সরম দয়ালু হৃদয়বান হবে, তবেই না সে ডাক্তার! চল্লিশ বছরের প্র্যাকটিস জীবনে এই প্রথম সে একটি অমানবিক কাজ করল। কত রুগীকে বিনা পয়সায় দেখেছে, রাতবিরেতে ছুটে গেছে, প্রয়োজনে শুধু ওষুধই নয়, পথ্যের ব্যবস্থাও নিজেই করে দিয়েছে। অথচ সেই মানুষটিকেই আজ একটি সত্যিকারের অভাবী মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে হল। মেয়েটির কান্নায় তার নিজের বুকের মধ্যে দুমরে মুচড়ে উঠল। কিন্তু তারপরেও ঠুঁটো জগন্নাথের মতো চোখ বড় বড় করে এই দুঃখজনক ঘটনাটি দেখে যাওয়া ছাড়া, সে আর কিছুই করতে পারল না।

কোন ঘটনায় একজন ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব তৈরী হলে, অথচ তার সমাধান সূত্র পাওয়া না গেলে, অপারগ মানুষটি তখন 'কী আর হবে' বা 'কী করা যাবে' এই ধারণায় ঘটনাটিকে ভুলতে চায়। তখন ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সে এমন কাজ করে, যা তাকে মানায় না। কোনদিন এমনটি করতে হতে পারে, ভাবেওনি হয়ত।

শচীন ডাক্তার হঠাৎ করে চেয়ার ছেড়ে তেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন জরুরী কোন কল আছে এমনি ব্যস্ততায় ওষুধের বাক্স, চশমা সব গুছিয়ে সাজিয়ে রাখল। দেওয়ালে ঝোলানো পেরেক থেকে স্টেথিস্কোপটি নামিয়ে চশমার পাশে রাখল। ঘরের আধবন্ধ জানলাটি খুলে দিল এবং ঘরের বাইরে এসে টেবিল ঝাড়ার কাপড়ের টুকরোটি দিয়ে নিজের নেমপ্লেটটি বার কয়েক মুছে, সেটিকে ঠিকঠাক সোজা করে দিল। মাত্র এই সামান্য কাজটুকু করতেই সে বেশ হাঁফিয়ে উঠল। এখন রাস্তায় লোকজনের ভিড়। কেউ না কেউ দেখল হয়ত যে, ডাক্তার নিজেই নেমপ্লেট মুছছে।

শচীন ডাক্তার যেমন ব্যস্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল ঠিক সেইরকম দ্রুততায় ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। খুব খাটাখাটনি হলে মানুষ যেমন টেবিলে মাথা রেখে ক্লান্তি দূর করে, সেইভাবে টেবিলের ওপর হাত দুটি সটান দুপাশে ছড়িয়ে মাথাটি একপাশে কাত করে রেখে লম্বা শ্বাস ফেলল — ওফ্! মানসিক অবসাদের জন্যই বোধ হয়, শচীন ডাক্তারের একটু ঘুম ভাব ভাব এসে গেছিল। হঠাৎ একটি ভারি গমগমে পুরুষ গলা ঠিক যেন চোঙামুখে তার কানের ওপরেই বেজে উঠল, আসতে পারি, ডাক্তারবাবু? শচীন ডাক্তার ধাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ছোট দরজাটি জুড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত একজন মানুষ এক পা চৌকাঠের বাইরে, অন্য পা'টি ঘরের মধ্যে রেখে যেন অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়সী লোকটির সারা মুখ জুড়ে অল্প অল্প হাসি। রুগী মানুষ

হাসি হাসি মুখে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকছে, এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। এ লোকটিকে শচীন ডাক্তার আগে কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ল না। সে চট করে সোজা হয়ে বসে গলাটাকে গম্ভীর করে বলল, আসুন।

লোকটি খুব স্বচ্ছন্দে ঘরে ঢুকে ফাঁকা পুরোনো একটি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর জামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে, শচীন ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল, নিন। শচীন ডাক্তার মাথা দুলিয়ে বলল, ধূমপান আমি করি না। আর — বলে একটু থেমে বলল, চেম্বারের মধ্যে ধূমপান পছন্দও করি না। লোকটি মুহূর্তে তার বাড়ানো হাতটি সরিয়ে নিল, সরি, কিছু মনে করবেন না।

— ঠিক আছে। শচীন ডাক্তার গলাটাকে আরও একটু ভারি করার চেষ্টা করল, কী হয়েছে বলুন?

লোকটি মিটমিট করে হাসল একটু। তারপর খুব বিনীতভাবে বলল, রুগী আমি নই। আমি কলবুক করতে এসেছি।

— কার বাড়ি? কত দূরে?

— কাছেই। বলে লোকটি একটু হাসল, যদি দয়া করে একবার যান, বিশেষ উপকার হয়।

এমনিতে শচীন ডাক্তারের বড়ই মন্দা সময় চলছে। সেই ভাঁটার সময়ে কলবুক শুনে তার চনমনিয়ে ওঠার কথা। সে কিন্তু এতটুকু ব্যাগ্রতা না দেখিয়ে থেমে থেমে বলল, আর একটু পরে গেলে হতো না? অবস্থা কি খুবই সিরিয়াস? আগন্তুক লোকটি কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটি ঝুলিয়েই রেখেছে, না। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। তবে আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুকে যখন তখন পাওয়াও তো কঠিন।

লোকটির কথায় শচীন ডাক্তার খুশি হল। আবার মনে মনে এটাও ভাবল, লোকটি তাকে 'অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু' বলে ব্যঙ্গ করছে না তো? টেবিল মোছার কাপড় দিয়ে সে যখন নিজের নেমপ্লেটটি মুছছিল, লোকটি তখন আশেপাশে কোথাও ছিল নাকি? স্বচক্ষে সেই দৃশ্যটি দেখে, লোকটি কলবুকের নাম করে তার সঙ্গে তামাশা করতে আসেনি তো?

শচীন ডাক্তারের মনে হল লোকটিকে একটু বাজিয়ে দেখার দরকার। কারণ ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শুনেছে — অভদ্রা বর্ষাকাল/হরিণী চাটে বাঘের গাল। সময় মন্দ হলে হাজাপচা মানুষও টিকি ধরে নেড়ে দেবার সাহস দেখায়।

শচীন ডাক্তার 'হুম' করে আওয়াজ করল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলল, আসলে

হয়েছে কি আমার অ্যাটেনডান্ট মেয়েটি আজ আসেনি। চেম্বারে তালা ঝুলিয়ে গেলে, অন্য পেসেন্ট ভুল ভেবে ফিরে যেতে পারে।

— যাবেন আর আসবেন। লোকটি বলল, আপনার মতো অভিজ্ঞ ডাক্তারের তো আর হ্যান-ত্যান সাত সতেরো শোনার প্রয়োজন হবে না। নাড়ি টিপেই সব বুঝতে পারবেন।

শচীন ডাক্তার টেরাচোখে দেখে নিয়েছে দ্বিতীয়বার 'অভিজ্ঞ' বলার সময়ে চোখমুখে যেন একটু সশ্রদ্ধ ভাবের ছায়া দুলে গেল। শচীন ডাক্তার উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। স্টেথোটি গলায় ঝুলিয়ে চামড়ার ছোট ব্যাগটি হাতে নিয়ে বলল, চলুন। কোথায় যেন বললেন।

— কাছেই। লোকটি হেসে বলল। তারপর হাতের ইশারায় একজন রিক্সাওলাকে ডাকল, গাড়িটা নিয়ে এদিকপানে আয় বাপ।

রাস্তার অপর পার থেকে একটি রিক্সা 'রোককে-রোককে' করতে করতে চেম্বারের সামনেটিতে এসে, গলার গামছটা দিয়ে সিটটা মুছে দিল, নমস্কার ডাক্তারবাবু। বসুন। শচীন ডাক্তার রিক্সা চড়ে কদাচিৎ। আগেও রোগীর বাড়িতে যেতে হলে সাইকেলে চড়ে যেত। পিছনের ক্যারিয়ারে ওষুধের বাক্সটি আটকে নিতো। ইদানীং রুগীই নেই। কতদিন পরে যে আজ কলবুক করে একজন রোগী দেখতে চলেছে! রিক্সাওলাটির মুখ শচীন ডাক্তার চেনে। নাম ধাম জানে না। আশপাশের লোকজন তার এই সম্মানীয় যাত্রাটুকু দেখছে কিনা, এটা দেখার জন্যই শচীন ডাক্তার ধীরে সুস্থে রিক্সায় উঠল। তারপর বেশ উঁচু গলায় পাশের সরকার বুকস্টলের ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, মানিক, জুরুরী একটা কলে যেতে হচ্ছে। চেম্বার খোলা রইল। পেশেন্ট এলে বসতে বলিস।

মানিক মুখের কথা নষ্ট করল না। ঘাড় নাড়ল শুধু।

আজ ছুটির দিন নয়। তবুও রাস্তায় মানুষের বেশ ভিড়। আজকাল স্কুল কলেজের মেয়েরাও যায় সাইকেল চড়ে। মোড় ঘোরার আগে ঠিকমত হাত দেখায় না। যখন তখন ঝুপঝাপ নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। পিছনে লরী কিম্বা বাস থাকলে লোকজন হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে ওঠে। গত বছর স্টেশন রোডে বাসের তলায় একটি কিশোরী সাইকেল সমেত চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছিল। তা নিয়ে পথ অবরোধ হল। থানা ঘেরাও হল। সপ্তা দুয়েকের জন্য একজন ট্রাফিক পুলিশও দেওয়া হল রেল গেটের মোড়ে। তারপর আবার যথারীতি আগের মতোই ট্রাফিক পুলিশ উধাও। সাইকেল রিক্সা, ভ্যানরিক্সা, বাস, লরির একটা কিম্ভূতাকার জটলা। তার ওপর টেলিফোনের লোকজন রাস্তা খুঁড়ে বিপদজনক গর্তগুলি ঠিকমত না বুজিয়েই ওয়ার্ক কমপ্লিট রিপোর্ট জমা করে দিয়েছে। একে মা মনসা,

তায় ধুনোর গন্ধ। পুরনো আমলের সরু রাস্তা। তার একদিকে মিলিটারী ট্রেঞ্চের মতো লম্বা গর্ত, অন্যদিকের গুমটি ঘরগুলো এক্কা দোক্কা খেলার মতো এক পা দু পা করে এগিয়ে আসতে আসতে রাস্তার অনেকখানি খেয়ে বসে আছে।

— ব্রিটিশ পিরিয়ড হলে এইসব হারামজাদাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দিত। শচীন ডাক্তার হঠাৎই বলে উঠল তার পাশে বসে থাকা লোকটির উদ্দেশে, ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই।

— তাই তো দেখছি। লোকটি জবাব দিল, এবার সব কিছুই কেমন বদলে গেছে মনে হচ্ছে। শচীন ডাক্তার ঘাড় ফিরিয়ে লোকটির মুখের দিকে চাইল, এবার মানে? আপনি এখানকার লোক নন বুঝি?

— না, মানে ...! লোকটি হেঁ হেঁ করে হাসল, পায়ের তলায় সরষে কিনা, কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছি। একটু থেমে বলল, সে আজ কত বছর হয়ে গেল!

ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়ে রিক্সাওয়ালা বিরামহীন হর্ণ টিপেই চলেছে। প্যাঁ প্যাঁ করে। ফাঁকফোঁকর দিয়ে যে যেমনভাবে পারছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিশোরীলালের সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক কচকচ করে পান চিবোচ্ছে আর থুক থুক করে পানের পিক ফেলছে। বুড়োর পান-বিড়ির গুমটিতে বসে তিনটি লোক প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক টুকরো কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রিক্সায় বসে শচীন ডাক্তার দেখছে তিনটি দেহ। আলাদা আলাদা পোশাক পরনে। কিন্তু তাদের মাথাগুলি এমন ঘেঁষাঘেঁষি, ঠিক যেন বড় মাপের দৈত্যাকৃতি একটি মাথা। শচীন ডাক্তার জানে লোক তিনটি একটি নিষিদ্ধ জুয়ার ব্যাপারে কথা চালাচালি করছে। নামটাও শুনেছিল 'স্যাটাস' না 'স্যাট্যা' কি যেন!

পথের করুণ অবস্থা, বিশৃঙ্খল মানুষেব বেপরোয়া পথচলা, পুলিশি অপদার্থতা, সর্বোপরি দিনদুপুরে সবার সামনে প্রকাশ্যে জুয়ার রমরমা ব্যবসা, এসব দেখে শচীন ডাক্তারের মন খারাপ হয়ে গেল। দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে, এটা সে জানে। কিন্তু চেম্বারের মধ্যে বসে থাকে বলে সমস্ত অব্যবস্থা এবং ক্ষতগুলিকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ পায় না।

শচীন ডাক্তার নিজেকে কখনই সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় ভাবে না। কিন্তু অব্যবস্থা, বেনিয়ম এবং যে কোন ধরণের নীচতা তাকে কষ্ট দেয়। ভাবায়। তার নিজের ক্ষমতায় কতদূর এগনো যায়, কতটুকু কাজ হতে পারে, এ সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তবুও এক এক সময় হয় না, অতি ক্ষীণ, দুর্বল জীবও তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়! শচীন ডাক্তার পড়াশুনা শিখেছে এবং পেশায় ডাক্তার হলে হবে কি, অর্থনৈতিক

স্তরভেদে তার অবস্থান মধ্যবিত্তের সারণিতে। অর্থাৎ দয়া-মায়া, স্নেহ, ন্যায়-অন্যায়বোধ, অনুশোচনা, এসব যেমন আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তি, চাটুকারিতা, খোশামোদ-লোভ এবং অন্তঃসারশূন্য গর্জন, এগুলিও আছে। এসব ক্ষেত্রে শচীন ডাক্তার তার তীব্র অসন্তোষের মোকাবিলা করার জন্য বিখ্যাত কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের রেফারেন্স টানে। যেমন নিশ্চল রিক্সায় বসে কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে একসময় সে এতটাই অধৈর্য হয়ে পড়ল যে পাশে বসা অচেনা লোকটি যেন তার কতদিনের পরিচিত, কত ঘটনার সাক্ষী, এমনি আগ্রহে খপ করে তার হাতটি ধরে বলল, মনে হয় কি জানেন, এই অকালকুষ্মাণ্ডগুলোকে চাবকে সোজা করে দিই। শায়েস্তা খাঁ কিম্বা লর্ড কার্জনের মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দরকার। লোকটি এ কথার কোন জবাব দিল না। নির্লিপ্তের মতো মুখ করে শচীন ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল। লোকটির এই মৌনতা শচীন ডাক্তারকে আরও দু কদম এগিয়ে দিল, চলুন নেমে পড়ি। বলে সে সত্যি সত্যি রিক্সা থেকে নেমে পড়ল। লোকটি শশব্যস্ত হয়ে পড়ল, আরে করছেন কী? এ তো রোজের ব্যাপার। আপনি ডাক্তার মানুষ, হেঁটে যাবেন? লোকটি এমনভাবে জিভ কাটল, যেন সে-ই কোন অপরাধ করেছে, আশপাশের লোক দেখলে ভাববে কি? আমার কথা বাদ দিন, আপনার তো একটা আলাদা মানসম্মান আছে।

লোকটি বলার ভঙ্গীমার জন্যই বোধহয় শচীন ডাক্তারের রাগ ক্ষোভ সব কর্পূরের মতো উবে গেল। সে আবার রিক্সায় উঠে বসল, আমরা হলাম গে ব্রিটিশ পিরিয়ডের লোক। যে কাজে বেরিয়েছি, সেটা না করে ফিরছি না। কথা ইজ কথা। কাজে ফাঁকি কি জিনিস শিখিনি। আর ভয়ডর! বলে ছোটো করে হাসল, ফুঃ।

শচীন ডাক্তার ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগটুকু দেখেছে। ব্রিটিশের অত্যাচার, সন্ত্রাস এসব বিষয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভই তার কোনদিন ছিল না। আজও নেই। বরং সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, ব্রিটিশের আরও কিছুদিন এ দেশে থাকার দরকার ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষগুলি দেশের নেতৃত্বে এসেছে, সেগুলি কেবল মিথ্যাবাদী অসৎ লোভী এবং কপট নয়, সর্বঅর্থে অপদার্থ। বিসমিল্লায় গলদ নিয়ে তো আর দেশ গড়ে তোলা যায় না। যে ঘরের খোদ খুঁটিগুলিই পলকা ঘুণধরা, সে ঘরের চালা পড়বেই। কারোর বাপের সাধ্যি নেই, চরম সর্বনাশের পথ থেকে দেশকে বাঁচায়। ক্ষীর ননী মাখন দেশনেতারা খাবে, আর বাকীরা আমড়ার আঁটি চুষবে, দীর্ঘদিন ধরে এমনটা চলতে পারে না।

খোলা মনে বিচার করলে শচীন ডাক্তারের অভিমতের কেউ বিরোধিতা করবে না।

কিন্তু যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতার কাছে যাও, যুক্তি, পরিসংখ্যান, তুলনামূলক বিচার ইত্যাদিতে তোমার ভাবনা চিন্তার খোলনলচে বদলে দেবে। তার তা না হলে তোমাকে দেশদ্রোহী অ্যাখ্যা দেবে। তার চেয়ে চুপচাপ থাকা ভাল। ভাল মানুষের দেখা পেলে, তবেই দু'চারটি মন্তব্য করে। এই আজ যেমন ক্ষোভের উদগীরণ আপনি বেরিয়ে এলে পাশের লোকটিকে দেখে। লোকটি তার একটি কথারও বিরোধীতা করল না। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কথার বিপক্ষে তর্কের কোন অবকাশই তৈরী করল না।

শচীন ডাক্তার খুশি হল মনে মনে। লোকটি কেবল দেখতেই সুশ্রী নয়, যে কোন ব্যাপার বোঝার মতো মনের মাটিটিও তৈরী। মূর্খের মতো তর্ক করে, সত্যিকে মিথ্যে বলে প্রমাণের চেষ্টা করে না।

এমন লোককেই না যথার্থ ভদ্রলোক বলে। শচীন ডাক্তার নিজের মনেই বলল, যা লোকটি গায়ে গা লাগিয়ে বসেও শুনতে পেল না, কারট্সি জ্ঞান কত। ঘরে ঢোকার আগে বিনীত অনুমতি চাইল। কত নরম করে বলল, আপনার মতো অভিজ্ঞ ডাক্তার নাড়ি টিপেই সব বুঝতে পারেন।

ভিড় জটলা বিশৃঙ্খলা, এমনকি কুলকুলে ঘাম, নাকের মধ্যে ধুলো ঢোকার অস্বস্তি, শচীন ডাক্তার সব ভুলে গেল। নরম করে জিজ্ঞেস করল, আর কতদূর? লোকটি হেসে সামনে হাত বাড়িয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রিক্সাওলাটি ফস করে বলে বসল, পেরায় এসে গেছি। নাক টেনে কিছু বুঝতে পারছেন না? শচীন ডাক্তার ঘাবড়ে গেল। ভারি অদ্ভুত জবাব তো! রোগীর গন্ধ বাতাসে ওড়ে নাকি? আগন্তুক লোকটি রিক্সাওলার পিঠে আস্তো করে থাপ্পড় মেরে, শচীন ডাক্তারকে দ্বিতীয় ধন্দে ডোবাল, ডাক্তারবাবু জানবেন কেমন করে, রুগীর মনে গামছা নেঙরাচ্ছে কিনা! আগে দুজনকে মুখোমুখি হতে দাও।

দু নম্বর রেলগেট পেরিয়ে মিশিরজির চায়ের দোকানের সামনে রিক্সা থামল। বাতাসে নাক টেনেই শচীন ডাক্তারের মনে হল, এলাকাটা ভাল নয়। রিক্সাওলা কপালের ঘাম মুচছে গামছা দিয়ে। আগন্তুক লোকটি ততক্ষণে রিক্সা থেকে নেমে শচীন ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আসুন ডাক্তারবাবু। শচীন ডাক্তার শহরের পুরোনো বাসিন্দা হলেও এ অঞ্চলে আগে কোনদিন আসেনি। চারপাশে তাকিয়ে গৃহস্থের বাড়িঘর বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুই তার চোখে পড়ল না। কয়েকটি গুমটি দোকানঘর। দোকানঘরের লাগোয়া টালির নীচু ছাদ একটি দুটি ঘর। তার মানে এই ঘরগুলির হতদরিদ্র বাসিন্দাদের মধ্যেই

কেউ একজন রুগী। কিন্তু তাকে ডেকে নিয়ে এল যে লোকটি, তার পোশাক, কথাবার্তা, আচার আচরণ দেখে এই ঝুপরি ঘরগুলির বাসিন্দা বলে মনে হয় না। তবে কি লোকটি এদের কারোর নিকট আত্মীয় ? নাকি সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, এমন কেউ ? কত মানুষ-ই তো আছে গোপনে বৃহৎ কর্ম করে চলেছে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে আত্মপ্রচারের আড়ালেই থাকতে চায়। গোপনে কাজ করেই তৃপ্তি পায়।

শচীন ডাক্তারের মনে অনেকগুলি বিপরীতমুখী প্রশ্ন এসে ভিড় করল।

শচীন ডাক্তার রিক্সার সিটে চুপ করে বসে আছে দেখে, লোকটি আবার ডাকল, কী হল ? আসুন ডাক্তারবাবু। শচীন ডাক্তারের হঠাৎ করে মনে পড়ল, ডাক্তারের প্রথম ও প্রধান কাজই হল সেবা। রুগী, সে চোর ডাকাত দালাল বেশ্যা যাই হোক না কেন, ডাক্তারের কাছে আসে যখন, তখন তার একটিই পরিচয়, সে রুগী। রুগীর চিকিৎসা করাই ডাক্তারের প্রধান ধর্ম। রুগী মানে সে করুণাপ্রার্থী নয়। সে সহযোগিতা চায় মাত্র। বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ নীলরতন কুন্ডু, শচীন ডাক্তারদের মতো একদল শিক্ষার্থীকে প্রায়ই বলতেন, বি এ গুড ম্যান ফার্স্টলি। দেন এ গুড ডক্টর। ডাক্তারের কাছে জাতপাত, ধনী দরিদ্র এগুলি বাছবিচার করা, অধীত বিদ্যার প্রতি অসম্মান করা। হোয়্যার দি সানলাইট ডাস নট এন্টার, দি ডক্টর মাস্ট।

ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়তেই শচীন ডাক্তার শরীরের মধ্যে অদ্ভুত ঝাঁকুনি বোধ করল। সে টপ করে রিক্সা থেকে নেমে বলল, চলুন কোনদিকে ?

— এই এদিকে। লোকটি শচীন ডাক্তারের বাঁ হাতটি ধরল, একটু সাবধানে আসবেন। অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, রাস্তাটা খুব সরু। তার ওপর ভোর রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিনা।

— ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। শচীন ডাক্তার নিজেও একটু হাসার চেষ্টা করল, সবরকম পরিবেশেই আমার যাওয়ার অভ্যাস আছে।

— তা তো ঠিক। লোকটি এবার বেশ উঁচু গলায় বলল; শহরে এতজন ডাক্তারবাবু আছেন জেনেও, আপনার কাছে ছুটে এসেছি। একটু থেমে বলল, ডাক্তারি আর ছুতোরগিরি তো এক নয়। ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার মানুষটিকেও তো সজ্জন হৃদয়বান হতে হবে। তবেই তো ডাক্তার ঈশ্বরের দূত।

সাবধানে পা ফেলে দুজনে আগে পিছু হাঁটছে। লোকটির কথাবার্তায় মার্জিতের ছাপ আছে। শচীন ডাক্তার পুলকিত বোধ করল। তবে ছুতোরের সঙ্গে ডাক্তারের তুলনাটা কানে লাগল। তা হোক, ছুতোরের পরে পরেই 'ঈশ্বরের দূত' কথাটাও বলেছে। ডাক্তারি

জীবনে এত বড় কথা শোনেনি শচীন ডাক্তার। ক'জনেরই বা এমন সৌভাগ্য হয়! এটা ঠিক, অনেক মতলববাজ লোকও আছে, যারা কথার কারুকার্যে অন্যকে সম্মোহিত করতে পারে এবং ওই কথার অলংকারটুকু বাদ দিলে, বাকি আর সব ব্যাপারেই লোকগুলি ধুরন্ধর, মিথ্যেবাদী এবং ন্যায্য পাওনাটুকু দেওয়ার ক্ষেত্রেও ধানাইপানাই করে। শচীন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা তো কম নয়। কম রকমের মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। ভাল আছে। ভালর বেশধারী মন্দও আছে। আবার এর উল্টোটাও আছে। ওপরে রুক্ষ ভেতরে জল টলটল করছে। এমন মানুষের দেখাও মিলেছে।

তবে শচীন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা বলছে, আজকের লোকটি মুখোশধারী ভদ্র নয়। তাহলে তার অভিজ্ঞ চোখে এতক্ষণে তা ঠিক ধরা পড়ে যেত। জীবনে দুচারবার ঠকেনি যে এমন তো নয়। ঠকেছে বলেই সত্যিমিথ্যের ভানটুকু চিনতে শিখেছে। আর সত্যি তো, চেম্বারে বসে পুরোনো খবরের কাগজ পড়া বা হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাওয়া ছাড়া যে ডাক্তারের আর কোন কাজ নেই, খুঁজে খুঁজে তাকেই যখন ডেকে নিয়ে আসে কেউ, বুঝতে হবে সে লোক খাঁটি জিনিসের খবর রাখে। ভালর কদর করতে জানে। পাকা গৃহিণী এক হাঁড়ি চালের একটি টিপে বুঝতে পারে, ভাত হয়েছে কিনা! শচীন ডাক্তারের জাজমেন্টে কোন ভুল নেই। এমন ভদ্র আর নম্র আচরণ যার, চোখে পড়ার মতো সামান্য বেচাল নেই একটুও, সে কোনমতেই ঠক, প্রতারক হতে পারে না। শচীন ডাক্তার তার পেশাগত কারণেই সংস্কার আবদ্ধ মানুষ নয়। সে নাস্তিক নয়। আবার পুরোপুরি আস্তিকও নয়। যে কোন ভাল কাজের পিছনেই ঈশ্বরের আনুকূল্য আছে এমন সে বিশ্বাস করে না। মানুষ বড় হয় তার কর্ম দ্বারা। পূজিত হয় তার সুকর্মের জন্য। চাটুকার ছাড়া মূর্খকে কেউ পণ্ডিত বলে না। এ লোকটি তাকে ঈশ্বরের দূতের সঙ্গে তুলনা করল। হয়ত একটু বাড়িয়েই বলেছে। তবে এটাও তো ঠিক, মুমূর্ষুকে চিকিৎসার দ্বারা জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে, একমাত্র ডাক্তারই।

'সেক্ষেত্রে' — নিজের মনেই ঠোঁট বন্ধ করে হাসল শচীন ডাক্তার। লোকটির কথাটি একেবারে ফেলনা নয়। 'ঈশ্বরের দূত' না হোক, জীবনদায়ী ডাক্তার 'প্রাণের দূত' তো বটে। এই বুঝি যায় যায় ভেবে সবাই যখন বলছে কানের কাছে মুখ নিয়ে হরিনাম কর, তখন ডাক্তার সবাইকে ঠেলে সরিয়ে কানে হরিনামের পরিবর্তে মুখে দু'চার ফোঁটা ওষুধ দেওয়া মাত্রই রুগীর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হচ্ছে, কিছু পরে চোখ মেলে চাইছে, ইশারায় প্রিয়জনকে কাছে ডাকছে, এমন ঘটনা তার নিজের জীবনেই ঘটেছে। শচীন ডাক্তারের মনে হল আগন্তুক লোকটি এই ঘটনাটির সাক্ষী ছিল হয়ত বা শুনেছে কারোর মুখে। আর সেই বিশ্বাসেই, শহরে এত ডাক্তার থাকতে ছুটে তার কাছেই এসেছে।

সংস্কার অবিশ্বাসী শচীন ডাক্তারের হঠাৎ করে মনে হল, আজ কি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার ডান চোখের পাতা নেচেছিল তড়াক তড়াক করে বা মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছিল সবুজ একঝাঁক টিয়া, দরজার হুড়কো খুলতে গিয়ে ঝপ করে টিকটিকি পড়েছিল কি দেহের বাঁ অংশে বা আজ দিনের শুরুতে যার মুখ দেখেছিল সে কোন বৃহন্নলা! মেঘ না চাইতেই যদি বৃষ্টি নামে, তখন অতি বড় যুক্তিবাদী বাস্তববিশ্বাসী মানুষও তার সঠিক কারণ হাতড়াতে হাতড়াতে একসময় প্রচলিত ধারণাকেই লজিক বলে মনে করে।

শচীন ডাক্তারের ক্ষেত্রেও তাই হল। সে তার সামনে সামনে চলা লোকটিকে দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল, মহাশয় কি ঈশ্বরবিশ্বাসী?

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত গলায় বলল, কেন বলুন তো?

— না, মানে! শচীন ডাক্তারের গলায় সামান্য জড়তা, অসুখ বিসুখ হলে অনেকে তো ডাক্তারের কাছে না গিয়ে, জলপড়া মাদুলি কবচ তারপর আপনার গিয়ে মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়া ...!

— প্রয়োজনে সবকিছুই করতে হয়। লোকটি শচীন ডাক্তারকে মাঝপথে থামিয়ে দিল, কোথায় যেতে হবে সে নির্দেশ তিনিই দেন। মা জানেন, কোন ছেলের পেটে কোনটি সয়। মন্দিরে যাব নাকি ডাক্তার কোবরেজ হেকিমের কাছে যাব, মনপ্রাণ দিয়ে ডাকলে, তিনিই সব বলে দেন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে লোকটি শচীন ডাক্তারের হাত থেকে ওষুধের বাক্সটি নিজের হাতে নিয়ে আস্তে করে বলল, আসুন। তবে মাথাটা একটু নামিয়ে নেবেন। দরজাটা নীচু কিনা।

লোকটির কথা বলার ধরণেই হোক বা যে কথাগুলি বলল, তার রেশ পুরোপুরি না কাটার জন্যই হোক, শচীন ডাক্তার কেমন ঘোরলাগা মানুষের মতো লোকটিকে অনুসরণ করে তার কথামত মাথাটি নামিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের মধ্যেটা কেমন আবছা অন্ধকার। ঘরের বাতাসে হালকা কটু গন্ধ ভাসছে। আশ্চর্য, শচীন ডাক্তারের চোখে ঘরটির বিবস্ত্র চেহারা বেমানান ঠেকল না। এমনকি কটু গন্ধটুকুও নাকে লাগল না। লোকটি একটি পুরোনো কাঠের চেয়ার এগিয়ে নিয়ে এল, বসুন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শচীন ডাক্তার চেয়ারে বসল। লোকটি ওষুধের বাক্সটি ছোট একটি চায়ের পেটি ধরনের বাক্সের ওপরে রেখে 'যে আজ্ঞে জাঁহাপনা' ঠিক এইরকম ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে ডানহাতটি কপালের কাছ বরাবর তুলে বিনীত গলায় বলল, রুগীকে ডাকি তাহলে?

শচীন ডাক্তারের গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। কোনরকমে ঘাড় নেড়ে সে

তার সম্মতি জানাল। লোকটি তখন বেশ সুরেলা গলায় ডাকল, একবার এসো এখানে। দেখো কে এসেছেন?

শচীন ডাক্তারের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ডাক্তারি জীবনে এমন অবিশ্বাস, চমকে ওঠার মতো ঘটনা যে ঘটতে পারে, সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। ঘন নীল আকাশের বুক চিরে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলেও মানুষ বুঝি এর চেয়ে কম চমকে ওঠে। ভাগ্যিস চেয়ারে বসেছিল। তা না হলে হয়ত পড়েই যেত। স্রেফ একটি পাতলা শাড়ি এবং টানটান ব্লাউজ পরনে, শাণিত ছুরির মতো মেদহীন ঋজু একটি নারী যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল এমন আচম্বিতে শচীন ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে দু চোখ বড় বড় করে প্রথমে বলল, আপ? তারপর চক্ষের নিমেষে ঘরের মেঝেতে ঝপ করে বসে পড়ে অবলীলায় ডানহাতটি শচীন ডাক্তারের কোলে ফেলে দিয়ে আদুরে আব্দারে গলায় বলল, দেখুন না ডাগদারবাবু, বহুত বিমার। মন ভাল নেই। একটু থেমে বলল, দাওয়াই বাতলান।

শচীন ডাক্তারের অনভ্যস্ত ভীরু চোখ তখন দেখছে রোগিনীর কোমরে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো দুটি তিনটি ঢেউ। ব্লাউজ ফুঁড়ে বুকের ওঠানামাটুকুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ানোর জন্যই দুষ্টু চঞ্চল কিশোরীর মতো, দেখলেই ভাল লাগে, এমন দেখাচ্ছে মুখের আদল। শচীন ডাক্তার এ রোগিনীকে আগে কোনদিনই দেখেনি। তবে এর ওর তার মুখে গল্প শুনেছে অনেক। চাক্ষুষ দেখছে আজই প্রথম। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। গল্প যা শুনেছে, বাস্তবের সিকিমাত্র তা। গল্পের চেয়েও অনেক রহস্যময়ী দুর্ভেদ্য এ নারী। অনিবার্য এর আকর্ষণ।

শচীন ডাক্তার খুব আস্তো করে রোগিনীর নাড়ি টিপে ধরল। দু চোখ বন্ধ করে স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। অনুভূতিতে ধরা পড়ছে না কিছুই। বন্ধ দু চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না। যদি চোখ খুললেই আরও কিছু চোখে পড়ে। শচীন ডাক্তার গৃহী মানুষ। দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছে চল্লিশ বছরের ওপর। নারী দেহের রহস্য তার অজানা নয়। তার কোন চারিত্রিক দুর্নাম নেই। সুতরাং চিত্তবৈকল্যের কোন কারণ থাকতে পারে না। তবু তার মনে হচ্ছে, আজকের অভিজ্ঞতাটি তার জীবনে শুধু অভিনব নয়। সম্পূর্ণ নতুন এবং আমৃত্যু স্মৃতিবহ।

শচীন ডাক্তারের মেজাজমর্জির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা শুনলে চমকে উঠবে যে এমন পরিবেশে অমন একজন নারীর সান্নিধ্য শচীন ডাক্তার কিন্তু বেশ উপভোগ করেছে! রাগ নয়, বিদ্বেষ নয়, আগন্তুক লোকটি যে কলবুক করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তার প্রতি সামান্য ক্ষোভও সৃষ্টি হল না শচীন ডাক্তারের মনে। মুহূর্তের জন্যও লোকটিকে তার

মুখোশধারী মিথ্যুক, প্রতারক বলে মনে হল না। দু চোখ বন্ধ অবস্থাতেই শচীন ডাক্তার রোগিনী না লোকটি কার উদ্দেশে যে বলল, কে জানে, শরীর থাকলেই রোগভোগ জ্বালা যন্ত্রণা এসব থাকবেই। আর এসবের মোকাবিলা করার জন্যই তো ডাক্তার।

— ঠিকই বলেছেন। লোকটি জবাব দিল, শরীর হল গিয়ে আকাশের মতো। কোথাও কিছু নেই, কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। চাঁদ তারা সব ঢাকা পড়ে গেল। আবার যেই জোরে বাতাস বইতে শুরু করল, বাতাসের দাপটে মেঘ উড়ে গিয়ে তারা ভরা আকাশ বেরিয়ে পড়ল। একটু হেসে বলল, আপনারা ডাক্তারবাবুরা হলেন গিয়ে দমকা বাতাস।

শচীন ডাক্তার বন্ধ দু চোখ খুলল। উত্তরদাতা যে তারই মুখের ওপর নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে, এটা দেখে তার ভাল লাগল। আগে আগে যে সমস্ত রুগীরা তার চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, তারা সকলেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে। দু চারজন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও, এখনও বিজয়া দশমীতে শচীন ডাক্তারের দীর্ঘায়ু কামনা করে চিঠি পাঠায়। মাত্র কয়েকমাস আগেই অল্পবয়সী একটি মেয়ে আবেগের শিশি উজাড় করে শচীন ডাক্তারকে চিঠি দিয়েছিল। চিঠির শরীরে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দও ছিল। চিঠিটি দু তিনবার পড়ার পর, একবার ভেবেছিল ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুকে দেখাবে। তাকে উদ্দেশ্য করে কোন যুবতী যে এমন রসঘন চিঠি পাঠাতে পারে, না দেখালে কে-ই বা বিশ্বাস করবে। তারপর আজ কাল করতে করতে চিঠিটির কথা ভুলেই গেছে। ফেলে দিয়েছে নাকি বইপত্রের খাঁজে বা অন্য কোথাও গুঁজে রেখেছে, নিজেরই আর মনে নেই।

মনের গতিবিধি বোঝা বড় ভার। মন তো মুহূর্তের দাস মাত্র। সারা জীবন যার ছোঁয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা, কখন যে সেই ব্রাত্য অস্পৃশ্য বস্তুটি আকস্মিক একটি ঘটনাকে ভর করে এসে, একরকম ঘাড় ধরে তার বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেবে, কে বলতে পারে! শচীন ডাক্তার কি নিজেই কোনদিন ভেবেছিল যে রুগী দেখতে এসে সে নিজেই রুগী হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ পথ চিনিয়ে তাকে চেম্বারে পৌঁছে না দিয়ে আসে, সে হয়ত আনমনার মতো চেনাপথেই ঘুরপাক খাবে। কেন সে এসেছিল, কীভাবে এসেছিল, বা এসে তার নিজের কী বিপর্যয় ঘটল, হাজার জন হাজার ভাবে জিজ্ঞেস করলেও সে প্রত্যেককে একইরকম উত্তর দিতে পারবে না। তার কথা জড়িয়ে যাবে। বাক্য অসংলগ্ন হয়ে পড়বে। এমন তো নয়, শচীন ডাক্তারকে আজই প্রথম কলবুক করে নিয়ে এল কেউ। বাড়িতে ডাকার মতো অর্থনৈতিক সঙ্গতি নেই, এমন অনেকের বাড়ি সে নিজে থেকেই চলে গেছে। বাড়ির লোককে ধমকেছে। ফিজ তো নেয়নি, উল্টে পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছে। প্রয়োজনে নিজে দুবার তিনবার এসে রোগীকে দেখে গেছে। দীর্ঘ ডাক্তারী জীবনে

রোগিনীও তো কম দেখা হল না। শচীন ডাক্তার বুঝতে পারত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্যারাবাঁকা কথা বলে বা হাসি হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে থেকে অন্য কিছু বলতে চেয়েছে, শচীন ডাক্তার সেসবকে মোটে পাত্তা দেয়নি। ডাক্তারির স্বার্থে রুগীর শরীর ছুঁয়ে যেটুকু দেখা আবশিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তার বাইরে এক পা'ও ফেলেনি। অতি বড় শত্রুও এ ব্যাপারে শচীন ডাক্তারের নামে দুর্নাম রটাতে একটি শব্দও খরচ করতে পারবে না।

কিন্তু আজ কী যে হল! যেন কত কী ভাবছে, এমনি গম্ভীরমুখে শচীন ডাক্তার বসেই রয়েছে। তার সামনে জলভর্তি দীঘির মত এক নারী। তার সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সুদেহী একজন পুরুষ। আর ঘরের দরজার বাইরে বসে মাঝে মাঝেই খক খক করে কেশে উঠছে রিক্সাওলাটি। পরিবেশগত উৎকর্ষতা নয়। দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হওয়ার মতো এখন তখন অবস্থাও নয় রোগিনীর। আবার এমনও নয় যে শচীন ডাক্তার বহুদিন বহু বছর পর নিতান্তই কাকতালীয় যোগাযোগে তার প্রিয় মানুষটিকে হঠাৎ করে খুঁজে পেয়ে বিস্ময় বিহ্বলে হতবাক হয়ে, নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেছে!

— কী হোবে ডাগদারবাবু? রোগিনীর এলিয়ে পড়া গলায় যেন সত্যি সত্যিই উদ্বেগ জড়ো হয়েছে। শচীন ডাক্তার এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল। তারপর অচৈতন্য মানুষ জ্ঞান ফিরে পেলে যেমন ধীর গলায় স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করে, ঠিক সেইভাবে থেমে থেমে বলল, কী হয়েছে যেন তোমার? কোথায় ব্যথা বলছিলে?

— সারে শরীরে দরদ। রোগিনী খিলখিল করে হেসে উঠল, মনে ভী দরদ। হাওয়া লেগেছে। আঙুল তুলে ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটিকে দেখিয়ে বলল, এ বাবুর হাওয়া। দিল বিগড়েছে।

শচীন ডাক্তার সাবধানে চেরা চোখে লোকটিকে দেখল। ভেতরের খুশির উচ্ছ্বাস যেন মুখে এসে জড়ো হয়েছে, এমনি পরিতৃপ্ত, সুখী সম্পূর্ণ চোখমুখ লোকটির। এবার লোকটি মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, আমি আবার তোমার মনে কী বাতাস দিলাম! একটু থেমে বলল, ছেলেমানুষী না করে, যা হয়েছে ডাক্তারবাবুকে খুলে বল না!

— ও হী তো বলছি। রোগিনী আবারও হাসল, মনে ভী দরদ লেগেছে। মন বলছে ছুট-ছুট লাগাই।

অন্য কোন পরিবেশে এ ধরণের কথাবার্তায় শচীন ডাক্তার অবশ্যই বিরক্ত বোধ করত। ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসে, তার সামনে যদি একজন পুরুষ এবং লাস্যময়ী একজন নারী 'মনের দরদ', 'হাওয়া লাগা'র মতো রসাল ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনা করত, তাতে অপমানিত বোধ করাও অসঙ্গত হোত না। কিন্তু শচীন ডাক্তার নিজেই বুঝতে

পারছে, ঘুপচি কম আলো বাতাস ভরা এই ঘরটায় যে ধরণের কথাবার্তা, যে ভঙ্গীতে বলা হচ্ছে, তা যেন ঘরটার পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে যথার্থ সঙ্গতের মতো শোনাচ্ছে। বরং এর উল্টোটা ঘটলে, সেটা তালবিহীন বেসুরো গানের মতো কানে লাগত।

এমনিতে শচীন ডাক্তার নিজে যে খুব রসপ্রিয় বা খেজুরে গল্পে মজা পাওয়ার মতো মানুষ, তা নয়। সামাজিক কোন সমস্যা, রাজনীতিকদের ভোলবদল, জিনিসপত্রের আকাল এবং উর্ধ্বগামী দাম, এসব নিয়ে আলোচনায় সে সত্যিকারের বিষয়বস্তু খুঁজে পায়। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অন্যের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্যে জয়ের আস্বাদ পায়। অপরের মান অভিমান উপভোগ করার মধ্যে কিছু কিছু মানুষ তৃপ্তি পায়। নষ্ট চরিত্রের মানুষের আলোচনায় মৌতাতের স্বাদ পায়। এইসব মানুষদের ওপর শচীন ডাক্তারের যথেষ্ট বীতরাগ ছিল। শচীন ডাক্তার কি ছাই নিজেই জানত, এই পরিণত বয়সেও তার নিজের মনের মধ্যেই রসের এমন চোরাস্রোত বইছে কুলুকুলু করে। দীর্ঘদিন অন্ধকার ঘরে বন্দী কোন মানুষকে হঠাৎ করে আলো হাওয়ার মধ্যে নিয়ে এলে সে যেমন অনাস্বাদিত আনন্দে বাতাস খামচে ধরতে যায়, চোখ বড় বড় করে আলো গিলতে থাকে, শচীন ডাক্তারের অবস্থাও রয়েছে সেইরকম। বিবাহিত জীবনের সূচনাতে শ্যালিকা বা শ্যালজের কান গরম হয়ে ওঠা জোলো রসিকতায় মনের মধ্যে যেমন চলকে উঠত, মাঝে মধ্যে দু চারটি ছোটখাট মন্তব্য প্রয়োগ করে যে ধরণের আনন্দ পাওয়া যেত, অবিকল চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের সেইরকম একটি রসঘন মুহূর্ত যেন, স্বাতী নক্ষত্র থেকে টুপ করে খসে পড়া এক ফোঁটা জলের মতো শচীন ডাক্তারের মনের ভেতরে যে মন, তার ওপর এসে পড়েছে। মনের মুক্তোটি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শচীন ডাক্তার ঘাড় দুলিয়ে অল্প একটু হাসল প্রথমে। তারপর বেশ খেলিয়ে কথাগুলিকে ধীর লয়ে প্রকাশ করল এইভাবে, এ ঘরে রোগ বাসা বাঁধতে পারে না। একটু থেমে বলল, এ ঘর হোল মন-সারাইয়ের কারখানা।

— বা! বাঃ! ভাললাগার আনন্দে দু চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাল সুপুরুষ লোকটি, বড় রসিক মানুষ আপনি। একটু থেমে গাঢ় গলায় বলল, মন হল গিয়ে ধোপাখানার ভাঁটি। যে রঙে ছোপাবেন, সেই বর্ণটি পাবে।

— অতশত বুঝি না। শচীন ডাক্তার পুলকিত ভাবটা গোপন রাখার জন্য হাত নেড়ে সহজ গলায় বলল, যেমন মনে হল, তেমনটি বললাম।

— এই তো দরকার। সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল লোকটি, মন মুখ এক না হলে, সেখানে যে বড় ফাঁকি থেকে যায় ডাক্তারবাবু।

পোঁচের ওপর পোঁচ রং চড়ানোর মতো, প্রশংসার ওপর প্রশংসার প্রলেপ চড়ালে

অতি বড় নিরহংকারী মানুষও খুশি হয়। বেশী কথা না বলে চুপচাপ থেকে তারিয়ে তারিয়ে ভাললাগার স্বাদটুকু উপভোগ করল শচীন ডাক্তার।

— ডাক্তারবাবু? লোকটি ডাকল, কিছু বলুন।

শচীন ডাক্তার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রায় মুখের হাসিতে এমন একটা ভঙ্গী করল, যার অর্থ দাঁড়ায়, কী আর বলব! সবই তো বলা হয়ে গেছে!

ওষুধের বাক্সটি খুলে চোখবুজে খুব অল্প সময়ের জন্য কী যেন ভাবল! তারপর ছোট ছোট সাদা গুলিভর্তি একটি শিশি লোকটির হাতে দিয়ে বলল, ল্যাচেসিস টু হাড্রেড। একদিন অন্তর দু বড়ি। খালি পেটে। ঘুম ভাল হবে। স্নায়ুর জড়তা কেটে যাবে।

যথার্থ ভদ্রলোক যেমন আচরণটি করে ঠিক সেইভাবে লোকটি পকেট থেকে টাকা বার করে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার ভিজিটটা!

— দিন গোটা কুড়ি টাকা। শচীন ডাক্তার নির্লিপ্ত গলায় বলল, আর রিক্সা ভাড়া!

— যে রিক্সায় এসেছেন, ওই আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবে। লোকটি দ্রুত জবাব দিল, ভাড়াপত্র দেওয়া আছে।

শচীন ডাক্তার চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েও, কি মনে হল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। রোগিনী মেঝে থেকে উঠে যে তার গা ঘেঁসেই দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি। ফলে খুব হালকাভাবে হলেও রোগিনীর বুকের ছোঁয়া লাগল, শচীন ডাক্তারের পিঠে। ঠিক লজ্জা নয়, একটু সংকুচিত বোধ করল ডাক্তার। অস্ফুটে ইস্! বলে রোগিনীর চোখের দিকে চেয়ে বলল, একবার হাঁ কর তো। ব্যাস ব্যাস। তারপর হাতের আঙুলের চাপে দু চোখ টেনে দেখল, ভাল। বেশ ভাল। ভয়ের কোন কারণ নেই।

— অনেক ধন্যবাদ। লোকটির গলায় গদ্গদভাব, ভোর রাত থেকে বলছে শরীর খারাপ। ভাল ডাক্তার ডাকো।

শচীন ডাক্তার বিজ্ঞের মতো ঘাড় দোলাল, যার মানে দাঁড়ায়, ভাল ডাক্তার বলতে যে এ শহরে সে-ই এক এবং অদ্বিতীয়, এ ব্যাপারে লোকটি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

মাথা নীচু করে ঘর ছেড়ে বাইরে এল শচীন ডাক্তার। ফটফটে রোদ। তার মনে হল আলো আঁধারি ঘরটা যেন অনেক মনোরম লাগছিল বাইরের তুলনায়। রোদটা যেমন চড়া, তেমনি তার তাত। এ বয়সে বেশী শীত বেশী গরম কোনটাই সহ্য হয় না। যেমন বেশী আলোতে স্পষ্ট দেখার পরিবর্তে, সব কিছু কেমন ধাঁধিয়ে যায়। এই এখন যেমন রিক্সাওলাটি তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা সত্ত্বেও শচীন ডাক্তার কাউকেই দেখতে পেল না। বলল, রিক্সাওলাটা গেল কোথায়?

— এই যে বাবু, আপনার পাশেই।

লোকটি দুই হাত জড়ো করে নমস্কার করল, প্রয়োজনে আবার আসবেন।

— অবশ্যই। বেশ জোরের সঙ্গেই বলল শচীন ডাক্তার, যা ওষুধ দিলাম, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। সামান্য ডিপ্রেসন আর তা থেকেই একটু অসংলগ্নতা। খুক খুক করে বার দুই কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল, ভয়ের কোন কারণ নেই। কেস যখন টেক আপ করেছি ...।

নীচু ছোট দরজাটি জুড়ে লোকটি। আর তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রোগিনী। সামান্য দূর থেকে হঠাৎ করে দেখলে কেউ ভাববে ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। একটা শরীরের সঙ্গে আর একটি শরীর যেন সেঁটে গিয়েছে।

শচীন ডাক্তারের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ সৃষ্টি হল এবং এটা যে এক ধরণের শূন্যতা বা হীনমন্যতার কারণেই এটাও সে বুঝতে পারল। সে আর পিছন ফিরে তাকাল না। অল্প দু চার পা এগিয়েছে যখন রিনরিনে সুরে একটি গলা বেজে উঠল, নমস্তে ডাগদারবাবু। আবার আসবেন।

ইচ্ছে থাকলেও প্রবল বিক্রমে নিজেকে সংযত করল শচীন ডাক্তার। পিছন ফিরে তাকাল না। এবার বেশ উঁচু গলায় পুরুষ কণ্ঠটি বলে উঠল, শ্রীময়ীর প্রণাম জানবেন ডাক্তারবাবু।

জেদী একগুঁয়ের মতো শচীন ডাক্তার এবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ঘাড় দুলিয়ে, হ্যাঁ, না, কিছুই বলল না। তার সামনে রিক্সাওলাটি হেঁটে যাচ্ছে। রিক্সাওলার হাতে ডাক্তারের ওষুধের বাক্স। শচীন ডাক্তার বেশ গম্ভীর গলায় ডাকল, একটু আস্তে চল। কী নাম তোমার?

— নয়নচাঁদ। চলতে চলতে জবাব দিল রিক্সাওলা। তারপর মুখ না ঘুরিয়ে হাতের ইশারায় পিছন পানে দেখাল, ওই নতুনবাবু আমায় ডাকে নয়ন বলে।

নয়

মাস পাঁচ ছয় হোল, বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরী বন্ধ। স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি, বিশ তিরিশজন শ্রমিক বন্ধ ফ্যাক্টরীর গেটের সামনে মাটিতে চট পেতে বসে আছে। মাথার ওপর পলিথিনের ছাউনি। বন্ধ কারখানাটি খোলার দাবীতে অসংখ্য পোস্টার, কারখানার দেওয়াল ভর্তি করে লাগানো। পোস্টারগুলি অপটু হাতে লেখা। বানান ভুল আছে। মনে হয় শাসক দলের অনুগত শ্রমিক সংগঠনটিই এখানে জোরদার। তাদের পতাকা কারখানার গেটে পাঁচিলে অস্থায়ী ছাউনির বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা। হাওয়ায় সেগুলি পতপত করে ওড়ে। প্রায় দিনই দেখি কেউ না কেউ মাউথপীস হাতে ঘাড় গলার শিরা ফুলিয়ে বক্তব্য রাখছে,

বন্ধ কারখানাটি খোলার দাবীতে। প্রথম প্রথম পথচলতি মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনত। ছোটখাট মন্তব্যও কানে আসত। হয়ত অনেকদিন ধরে একইরকম কথাবার্তা শুনতে শুনতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইদানীং অবস্থানরত কর্মীরা ছাড়া অন্য কোন লোক বক্তব্য শোনার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে না।

অলোকেশ বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরীর কর্মী। প্রতিদিন তাকে আমি বসে থাকতে দেখি। অলোকেশের দিদি আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। সেইসূত্রে ওকে আমি জানি। কারখানা বন্ধ হওয়ার বছর দুই আগে বিয়ে করেছে অলোকেশ। একটি বাচ্ছাও আছে। এখন ওর দিন চলছে কীভাবে, জানি না। আমাকে দেখতে পেলেই অলোকেশ হাত তোলে। ঘাড় কাত করে অল্প একটু হাসে। ওর দেখাদেখি চারপাশে যারা বসে থাকে, তারাও আমার দিকে তাকায়। এত জোড়া চোখ আমাকে দেখছে ভাবলেই কেমন আড়ষ্ট বোধ করি। জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। অলোকেশের কাছ থেকে তার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই শুনেছে, আমি একটি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পড়াই। এখন স্কুল টীচারের মাইনেপত্রও বেশ ভাল। এ ব্যাপারটা ওই লোকগুলিকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়। আমাকে দেখলে হয় তারা মুষড়ে পড়ে, তা না হলে মনে মনে গজরায়। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত কোন মানুষ, তার চেয়ে সঙ্গতিসম্পন্ন অন্য কোন মানুষকে শত্রু ছাড়া, কখনই বন্ধু বা সহমর্মী বলে ভাবতে পারে না।

প্রায়ই ভাবি অলোকেশকে আলাদাভাবে ডেকে জিজ্ঞাসা করব, ওদের লড়াইটা এখন কোন পর্যায়ে আছে বা আমার তরফ থেকে আমি ওদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি কিনা বা কীভাবে সেটা করা যেতে পারে! কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করি। হয়ত ঠিক সংকোচও নয়, নিজের মধ্যেই দ্বিধা তৈরী হয়। অয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা অলোকেশ জানে। ওর দিদির মুখ থেকে হয়ত একটু বেশীই জানে। সেইসব প্রসঙ্গ তুলে যদি দুম করে বলে বসে, লড়াইয়ে নামার মন্ত্রটা তো তোমরাই শিখিয়েছ, নীরুদি। এখন না হয় গায়ে নামাবলি জড়িয়ে দিব্যি ভোল পাল্টে ফেলেছ।

অলোকেশ হয়ত জানে আমি যেমন শিক্ষকতা করি, অয়নও তেমনি বাইরে কোন চাকরি করে। আজ না হোক, দু মাস দু বছর পরে আমরা সেটেল করব এবং তখন আমাদের দুজনার রোজগারে অলোকেশের চেয়ে আরামে থাকব। ভাল খাব। ঘুরব, বেড়াব।

আমি যদি অলোকেশকে বোঝাতে যাই যে জোর করে কাউকে লড়াইয়ের ময়দানে নামানো যায় না, এটা সম্পূর্ণভাবেই তার ভেতরের ইনস্টিংকট। পরিস্থিতির ডাকে সবাই যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাহলে তো কত সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। আর লড়াইয়ের

ময়দান ছেড়ে অনেকে চলে গেলেও, সবাই যায় না।

আমি জানি অলোকেশ আমার এইসব যুক্তি মানতে চাইবে না। বিশ্বাসই করবে না যে অয়ন বাইরে থেকে চাকরি করে না। এখনও লড়াই-ই করে। নিঃস্বার্থ লড়াই বলতে যা বোঝায়, তাই।

স্কুল থেকে ফেরার পথে আমার কোন তাড়া থাকে না। বাসে এলে, দুটো তো মাত্র স্টপেজ। কয়েক মিনিটেই বাড়ির গলির মুখে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমার অন্য সহকর্মীরা প্রয়োজনে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য রীতিমত দৌড়ঝাঁপ করে। কারণ বাড়ি ফিরেই তারা প্রাইভেট টিউশন করে। আমি এসবের কিছুই করি না। ফলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কোন ব্যাগ্রতা নেই আমার। আমি বেশ অলসভাবে, এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি। এতে কিছুটা সময় কেটে যায়। আবার অনেক সময় পুরনো বান্ধবী বা পরিচিত কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে, যতক্ষণ না সে বিরক্ত বোধ করে, আমি গল্প করি। স্কুলে বছরের পর বছর গতানুগতিক একই বিষয় পড়াতে পড়াতে আমার মধ্যে ক্লান্তি জমে উঠেছে। অন্য কোন বিষয়ের কথা অন্যভাবে বলতে পারলে, নিজেকে হালকা মনে হয়। স্বচ্ছন্দ লাগে।

একদম সামনাসামনি না গিয়ে খানিকটা দূর থেকে, দমকল অফিসের গেটের কাছে বা দু নম্বর বাস স্টপেজে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে, অলোকেশদের অবস্থানে প্রতিদিন যে বক্তব্য রাখা হয়, আমি তা শুনি। বক্তব্য শেষে চড়বড় শব্দে তালি পড়ে, মুহুর্মুহু শ্লোগান দেওয়া হয়। ইদানীং সাধারণ কিছু লোকজনকে লক্ষ্য করি, যারা তালির শব্দ বা শ্লোগান শুনে চোখমুখ বিকৃত করে ব্যঙ্গ করে। ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। যার মধ্যে কিছু অশ্লীল শব্দও থাকে। আমার কিন্তু খারাপ লাগে। খারাপ লাগে এই ভেবে যে, কাজবিহীন মানুষগুলি প্রত্যেকেই সংসারী। তাদের সংসারে বউ ছেলে মেয়ে, মা-বাবা, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই আছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে শুধুমাত্র দু বেলার আহার আর লজ্জা ঢাকার প্রয়োজনীয় পোশাকের সংস্থান করার মতো জমানো পুঁজিও এদের অনেকেরই নেই। তার ওপর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, অসুখবিসুখ এসবও আছে। সাধারণভাবে যে ধারণাটা চালু আছে যে, কারখানা বন্ধ হয় শ্রমিকদের অস্বাভাবিক চাহিদা এবং কাজ না করার প্রবণতার জন্য, ব্যাপারটা কিন্তু সর্বাংশে সত্যি নয়। মালিক অনেক হিসেব নিকেশ করে, ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে গোপন শলা পরামর্শ করে কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। চালু একটি কারখানা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে, শ্রমিকদের মতো মালিকও আতান্তরে পড়বে, তারও ব্যাপক ক্ষতি হবে, এমন ভাবনা একমাত্র নির্বোধরাই ভাবে।

আমি সরাসরি রাজনীতি করি না। তা সত্ত্বেও কী থেকে কী হয়, এটুকু বুঝতে পারি। আমি জানি মাসের পর মাস কোন কারখানা বন্ধ থাকলে, সেই কারখানার শ্রমিক আত্মহত্যা করে। বিকল্প রোজগারের জন্য এর ওর তার দোরে দোরে ঘোরে। কিন্তু লোকসানের তাড়নায় কারখানার মালিক আত্মহত্যা করেছে বা তার বাড়ির ছেলেমেয়ে প্রাইভেট কারের বদলে বাসে ট্রামে যাতায়াত করছে, এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

সাধারণ কর্মচারীদের জন্য আমার তাই সবসময়েই একটা ফেলো ফিলিংস আছে। আর কে বলতে পারে, আজ না হোক কাল বা পরশু, অলোকেশের মতো আমাকেও ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য অবস্থানে বসতে হবে না? লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে না? বিশেষত বিশ্বায়নের নাম করে, বিদেশী পুঁজির আগ্রাসন, খোলামেলা উদার অর্থনীতি এবং বেসরকারীকরণের ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে, তাতে যে কোন রকমের স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। নিশ্চয় অনিশ্চয়ে, সম্ভব অসম্ভবে পরিণত হতেই পারে যে কোন সময়ে।

বক্তৃতার পরিবর্তে আজ গান শোনা যাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে। তার মানে কোন গণ সংগঠনের পক্ষ থেকে অবস্থান ধর্মঘটীদের সমর্থন গান, পথনাটিকা এ সবের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে কোরাসে গণসংগীত গাইছে। মাঝবয়সী দুজন লোক, একজন দড়ির ফাঁসে একটি ঢোল গলায় ঝুলিয়ে, অন্যজন খঞ্জনী হাতে গাইয়েদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছে। সুরের অভাব রয়েছে ছেলে দুটির গলায়। চড়ায় উঠলে মেয়েটির গলাও কেমন খ্যানখেনে শোনাচ্ছে। কিন্তু ঢোল খঞ্জনী সব মিলিয়ে ব্যাপারটা জমে গেছে। আজ বেশ ভিড়ও হয়েছে। অন্যদিনের মতো দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে, আমি কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম, এবং এর ওর মাথা টপকে ভেতর পানে উঁকি দিলাম। গাইয়েদের সম্মানার্থে কিনা জানি না, ধর্মঘটী শ্রমিকরা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু তালি দিয়ে গানের ছন্দ মেলাবার চেষ্টা করছে। ইদানীং এমন দৃশ্য কম দেখা যায়। কিন্তু সত্তর বাহাত্তর পঁচাত্তরে যে কোন বামপন্থী সভাসমিতিতে এই ধরণের গণসংগীত মাস্ট ছিল। অয়নের সঙ্গে আমি এই ধরণের অনুষ্ঠানে বহুবার গেছি। ফলে গানগুলির শুধু সুর নয়, কথাগুলিও আমার মনে আছে। আজ যে গানটি গাইছে, 'অন্ধকারের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল'। প্রথম যেদিন এই গানটি শুনেছিলাম, হঠাৎ করে বুঝতে না পেরে অয়নকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এমন রোমান্টিক গান ... এখানে ... মানে ...! অয়ন কোন জবাব না দিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে মুচকি মুচকি হেসেছিল। তারপর যখন বুঝতে পেরেছিল যে সত্যি গানের শব্দগুলি আমার কাছে বেমানান ঠেকছে এবং আমার প্রশ্নের মধ্যে কোন ছলচাতুরি নেই, তখন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছিল, মন দিয়ে শোন। লিরিক্যাল

শব্দগুলো এখানে কী প্রচণ্ডভাবে ফোর্সফুল। একটু থেমে বলেছিল, চীন বিপ্লবে যোগ দেওয়ার জন্য মাও সে তুং নারীদের ডাক দিলেন কীভাবে জান? বলে অয়ন কেমন নির্দ্ধিধায় অনেক লোকের মধ্যে দাঁড়িয়েই আমার চিবুকটা আস্তো করে তুলে ধরে বলেছিল, মাও বললেন, এসো নারী, তুমিই অর্ধেক আকাশ।

আজ এত বছর পরে সেদিনের ঘটনাটা হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ায়, অদ্ভুত শিহরণ বোধ করলাম। চোখে জল এসে গেল। আর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। কে গাইছে, কেন গাইছে, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। গানের সুরটা কানে বাজছে। কথাগুলি মগজে পৌঁছাচ্ছে না। এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ কে যেন কানের ওপর মুখ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ভেতরে আসুন না, নীরুদি। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি অলোকেশ ডাকছে। ও নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ থেকে আমায় লক্ষ্য করছে। আমার অন্যমনস্কতা ওর চোখে আটকে গেছে। সেই কারণেই ও ভিড় ঠেলে আমার পাশটিতে হাজির হয়ে আকুতিভরা গলায় ডাকছে, ভেতরে আসুন না। তার মানে অলোকেশ বিশ্বাস করে, পুরোপুরি ওদের মত পথের বিশ্বাসী না হলেও, আমি মালিকপক্ষের সমর্থক নই। বরং ওদের প্রতিই আমার সহানুভূতি।

মালিক মূলত শোষক। অন্যায়ভাবে অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের তীব্র অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, এই বিচারে মালিক খারাপ, ধূর্ত। শ্রমিকরা নির্দোষী এবং নির্যাতিত। আর পাঁচজন অরাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষের মতো আমিও এটা বিশ্বাস করি। তার মানে এই নয় যে শ্রমিকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও শ্লোগান দেব, তাদের পাশে বসে অবস্থান-এ অংশ নেব।

আমি খুব সচেতনভাবেই বললাম, তোমাদের মাঝে গিয়ে আমি বসব কেন?

আমার প্রশ্নে অলোকেশ ক্ষুণ্ণ হল, সেটা বুঝতে পারলাম, আমার মুখের দিকে তার নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকার মধ্যে। তারপর থেমে থেমে গম্ভীর গলায় বলল, আপনি আমাদের লড়াইকে সমর্থন করেন না?

— হ্যাঁ। আস্তো করে ঘাড় নাড়লাম, সমর্থন করা আর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্যে তফাত আছে বই কি!

আমি যেমন অলোকেশের কাছে কোনভাবে দায়বদ্ধ নই, সে'ও আমার কাছে কোনভাবে ঋণী নয়। আর আমাদের দুজনের কেউ-ই ছোট নই। অলোকেশ যেমন আমায় অনুরোধ করছে, কোনরকম জোর করছে না, আমিও তেমনি ওর অনুরোধ রাখতে পারি, আবার নাও পারি।

— আপনার দেখাদেখি আরও অনেকে আসবে, অলোকেশ বলল, আপনার ওপর এটুকু জোর করতে পারি না?

অলোকেশের বলার মধ্যে মিনতির সুর। কাতর অনুরোধের মতো শোনাচ্ছে ওর কথাগুলি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াবার কোন তাগিদ পেলাম না মনের ভেতর থেকে। হেসে বললাম, ভুল বুঝো না অলোকেশ। আমি তো কোনদিন সরাসরি রাজনীতি করিনি। তোমরা কিন্তু লড়াই করছ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে ...।

— নীরুদি? অলোকেশ আমায় থামিয়ে দিল, আপানি কেবল পতাকার রংটাই দেখলেন? এবার কিন্তু অলোকেশের গলায় মৃদু অনুযোগের সুর, মানুষগুলোর কথা একবার ভাবলেন না?

অলোকেশের এই প্রশ্নটি কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং বহুমাত্রিক। অলোকেশের মতো আমারও বহুক্ষেত্রেই মনে হয়, রাজনৈতিক মতাদর্শগত ফারাক যাই থাক না কেন, যে বা যারা কষ্ট পাচ্ছে, বিপদগ্রস্ত হয়েছে, দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, তাদের সর্বপ্রথম পরিচয় তো মানুষ। আমারই মতো ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্খা, ন্যায্য অধিকারের দাবীদার সে বা সেই মানুষগুলি। এক্ষেত্রে তত্ত্বের কচকচানি পাশে ঠেলে রেখে সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দেওয়াই তো উচিত কাজ।

মাত্র কয়েকদিন আগে অব্দি এই বিশ্বাসেই অবিচল এবং অটল ছিলাম। আর তাই কানে শোনামাত্রই প্রিয়লালের ডাকে বস্তিতে ছুটে গিয়েছিলাম। একটি সহজ ঘটনা, যেখানে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের অবস্থান, তার কারণ ইত্যাদি সহজপাঠের 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'-র মতো সিধে সরল এবং অনায়াসবোধ্য, সেক্ষেত্রেও আমি যে একশভাগ সফল হয়েছি, এমন তো বলতেই পারি না, উপরন্তু আমার উপস্থিতি অনেকের কাছেই অস্বস্তিকর, পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। আবার কেউ কেউ এর মধ্যে রহস্যের আঁচও পেয়েছেন। সর্বোপরি আমার নিজের মধ্যেই অনেকগুলি প্রশ্ন তৈরী হয়েছে। এতদিন যে সত্য এবং বিশ্বাসকে চূড়ান্ত অভ্রান্ত বলে জানতাম, বেহুলার বাসরঘরের মতো নিশ্চিদ্র, সুরক্ষিত মনে করতাম, দ্বিধা দ্বন্দ্বের কালনাগিনী কীভাবে যে সেখানে ঢুকে পড়েছে! প্রতি মুহূর্তে সোজাসাপটা যে কোন কাজে সাদামাটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও এখন আমি যথেষ্ট সাবধানী। নিষ্কর্মারা খুঁত ধরে এবং ভুল তারই হয়, যে কাজ করে, এই আপ্তবাক্যটি মনে থাকা সত্ত্বেও, মাত্র একটি ঘটনার ধাক্কায় আমি কেন যে এতটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছি! শুধু বাইরে নয়, আমার নিজের বাড়িতেও আমার কাজটি সমালোচিত হয়েছে। আমার ভাই সিদ্ধার্থ বিরক্তিভরা গলায় বলেছে, এমন আগলি ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছো কেন?

আবার আমার কর্মস্থল অর্থাৎ যে স্কুলে আমি পড়াই, সেখানে মান্থলি মিটিংয়ের পর সেক্রেটারী আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছেন, মাস্টারী ব্যাপারটা দুধ-সাদা পোশাকের মতো। একটু আধটু দাগ লাগলেই বড় বেশী প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।

আমায় নিরুত্তর দেখে, সেক্রেটারী হয়ত ভেবে নিলেন, আমি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আর তাই কিছুটা চ্যারি আপ করার জন্য, আবার তার সঙ্গে কিছুটা প্রচ্ছন্ন হুমকি মিশিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন, মাস্টারী নোবেল প্রফেসন। ল অব্ কনডাক্টটা তাই খুব কঠোর।

আশ্চর্য! সিদ্ধার্থকে যেভাবে কাউন্টার অ্যাটাক করেছি, সেক্রেটারীর ক্ষেত্রে তার বিপরীত আচরণ করলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাধ্য মেয়ের মতো সব শুনলাম।

রাতে ঘুম আসার আগে অব্দি একটি কথাই ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। সেক্রেটারীর কথার একটুকরো জবাব আমি দিলাম না কেন? বা দিতে পারলাম না কেন? তবে কি আমার মধ্যেও মধ্যবিত্ত-সুলভ হারানোর ভয় রয়েছে? তবে কি, আমি নিরুপমা সান্যাল, একই কাজের জবাব দিহির ক্ষেত্রে কোথাও আক্রমণাত্মক, সরব উচ্চকিত, আবার কোথাও পরাজিতের মতো সুবিধাবাদী রক্ষণাত্মক, নীরব নিরুত্তর?

অলোকেশ স্থির চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, ওর কথার জবাবে আমি কী বলি, তা শোনার জন্য। নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেলে, মনের গহনে শরীরের ভিতরে অমানুষিক তোলপাড় শুরু হয়, হয়ত চোখেমুখেও তার ছাপ ফুটে ওঠে। মনে হয় এই বুঝি ধরা পড়ে গেল। এই বুঝি সব ফাঁস হয়ে গেল। আমি বেশ জোর করেই নিজের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলাম, ভুল বুঝো না অলোকেশ। তোমাদের প্রতি আমার একশভাগ সিমপ্যাথি। মানিটারি কোন প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই বলবে। কোনরকমে এইটুকু বলেই আমি পিছন ফিরলাম, সত্যি আজ তাড়া আছে। বাড়িতে অতিথি আসবে।

যেন ভয়ংকর কোন দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি, এমন ব্যস্ততায় ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম। অলোকেশ আমার সব কথা শুনতে পেয়েছে কিনা জানি না। হাতব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলাম। একটু জল খেতে পারলে ভাল হোত। গলাটা শুকনো শুকনো লাগছে। এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এই পোশাক পাল্টাতেই হবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দুটি তিনটি ফাঁকা রিক্সা দেখতে পেলাম। তার মানে রিক্সাওলারা জমজমাট গানের আসরে মেতে গেছে। কিন্তু এখানে আর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। অন্যদিনের মতোই হেঁটে, কিন্তু বড় বড় পা ফেলে একরকম দৌড়তে শুরু করলাম। ছোট দুটি মোড় পেরিয়ে, বড় রাস্তায় উঠেছি, হঠাৎই একটি রিক্সা

রীতিমত আওয়াজ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল আমার পাশটিতে, নিন, উঠুন। আমিও কোথায় যেতে চাই, কত ভাড়া লাগবে, এসব কোন প্রশ্ন না করেই দ্রুত রিক্সায় উঠে পড়লাম। রিক্সা চলতে শুরু করল। গান থেমে গেছে। কেউ একজন আবৃত্তি শুরু করেছে — লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে ... মনে হয় ... আমিই লেনিন। মাইকে আবৃত্তির আওয়াজ যখন ক্ষীণ ক্ষীণতর হতে হতে পুরোপুরি হারিয়ে গেল, নিজের অজান্তেই বুক খালি করে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এল — 'ওফ্! তখন সামনের দিকে মুখ করে চালাচ্ছে যে রিক্সাওলাটি, আমি যার ঘামে ভেজা গেঞ্জি ফুঁড়ে জলছাপের মতো পিঠের বড়সড় জরুলটি দেখতে পাচ্ছি, তাকে বললাম, জোড়াপুকুর ধার যাব। কত নেবে বল?

রিক্সাওলা ঘাড় না ফিরিয়েই জবাব দিল, যা বিবেচনা করবেন।

— এ আবার কেমন কথা! গলাটা সামান্য চড়িয়েই বললাম, আমার বিবেচনায় যদি একটাকা হয়, নেবে তো?

— হুঁ। বলে রিক্সাওলা পিছনপানে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল, আপনি আমার গাড়িতে চড়েছেন, এ কি কম সৌভাগ্যি!

একই মুখের কতরকম ধাঁচ! নির্মল হাসি ছোপানো মুখটি দেখে অতিবড় শত্রুও গলে জল হয়ে যাবে। আমি তো ভাবতেই পারছি না এই সেই বীভৎস মূর্তিমান শয়তান নয়নচাঁদ!

— তুমি? কে যেন ভেতর থেকে ঠেলে দিল প্রশ্নটা।

— আজ্ঞে। ঠিকই চিনেছেন। এই তো সেদিনের ঘটনা। যেন আমি তার কত পরিচিত বা সে আমার, এমন ভঙ্গীতে নয়নচাঁদ বলল, আমি আপনাকে অনেক আগেই দেখেছি। এক বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটু থেমে বলল, বলতে পারেন তখন থেকেই আপনাকে ফলো করছি।

— ফলো! তুমি! আমাকে! নিজেই বুঝতে পারছিলাম, কথাগুলি আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

— করব না? বেশ হেসেই জবাব দিল নয়নচাঁদ, সেদিনের ঘটনাটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

ঠিক মনে হচ্ছে ভারশূন্য অবস্থায় হাওয়ার মধ্য দিয়ে একরকম উড়েই চলেছি। রিক্সার ফুটবোর্ডে পা দুটিকে কে যেন আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। শারীরিক অনুভূতি বলতে শুধু এইটুকুই। সারাটা পথ নয়নচাঁদ আর একটিও কথা বলল না। ভুল করেও একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাল না।

দশ

ইদানীং সিদ্ধার্থকে দেখি, সবসময় কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। এমনিতেই সিদ্ধার্থ কথা বলে কম। এখন তো আবার অনেক কথার জবাব আকারে ইঙ্গিতে দেয়। সাংসারিক কোন ব্যাপারে কোনদিনই নিজেকে ইনভলভ্‌ড করেনি। নিজের পড়াশুনাটুকুও ঠিকমত করে বলে মনে হয় না। প্রায়ই ভাবি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করব, কেন ও সবসময় এত চুপচাপ। উদাসীন! ছেলেবেলায় যারা ওর বন্ধু ছিল, তাদের কাউকেই আর আমাদের বাড়ি আসতে দেখি না। পরিবর্তে মাঝবয়সী দুজন লোক মাঝেমধ্যে সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন ঘরের দরজা ভেজিয়ে সিদ্ধার্থ নীচু গলায় তাদের সঙ্গে কথা বলে। বিদায় বেলায় তাদের পৌঁছতে বড় রাস্তার মুখ অব্দি যায়।

আশ্চর্য লোকদুটি সিদ্ধার্থ ছাড়াও, আমি মা এবং অনু যে এ বাড়ির আরও তিনজন সদস্য রয়েছি, তাদের যেন চেনেই না। সিদ্ধার্থর অনুপস্থিতিতে লোক দুটি এলে, যদি বলা হয় 'বাড়ি নেই' প্রত্যুত্তরে তারা একটিও কথা জিজ্ঞেস করে না। পরে সিদ্ধার্থ বাড়ি ফিরলে ওকে যদি লোকদুটির আসার কথা বলা হয়, ওর মধ্যেও কোনরকম ব্যাগ্রতা বা ভাবান্তর দেখি না। চুপচাপ শুনে, বড়জোর অস্ফুটে বলে 'অ'। অনুর চেয়ে সিদ্ধার্থ বয়সে ছোট। কিন্তু ওর চোখমুখের চেহারা, চলাফেরার ভঙ্গী, এসব দেখলে যে কেউ বলবে, সিদ্ধার্থ অনেক বেশী ম্যাচিওর। অনুর মধ্যে এখনও কিছু ছেলেমানুষী আছে। যখন তখন হি হি করে হেসে ওঠে। মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করে। আমাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে। গভীর মনোযোগে খবরের কাগজের শব্দ-জব্দ-র ঘর ভর্তি করে।

সিদ্ধার্থ সবসময়ে এমন চিন্তান্বিত মুখ করে থাকে যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ইতিহাস বা পরবর্তী প্রজন্মের দূষণ সংক্রমণের মতো গভীর কোন বিষয়ে ও দিনরাত ভেবেই চলেছে।

একদিন সকালে বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় দেখি, সিদ্ধার্থ শিরদাঁড়া টানটান করে পদ্মাসনে বসে। আর ওর সামনে একটি খোলা বই। হাওয়ায় পাতা উল্টে যায়, তাই একটি ভাঙ্গা পেপারওয়েট বইটির খোলা পাতার ওপর চাপা দেওয়া। লুকিয়ে লুকিয়ে সিদ্ধার্থ যে যোগব্যায়াম করে, আমার জানা ছিল না। হয়ত মা বা অনু জানে। আমার চোখে আজই প্রথম পড়ল। শরীরচর্চা ভাল। কিন্তু সকালবেলায় পড়াশুনোর পরিবর্তে ব্যায়াম, ব্যাপারটা মোটেই আমার ভাল লাগল না। বাবা বেঁচে নেই। খুব সঙ্গত কারণেই এক্ষেত্রে সিদ্ধার্থকে শাসন না হোক সাবধান করা আমার উচিত। জানলার গরাদ ধরে আমি অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই দু চোখ বন্ধ করে আছে। কারণ ঘরের

মেঝেতে আমার ছায়া পড়েছে। ছায়ার ছেঁড়া একটু অংশ আড়াআড়িভাবে ওর মুখেও পড়েছে। ওর কিন্তু কোন হুঁশ নেই। ঘরের দরজাটা বন্ধ ভেবে আমি দরজায় বেশ জোরে ঠেলা দিলাম। দরজাটা আস্তো ভেজানো ছিল বলে, আমার হাতের ঠেলায় পাল্লাদুটি দু পাশের দেওয়ালে বেশ শব্দ করেই ধাক্কা খেল। মুহূর্তে সিদ্ধার্থ বন্ধ দু চোখ খুলে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি?

— ব্যায়াম করছিস? আমি আস্তো করে হাসার চেষ্টা করলাম, ওটা কি ব্যায়ামের বই?

সিদ্ধার্থ ঝপ করে বইটা বন্ধ করে মাথার বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল। এবার আমার সত্যি সত্যি হাসি পেল। ও এমন দ্রুততায় বইটা সরিয়ে ফেলল যেন ওটি যৌন বিষয়ক সস্তার, ছাপার ভুলে ভরা কোন বই। আমি ওর পাশে বসে গায়ে মাথায় আস্তো হাত বুলিয়ে দিলাম, ব্যায়াম ভাল জিনিস। তবে পড়াশুনোটাও তো করতে হবে। বারো ক্লাসে রেজাল্টভাল না হলে ...।

— কে বলেছে? সিদ্ধার্থ আমার কথা সম্পূর্ণ করতে দিল না, আমি পড়াশুনা করি না?

— কেউ বলে নি। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, আমি-ই বলছি। সিদ্ধার্থ আমার এ কথার কোন জবাব দিল না। বিছানা থেকে নেমে দেওয়ালের পেরেক ঝোলানো জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিল। অন্যমনস্কের মতো কয়েক পা হেঁটে পুব দিকের জানলাটার গরাদ ধরে দাঁড়াল। আমার দিকে পিছন করে। জানলাটার নীচে বুনো ঘাস আগাছার জঙ্গল। সামান্য দূরে সীমানার পাঁচিল। সিদ্ধার্থ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নতুন করে দেখার কিছু নেই। তবু ঠায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। নিজেকে বেশ অপমানিত বোধ করলাম। বয়সে সিদ্ধার্থ আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমার প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে' 'কী বৃত্তান্ত' এই ধরণের। অনেকটা কোয়্যারী করার মতো। তারপর এমন ভঙ্গীতে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল যেন আমার প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হয়েছে। আগাম জানান না দিয়ে ওর ঘরে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটাও ও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। পিছন ফিরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে ও হয়ত বোঝাতে চাইছে, আর কোন রকম অনুশাসন, তা সে যত অকিঞ্চিতকর প্রশ্ন যত নরমভাবেই বলা হোক না কেন, তাতেও ওর ঘোরতর আপত্তি। দুঃসহ নৈশব্দের পরিমণ্ডল তৈরী করে ও আমাকে ওর ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলছে। অন্য কোনদিন সিদ্ধার্থ এই ধরণের ব্যবহার করলে, আজ যেমন সেদিনও তেমনি আহত বোধ করতাম। তবে সেদিন হয়ত মনের ক্ষোভ অভিমান দুঃখ চেপে রেখে নিঃশব্দে ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

আসতাম। আজ কিন্তু কোনমতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। প্রথমে নয়নচাঁদের বস্তির ঘটনা, প্রায় তার গায়ে গায়েই বেঙ্গল জুট মিলে অলোকেশদের অবস্থান ঘর্মঘটের ব্যাপারটা, দুটি ক্ষেত্রের একটিতে ন্যায় নীতিবোধের তাগিদে ছুটে গেছি। অন্যটিতে একইরকম তাগিদ অনুভব করা সত্ত্বেও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি এবং সামাজিক ভয় লজ্জার কথা বিবেচনা করে পিছিয়ে এসেছি। নিজের মনেই সংশয় তৈরী হয়েছে এ দুটির কোনটি ঠিক এবং কোনটি ঠিক নয়। উচিত অনুচিতের দোলাচলে নিজেই দুলছি। মানসিক এইরকম ভারসাম্যহীন অবস্থায় যে কোন মানুষ নিশ্চিত জয়ের ক্ষেত্র খোঁজে। আমার মনে হল সিদ্ধার্থকে প্রতিআক্রমণ করতে পারলে, আমার যুক্তি দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলতে পারলে, ধমকে ওকে চমকে দিতে পারলে, নিজের ভেতরে বিশ্বাসহীনতার যে লড়াই চলছে, তা যেন অনেকটা ফিকে হয়ে যাবে। আমার পা, ক্রমাগত যা চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল হঠাৎ করে কোন শক্ত বস্তুতে বাধা পেয়ে, আমাকে নির্ভয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার মতো দেহের আর মনের জোর দেবে।

— এদিকে ফের। আমি বেশ কড়া গলাতেই ডাকলাম সিদ্ধার্থকে।

সিদ্ধার্থ কিন্তু আগের ভঙ্গীতেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই জবাব দিল, যা বলবার বল না।

— ওই লোকদুটো যারা প্রায়ই তোর কাছে আসে। — অনেক কথা বলতে হবে ভেবে নিয়েই, আমি এবার ধীর গলায় আস্তে করে বলতে শুরু করলাম, যারা এলেই, তুই ঘরের দরজা বন্ধ করে ফিসফিস করে কথা বলিস, ওরা কারা?

— ওরা আমাদের সংগঠনের কর্মী। সিদ্ধার্থ বলল, কেন, কী করেছে লোক দুজন?

— কী আবার করবে? আমি ব্যাঙ্গাত্মক সুরেই বললাম, ওদের দৌড় কতদূর তা আমি জানি।

— আঃ! সিদ্ধার্থ বিরক্তি মেশানো গলায় বলল, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছ কেন? একটু চুপ করে থেকে হাসল। যে হাসিতে বিদ্রূপের শাণিত ধার, ওই দুজনের সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। ওদের পড়াশুনো, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, সর্বোপরি ওদের মতো সৎ খুব কম মানুষই আছে।

— তাই নাকি? ইচ্ছে করেই আমি চোখ বড় বড় করে বিস্মিতের ভাণ করলাম।

— সত্যিই তাই। সিদ্ধার্থ আমার ভাণটুকু ধরতে পেরেছে বলেই বোধ হয় অল্প একটু হাসল, তুমি ভাবতেই পারবে না। 'তুমি' শব্দটার ওপর অনাবশ্যক জোর দিল।

— বেশ তো। আমি বললাম, ধরে নিচ্ছি আমার মতো সাদামাটা একজন চাকুরে মেয়ে, তোর ওই দুই দাদার পড়াশুনোর ডেপথ্, ল'ইয়ারি ক্ষমতা, এ সবের নাগাল কোনদিনই

পাব না। হয়ত ওদের মতো একশভাগ সৎও নই। কিন্তু তার আগে একটা কথা বল তো, পারটিকুলার ওই দুজন লোকই বারবার তোর কাছে আসে কেন? চোরের মতো দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে কেন? তোদের সংগঠনে আর কোন লোক নেই? তাদের তো দেখিনি কোনদিন।

— নাই-ই দেখতে পার। সিদ্ধার্থ বলল, সংগঠনের রিজিডিটি কর্মী সংখ্যায় নয়। কর্মীদের গুণগত মানে। একটু থেমে বলল, আমাদের প্রতিটি কর্মীর ডেডিকেশন কী মারাত্মক, তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। যে কোন মুহূর্তে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে।

সিদ্ধার্থর কথায় আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তার মানে যে কোন মুহূর্তে সিদ্ধার্থও নিজেকে উৎসর্গীত করতে পারে সংগঠনের স্বার্থে। তাড়াতাড়ি বললাম, তোকে এ সবের মধ্যে জড়ালো কে?

— জড়ালো বলছ কেন? সিদ্ধার্থ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল, বলো, এমন সৌভাগ্য আমার হোল কেমন করে?

তার মানে সিদ্ধার্থ একশভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে যে, গুপ্ত সংগঠনটির একজন বিশ্বস্ত কর্মী, প্রয়োজনে অবলীলায় যে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে, এইরকম কিছু হতে পারলে তার জীবন সার্থক হবে। এখন থেকে এটাই তার ধ্যানজ্ঞান লক্ষ্য আদর্শ সব কিছু। আমি জানি এ সব ক্ষেত্রে জোর করে ওর মতের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে অন্য কিছু করানো যাবে না। তাতে উল্টো ছিরি হতে পারে। অভিমানে বা রাগের বশে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে। আবার ইচ্ছাপূরণের বাধাবিপত্তির কথা যত ভাববে, ততই হয়ত ওর মধ্যে অবসাদ ক্ষোভ এবং দুঃখ জমা হতে থাকবে। পরিণতিতে নিজেকে একা এবং ব্যর্থ, এইরকম ভেবে নিয়ে আত্মহননের পথও বেছে নিতে পারে।

সিদ্ধার্থ কোনরকম দুর্ঘটনার শিকার হোক, এটা আমি কোনমতেই চাই না। চাইতে পারি না। সে আমার ভাই। তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। সিদ্ধার্থর ভাললাগা মন্দলাগা একান্তভাবেই তার নিজস্ব ব্যাপার। কোন কাজ করার জন্য যদি সে মনের ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করে, সেক্ষেত্রে আমার বুদ্ধি বিবেচনা নির্দেশ খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। হয়ত সরাসরি আমার কথার জবরদস্ত বিরোধীতা করবে না বা আমার মুখের ওপর সরাসরি 'না', 'সম্ভব নয়' এ জাতীয় কিছু বলবে না, কিন্তু ও যা করতে চায় বা করবে বলে কৃতসংকল্প, সে পথেই এগোতে থাকবে।

কিন্তু এতগুলি 'অসম্ভব' সত্যি জেনেও আমার মনে হল একবার চেষ্টা করে দেখা

উচিত, সিদ্ধার্থকে ফেরানো যায় কিনা! বাবা যখন মারা যান, সিদ্ধার্থ নেহাতই ছোট। বাবার সান্নিধ্য পেলে ওর মধ্যে হয়ত অন্যরকম একটা জগৎ তৈরী হোত। সিদ্ধার্থ যে গুপ্ত সংগঠনটির কথা বলে, তার ধুরন্ধর মতলববাজ নেতাগুলি ধরে ফেলেছে যে, যে কোনরকম দুঃসাহসিক কাজকর্মগুলি করার জন্য সিদ্ধার্থর মতো ইমম্যাচিওর আবেগসর্বস্ব কর্মীই সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ যে কোন অস্বাভাবিক ঘটনার নায়ক হওয়ার জন্য অল্পবয়সীদের মধ্যে উন্মাদনা থাকে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এইসব অল্পবয়সী কর্মীদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। নিজেরা তাত্ত্বিক নেতা সেজে, ইতিহাস ভূগোল সমাজবিজ্ঞান তার সঙ্গে পরিসংখ্যান রেফারেন্স ইত্যাদি মিশিয়ে এমনসব কথা বলে, যা শুনে কমবয়সী কর্মীদের মধ্যে আপোষহীন আমৃত্যু লড়াইয়ের তীব্র জেদ জেগে ওঠে। তাদেরকে বোঝানো হয়, তোমার আত্মদানে, আপামর মানুষের কল্যাণ হবে, সমাজের খোলনলচে আমূল বদলে যাবে, তোমার আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এমনও হতে পারে, তোমার লড়াইয়ের ফলে পৃথিবীটা বদলে যাবে যখন, তখন তুমিই সেই নতুন পৃথিবীর অধীশ্বর হবে। মুহুর্মুহু লোকে তোমার নামে জয়ধ্বনি দেবে। অপরিণত মস্তিষ্ককে নিজের মতো করে ব্যবহার করা যায়। এতে তাত্ত্বিক নেতার দুটি সুবিধা। তাঁর তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগও হল। আবার সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তাটুকুও পৌঁছে দেওয়া গেল যে, নেতা আপোষহীন লড়াইয়ে বিশ্বাসী। অনুগত কর্মীরাও দেওয়ালে পোস্টার সাঁটল। যেখানে নেতাকে "বিশ্ব বিপ্লবের মহান কর্ণধার" বলে উল্লেখ করা হল।

আমার ধারণা সিদ্ধার্থর কাছে মাঝবয়সী যে লোক দুজন আসেন, তাঁরাও এই ধরনের মতলববাজ, ক্ষমতালোভী নেতা। সিদ্ধার্থকে দিয়ে কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারলে, সংগঠনে এই দুজনের গুরুত্ব বাড়বে। ক্ষমতা প্রয়োগের সীমারেখা আরও বিস্তৃত হবে।

সিদ্ধার্থ কিন্তু এখনও আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়সের তুলনায় ওর স্বাস্থ্য বেশ বড়সড়। পিছন থেকে দেখলে যে কেউ ভাববে মধ্যবয়সী কোন লোক। কিন্তু ওর মুখে কৈশোরের লাবণ্য। চোখ দুটি অপার বিস্ময়ে ভরা। কেন জানি না হঠাৎ করে মনে হল যদি কোনদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও আর ঘরে না ফেরে! বিনিদ্র রাত শেষে অচেনা অজানা কোন লোক এসে খবর দিয়ে যায়, সিদ্ধার্থ জীবিত নেই বা গভীর রাতে খাকি পোষাক গায়ে একদল সরকারী গুণ্ডা কালো রংয়ের জাল ঘেরা গাড়ি নিয়ে এসে, মধ্যরাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে ফালাফালা করে দিয়ে অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো সিদ্ধার্থর খোঁজে লণ্ডভণ্ড করে দেয় বাড়ির সমস্ত আসবাব, বিছানা! উল্টে ফেলে দেয় রান্নাঘরের জলের

বালতি, মায়ের ঠাকুরঘরের সিংহাসন, বইয়ের র‍্যাক, টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে দেয় খাটের মশারী, জানলার পর্দা। তখন হয়ত প্রাণভয়ে সিদ্ধার্থ পাঁচিল টপকে পালাতে যাবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধাতব গুলি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে গিয়ে বিঁধবে তার পিঠের মাঝখানে বা রগের নীচে।

আমি যেমন করে ভাবছি হয়ত এসবের কিছুই হবে না। আবার হয়ত এর চেয়েও বীভৎস পৈশাচিক নিষ্ঠুর কোন ঘটনা ঘটবে। যাই হোক না কেন, দিদি হিসাবে আমি কোনদিন কোন অবস্থাতেই সিদ্ধার্থর বিপর্যয়, ক্ষতির কথা ভাবতে পারি না। জানি না আমার যুক্তিতে আদৌ তাকে নোয়াতে পারব কি না! কিন্তু মনের ভেতর থেকে ঠেলা দিল কে যেন, এ ক্ষেত্রে পারি না পারি, চেষ্টা না করাটা শুধু অমানবিক নয়, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হবে।

— শোন? সিদ্ধার্থকে নরম গলায় ডাকলাম, কাছে আয় একবার।

— বল না। সিদ্ধার্থ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেই জবাব দিল।

— কাছে না এলে বলব কেমন করে? এসব কথা তো জোরে বলা যাবে না।

সিদ্ধার্থ জানলা থেকে সরে এসে বিছানায় আমার মুখোমুখি বসল।

— তোর ওপর আমাদের অনেক আশাভরসা। থেমে থেমে বললাম।

— আমাদের মানে? সিদ্ধার্থ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

— বাড়ির সবার। আমি বললাম, বিশেষ করে আমার।

— তুমি তো চাকরি কর।

— তার সঙ্গে তোর এসট্যাবলিশমেন্টের সম্পর্ক কী? নিজেই বুঝতে পারলাম, আমার গলা যেন সামান্য কেঁপে গেল।

— এসট্যাবলিশমেন্ট বলতে তুমি কি বোঝ? সিদ্ধার্থ জেরার ভঙ্গীতে বলল, ভাল একটা চাকরি? একটা সাজানো গোছানো বাড়ি? বউ নিয়ে বছরে একবার বেড়াতে যাওয়া? তারপর ছেলেমেয়ের এডুকেশন, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, এই সব তো? এই অব্দি বলে সিদ্ধার্থ একটু থামল। তারপর ধীর গলায় বলল, তুমি যেরকম ভাবছ, সেটা একজন পাতি কেরানীর ভাবনাচিন্তা, ধ্যানজ্ঞান, মোক্ষলাভও বলতে পার।

— তুই নিজেকে কী ভাবিস বল তো? বেশ রাগত গলায় বললাম।

— কিছুই ভাবি না। সিদ্ধার্থ ঘাড় দুলিয়ে হাসল, তোমরাই, বিশেষ করে তুমি, আমাকে নিয়ে একটু বেশী ভাবছ।

— সেটাই তো স্বাভাবিক। আফটার অল আমি তোর দিদি।

— কী মুশকিল! সিদ্ধার্থর চোখমুখে বিরক্তিভাব ফুটে উঠল, এসব সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলছ কেন? আমি তো বড় হয়েছি। আমাকে আমার মতো করে ভাবতে দাও না।

সিদ্ধার্থর জবাবের শেষ অংশটুকু শোনামাত্রই অয়নের কথা মনে পড়ে গেল। আজ সিদ্ধার্থর যে বয়স, সেদিন আমারও ছিল ওই রকমই। আর আমার আজকের ভূমিকায় সেদিন ছিল অয়ন। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভাললাগা মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দ যে কোন ব্যাপারে অয়ন তার নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেই, আমিও সেদিন অবিকল আজকের সিদ্ধার্থের মতো করে বলতাম, আমি তো বড় হয়েছি। আমার মতো করে ভাবতে দাও।

আজ এই সংকটময় মুহূর্তে অয়ন পাশে থাকলে, ও নিশ্চয়ই সিদ্ধার্থকে সর্বনাশের পথ থেকে টেনে আনতে পারত। অয়নের বুদ্ধির কাছে সিদ্ধার্থ অবধারিতভাবে নুইয়ে পড়ত। প্রয়োজনে অয়ন ধমকে, ভয় দেখিয়ে সিদ্ধার্থকে নিজের দিকে টেনে আনতে পারত। অয়ন বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতেও পারত যেমন, আবার দরকারে বেপরোয়া রূঢ় হতেও ওর বাধত না।

এখন আমি কী যে করি। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে হাজারবার বোঝালেও, সিদ্ধার্থ বড়জোর চুপ করে থাকবে। কিন্তু ওর ভাবনা চিন্তায় সামান্য চিড়ও ধরবে না। আবার ওর তালে তাল দিতে দিতে ওর মুখ থেকেই ভেতরের কথা টেনে বার করে আনব, শব্দের এমন জাগলারি, বাক্যের এমন নিখুঁত সুচারু প্রয়োগও আমার অজানা। বড় জোর যেটা পারি, তা হল আমার চোখের জলে যদি ওর বুকের মধ্যে একবারের জন্যও মুচড়ে ওঠে। বরাবরই সিদ্ধার্থ অন্তর্মুখী বলে মানবিক কোন ভাবাবেগ ওকে তেমনভাবে ছোঁয় না। পরিবর্তে ও ভেবে নিতেই পারে, আমি বা আমার মতো আরও যারা চোখের জলকেই জয়ের অস্ত্র বলে মনে করি, সেই সমস্ত দুর্বল পঙ্গু মানসিক অথর্ব মানুষগুলিকে একটু সোজা সবল এবং সুস্থ করার জন্যই গুপ্ত সংগঠনের কাজে ওর বেশী করে থাকা উচিত। প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি আজ যা অধিকাংশ ভারতীয় ভুলে যাচ্ছে, নতুনভাবে তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওদের সংগঠন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চারপাশে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা পানীয়জল এইরকম হাজারো হাজারো সমস্যা থাকতে, সেসবকে পাশে সরিয়ে রেখে, ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য ওরা কেন যে এমনভাবে মেতে উঠেছে, কে জানে!

— তোদের কি ধারণা, বৈদিকযুগ আবার ফিরে আসবে? আমি সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করলাম।

— আসবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? সিদ্ধার্থ বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিল।

— ধরলাম তোর কথামত বৈদিক যুগ সত্যি সত্যি ফিরে এল। তাতে কি বেকারী দারিদ্র্য অশিক্ষা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, এসবের কোন সুরাহা হবে?

— তুমি তো বেশ গুছিয়ে বলতে পার। সিদ্ধার্থ হাসল। কিন্তু হাসিটা সরল সোজা নয়, আমাদের শহরে একজন মস্ত বড় মানুষ এসেছেন। সামনের সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে তাঁর আসার কথা। একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার প্রশ্নগুলো তাঁকে জিজ্ঞেস কোর না।

— তিনি কি তোদের সংগঠনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি?

— না, না। সিদ্ধার্থ ঘাড় নাড়ল, নিতান্তই একজন গৃহী মানুষ। আমার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি কিন্তু সত্যিই চার্মড।

— তোর সঙ্গে আলাপ। ... কোথায়? ... কীভাবে ... ?

— এটা তোমার অনাবশ্যক কৌতূহল, সিদ্ধার্থ গলাটাকে ভারি করে বলল, মানুষের সঙ্গে মানুষের হঠাৎ করে আলাপ হতে পারে না? আলাপের আবার পূর্ব শর্ত, স্থান, কাল এসব থাকে নাকি?

— না, তা নয়। মনে মনে ভাবলাম, সেই সিদ্ধার্থ। যাকে একরকম কোলেপিঠে মানুষ করেছি, তার উত্তরে আমি রীতিমত ধাঁধিয়ে যাচ্ছি! কথার খেই হারিয়ে ফেলছি!

— ভদ্রলোক কি এখানে কোন আত্মীয়ের বাড়ি এসেছেন?

— অতশত জানি না।

— তোর সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাত হোল কোথায়?

— মিয়ারবেড়ের মোড়ে অমরের চায়ের দোকানে।

— অদ্ভুত তো! আমি ইচ্ছে করে গলাটাকে খাদে নামিয়ে বললাম, তোর সঙ্গে আলাপ হওয়া মাত্রই তোকে ভাল ভাল দামী দামী জ্ঞান উপদেশ শোনাতে শুরু করলেন?

আমার কথায় মুহূর্তে সিদ্ধার্থর চোখমুখ ভারি হয়ে উঠল। ও যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেটা বুঝিয়ে দিল আমার কথার প্রত্যুত্তরে কোন জবাব না দিয়ে। আমার নিজেরই খারাপ লাগতে লাগল। এভাবে সারকাসটিক্যালি কথাবার্তা বলাটা আমার ঠিক কাজ হল না। সিদ্ধার্থ বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। লোকটির সঙ্গে আলাপিত হয়ে ও হয়ত সত্যি খুব খুশি হয়েছে। লোকটির কথাবার্তা ওকে মুগ্ধ করেছে। আর এ সবের জন্যই ও লোকটিকে সামনের সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সিদ্ধার্থ আমন্ত্রণ জানিয়েছে মানেই,

লোকটি এ বাড়ির প্রত্যেকের দ্বারা আমন্ত্রিত। তাঁর যথাযথ আপ্যায়নের দায়িত্ব, সিদ্ধার্থের যেমন, আমারও তেমনি।

— কবে আসবেন বললি? আমি যেন সত্যি আগ্রহী এইভাবেই জিজ্ঞেস করলাম।

— সামনের সপ্তাহে। যে কোন দিন।

— তার আগে আমাকে একটু জানাস। সকাল করে বাড়ি ফিরে আসব।

আমার জবাবে সিদ্ধার্থ কী বুঝল কে জানে! 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলল না। কিন্তু ওর চোখমুখ দেখে মন হল ও মনে মনে খুশি হয়েছে। হয়ত এমনও ভেবে থাকতে পারে যে আমার প্রশ্নের জবাব যা ও দিল না বা দিতে পারল না, সেইসব প্রশ্নগুলি যখন আগন্তুত ভদ্রলোক তাঁর শাণিত যুক্তির ধারে কেটেকুটে একাক্কার করে দেবেন, তখন যদি আমার মন হয়, সিদ্ধার্থ যথার্থই একজন গুণীর সান্নিধ্য পেয়েছে, আমার সেই অব্যক্ত তারিফটুকুই ওকে খুশি করবে। এমনকি এরজন্য ও শ্লাঘাও বোধ করতে পারে। অয়ন যেদিন প্রথম আমাদের বাড়ি এসেছিল, স্কুলের মাস্টার মশায়ের মতো প্রথম দিনেই আমাকে অনাবশ্যক কিছু প্রশ্ন করেছিল। যার উত্তর আমি ঠিক মত দিতে পারিনি। দেওয়ার কথাও নয়। কারণ স্কুলের পড়াশুনার বাইরেও যে পড়াশুনার আর একটি বিশাল জগত আছে, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধ্যান ধারণা ছিল না। সঠিক উত্তর দিতে না পারার জন্য স্বভাবতই লজ্জা পেয়েছিলাম। আবার রেগেও গেছিলাম অয়নের ওপর। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে সেদিন যদি অয়ন না আসত, আমার জীবনের একটা দিক অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যেত।

আজ যেমন সিদ্ধার্থ বলল, সে এক মস্ত মাপের মানুষ, যাঁর কথাবার্তায় ও রীতিমত মুগ্ধ এবং আমাকে বেশ জাঁক করেই বলল, তোমার প্রশ্নগুলো তাঁকে জিজ্ঞেস কোর। পরোক্ষে ও বোঝাতে চাইল সামাজিক যে সমস্ত প্রশ্নের উত্থাপন করে ওকে আমি আক্রমণ করতে চাইছি, সেই আগন্তুক মানুষটির কাছে আমার প্রশ্নগুলো নিতান্তই এলেবেলে। তাঁর ধারাল যুক্তির সামনে আমার প্রশ্নগুলি ঝড়ে কলাগাছ উপড়ে পড়ার মতো মুখ থুবড়ে পড়বে।

সিদ্ধার্থ এটা ভালভাবেই জানে যে ওর মত এবং পথের এক পা সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছে এবং রুচি কোনটাই আমার নেই। আমি কোনদিনই বিশ্বাস করি না ধর্মীয় বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন হবে, সমাজের উঁচু তলায় আরামে বসে আছে যারা, তারা রাতারাতি সুখ ঐশ্বর্য সম্পদ এবং অহংকার ছেড়ে, নীচুতলার মানুষকে বুকে টেনে নেবে বা যে কোনরকম অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চারে ফেটে পড়বে, এটা কখনোই সম্ভব নয়।

নীচুতলার মানুষও জামার কলার থেকে ময়লা ঝাড়ার মতো করে, পুরুষানুক্রমে লালিত দাসত্বের মনোভাব, হীনমন্যতা, সংস্কার, অশিক্ষাজনিত মিথ্যা বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। তা যদি হোত তাহলে আজ অব্দি পৃথিবীতে কম সংখ্যক ক্রুশেডের ঘটনা ঘটে নি। তারপরেও ধনী দরিদ্র শোষক এবং শোষিতের অবস্থান এবং অনুপাতে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হয়নি। সভ্যতার আদি থেকে যা ছিল, আজও তাই চলছে। হ্যাভ এবং হ্যাভ নটের লড়াই। হয় এই লড়াইয়ের পদ্ধতিটা পাল্টেছে, আগের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং জটিল হয়েছে, কিন্তু মোটের ওপর শ্রেণী সংগ্রামটা আজও অব্যাহত। এর সমাধান কিসে বা আদৌ কোন সমাধান সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে অনেকের মতো আমিও কিছুটা বিভ্রান্ত। পেরেস্ত্রৈকা, গ্লাসনস্তের হাওয়া বইয়েও সোভিয়েত রাশিয়ার অখণ্ডতাকে ধরে রাখা যায় নি। ছোট্ট একটা দেশের মাত্র কয়েক কোটি মানুষ নিখাদ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দীর্ঘ সাতাশ বছর টানা লড়াই করে পর্যুদস্ত করেছে, পরমাণু শক্তিধর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশটিকে। লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে রক্ত ঝরানো পথে স্বাধীনতা নিয়ে এসেও, ছোট্ট দেশটি কিন্তু তারপর নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে নিজেদেরই ক্ষতবিক্ষত করেছে। আর মৌলবাদীরা তো তাদের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মধ্যেই ফেলে রেখেছে।

এক একদিন রাতে যখন ঘুম আসে না, অয়নের কথা মনে পড়ে, তখন দূরের আকাশের তারাটিকে সাক্ষী রেখে বলি, বিশ্বাস কর অয়ন, আমি তোমায় ভালবাসি। শ্রদ্ধা করি। কারণ তুমি লড়াই-এ আছ। তোমার পথ ঠিক কি বেঠিক আমি জানি না। সময় তার বিচাব করবে। এই সমাজটাকে বদলাবার জন্য তুমি কিছু করছ। আমি আমার চৌহদ্দির বাইরেই বেড়োতে পারলাম না।

সিদ্ধার্থকে বললাম, তোর সেই মস্ত বড় জ্ঞানীগুণী মানুষটি এখন আছেন কোথায়?

সিদ্ধার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, তা জানি না।

— সে আবার কী কথা! তিনি আমদের বাড়ি আসবেন, অথচ তুই তাঁর ঠাঁই ঠিকানা জানিস না! ব্যাপারটা সত্যি আমার কাছে আজগুবি অবাক মনে হল, যদি তোর সঙ্গে আর দেখা না হয়?

— হবেই। সিদ্ধার্থ বেশ ধীরস্থির গলায় বলল, চিনির দানা যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন, পিঁপড়ে ঠিক তার সন্ধান পায়।

সময়োপযোগী এবং যথোপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে এমন গুছিয়ে সিদ্ধার্থকে আগে কোনদিন কথা বলতে শুনিনি। ভাল লাগল। আবার একটু সন্দেহও জাগল মনে। যা বলল, তা ওর নিজের কথা, নাকি অন্য কারোর মুখে শোনা কথা উগড়ে দিল। হেসে বললাম, উদাহরণটা

কিন্তু চমৎকার দিয়েছিস তার মানে ভেতরে ভেতরে নিজেকে বেশ তৈরী করেছিস। মিথ্যে বলে ধরা পড়ে যাওয়া মানুষের মতো সিদ্ধার্থর মুখজুড়ে বোকা বোকা ছেলেমানুষী হাসি, কথাটা ওনারই। আমার নয়।

— তার মানে নিজেকে উনি চিনির দানার মতো ভাবেন। তোদের মতো পিঁপড়ের দলের কাছে যা নাকি মহার্ঘ! অপরিহার্য যার টান! আমার জবাবে সিদ্ধার্থ খুশি হল না। আমার পাল্টা প্রশ্নগুলোর মূল উদ্দেশ্য ওকে ছোট করা এবং সেই অনাগত বহুদর্শী মানুষটিকে অকারণে হেয় প্রতিপন্ন করা, এই রকম কিছু ধারণা করেই, সিদ্ধার্থ হঠাৎই রেগে গেল, যাঁকে চেনো না, জানো না, তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করাটা ঠিক কাজ নয়, অন্তত তোমার কাছ থেকে এটা আশা করি না।

বুঝলাম আমার কথায় ও সত্যি সত্যি দুঃখ পেয়েছে। কিম্বা যে মানুষটির সম্পর্কে ও বলছে, যে কোন কারণে তাঁকে এতটাই ভাল লেগেছে যে, আমার মন্তব্যে ও যতটা কষ্ট পেয়েছে, ঠিক ততটাই ক্ষোভ জেগেছে আমার বিরুদ্ধে। আস্তে করে বলল, তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ! আবার রাজনীতির পাঠও নিয়েছ! দু চার মিনিট কথা বলেই দেখ না। একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার যুক্তি তর্কের ঠিকমত জবাব দিতে না পারলে, কথা দিচ্ছি, আমি নিজেই ওনাকে চলে যেতে বলব।

সিদ্ধার্থ এমনভাবে বলল, যেন আমি ওর কোন কথা বিশ্বাস করছি না বা সত্যিকারের একজন গুণী মানুষের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে, এটাও মানতে চাইছি না। ও হয়ত ভাবছে আমার সামনে দ্বিতীয় একজনের প্রশংসা করলে ব্যাপারটা বুঝি আমার ইগোতে লাগে। তাই আমি হাসির ছলে মজা করার মতো করে, ওর সঙ্গে কথা বলছি।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অপরের যুক্তি বিশ্লেষণ সে আমার মনোমত না হলেও, আমি তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। এমনও তো হতে পারে আমার অল্পবুদ্ধিতার জন্য আমি তাঁর কথাগুলিকে ঠিকমত ফলো করতে পারছি না। বেশ কিছুটা সময় থিতিয়ে গেলে হয়ত এমন একদিন আসবে, যখন মনে হবে সিদ্ধার্থ যা বলেছিল তার মধ্যে কোন খাদ নেই।

— কিছু মনে করিস না। আমি সিদ্ধার্থকে বললাম, আমি কাউকে ছোট করছি না। আসলে ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এইসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে এমনভাবে হাইলাইটেড করেন, যেমন ধর নিজেকে ঘোষণা করলেন 'যুগাবতার', বা 'জন্মসিদ্ধ' কিম্বা 'ত্রিকালদর্শী', তখনই মনে সংশয় জাগে।

— তুমি যা ভাবছ! এইটুকু বলে সিদ্ধার্থ আমার মুখের থেকে চোখ দুটি নামিয়ে নিল।

তারপর বাধ্য ছাত্র যেভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয়, ঠিক সেইভাবে মাথা নীচু করে অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় থেমে থেমে বলল, চিনির দানা আর পিঁপড়ের উদাহরণটা নিজেকে এসট্যাবলিস করার জন্য বলেন নি। অন্য কোন একটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন। উদাহরণটা আমার ভাল লেগেছিল বলে, নিজের থেকেই ওটা ব্যবহার করেছি।

— বুঝেছি, বুঝেছি। ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বললাম, একদিন সন্ধ্যার দিকে আসতে বল না। অনেকক্ষণ কথা বলা যাবে। আমার কথায় সিদ্ধার্থ খুশি হল এবং সংক্ষেপে বলল, দেখি।

বিছানা থেকে উঠে আমি ঘরে দরজার কাছে এসেছি, সিদ্ধার্থ ডাকল, দিদি?

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, কী?

— ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে তুমি আনন্দ পাবে। হুবহু অয়নদার মতো। ওই রকম পড়াশুনো। বলার ভঙ্গীমা। বোঝাবার ক্ষমতা। আর অজস্র এক্সজামপিল, রেফারেন্স।

সিদ্ধার্থ কেন যে শেষ মুহূর্তে অয়নের প্রসঙ্গ তুলল! ও কি ভাবল ভদ্রলোক হুবহু অয়নের মতো, এটুকু শুনেই আমার যাবতীয় ক্ষোভ বিদ্বেষ সব মুহূর্তে উবে যাবে! সিদ্ধার্থকে আমি যতটা ইমম্যাচিওর ভাবি, মোটেই তা নয়। বরং উপস্থিত বুদ্ধির জোরে আমি ওর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছি।

সিদ্ধার্থর কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি ধীর পায়ে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলাম। তারপর খুব সহজভাবেই গলা উঁচু করে মা'কে ডাকলাম, মা? চায়ের জল বসিয়েছ নাকি? সিদ্ধার্থ সুচতুরভাবে আমাকে লক্ষ্য করলেও যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে, অয়নের প্রশংসায় আমি আলোড়িত হয়েছি।

কুয়োতলায় গতরাতের এঁটো বাসনের গায়ে ঠোক্কর দিচ্ছিল একটা কাক। হঠাৎ একটি বেড়াল এসে হাজির হওয়া মাত্রই কাকটি উড়ে গিয়ে পাঁচিলে বসে, বেড়ালটির দিকে চেয়ে কা-কা করে চীৎকার করতে লাগল। আমি জানি আমাদের পোষা কুকুরটি যদি এখন এই মুহূর্তে কুয়োতলার কাছাকাছিও আসে, ওই কাকটির মতো বেড়ালটিও দূরে সরে গিয়ে কুকুরটির দিকে চেয়ে ম্যাও-ম্যাও করে অসহায়ের মতো ডাকতেই থাকবে। স্ট্রাগল ফর সারভাইভালের এটি একটি চিরন্তন ধারা।

অয়ন, তোমাকে দেখিনি কতদিন! কত শত্রুর পদক্ষেপ শোনার অবসরে, কত গোলা ফাটার মুহূর্তে, জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি। আমি এবং আমরা তো রয়েছি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের ইতিহাস যখন লেখা হবে, আমরা আত্মসুখী বিশাল পড়াশুনা করা তাত্ত্বিক পণ্ডিতের দল, সে লেখায় অনুল্লিখিত

থেকে যাব। আমরা যে চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে মোকাবিলা করায় ভয় পেয়েছি। আমরা দূরে বসে ঐ যেমন কাকটি বা বিড়ালটি অনুযোগের গলায় ডাকছে, বড়জোর ওইভাবে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেব।

শীত এমন কিছুই পড়েনি। বুড়ো মাংগিলাল এর মধ্যেই মাথায় হনুমান টুপী, গায়ে মোটা ধোসা চাদর জড়িয়ে বারান্দার কোণে যেখানে রোদ এসেছে, সেখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে, থেকে থেকেই বেশ শব্দ করে কাশছে। আমাকে দেখে দু চোখে হাসি হাসি ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল, কাল একঠো লেটার এসেছে।

— চিঠি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার?

মাংগীলাল কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর খুট খুট করে তার ঘরে গিয়ে সত্যি সত্যি মুখ আঁটা একটা খাম নিয়ে এল। চিঠিটা আমার নামেই এসেছে। পোস্টাফিসের অস্পষ্ট স্ট্যাম্প দেখে কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না।

— তুমি তো আমায় কিছু বলনি? হয়ত কোন জরুরী চিঠি।

— হোবে। বলে মাংগীলাল তার অল্প কয়েকটি দাঁত সম্বল মুখ ফাঁক করে হাসল, হামার স্মরণ হচ্ছে, এ লেটার দাদাবাবুর হোবে। জরুর।

মাংগীলালের ধারণা আমার নামে যত চিঠি আসে, সব অয়নের লেখা চিঠি। অয়ন কিন্তু ওর চিঠিতে রাজনৈতিক কথার বাইরে একটি কথাও লেখে না। মাংগীলালকে অয়ন হয়ত ভুলেই গেছে। অয়ন যখন আমাদের বাড়ি আসত, তখনও যে মাংগীলালের সঙ্গে তার নিয়মিত কথাবার্তা হোত তা নয়। অয়ন মাংগীলালকে কোনদিন কোনরকম আর্থিক সাহায্য করেনি। বিপদে পাশে দাঁড়িয়ে সাহস এবং সদুপদেশ দেওয়ার মতো কোন ঘটনাও ঘটেনি। বরং মাংগীলাল অয়নকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে এক মুখ হেসে 'নমস্তে দাদাবাবু' বললে, প্রত্যুত্তরে অনেক সময়েই অয়ন কোন জবাব পর্যন্ত দিত না। ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিকটু লাগত। একদিন অয়নকে বলেই ফেলেছিলাম, মাংগীলালকে তুমি চেনো না?

অয়ন অবাক গলায় জবাব দিয়েছিল, চিনি তো। ও তোমাদের বাড়ির কাজের লোক।

— ব্যাস, এইটুকু! অয়নের ওপর সত্যি আমার তখন রাগ হচ্ছিল, তুমি এলে ও কি দারুণ খুশি হয় জানো? তোমাকে কতটা ভালবাসে!

— খুশি হতেই পারে। আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই অয়ন নির্লিপ্তের গলায় বলেছিল, ভালও বাসতেই পারে।

— তুমি কিন্তু ইনডিফারেন্ট আচরণ কর ওর সঙ্গে।

— সেটা কেবল তুমিই লক্ষ্য করেছ, তাই না?

— এ বাড়ির সবার চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে।

— তাহলে তো আমার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। অয়ন দু কাঁধ ঝাঁকাল, তোমাদের বাড়িতে আমার আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করো।

বুঝলাম, জবাবটা হেসে দিলেও, অয়নের শ্লাঘায় লেগেছে। মাংগীলালের প্রতি সৌজন্য দেখানোর ব্যাপারটা ওর কাছে নিতান্তই মধ্যবিত্ত সুলভ সস্তার সেন্টিমেন্ট বলে মনে হয়েছে। মাংগীলালের প্রতি ওর ব্যবহারের জন্য যে কোনরকম প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা ওর ধারণারও বাইরে ছিল। স্বভাবতই অয়ন ক্ষুব্ধ।

— প্রতিটি মানুষের জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন লেভেলে তার মতো করে চলতে হয়, সে কি ভাবল, কীভাবে ব্যাপারটা নিল, এতকিছু ভাবতে হয়, তাহলে তো নিজস্বতা বলতে কিছুই থাকে না।

বুঝলাম অয়ন তর্কের অবকাশ তৈরীর চেষ্টা করছে। এখুনি হয়ত অমুক দার্শনিক, তমুক কবি, কিম্বা বিখ্যাত কোন রাজনীতিবিদের মন্তব্য আওড়ে, নিজের স্বপক্ষে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করবে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কোন মানুষ বিশেষ একটি মতাদর্শে বিশ্বাসী হলে, জগত সংসারের যাবতীয় ঘটনাবলীকে সেই মতাদর্শের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করে। প্রাথমিক কিছু সামাজিক মূল্যবোধ বা আচার বিচারকে সে তখন ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। অয়ন সিদ্ধার্থ অলোকেশ এই তিনজনেরই এই একটি জায়গায় অদ্ভুত মিল। তিনজনেই নিজেদের মতো করে সবকিছুকে বিচার করে। ব্যাখ্যা করে। এক্ষেত্রে এদেরও যে ভুল হতে পারে, কোনমতেই সেটা মানতে চায় না।

মাংগীলাল আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন আমি এখুনি মুখবন্ধ খামটি খুলে আনন্দে চীৎকার করে উঠব, হ্যাঁ, মাংগীলাল, তুমি ঠিক বলেছ, এটা তোমার দাদাবাবুর চিঠি। আর আমার আনন্দের ভাগীদার হয়ে সে অল্প অল্প মাথা ঝাঁকাবে, হামি যো ভাবি, ওহি সাচ হয়। ফির ফির তিনবার পোড়ো। তব মালুম হোবে। বহুত লিখাইপড়া আদমি দাদাবাবু।

মাংগীলালের এই সরলতা এবং সৌজন্যের ব্যাপারটা আমাকে খুব নাড়া দেয়। চিঠিটা অন্য কেউ লিখেছে দেখেও আমি যদি বলি এটা 'দাদাবাবুর চিঠি', মাংগীলাল মেনে নেবে। আবার যদি এর উল্টোটা বলি, সেটাও বিশ্বাস করবে। তার চেয়েও বড় ব্যাপার যেটা, তা হল, চিঠিতে দাদাবাবু কী লিখেছে বা ওর কথা কিছু লিখেছে কিনা, এ বিষয়ে একটি প্রশ্নও আমাকে করবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় মাংগীলাল নিজে লেখাপড়া জানে না বলেই কি

তার মনে কোন কৌতূহল নেই? কিন্তু আমার চারপাশে লেখাপড়া জানা এমন অনেক মানুষ দেখেছি, প্রতিনিয়ত যিনি তাঁর অজানা বিষয়েও একগুঁয়ের মতো ভিত্তিহীন তর্ক করেন। অনুচিত জেনেও অহেতুক কৌতূহল দেখান বা অযাচিত উপদেশ দেন। এই যেমন অলোকেশ বা সিদ্ধার্থ আমরা অনিচ্ছা অনীহা বোঝার পরও আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। যে কোন বিষয় যাচাই না করে মেনে নেওয়া, নিশ্চয়ই উচিত কাজ নয়। তবে ইদানীং কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় কম জানা, কম বোঝা, অনেক স্বস্তির। তাতে বড়জোর লোকে আড়ালে হাসবে। সরলতাকে নির্বুদ্ধিতা বলে ভাবেবে। স্বল্প জানাকে নীরেট মূর্খতা অ্যাখ্যা দেবে। তা দিক না, ক্ষতি কী! লোকে তো কত কী-ই বলে! যে কোন ঘটনার কত রকম ব্যাখ্যা করে। এমনকি বিকৃত অরুচিকর ব্যাখ্যাও করে। কী এল গেল তাতে? সব লোক যেমন সমান নয়, সব লোকের সব ভাবনাও তো তেমনি সমান গুরুত্বের নয়। যে যার মতো করে তো ব্যাখ্যা করবে!

সিদ্ধার্থ প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারী দিয়েছে, দূরদর্শী, অগাধ পড়াশুনা করা, সুবাগ্মী এবং বিপুল তার্কিক ব্যক্তিটির মুখোমুখি বসে আমায় প্রশ্নগুলি রাখতে হবে। মুখে প্রকাশ না করলেও অলোকেশ তো রীতিমত ক্ষুব্ধ তাদের অবস্থান ধর্মঘটে অংশগ্রহণ না করার জন্য। আর অয়ন তো প্রতিটি চিঠিতে এমন সব নির্দেশ পাঠায়, যেন তার মত ও পথের প্রচারক হিসাবে আমি নিজেকে তৈরী করি।

আমার মুখের পানে মাংগিলালের অমন নিষ্পাপ তাকিয়ে থাকা দেখতে দেখতে, নিজের অজান্তেই দু চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। আমি জানি হাজার চেষ্টা করেও আমি মাংগিলালের সরলতা এবং সৌজন্যের অধিকারী হতে পারব না। এটা ওর সহজাত প্রবৃত্তি এবং অবশ্যই এই সুপ্রবৃত্তিটুকু বজায় রাখার জন্য ও অন্য পাঁচজনের কথায় বা কাজে প্রভাবিত হয়নি।

ওই দেখ! অনেক আগে যেমন, এখনও সেই একইভাবে মাংগিলাল হাসিহাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। ভুল করে একবারও বলছে না, চিঠিটা খুলে দেখ দিদিমনি। সত্যি করে বল কে লিখেছে, আমার কথা কিছু লিখেছে কিনা!

সিদ্ধার্থ ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বোধহয় আমাকেই খুঁজছে। হঠাৎ বাগানে আমাকে আর মাংগিলালকে দেখে হনহন করে এগিয়ে এল, আগামীকাল সকাল করে বাড়ি ফিরো। দেখি যদি ওনাকে নিয়ে আসতে পারি। কথাটা বলেই সিদ্ধার্থ পিছন ফিরল। মাংগিলাল অস্ফুটে ডাকল, ছোটবাবু? সিদ্ধার্থ যেন শুনেও সে ডাক শুনতে পেল না। বড় বড় পা পেলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

— তুমি ডাকলে কেন, সিদ্ধার্থকে? আমি বেশ রাগত গলায় বললাম মাংগিলালকে।

আমার কথায় মাংগিলাল থতমত খেয়ে ভয় ভয় গলায় বলল, কেন? কোই গরমিল হয়েছে?

— দেখলে না, তোমার ডাকে সাড়া দিল না।

— না, না। মাংগিলাল ঘাড় দুলিয়ে হাসতে লাগল, এহি ঠিক বাত নয়। ছোটবাবু শুনেনি।

আমি জানি মাংগিলালের জবাবে কোন ছলচাতুরি নেই। ও সত্যি বিশ্বাস করেছে, সিদ্ধার্থ ওর ডাক শুনতে পায়নি। সিধে সরল মানুষদের নিয়ে এও এক অদ্ভুত বিপত্তি। মান অপমান বোধ না থাকায় অনেক সময়েই কোন কোন ব্যাপার কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায় না। তখন মানুষটির প্রতি অনুকম্পার পরিবর্তে রাগ হয়।

— মাংগিলাল তোমাকে যদি কেউ এক গালে চড় মারে, তুমি কি আর একটা গাল বাড়িয়ে দেবে? মাংগিলাল প্রথমে আমার প্রশ্নটি ধরতে পারল না। দ্বিতীয়বার বলার পর চোখমুখ কুঁচকে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। যেন তার সন্দেহ জেগেছে মনে, এ ধরণের প্রশ্ন আমি হঠাৎ করে করলাম কেন! তারপর আমি আবার যখন বললাম কী হল? বল।

— দিদিমনি? মাংগিলাল বেশ গম্ভীরভাবে বলল, ঝুটমুট অচানক আদমি চড় মারবে কেন?

— ধর যদি মারে? আমি বললাম, তুমি কী করবে তখন?

— হামি ভি মারবো।

— সত্যি?

— কিঁউ নেহী? মাংগিলাল যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম, তার গলার শিরা ফুলে উঠেছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েছে, মার কা বদলা মার। হ্যাঁ জরুর। বলে আবার বলল, বদলা মার। বয়সের ভারে মাংগিলালের সোজা শরীরটা নুব্জ হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। নিজের অজান্তেই মাংগিলাল শীর্ণ আঙুলগুলি মুঠো করে, যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ, এমনি উদ্যত ভঙ্গীতে দু হাতের মুঠো অল্প অল্প নাড়াচ্ছে।

মাংগিলাল যে অযাচিত আক্রান্ত হলে, তা প্রতিহত করার মতো শক্তি না হোক, মনের জোর দেখাতে পারে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। অর্থাৎ এতকাল আমি বা এ বাড়ির সকলে যেটা ভাবত যে, মাংগিলালের কোন মান অপমান বোধ নেই, যখন তখন

যে সে যেমন খুশি আচরণ করতে পারে তার সঙ্গে, এমনই আকার আকৃতিবিহীন একদলা মাটির মতো মানুষ, সেটি একশভাগ ঠিক নয়। হতে পারে আর পাঁচজনের মতো সে দুর্মুখ, বেপরোয়া, দুঃসাহসী নয়, আবার শীতকালের সাপের মতো শীতল, আক্রমণবিমুখও নয়।

মাংগিলালকে যেন এ বাড়িতে আমিই এবং আজই প্রথম নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। নিজের ওপর খানিকটা আত্মবিশ্বাস টের পাচ্ছিলাম। অয়ন অলোকেশদের মতো সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে না নেমেও, নেপথ্যে থেকে আমি ভেঙ্গে পড়া একটি মানুষকে প্রয়োজনে লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।

— মাংগিলাল?

—জী দিদিমনি?

— আমাকে কেউ যদি অপমান করে, তুমি বাধা দেবে তো?

— আলবৎ। মাংগিলাল রীতিমত চিৎকার করে উঠল। গলাটাও কেমন কর্কশ শোনাল, ও আদমীর জিব ছিঁড়ে লিব।

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি ইচ্ছে করেই হাসলাম, তুমি আমায় খুব ভালবাস, তাই না?

মাংগিলাল আমার হাসি এবং কথা বোধহয় কিছুই শুনতে পায়নি। ওর শরীরের মধ্যে হয়ত তখনও প্রতিহিংসায় তোলপাড় করছে রক্ত। সত্যি সত্যি ভেবে নিয়েছে শয়তান বদ স্বভাবের কোন একজন লোক, আমার আর ওর চারপাশে তক্কে তক্কে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই সেই বদলোকটা ওর গালে চড় মারবে এবং তার সঙ্গে আমায় লাঞ্ছিত করবে অশ্রাব্য ভাষায়, শারীরিক শ্লীলতাহানির দ্বারা।

— দিদিমনি, একঠো বাত শোনেন। মাংগিলাল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হামার পিতাজী গান্ধীবাবার ডাক শুনে জেলে গেল। জেলমে বহুত পরশান হোল। ছুট্টি মে ঘর এল তো ফির আংরেজ এল। পিতাজী সালেন্ডার ইন্তেজাম করল। তখন হামার মা বলল পিতাজীকে, তুম পালাও। হামি সামাল দিচ্ছি। মা আংরেজের লাঠি খেল, গাল শুনল। লেকিন কাঁদল না। কোই বাত ভী বলল না। হামার তখন দশ বরষ উমর আছে।

আমি অবাক চোখে মাংগিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, যে মানুষটিকে এতকাল অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত আসবাবের মতো ভেবে এসেছি আমরা, গর্ব করে বলার মতো তারও কিছু পারিবারিক ইতিহাস আছে। আমরা শিক্ষিত শহুরে মানুষেরা কত অল্প পুঁজি নিয়ে গৌরব-গাথা রচনা করি। গোপনে ইংরেজের দালালি করে স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্র পেয়েছেন আমাদের শহরেরই একজন মানুষ। আমি তাঁকে চিনি। স্বাধীনতা লাভের পর

তিনি সরকারি হাসপাতালে খাবার সাপ্লায়ের ব্যবসা করে অসৎ পথে প্রচুর টাকা অর্জন করেছেন। তাঁর ছেলেরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বাবার রেকমেনডেশনে রান্নার গ্যাসের ডিলারশিপ, রেশন দোকান, সরকারী বাড়ি তৈরীর কনট্রাকটারী, এইসবের ব্যবসা করে দেদার পয়সা লুটছে।

মাংগিলাল যা বলল, তার চার আনাও যদি ঠিক হয়, তাহলে তো মাংগিলালের অর্থনৈতিক অবস্থা এত করুণ হওয়ার কথা ছিল না। পরের বাড়ি দাসত্ব করতে করতে এভাবে তার জীবনটা শেষ হওয়ার কোন যুক্তি ছিল না।

অয়ন প্রায়ই বলত, স্বাধীনতা এসেছে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে। মেজরিটি যে তিমিরে ছিল, আজও সেই তিমিরেই। টোটাল রেভলিউশন বলতে যা বোঝায়, ভারতবর্ষে তা আজও হয়নি। তবে হবে। হতেই হবে। পৃথিবীর আবর্তনের মতোই তা ধ্রুব সত্য। তাই লড়াই আজও চলছে। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

যেমন অয়ন বিশ্বাসী বন্দুকের নলে। তার ধারণা শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু। কিন্তু মাংগিলালের মতো মানুষেরা, যারা সমাজের অচ্ছুৎ অপাঙক্তেয়, অথচ যাদের রক্তে রয়েছে লড়াইয়ের বীজ, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রয়েছে তীব্র ক্ষোভ আক্রোশ, অশক্ত শরীরের সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলি কী করবে? থেকে থেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে? বা হঠাৎ কোন অন্যায় দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, পরমুহূর্তেই নিজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান এবং অবস্থার কথা বিবেচনা করে, বহু কষ্টে ক্ষোভকে প্রশমিত করবে? দেখছি না, দেখব না, এমনি ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, লুকিয়ে চোখের জল মুছবে? আমার মনের প্রশ্নগুলি টের পেয়ে নাকি নিছকই কাকতালীয় ভাবে, ছোট্ট কিন্তু অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলল মাংগিলাল। সে আমার খুব কাছে সরে এসে, যেন কোন গোপন কথা বলছে এমনি সতর্কতায় চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, দাদাবাবু যে পথে আছে, ওই সাচ আছে। মার কে লেঙ্গে সব কুছ বদলে যাবে।

আমি তো রীতিমত তাজ্জব। মাংগলিাল কি কখনও অয়নের চিঠি খুলে পড়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে? কিন্তু ও তো লেখাপড়া শেখেনি। বাংলা অক্ষরও চেনে না। যদি অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়েও থাকে, অয়নের চিঠির সারাৎসার উপলব্ধি করা, আত্মস্থ করা আনকোরা কোন লোক, যে আমার মতো অয়নকে খুব কাছ থেকে স্টাডি না করেছে, তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

আমার নামে কোন চিঠি এলেই, মাংগিলাল ভাবে সেটা অয়নের লেখা চিঠি। সত্যি যেটি অয়নের চিঠি, তার অক্ষরগুলি কি টোটার চাইতেও ভারি। শব্দগুলি কি জ্বলন্ত কয়লার

টুকরোর মতো! আমার নামে পাঠানো মুখবন্ধ খামে ভরা প্রতিটি চিঠিতে মাংগিলাল টোটার ভার, জ্বলন্ত কয়লার উত্তাপ প্রত্যাশা করে! অয়ন জানল না মাংগিলালের হৃদয়ে সে কতখানি জায়গা জুড়ে আজও রয়ে গেছে!

ঝড়ে হেলে পড়া গাছের মতো নুব্জ শরীরটা একপাশে কাত করে কোনরকমে মাটিতে পা ঘষরাতে ঘষরাতে মাংগিলাল ফিরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি মাটিতে পড়ে যাবে। তা কিন্তু হবার নয়। আমি জানি মাংগিলালের শরীর বেয়ে শিকড়-বাকড় মাটির অনেক গভীরে নেমে গেছে।

শিকড়ের টান, সে যে বেজায় শক্ত।

এগারো

এমনিতে আবাসিক মফস্বল শহর বলতে যা বোঝায়, আমাদের শহরটি তাই। আয়তনে খুব বড় নয় বলে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম না জানলেও, মুখ চেনে। বদমাইশ, গুণ্ডা প্রকৃতির কয়েকজন এবং চোরাই কারবারী, হাবভাবে সন্দেহজনক দু'চার জন আছে। তারা সংখ্যায় অল্প বলেই হয়ত বেশী সংখ্যক শান্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করে এবং শহরের বুকে বসে সগর্বে নিজেদের অপকর্মের জাহির করার সাহস পায় না। কিম্বা হয়ত ভাল মানুষের দল নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই সব মুষ্টিমেয় খারাপ মানুষগুলিকে এড়িয়ে চলে। কারণ যাই হোক না কেন, এতে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় আছে। মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করে। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে স্বামী স্ত্রী নিরুপদ্রবে বাড়ি ফিরতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি মিছিল মিটিং করে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দল কখনোই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। আজ এ দল ছ'ঘণ্টার পথ অবরোধ করলে, কাল অন্য একটি দল অবরোধের বিরোধীতা করার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা বন্‌ধ ডাকে না। রাজনীতি নিয়ে বড়জোর রাস্তার ধারের ধাপিতে, চায়ের দোকানে বা গঙ্গার ধারে বয়স্কদের বৈকালিক আড্ডায় সময় বিশেষ কিছু গরম কথার চালাচালি হয়, তথ্যের চাপান উতোর চলে। মতপার্থক্যটুকু কিন্তু এই সীমারেখার মধ্যেই আটকে থাকে। আলোচনা শেষ তো, যে যার সামাজিক অবস্থানে ফিরে বন্ধু, প্রতিবেশী বা এককালের সহকর্মী। তখন বাজারদর, ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যর্থতা, ভাড়াবাড়ি নিজের বাড়ির সুবিধা অসুবিধা এইসবের আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠে। এমনকি উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও একই ধরণের প্রবণতা। ফলে দেখ না দেখ, খুনখারাপি, অবিরাম বৃষ্টিপাতের মতো বোমা বর্ষণ,

অপহরণ, বন্‌ধ, অবরোধ, এসব আমাদের শহরে নেই।

আজ ভোর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল, পরপর কয়েকটি বোমের শব্দে। অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসে প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। মনে হল বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে এক দঙ্গল মানুষ ছুটে চলে গেল, কিছু বলতে বলতে। লোকগুলি কী বলছে বুঝতে পারলাম না। কারণ তাদের মিলিত কথাবার্তা হৈ হৈ শব্দের মতো শোনাচ্ছে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে আমি ঘরের আলো জ্বাললাম। তারপর কী হয়েছে দেখবার জন্য জানলা খুলতেই আধো অন্ধকার রাস্তা থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ কর্কশ গলায় চীৎকার করে উঠল, জানলা বন্ধ করুন। তা না হলে বিপদ হবে।

হুঁশিয়ারীটা যে আমাকেই দেওয়া হচ্ছে এটা বুঝতে পেরেই ঝপ করে জানলা বন্ধ করে দিলাম। পাশের ঘরে সিদ্ধার্থেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ও আমার মতো হতচকিত হয়ে ঘরের আলো জ্বেলেছে। তবে জানলা খোলেনি। পরিবর্তে সন্তর্পণে দরজা খুলে বারান্দাটুকু পার হয়ে এসে আমার ঘরের দরজায় আস্তো টোকা দিল, দিদি? এই দিদি? দরজাটা খোল একবার।

সিদ্ধার্থ ডাকছে বুঝতে পেরেও, দরজা খুলতে আমার বেশ ভয় করতে লাগল। সিদ্ধার্থ দ্বিতীয়বার চাপা গলায় 'দিদি' বলতে ডাকতে, আমি যথাসম্ভব নীচু গলায় বললাম, খুলছি। চেঁচাস না।

আমি খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এসে ঘরের দরজা খুললাম। সিদ্ধার্থ ঝোড়ো হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকে, আমি কিছু বলবার আগেই নিজে দরজাটা বন্ধ করে দিল। হাত দিয়ে চাপ দিয়ে এমনভাবে হুড়কোটাকে পরখ করল যেন বাইরে ঝড়ের তান্ডব শুরু হয়েছে। হুড়কোটা শক্ত করে না লাগালে ঝড়ের ঝাপটায় এখুনি দরজাটা বিকট শব্দে দু'পাশের দেওয়ালে আছড়ে পড়বে। সিদ্ধার্থর চোখ মুখে ভয় উৎকণ্ঠার ছাপ। ওকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। ফ্যালফ্যালে চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, গুলির আওয়াজ শুনতে পাওনি?

— গুলির আওয়াজ? আমি বোকার মতো ঘাড় নেড়ে বললাম, আওয়াজ? না তো!

— কোন আওয়াজ শুনতে পাওনি?

এবার ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ তবে গুলি তো নয়। বোমের আওয়াজ।

— তুমি বোধহয় অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে?

— হ্যাঁ। আমি বললাম, কেন?

— অনেকক্ষণ ধরে কিছু লোক রাস্তা দিয়ে দুমদ্াম ছোটাছুটি করছিল। ফিস ফিস করে

নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল। তারপর কয়েকজন লোক 'ধর ধর' করতে করতে কাকে যেন তাড়া করে ছুটে গেল। এই অব্দি বলে সিদ্ধার্থ অল্প একটু থামল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই দুম করে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নাইট বাল্বটা জ্বেলে দিল, মনে হল যে ছুটে পালাচ্ছিল, তিনচারজন দৌড়তে দৌড়তে এসে তাকে ধরে ফেলে এলোপাথারি মারতে শুরু করল। মার খেতে খেতে লোকটা একবার ককিয়ে উঠল, 'মাগো' বলে, আর বিশ্বাস কর! — সিদ্ধার্থর চোখমুখে আতঙ্কের ছাপ, 'মাগো' বলার সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিনবার গুলির শব্দ। তার মানে লোকটাকে ওরা খতম করে দিল। হয়ত আমাদের বাগানের দরজার সামনেই বা একটু ওপাশে লোকটার ডেড বডি এখন পড়ে আছে।

সিদ্ধার্থর মুখে 'ডেডবডি' শব্দটা শোনা মাত্রই আমার পিঠ বেয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে একটি ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত আগেও জীবিত ছিল এমন একজন মানুষ, আততায়ীর গুলি খেয়ে লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে আমাদের বাড়ির সামনে!

খবরের কাগজে পড়েছি এলাকা দখলের জন্য দুটি সমাজবিরোধী দল পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে। বা রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন একটি দলের কয়েকজন মিলে তাদের বিপরীত দলের কোন নেতা বা সাধারণ একজন কর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং এই জাতীয় লড়াই-এ বন্দুকের ব্যবহার এখন জলভাত হয়ে গেছে। কাগজে পড়া আর এই জাতীয় একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি ঘুমোচ্ছিলাম, কিন্তু কোন কারণে ঘুম না আসার জন্যে, সিদ্ধার্থ বিছানায় জেগে শুয়ে শুয়ে সমস্ত ঘটনাটির সাক্ষী হয়ে রইল। যেহেতু এ ধরণের একটি নিষ্ঠুর ভয়াবহ ঘটনা আজই প্রথম ঘটল আমাদের শহরে, সুতরাং সিদ্ধার্থর ভয় পাওয়া এবং ঘাবড়ে যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আমার বিছানার মশারীর একটি কোণ খুলে দিয়ে ও শোকগ্রস্ত বা দীর্ঘদিন ধরে রোগগ্রস্ত একজন মানুষের মতো বিছানার এককোণে বসে পড়ে ক্লান্ত গলায় বলল, একটু জল খাওয়াবে?

আমি বুঝতে পারছি অভিজ্ঞতাটি আনকোরা বলে সিদ্ধার্থ শুধু ভয় পেয়েছে, তা নয়। যথেষ্ট বিচলিতও হয়ে পড়েছে।

আমি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে, জলভর্তি গ্লাসটা সিদ্ধার্থর হাতে তুলে দিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার ডানহাতটি অল্প অল্প কাঁপছে। পায়ের তলা বেশ ঘেমে গেছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ব ঘরের মেঝেতে। তাড়াতাড়ি সিদ্ধার্থর হাতে জলের গ্লাসটি দিয়েই বিছানায় ওর পাশে বসে পড়লাম। শাড়ির আঁচলে

ঘাড় গলা কপালের ঘাম মুছলাম। কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হল, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। দু কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে এমন শব্দ হচ্ছে যে বাইরের আর কোন আওয়াজ কানের পর্দা ভেদ করে ভেতরে পৌঁছতে পারছে না। চোখের ইশারায় সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার বল তো?

সিদ্ধার্থ আমার প্রশ্নটা আঁচ করতে পেরে প্রথমে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ সে কিছু জানে না। বা বুঝতে পারছে না। তারপর বন্ধ জানলার দিকে অল্পক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে থেকে স্বগতোক্তির মতো করে বলল, গড় নোজ, কে কাকে মার্ডার করল!

আক্ষরিক অর্থে 'খুন' এবং 'মার্ডার'-র মধ্যে কোন ফারাক নেই। কিন্তু 'মার্ডার' শব্দটির মধ্যে অদ্ভুত রকমের গা-ছমছমানি ভাব আছে। তার সঙ্গে রহস্যের ঘনঘটা। আমাদের এই ছোট্ট শান্ত নিরুপদ্রব শহরটিতে পরিকল্পনামাফিক একজন মানুষ খুন হয়ে যাবে ভাবতেই, ভয় যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তার মানে যে মার্ডার হল এবং যারা সেই ভয়ংকর কাজটি করল, তারা এই শহরেরই বাসিন্দা! হয়ত আমার খুবই পরিচিত ঘনিষ্ঠ বা আলাপ না থাকলেও আমি তার বা তাদের মুখ চিনি। রাস্তাঘাটে দেখা হলে আমার সঙ্গে হেসে গল্প করেছে বা ঘাড় কাত করে কুশল জানিয়েছে। সেইসব শান্ত নিরীহ মুখগুলির মধ্যেই কয়েকজন খুনী মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! যে খুন হল হয়ত সে নিতান্তই ছাপোষা একজন মানুষ। সে তার খুনীদের চিনতে পারেনি। বা তাদের গোপন কোন অসামাজিক কাজের খবর জানতে পারার জন্যই, তাকে খুন করে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হল। অর্থাৎ আমাদের এই আপাত নিরীহ শহরে অন্যায়ের বীজ রোপিত হয়েছে বহুদিন আগেই। আমরা জানতে পারিনি। বুঝতে পারিনি। যে কজন সেই সমস্ত অসামাজিক কাজগুলির খোঁজখবর জেনে গিয়েছিল, আজকের 'মাগো' বলে আর্তনাদ করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেও যাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হল, সে ওই 'কজনের' একজন। অপরাধীরা তাকে হত্যা করে পরোক্ষে বুঝিয়ে দিল, কোন কারণে তাদের পথ আগলাবার চেষ্টা করবে যে, তাকে ওইভাবে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

অয়ন প্রায়ই বলত, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাটা বড় ধরণের অপরাধ। তাহলে যে লোকটিকে হত্যা করা হল, প্রতিবাদ তার রক্তে প্রবহমান। সে কি অয়নের মতোই বিশ্বাস করে একমাত্র সরাসরি প্রতিবাদ করাই যে কোন সুস্থ সামাজিক মানুষের একান্ত কর্তব্য! অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য লড়াই করাটা কিছু মানুষের রক্তে আজও রয়েছে। কিন্তু তার মূল্যে যদি নিরস্ত্র অসহায়ভাবে জীবন দিতে হয়, তবে তো প্রতিবাদের কোন রক্ষাকবচই নেই। ভবিষ্যতে অন্যায় দেখেও, মানুষ মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। যে যত বড় প্রতিবাদীই

হোক না কেন, তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি হল বেঁচে থাকা।

ভাবলেশহীন মুখ করে সিদ্ধার্থ এমনভাবে বসে রয়েছে, যেন এই ঘটনাটির কথা সে আগেই জানত। ঘটে যাওয়ার পর, এখন পরবর্তী পর্যায়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। বা নিজে সে যেহেতু একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, হয়ত তাই ভাবছে এই ধরণের আক্রমণ তার বা তার অন্য কোন সহযোদ্ধার জীবনেও যে কোন সময়েই ঘটতে পারে। চুপচাপ বসে সেই সম্ভাব্য ভয়ংকর দিনটি কীভাবে মোকাবিলা করবে, তার ঘুঁটি সাজাচ্ছে। আমার বিশ্বাস আমাদের আশপাশের বাড়ির মানুষেরাও বীভৎস আওয়াজটা শুনেছে। কিছু মানুষের দ্রুত ছুটে যাওয়ার শব্দ, তাদের চাপা গলার তর্জন গর্জন এবং নিহত মানুষটির কাতর করুণ গলার 'মাগো' ডাকটিও শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ভয়ে তারা কেউ ঘরের আলো জ্বালেনি। জানলা খুলে দেখার চেষ্টাও করেনি। এমন নয় যে এ ধরণের ঘটনা রোজই ঘটে। তাই খানিকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমি বা সিদ্ধার্থ যেমন, তারাও এই নতুন অভিজ্ঞতায় পাজলড্ হয়ে গেছে। ভয়ও পেয়েছে।

সিদ্ধার্থকে বললাম, লোকগুলো কী বলছিল, বুঝতে পারিস নি? সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বলল, লোকগুলো চাপা গলায় কথা বলছিল তো। কেমন করে বুঝব?

— আর যে লোকটা 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠল, তার গলাটা চিনতে পারিসনি?

— মনে হল যেন! সিদ্ধার্থ চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, চেনা। কিন্তু কিছুতেই নামটা মনে করতে পারছি না।

সিদ্ধার্থর উত্তরটা আপাত নিরীহ মনে হলেও, আলো আঁধারীর মতো অদ্ভুত রহস্যময়তায় ভরা। আমার মনে হল ঘটনার আকস্মিকতায় সিদ্ধার্থ ভয় পেয়েছে, কিন্তু লোকটি যে খুন হয়েছে, আমাদের বাগানের দরজার কাছাকাছি কোথাও তার রক্তাপ্লুত শরীরটা পড়ে আছে, এমন নিশ্চয়তা ও পেল কোথা থেকে?

— ধর, তোর কথামত! আমি বললাম, ডেডবডিটা আমাদের বাগানের দরজার ঠিক সামনে বা দরজার গা ঘেঁসে ফেলে রেখে গেছে খুনীর দল। তাতে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি খানাতল্লাশি করতে পারে তো? বা আমাদের জেরা করতে পারে?

— সেটাই তো স্বাভাবিক। সিদ্ধার্থ জবাব দিল, ডিটেকশনের ক্ষেত্রে প্লেস অফ্ অকারেন্সের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বৈকি!

— কী হবে তাহলে? সত্যি আমার গলা ধরে আসছিল ভয়ে, যদি ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে বাগানের দরজায় লাথি মেরে খুলে হুড়মুড় করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে?

— অনেক কিছুই হতে পারে। সিদ্ধার্থ দার্শনিকের ভঙ্গীতে বলল।

— আমার কথা বাদ দে। আমি বললাম, প্রথমত আমি মেয়েমানুষ, দ্বিতীয়ত স্থানীয় একটি স্কুলে পড়াই। আমাকে তেমনভাবে সন্দেহ করার কেউ নেই। কিন্তু তুই কী করবি তখন?

— আমি? দুচোখ বড় বড় করে সিদ্ধার্থ বলল, আমাকে পুলিশ অযথা হ্যারাস করবে কেন? একটু থেমে বলল, বড় জোর মামুলি কিছু প্রশ্ন করবে। কোন ইনসিডেন্ট ঘটে গেলে আশপাশের লোকজনদের যেমন প্রশ্ন করে সেই জাতীয়।

পড়া মুখস্থ বলার মতো করে সিদ্ধার্থ কথাগুলি বলে গেল। কিন্তু ওর গলায় কোথায় যেন একটা অসহায়তার ছোঁয়া রয়েছে বুঝতে পারলাম।

— তুই একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা! আমি বললাম, পুলিশকে তো জানিস! গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ওরা কত দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

— সেটা ঠিক কথা! সিদ্ধার্থ ঘাড় নাড়িয়ে আমার কথা সমর্থন করল, তবে কিনা, আমাদের সংগঠন তো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। আর ব্যক্তি হত্যায় বিশ্বাসীও নয়। বরং এর উল্টোটা। আমরা বিশ্বাস করি প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শ অর্থাৎ কিনা পারস্পরিক প্রেম প্রীতি এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের মধ্যে দিয়েই ...!

— চুপ কর তো। সত্যি আমার বিরক্তি লাগছিল সিদ্ধার্থর লেকচার। একঘেয়ে গতে বাঁধা অসম্ভব অবাস্তব কিছু শব্দের রিপিটেশন। একজন মানুষ খুন হয়ে গেছে। সামান্যক্ষণ আগে। রক্তের দাগ এখনও শুকোয়নি। ভোর না হতেই সারা শহর জুড়ে তোলপাড় শুরু হবে। আর সিদ্ধার্থ যেমন বলল, সেইমত যদি সত্যি সত্যি মৃতদেহটি আমাদের বাড়ির আশেপাশে কোথাও পড়ে থাকে, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই আমাদের ক্ষেত্রে বেশী হবে। আমরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই, এটা হয়ত সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু এত বড় একটা কান্ড ঘটে গেল, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, এ কথাটা অনেকেই মানতে চাইবে না। বিশেষত পুলিশ তো নয়ই। আর জেরার মুখে বা ঘাবড়ে গিয়ে সিদ্ধার্থ যদি বলে বসে ও আততায়ীদের ফিসফিসে গলায় কথাবার্তা বা নিহতের করুণ গলায় 'মাগো' আর্তনাদ শুনেছে বা যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় যে জানলা খুলে দেখার চেষ্টা করেছিলাম! জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তখন আমাদের অবশ্যই থানায় আসতে বলবে। সেখানে ঠিকুজি কুষ্টি নাড়াঘাঁটা করতে করতে যদি আচমকাই অয়নের প্রসঙ্গ ওঠে, আমার মনে হয় না, পুলিশ নিজের অকর্মণ্যতাকে ঢাকা দেবার জন্য অয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্কের জের ধরে খুনের রহস্য আবিষ্কারের এমন নির্ঝঞ্ঝাট অনায়াস সুযোগটুকু হাত ছাড়া করবে।

সিদ্ধার্থকে ধমকে চুপ করালাম বটে, কিন্তু চোরাস্রোতের মতো ভয় এবং দুশ্চিন্তার একটি ধারা আমার সারা শরীরের এখানে সেখানে খেলে বেড়াতে লাগল।

ভোর হতে খুব বেশী দেরী নেই। বিক্ষিপ্তভাবে একটি দুটি করে পাখি ডাকছে। দিনের প্রথম ব্যান্ডেল লোকালের হর্ণ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। স্টেশন চত্বরে দৈনিক কাগজের কয়েকজন বিক্রেতা, কাঁচা আনাজের কিছু কারবারী ভোর রাতের এই ট্রেনটিতে যায়। শুনেছি ওরা নাকি দলবদ্ধভাবে একটি কম্পার্টমেন্টে ওঠে। ওদের সঙ্গে লাঠি, দু-একজনের জামার নীচে ধারাল অস্ত্রও থাকে। টাকা পয়সা ছিনতাইয়ের ভয়ে এরা এইসব সাবধানতা নেয়। দিনের প্রথম ট্রেনটির একদল মানুষ, যারা আমাদের এই শহরেরেই বাসিন্দা, তারা জানতেও পারল না, তাদেরই শহরের একজন মানুষ সামান্যক্ষণ আগেই খুন হয়ে গেছে। এখন সে লাশ হয়ে পড়ে রয়েছে স্টেশন থেকে কয়েকশ গজ দূরে। ভোরের ব্যবসায়ীদের মতো নিহতের সঙ্গে অন্য দ্বিতীয় একটি মানুষও ছিল না নিশ্চয়ই, যে অন্তত চীৎকার করে পড়শীদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারত বা সামান্যতম বাধা দেবার চেষ্টা করত। আত্মরক্ষার জন্য নিহত মানুষটির কাছে লাঠি বা ধারাল কোন অস্ত্র ছিল না নিশ্চয়ই যা দিয়ে সে ন্যূনতম প্রতিরোধ করতে পারত! হয়ত হতভাগ্য মানুষটিকে কুকুরের মতো তাড়া করে ছুটিয়ে এনে, যখন তার কষের দুপাশ বেয়ে সাদা গ্যাঁজলা বেরিয়ে আসছে, তখনই তাকে ঘিরে ধরে নারকীয় উল্লাসে একটা দুটো নয়, পরপর তিনটে গুলি মেরে আততায়ীরা নিশ্চিত আরাম এবং স্বস্তি বোধ করেছে।

নাইট বাল্বের অল্প আলোর মধ্যে আমার সামান্য তফাতে নিশ্চুপ বসে সিদ্ধার্থ। এখন তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সময় যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকার সরে গিয়ে নতুন দিনের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে, সিদ্ধার্থ যেন অসহায় থেকে অসহায়তর অবস্থার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সিদ্ধার্থ এমনভাবে বসে রয়েছে যেন আস্তো ঠেলা দিলেই ও ঢুস করে পড়ে যাবে।

— একটু চা খেলে হোত। আমি ঘরের দমবন্ধ আবহাওয়াটাকে কাটাবার জন্য বললাম। আর সত্যি সত্যি আমার সারা শরীর জুড়ে এমন ক্লান্তি এবং অবসাদ যে মনে হচ্ছিল গরম এক কাপ চা এবং তার সঙ্গে ক্রোসিন জাতীয় একটি ট্যাবলেট খেলে বোধ হয় একটু চাঙ্গা বোধ করব। চায়ের কথায় সিদ্ধার্থও সামান্য নড়ে চড়ে বসল। কিন্তু পরমুহূর্তেই দুচোখ বড় বড় করে ভয়চকিত গলায় বলল, পাগল হয়েছ! এই সময়ে কেউ আলো জ্বালায়! একটু চুপ করে থেকে বলল, আর তো দু এক ঘণ্টা পরে সব জানাজানি হবে যাবে, তখন না হয় ...!

সিদ্ধার্থ এমনভাবে বলল যেন আর কিছু সময় পরেই খুনের রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে এবং তখন আমরা নির্দোষী প্রমাণিত হয়ে দুহাত ধুয়ে আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দেব, আঃ! তখন যা কিছু জল্পনা কল্পনা, সম্ভাব্য কারণ এবং খুনীর চরিত্র মোটিভ এসব নিয়ে আলোচনা, তত্ত্বতালাশ হবে, আমরা সে সবের ছোঁয়ার বাইরে থাকব। আমাদের সম্বন্ধে নূন্যতম প্রশ্নও জাগবে না কারোর মনে। তখন আমরা পরম নিশ্চিন্তে আয়েস করে বসে, রোজ যেমন করি খবরের কাগজের টাটকা খবরগুলির ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে চায়ের কাপে সুরুৎ সুরৎ করে চুমুক দিই, সেইভাবে প্রতিদিনের মতোই শুরু হবে আজকের দিনটিও। নিজেদেরকে যারা একশভাগ নিরাপদ মনে করে, তারা ভুলে যায়, আগুন যে বা যারাই লাগিয়ে থাকুক না কেন, আগুন যখন জ্বলতে শুরু করেছে, তার আঁচ তাদের গায়েও লাগবেই। সিদ্ধার্থ ভাবছে এই মুহূর্তে ঘরের আলোটুকু না জ্বালিয়ে নিজেদের জাগ্রত অস্তিত্ব কোনরকমে না জানানো গেলেই বোধহয়, সবরকম নৈতিক দায়িত্ব, জিজ্ঞাসাবাদ এবং সন্দেহের হাত থকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে নির্দোষী, নিরপরাধ প্রমাণ করাটাই একান্ত জরুরী। এতে সবার সামনে যেমন, নিজের ভেতরেও একটা জোর পাওয়া যায়। বিশ্বাস অনুভূত হয়।

সিদ্ধার্থর মতো না হলেও, ভয় এবং উৎকণ্ঠা আমারও যে হচ্ছিল না, তা নয়। তবে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল, এমন নিষ্ঠুর করুণ একটি ঘটনা থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা মোটেই সাধুবাদযোগ্য নয়। খুনীকে আমি ধরব না, ঘটনার খানাতল্লাসিও চালাব না, কিন্তু যে মানুষটি খুন হয়ে গেল, সে দোষী বা নির্দোষী যাই হোক না কেন, এ ধরণের ঘটনার নিন্দা তো করতে পারি! করা উচিতও। যে কারণে গতকাল বিকালে অলোকেশদের ঘটনার মধ্যে কোনরকম আগাম প্রস্তুতি ছাড়াই আমি একা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম, অতগুলি মারমুখী, উন্মত্ত মানুষদের বিরুদ্ধে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচারে আমার কাজটি ঠিক না বেঠিক, উচিত না অনুচিত, আমি ওসব নিয়ে ভাবি না। অনেকে মিলে নিরস্ত্র একজন মানুষকে মারার মধ্যে রাজনীতির কোন অধ্যায়ের পাঠের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে কিনা আমি জানি না। একজন মানুষকে হত্যা করলে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে ধারাবাহিক সংগ্রাম বা জনমত গঠনের কোন প্রশ্নই আসত না।

সিদ্ধার্থকে বললাম, যে মরে এবং যারা মারে, দুপক্ষই কাওয়ার্ড।

— কাওয়ার্ড বলছ কেন? সিদ্ধার্থ বলল, যে প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে, বাঁচার ইচ্ছে প্রবল বলেই তো দৌড়চ্ছে। স্বেচ্ছায় কে মরতে চায় বল! একটু থেমে বলল, ক্ষুদিরাম যে

ফাঁসিতে গেছিল সেটাও পুরোপুরি নিজের ইচ্ছেয় নয়। তাকে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

— ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের আসল কারণটুকু কেবল তুই জানিস! আমি ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বললাম।

— শুধু আমি কেন! সিদ্ধার্থর গলায় সামান্য ঝাঁঝ, সবাই জানে। ওই যে বল না বিখ্যাত উপন্যাসটায় এর উল্লেখও আছে।

— ঐতিহাসিক সব ঘটনাকেই এখন নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যেমন ডাক্তারবাবুরা একই খাদ্যের পুষ্টি অপুষ্টি নিয়ে আজ যা বলছেন, কাল তার উল্টোটা বলছেন। আমি বললাম, ইতিহাসকে বিকৃত করার ইতিহাসটা নতুন কিছু নয়।

সিদ্ধার্থ আস্তো করে হাসল, প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে বাস্তব কারণ যেমন আছে, আবার আবেগ উচ্ছ্বাসেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। ধর না কেন অয়নদারা যে পথে হাঁটছে, ওরা নিজেরাও জানে, এ পথের কোন দিশা নেই।

— না বুঝেই হাঁটছে? আমি গলাটাকে খাটো করে বললাম, তোর মতো একজন তাত্ত্বিকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল, বল?

আমার কথায় সিদ্ধার্থ দপ করে রেগে উঠল, আমি বা আমার সংগঠনের কেউ-ই কোনদিন ভাবি না, আমরা যে পথে চলেছি, সেটাই চূড়ান্ত এবং একমাত্র পথ। বরং আমরা বিশ্বাস করি, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই বদলায়। প্রয়োজনে মত এবং পথেরও বদল হয়। কারণ অ্যাবসলিউট ট্রুথ বলে কিছু নেই।

আমি অবাক হয়ে সিদ্ধার্থর মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। সেই সিদ্ধার্থ! যাকে মায়ের মতো মানুষ করেছি, সে আমাকে পথের নিশানা বোঝাচ্ছে! কেবল বোঝাচ্ছেই না, অয়নের মতাদর্শেরও বিরোধীতা করে পরোক্ষে আমাকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে, ভুলেও আমি যেন অয়নের রেফারেন্স দিয়ে দেশ কাল সময় বা সময়োচিতকর্তব্য করণীয় কী, এইসব বিষয়ে তাকে বিন্দুমাত্র বোঝাবার চেষ্টা না করি। একবার ইচ্ছে হল বলি, যে একটি খুনের ঘটনার সাক্ষী হওয়ার ভয়ে, ঘরের আলো নিভিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বন্ধ ঘরে বসে থাকে, অয়নের মতো প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার কথা, সে কখনও, কোন অবস্থাতে ভাবতে পারে? আর সেইজন্যই নির্লোভের, ভয়হীনতার বা আত্মত্যাগের কাহিনীকে গল্প বলে চালাতে বা সেই কাহিনীর পিছনে সুবিধাবাদের ছায়া দেখতে পায়। বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আসল কাহিনীর ল্যাজামুড়ো উল্টেদিয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে আড়াল করতে চায়।

— আমার মনে হয়! এমনভাবে বললাম যে, সিদ্ধার্থ ভাবল আমি বুঝি সত্যি তার কথা মেনে নিয়েছি।

আবেগ উচ্ছ্বাস বা অন্যের বাহবায় তোল্লা খেয়ে তোর একটা কিছু করে দেখানো উচিত। একটু থেমে বললাম, যেই খুন হয়ে থাকুক না কেন, মোটের ওপর সে তো আমাদের শহরেরই একজন মানুষ। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে একবার দেখ না! বলা তো যায় না লোকটা হতো সত্যি এখনও মরেনি। মৃত ভেবে আক্রমণকারীরা পিছটান দিয়েছে। আমাদের বাড়িতে এনে সামান্য সুশ্রূষা করলে লোকটা হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখ না।

সিদ্ধার্থ আমার বলার ধরণ থেকেই বুঝতে পেরেছে আমি ওকে শ্লেষ করছি। ওর অস্ত্রেই ওকে ঘায়েল করতে চাইছি।

আজই প্রথম দেখলাম, নিজের অক্ষমতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্য প্রসঙ্গ টেনে এনে আলোচনার গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে সিদ্ধার্থর জুড়ি নেই!

গতকাল রাতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল ঘুম হয়নি? সিদ্ধার্থ আমাকে বলল।

— কোন রাতেই আমি ঠিকমতো ঘুমোতে পারি না। সারাদিন পরিশ্রম করার পরও রাতে সহজে ঘুম আসতে চায় না। নানারকম চিন্তা শরীরের মধ্যে তোলপাড় করে। অন্ধকার বিছানায় একা জেগে বসে থাকি কোন কোন রাতে।

— রাতে ঘুমটা খুব জরুরী। সিদ্ধার্থ বলল, উপায় একটাই। তা হল ঘুমের আগে প্রতিদিন তোমায় অন্তত ১৫/২০ মিনিট মেডিটেশন করতে হবে। এতে শুধু যে মনের চঞ্চলতা দূর হয়, তা নয়। যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে যে দোনামোনা ভাবটা আসে, সেটাও দূর হয়।

— সে না হয় পরের কথা। আমি বললাম, এখন আমাদের কী করা উচিত বল?

— কী আবার? সিদ্ধার্থ দু কাঁধ ঝাঁকাল, সকাল হলে সবাই যখন জানতে পারবে কে খুন হল, আমরাও তখন জানতে পারব। কেন খুন হল বা কারা খুন করল, এসব নিয়ে সবাই যেমন আলোচনা করবে, আমরাও তাই করব। আর সত্যি বলতে কি জানো দিদি! বলে সে দূরছাইয়ের ভঙ্গীতে বলল, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। যারা মারছে তারা ভাল লোক নয় যেমন, যাকে মারছে সে'ও তেমন সুবিধের নয়। নিশ্চিত জানবে।

আমার মনে হল এরপর আর কোন কথা চলে না। সিদ্ধার্থ যেভাবে ঘাতক এবং নিহতের জেনারালাইজেশন করল, তাতে আর যাই হোক, ওর সঙ্গে যুক্তি তর্ক শুধু অর্থহীন নয়, সময়ের অপচয়ও বটে। আর কেন জানি না, নিজের মনের মধ্যে অদ্ভুত অভিমান হল, সিদ্ধার্থ বয়সে এবং সম্মানে আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও, ও আমার প্রতিটি কথার

বিরোধীতা করে কেন! কেন এই বিশ্বাস ভরসাটুকু ওর মনে জন্মায়নি যে, দিদি যেটা বলছে, সেটা ঠিক হতেই পারে! বা বয়সের অভিজ্ঞতায় দিদির মতামত এবং সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ওর চেয়ে জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য!

কোন ব্যাপারে অকারণে পিছিয়ে আসতে হলে, নিজেকে খুব দুর্বল, অক্ষম বলেই মনে হয়। নিজে জানছি এটা ঠিক নয়, বুঝতে পারছি এ পথটি সঠিক পথ নয়, তারপরেও নিজেকেই গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। প্রয়োজনে পিছিয়েও আসতে হচ্ছে। এ এক ধরণের পরাজয়। আজ যদি সিদ্ধার্থর জায়গায় অয়ন থাকত, আমি অবধারিতভাবে আমার যুক্তিকে খাড়া করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। কোন অবস্থাতেই অয়নের চাপিয়ে দেওয়া মতামত বা প্রসঙ্গ পাল্টানোর চালাকিকে প্রশ্রয় দিতাম না। কিন্তু আশ্চর্য, সিদ্ধার্থর সঙ্গে আমার অতিরিক্ত একটি কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। বুঝতে পারছি সিদ্ধার্থ মনে মনে যথেষ্ট উৎফুল্ল। কারণ সে তার মতো করে যা বলার বলে দিয়েছে, এমনকি অয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আমাকে বিব্রত করতেও এতটুকু পিছপা হয়নি। পরিবর্তে ওর যুক্তির অসারতা বুঝেও, ওর চালাকি ধরতে পেরেও আমি-ই চুপ করে গেলাম। নিজেরই মনে হল ভাই বলে স্নেহবশত সিদ্ধার্থকে করুণা দেখানোর জন্যই 'ঠিক আছে বাবা' এই রকম স্পষ্ট প্রতীয়মান উপসংহার টানলাম।

বাবা বলতেন তর্ক করে বোকারা। আমার ধারণায় এটা সর্বাংশে সত্যি নয়। তাহলে তো, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি তর্কের পরিবর্তে, সুস্থ চিন্তাশীল মানুষকে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সত্যান্বেষী কোন মানুষ তো আর পেশীবল দেখাবেন না। তিনি যুক্তি উদাহরণ এইসবের জোরেই নিজের মতামতকে তুলে ধরবেন। এখন মনে হয় বাবা বোধহয় 'বোকা' বলতে সেইসব মানুষকে বোঝাতেন, যারা একগুঁয়ের মতো ঠিক বেঠিক, ন্যায় অন্যায় বিচার না করেই, নিজের মতামতকে একরকম জোর করে অপরের ওপর চাপিয়ে দেন। আপাতভাবে হয়ত মনে হয় তিনি তর্কের জাল বিস্তার করছেন, মূলত তিনি যেটা করছেন, স্রেফ গাজোয়ারী। স্বভাবতই তাঁর গলার জোর বেশী হবে। অপরের বক্তব্য শোনার ধৈর্য তাঁর থাকবে না এবং অবশ্যই তর্কের বিষয়বস্তুর বাইরে গিয়ে অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করে বা ব্যক্তি আক্রমণের পথে তিনি প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবেন। বাবা ঠিকই বলতেন, এই জাতীয় মানুষের সঙ্গে তর্ক করেন যিনি, তিনি বোকা। যেমন সিদ্ধার্থকে এতক্ষণ ধরে বোঝাবার যে অলীক চেষ্টা আমি চালাচ্ছি, তাতে আমি অবধারিতভাবে বোকা-ই। কারণ সিদ্ধার্থ তো পণ করে বসেই আছে, ও কিছু শুনবে না। আমার কোন কথা মানবে না। কোন যুক্তিকে স্বীকার করবে না।

বিছানা থেকে নেমে আমি ঘরের দরজা খুললাম। সিদ্ধার্থ ব্যস্ত গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

— রান্নাঘরে। আমি আস্তে করে বললাম, তুই না খাস, না খাবি। আমার চা খাওয়া একান্ত দরকার। মাথাটা ভার ভার লাগছে।

— আমি যাব তোমার সঙ্গে? সিদ্ধার্থ বলল। আমি হেসে বললাম, কেন? একলা ঘরে থাকতে তোর ভয় করবে?

সিদ্ধার্থ রেগে গেল, বাজে কথা বল কেন?

— না, মানে তুই তো! ইচ্ছে করেই শব্দগুলিকে ছেড়ে ছেড়ে উচ্চারণ করলাম, ভোরের আলোর অপেক্ষায় রয়েছিস।

— ঠিকই তো। সিদ্ধার্থ বেশ রাগী রাগী গলায় বলল, কী হল দেখবার জন্য, এই মুহূর্তে দরজা খুলে বাইরে বেরোবোর মধ্যে তো কোন বাহাদুরি নেই। একটু চুপ করে থেকে বলল, অবশ্য তুমি যদি মনে কর যেতে পার। তুমি তো হাইস্কুলের দিদিমনি। এ শহরে তোমার ব্যাপক পরিচিতি। তোমার ভয় কী বল! হয়ত দেখবে খুনীরা ফিরে এসে ঘটনাটা নিজের মুখে তোমায় শুনিয়ে যাবে।

অন্য সময় হলে সিদ্ধার্থর এই ধরণের কথায় আমি কষ্ট পেতাম এবং ভীষণ রেগেও যেতাম। আজ কিন্তু আমার হাসি পেল। আমাকে আক্রমণ করার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থর অসহায়তাই ফুটে বেরোচ্ছে। আসলে ও চাইছে আমি ওর কথায় দপ করে রেগে উঠে ঘুরে দাঁড়াই এবং ওর সঙ্গে একপ্রস্ত কথা কাটাকাটি শুরু করি। তাতে ওর একাকীত্বের ভয়াবহতাটুকু দূর হবে। আর আমাদের দুজনের কথার চাপান উতোরের মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা সময়ও গড়িয়ে যাবে। ততক্ষণে পূব আকাশে আলোর ছটা দেখা দেবে। পাখি ডাকবে বেশী করে। পথেঘাটে মানুষজনের শোরগোল শুরু হয়ে যাবে। সিদ্ধার্থর এই একলা থাকার ভয়টা আমার বেশ উপভোগ্য মনে হল। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলাম ওর দিকে চেয়ে, তুই ঠিক বলেছিস। এ শহরে আমার বিশাল পরিচিতি। শুধু দিদিমনি বলে নয়। আরও নানা কারণে। খুনীরা না হোক অন্য যে কেউ এসে ঘটনাটা আমায় জানিয়ে যাবে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে খোঁজ নিতে হবে না।

আমরা কথা বলা সম্পূর্ণ শেষ হয়নি, হঠাৎই সদরের কড়া নেড়ে ব্যস্তসমস্ত গলায় একজন নয়, দু'তিনজন, কি তারও বেশী কয়েকজন মানুষের আকুল ডাক, নীরুদি? নীরুদি? দরজাটা খুলুন একবার।

মুহূর্তে সিদ্ধার্থর চোখমুখে আশ্চর্য পরিবর্তন। হাতের ইশারায় আমাকে দরজা খুলতে

নিষেধ করল। ঘরের বাইরের মানুষগুলি এবার রীতিমত পাড়া কাঁপিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। আমি দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছিল বাইরের ঝোড়ো হিমেল হাওয়া আমার ঘরে ঢুকবে বলে বন্ধ দরজার ওপাশে দাপাদাপি শুরু করেছে। স্বেচ্ছায় আমি যদি দরজা না খুলি, উন্মত্ত হাওয়া নিজের জোরে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়বে। যারা ডাকছে আমি তাদের কারোর গলাই চিনতে পারছি না। হয়ত চাপা গলায় ডাকছে বলে বা উত্তেজনায় গলার সুর পাল্টে গেছে তাদের। তবে 'নীরুদি' বলে ডাকছে যখন, তখন আগন্তুকরা আমার পরিচিতই হবে। তবে কি, সিদ্ধার্থ যা বলছে, সেটাই সত্যি! খুন হওয়া মানুষটিকে আততায়ীরা আমাদের বাগানের দরজার সামনে বা সামান্য আশেপাশে ফেলে রেখে গেছে! ভোরের মানুষজন রক্তে মাখামাখি প্রাণহীন নিশ্চল একটি দেহ আমাদের বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখে, নিশ্চিতভাবেই ধারণা করেছে, আমরা এই ভয়াবহ ঘটনাটি আদ্যন্ত জানি। আর সেইজন্য প্রথমেই দৌড়ে এসেছে আমাদের বাড়িতে। চারপাশের নিস্তব্ধতাকে চিরে ফালা ফালা করে দিয়ে উন্মত্তের মতো দরজার কড়া নাড়ছে।

কী করব, কী করা উচিত, বুঝে উঠতে না পেরে সিদ্ধার্থকে এবার আমি ইশারায় ডাকলাম, তুই এসে দরজা খুলে দিয়ে যা। সিদ্ধার্থ এমন শূন্য চোখে আমার দিকে তাকাল যেন আমার ইশারা তার নজরেই পড়েনি। বা পড়ে থাকলেও সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সিদ্ধার্থর ওপর বেজায় রাগ হল। একজন পুরুষ মানুষ, যে নাকি গুপ্ত সংগঠন করে, দেশের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারই যার জীবনের ব্রত, সে যদি এমন ইনডিফারেন্ট আচরণ করে, তখন তার মুখের কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে, মানুষটিকে শুধু যে কাপুরুষ বলে মনে হয়, তাই নয়। মনে হয় মানুষটি নিজেকে বড্ড বেশী ভালবাসে। নিজের বিপদ, নিজের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ষোলআনা সেয়ানা-সতর্ক।

বারান্দার কোণের ঘর থেকে অনু চীৎকার করে উঠল, এই দিদি? কী হয়েছে?

তার মানে এবার দরজা খুলতেই হবে। তা না হলে হয়ত অনুই আচমকা নিজের দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে। আশ্চর্য গতরাতের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও অনু জানে না। নাকি আমি এবং সিদ্ধার্থ যেমন, অনুও তেমনই বোমের আওয়াজ, দৌড়োদৌড়ির শব্দ এবং তীক্ষ্ণ করুণ গলার 'মাগো' ডাক শুনেছে। ভয় পেয়ে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চুপ শুয়েছিল এতক্ষণ। আবার হয়ত এমনও হতে পারে, ভাল কোন গল্প বা বুক-ভরানো কোন কবিতা পড়ে, অনু এমনই নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে ঘরের বাইরে যে এত কাণ্ড ঘটে গেল, তার ছিটেফোঁটাও তাকে স্পর্শ করেনি। জাগতিক সব কিছুই তখন ওর ইন্দ্রিয়স্পর্শের বাইরে ছিল।

অনু নিজের ঘর থেকে আবার চেঁচিয়ে ডাকল, দিদি? শুনতে পাচ্ছ না, কারা কড়া নাড়ছে? আমার এবং সিদ্ধার্থর মতো অনু এই সাতসকালে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। ও হয়ত নিজের বিছানায় উঠে বসে, ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছে। তা না হলে বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে রাতের অবিন্যস্ত পোশাক গুছিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমার মনে হল, বেশী দেরী করা ঠিক নয়। তাতে যারা কড়া নাড়ছে, তাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে। আশপাশের বাড়ি থেকেও হয়ত ইতিমধ্যেই উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থর দিকে আর একবার তাকালাম। আগের মতই ও ভাবলেশহীন মুখ করে বসে আছে। ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে। আমার তো মনে হল সিদ্ধার্থ বেশ যত্ন করে প্রথমবারের চেয়েও এখন নিজেকে আরও বেশী অমনোযোগী সাজবার চেষ্টা করছে। অন্য সময় অন্য যে কোন ব্যাপারে ও এমন ভাব দেখায়, কথা বলে, মনে হয় ও আমার গার্জেন। ও যেমন যেমন বলবে, দেখাবে, আমি সেই সেই মত করতে বাধ্য। অথচ আজ সত্যিকারের বিপদে ও কেমন চতুরের মতো আমার কোর্টে বল ঠেলে দিয়ে নিরাসক্ত তাপউত্তাপহীন মুখ করে বসে রয়েছে।

দরজার হুড়কোটা খুব সাবধানে শব্দ না করে খুলেই আমি সেটাকে ছেড়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মানুষ বাঁধভাঙ্গা জলের মতো হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে দ্রুত এদিক ওদিক দেখতে লাগল। লোকগুলি ভেবেছিল দরজা খোলামাত্রই ওরা আমাকে দেখতে পাবে। কিন্তু আমি যে দরজার পাশটিতে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা ওদের নজরেই এল না। ওরা সিদ্ধার্থকে ধরে সজোরে নাড়া দিল, নীরুদি কোথায়? এমন অভাবিত ঝাঁকানিতেও সিদ্ধার্থ অদ্ভুত রকম নিশ্চল বসে বসেই চোখের ইশারায় দরজার পাশটিতে ইঙ্গিত করল। মুহূর্তে লোক কজন দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে আগুনঝরা চোখে আমার দিকে চেয়ে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, আপনার জন্যে এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল। বলুন, এখন কী করবেন? বলতে বলতে একটি লোক লাফ দিয়ে আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে আমার একটি হাত ধরে সজোরে ঝাঁকাতে লাগল, বলুন, কী করবেন? লোকটির কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কান্নায়, আমরা যে ভাবতেই পারিনি, নীরুদি।

আমি কিন্তু সত্যি কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকগুলি কী বলছে? আমি ওদের কী ক্ষতি করলাম! আমার কাছে ক্ষতির জবাবদিহি-ই বা চাইছে কেন? লোকগুলিকে আমি চিনতে পেরেছি। নাম জানি না। কিন্তু হঠাৎ করে আমার কাছে ছুটে এসে ওরা এমন নাটুকেপনা করছে কেন! আমি তো কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না, 'ক্ষতিসাধন' বা

'সর্বনাশ' করা বলতে যা বোঝায়, আমি তেমন কিছু করেছি কিনা। ঘটনাটা কী এবং তাতে আমার ইনভলভ্‌মেন্ট কোথায়, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার চোখের সামনে ঝাপসা পর্দা দুলছে। ঘরের আলো মিইয়ে যাচ্ছে। চেনা ঘরটার আসবাব দেওয়াল সব নড়ছে, জায়গা বদল করছে। এমনকি যে লোকটি আমার হাতটি এখনও ধরে রয়েছে, তার কান্নাধোওয়া শব্দগুলি মনে হচ্ছে যেন কতদূর থেকে ভেসে আসছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, একটা আধো অন্ধকার পৃথিবীতে আমি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি।

এই সময় কে যেন বেশ জোরে ডাকল আমায়, দিদি না নীরুদি কী বলে, তাও ঠাওর করতে পারলাম না। আমি পড়ে যাইনি বা মেঝেতে বসে পড়িনি। দেহের ভার দেওয়ালের ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখের সামনে কালো ফুটকির মতো অনেকগুলি মানুষ দ্রুত এপাশ ওপাশ করছে। বদ্ধ হলঘরে অনেকে একসঙ্গে চীৎকার করলে যেমন শোনায়, হুবহু সেইরকম একটি দলাপাকানো শব্দ আমার কানে পৌঁচচ্ছে। যদিও তা বেশ ক্ষীণ।

হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার দেহের ভার তার নিজের কাঁধে নিয়ে ঘষরাতে ঘষরাতে বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শাড়ির আঁচল বোধহয় পড়ে গেছিল কাঁধ থেকে। অন্য কেউ একজন শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার পিঠবুক সব ঢেকে দিল। দু চোখ বিস্ফারিত করে ঘরের মানুষগুলিকে চেনবার চেষ্টা করলাম। সব আবছা ঘোলাটে লাগলে লাগল। যে বা যারা আমার দেহটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিছানার দিকে, আমি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত পা ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলাম। হাত এবং পা দুই-ই মনে হল পাথরের চেয়ে ভারি। আশ্চর্য, আমি পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যাইনি, আবার ঠিকমত সব কিছু বুঝতেও পারছি না। যেমন আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিছানার দিকে, এটা বুঝতে পারছি। চৌকির ওপর পাতা বিছানাটিও চিনতে পারছি। কিন্তু যারা আমাকে জাপটে ধরে একরকম হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদের মুখ চিনতে পারছি না। বেশ বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে না। কোন চতুর হাত আমার দেহের আনাচে কানাচে হানা দিচ্ছে না। এমনকি দাঁতে দাঁত পিষে হিসহিসে গলায় কথাও বলছে না কেউ। এরা আমায় আক্রমণ করবে না বা এদের দ্বারা আমি লাঞ্ছিতও হব না। আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বা এরপর কী ঘটতে পারে, এসব নিয়ে ভাবতে শুরু করলেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একসময় চৌকির বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার চোখমুখে বেশ জোরে জোরে জলের ঝাপটা মারা হচ্ছে যখন, আমার মনে হল আমি নির্ঘাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু দাঁড়িতে থাকতে থাকতে কীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম,

কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। মনে পড়ার মতো কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। এমনকি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে যে মুখটি সেটি যে একটি নারীর মুখ, তাও বুঝতে পারলাম। আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে জানলা দরজা দেওয়ালে রোদ্দুর, আলনাতে শাড়ি এবং আমার চারপাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মানুষজন — সব দেখলাম। মানুষগুলিক চিনতে পারলাম না।

'দিদি' বলে কে যেন ডাকল। গলাটি কোন ছেলের না মেয়ের ধরতে পারলাম না। কিন্তু আস্তে করে ঘাড় নাড়লাম, যা থেকে বোঝানো যায়, ডাক আমি শুনেছি। এবার বেশ স্পষ্ট গলায় কে যেন বলল, পুরোপুরি অজ্ঞান নয়। তবে সামান্য ঘোর আছে।

অবাক কাণ্ড। যা বলা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। অর্থও ধরতে পারছি। কিন্তু তারপরেও ঘটনাটা কী, কেমনভাবে ঘটল এসব কিছুই স্মরণ করতে পারছি না। তার মানে পুরোপুরি না হলেও কিছু সময়ের জন্য আমি চৈতন্য হারিয়েছিলাম। তারপর ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর, আমার অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে ওই যে বলছে 'সামান্য ঘোর আছে' এটা ঠিক। তা নাহলে আমি ঘটনা পরম্পরা স্মরণ করতে পারছি না কেন! বা ডিস্টিংক্টলি মানুষগুলিকে তাদের চেহারায় বা গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পারছি না কেন! মাথাটা অসম্ভব ভারি লাগছে। তার সঙ্গে সারা শরীর জুড়ে অবসাদ, ভীষণ ক্লান্তি। তেড়েফুঁড়ে জ্বর আসার আগে যেমন হয়, ঠিক সেইরকম মাথা ভারি, অবশ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি। শব্দেরা কানে পৌঁচচ্ছে অচেনা গলায়, নীচু স্বরে। আর মনে হচ্ছে দুচোখের পাতা চেষ্টা করেও খুলে রাখতে পারছি না। ঘুম হামাগুড়ি দিয়ে কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ছুটে আসছে। এখনি আমার সত্তা, সচেতনতা এবং বিচারবোধ সব কিছু ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে।

— কী হল, দিদি? বেশ জোর গলায় একটি মেয়ে বলে উঠল, তোমার কী কষ্ট হচ্ছে? বলতে বলতে হ্যাঁচকা টানে আমাকে বিছানায় বসিয়ে দুহাতে আমার মাথাটি ধরে বেশ কয়েকবার ঝাঁকানি দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, গাঢ় গভীর নিদ্রা থেকে মেয়েটি আমায় জাগিয়ে তুলল। শরীর অবশ। কিন্তু হ্যাঁচকা টানে মাথার ভার ভার ভাবটা যেন অনেকটাই হাল্কা হয়ে গেল। এমনকি আবছা অস্পষ্ট দৃষ্টিও বেশ খানিকটা সহজ স্বাভাবিক মনে হল। এতক্ষণ যেন একটি মোটা কাপড়ের পর্দায় আমার চোখ দুটি বাঁধা ছিল। কে যেন কাপড়ের বাঁধনটুকু সরিয়ে নিয়েছে। এখন আমি আমার ঘরটির সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলিকেও অল্পস্বল্প চিনতে পারছি। যেমন যে মেয়েটি আমাকে টেনে তুলে প্রায় আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, সে অনু। সামান্য তফাতে অন্য একটি বিছানায় বসে

সিদ্ধার্থ। আর আমাকে চারপাশ ঘিরে রেখেছে যে মানুষগুলি, তাদের আর ফুটকির চেহারার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। আমি তাদের মুখ চিনতে পারছি। কিন্তু একজনেরও নাম জানি না। অনু আমার মুখের দিকে চেয়ে, কী হল দিদি? প্রশ্নটা করছে। ভয়-ভয় চোখে আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রয়েছে যেন আমি অপ্রকৃতিস্থ। স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। বা আমার শরীরের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি কিছুতেই সেটা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। আমি হাসার চেষ্টা করলাম। আর তাতেই কাজ হল। অনু গলাটাকে বেশ উঁচু করে ঘরের সকলকে শুনিয়ে বলল, আর কোন ভয় নেই। দিদির ঘোর ভাবটা কেটে গেছে।

তার মানে কিছু সময়ের জন্য হলেও আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। বা স্মৃতিভ্রংশ জাতীয় কিছু ঘটেছিল। অচেনা মানুষগুলি, তাদের সঙ্গে অনু মিলেমিশে আমাকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলেছে। কিন্তু এই মানুষগুলি কারা? কেনই বা এসেছে এখানে? কনুইয়ে ভর দিয়ে আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। অচেনা একটি লোক দ্রুত ছুটে এসে একরকম জোর করে আমায় শুইয়ে দিল, একদম উঠবেন না। চুপচাপ শুয়ে রেস্ট নিন। লোকটি অন্য মানুষগুলিকে হাতের ইশারায় ঘরের বাইরে চলে যেতে বলল। অল্পবয়সী একটি ছেলে রাগত গলায় বলে উঠল, যাব তো নিশ্চয়ই। তবে যে ক্ষতিটা উনি আমাদের করলেন, সেটাকে কোনমতে মানা যায় না। ছেলেটির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরও কয়েকজন ঘাড় নাড়ল, সুদীপ্ত ঠিকই বলেছে। নীরুদি যদি বাধা না দিত ...!

— প্লীজ! অনু কাতর গলায় বলে উঠল, দিদিকে দোষারোপ করবেন না। ও হয়ত না বুঝেই কাজটা করছে। তা নাহলে ওর জন্য একজন মানুষ খুন হয়ে যাবে, এতটা নিষ্ঠুর ও নয়।

— চুপ করুন। সুদীপ্ত নামে ছেলেটি এত জোরে চীৎকার করে উঠল যে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম এবং কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই সটান বিছানায় উঠে বসলাম। 'খুন' শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। কে খুন হল? কারা কী জন্য খুন করল, এমনি সব জরুরী প্রশ্নের তাড়নায় আমি কী করব, কাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব, ঠিক করতে না পেরে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। আশ্চর্য! আমায় উঠতে দেখেও কেউ ছুটে এসে আমায় শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল না। এমনকি আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়েও, সকলেই এমন অবাক মুখ করে দেখতে লাগল যেন আমি ওদের সকলকে চুপ করতে বলেছি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাহিনী শোনাব বলে। আমি বেশ বুঝতে পারছি ভয় নাকি উত্তেজনায়, কেন কে জানে, আমার গলার কাছটা শুকনো লাগছে। ঢোক গিলতে গিয়ে থুতু আটকে যাচ্ছে গলায়। সেই অবস্থাতেই বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর আস্তে আস্তে বললাম, কে খুন হয়েছে? কারা খুন করেছে? কেন?

লোকগুলি নিশ্চয়ই আমার কাছেই এসেছিল। আমাকে কিছু বলবে বা আমার থেকে কিছু শুনবে বলে। যে যে অবস্থায় ছিল, মুহূর্তে অ্যাটেনশন প্লীজ-র ভঙ্গীতে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

— কে খুন হয়েছে? আমি আমার বললাম।

— সে তুমি চিনবে না। অনু নীচু গলায় আস্তে আস্তে বলল।

— কেন চিনবে না? রাগী চোখমুখের একজন লোক অনুকে ধমকে উঠল, ওনার জন্যই তো এই ঘটনাটা ঘটল। বলে লোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসল, যে হাসিতে প্রীতি সম্ভাষণের পরিবর্তে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ স্পষ্ট, এখন তো সন্দেহ হচ্ছে, হঠাৎ করে উনি হাজিরই বা হলেন কেন? আর মালিকের ইনফর্মারটাও ঠিক ওই সময়ে ওখানে হাজির হল কেন?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটির বুঝি সন্দেহ হল, আমি তার অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছি। আসলে আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবছি, ওরা বাড়ি বয়ে এসে আমায় দোষারোপ করছে কেন? কোথাকার কে খুন হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? সর্বোপরি এতগুলি লোকের মালিক মানে সে তো বেশ বিত্তবান ক্ষমতাশালী লোক। এমন লোক কে সে?

— শোন একটা কথা। লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করে আমি বললাম, ধীরস্থির ভাবে, তোমরা আমাকে একটু ভাবতে দাও। সত্যি যদি আমার জন্য তোমাদের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, যেমন করে পারি, তা কনপেনসেট করব।

— মরা গরু উঠে দাঁড়িয়ে তো আর ঘাস খাবে না, নীরুদি! সুদীপ্ত বলে ছেলেটি বলে উঠল, আপনার একটা ভুলের জন্য একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আপনি দুহাত রগড়ে ধুয়ে এমন একটা ভাব করছেন, যেন আমাদের মুখ থেকে ডিটেলস না শুনে, কিছুই মনে করতে পারছেন না। বাঃ নীরুদি! বাঃ! বলে ছেলেটি অন্য লোকগুলির দিকে চেয়ে বলল, প্রফেশনাল দোষীরা যেভাবে নিজেকে আড়াল করে, আপনি ঠিক তেমনটি করছেন!

যেহেতু আমি আগের চেয়ে এখন অনেকটাই স্বাভাবিক, স্বভাবতই ছেলেটি যে অর্থে কথাগুলি বলছে, তা যে মূলত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যেই বলছে, এ ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। আর আশ্চর্য, আমি যে মারাত্মক কোন অন্যায় করেছি, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে চিবুকে ঘাম জমে গেল। কোনরকমে ধীর লয়ে আস্তো ছাড়া ছাড়া গলায় বললাম, আপনারা আমায় একটু খুলে বলবেন ঠিক কী হয়েছিল ব্যাপারটা? আর সেখানে আমার ভূমিকাটাই বা কী?

— আপনি। আঙুল তুলে একটি লোক কর্কশ গলায় আমার কথার জবাব দিল, মালিকের সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে ভাবলেন কী বিরাট কাজই না করলেন। একটু থেমে লোকটি বলল, আপনার দোষে নীরুদি, একজনের লাইফ গেল। তার সঙ্গে একটা মুভমেন্ট মুখ থুবড়ে পড়ল।

অনুতাপ অনুশোচনার পরিবর্তে আমার রাগ হল। এরা 'একটা ফ্যামিলি', 'একজনের লাইফ', 'একটা মুভমেন্ট' — এইভাবে আরবিটারী কথাবার্তা বলছে কেন? এরা কি ভাবছে, আমি সব বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করছি? আমি যে দোষী এটা বুঝতে পেরেই নিজেকে অসুস্থ এবং স্মৃতিবিভ্রমী এইভাবে ফোকাস করতে চাইছি? সত্যকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে না পারার কষ্টটা কেবল কষ্টের নয়। লজ্জা, গ্লানি এবং অসহায়তার এক চরম অব্যক্ত যন্ত্রণা। আমি যদি এখন কেঁদে ফেলেও বলি, সব কিছু আমি ঠিক ঠিক কিছুতেই মনে করতে পারছি না, আমি জানি, আমার চোখের জলকেও এরা ছল বলেই ভাববে। তবে এটাও ঠিক, এরা যখন কেবলমাত্র আমাকেই আঙ্গুল তুলে দেখাচ্ছে, তখন যত আবছা অল্পভাবেই হোক না কেন, অপ্রীতিকর দুর্ঘটনাটির সঙ্গে সরাসরি না হোক, পরোক্ষে আমি জড়িয়ে আছি। এরা যদি ভাসাভাসা ভাবে না বলে, স্পষ্ট করে বলে, হ্যাঁ বা না, আমি নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করতে পারি।

একমাত্র পেশাদার খুনী, দালাল বা ইনফর্মার ছাড়া একজন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুতে, কোন সুস্থ মানুষ খুশি হতে পারে না। আর খুন করানোর মতো একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়াব, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

— দেখুন, গলাটাকে বেশ শক্ত করে বললাম, আমি রাজনীতি করি না। আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ল্ডের সঙ্গেও আমার কোনরকম যোগসাজশ নেই। এরপরেও আপনারা খুনের জন্য আমি দায়ী এমন সিদ্ধান্তে এলেন কেমন করে?

— নীরুদি, আপনি সত্যি রাজনীতি করেন না? মনে মনেও সমর্থন করেন না কোন দলকে? একটি লোক জেরার ভঙ্গীতে কিন্তু বেশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমাদের অবস্থান ধর্মঘটে হঠাৎ করে ঢুকে পড়লেন কেন? একটু হেসে বলল, সে কি কেবল অলোকেশের কথা ফেলতে পারেননি বলে?

অলোকেশের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার ছবির মতো গতকাল বিকেলের ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ফুলে উঠল।

— হ্যাঁ। ঠিক তাই। আমি বললাম, অলোকেশের অনুরোধ ফেলতে পারিনি বলেই আপনাদের মাঝে গিয়ে বসেছিলাম। এর মধ্যে আমার অন্যায়টা কোথায়? রাজনৈতিক

চিন্তাভাবনা যাই হোক না কেন, ন্যায্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণে কোন বাধা থাকা তো উচিত নয়।

— ঠিক বলেছেন। মাঝবয়সী একটি লোক গম্ভীর গলায় বলল, এই অব্দি আপনি একশভাগ ঠিক। কিন্তু তারপর! বলে লোকটি বিষণ্ণ হাসল, তারপরে আপনার ভূমিকাটা কী হল?

— তার পর মানে? যেন আপনাআপনি শব্দ দুটো বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

— সেই কথাই তো বলছি। লোকটির চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখের চাউনিরও পরিবর্তন হল, যে অলোকেশ আপনাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে এল, সে জানলও না ...! লোকটি তার কথা শেষ করতে পারল না। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজের মুখ ঢাকল। লোকটি কাঁদছে। কারণ হেঁচকি তোলার মতো তার গলার শিরা ফুলে ফুলে উঠছে। আর তা দেখাদেখি অন্যরাও কেউ ঘরের জানলার দিকে, কেউ ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে। ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, শোকস্তব্ধ মানুষ যেভাবে নিশ্চল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মৃতের আত্মীয়ের প্রতি সমবেদনা জানায়, ঘরের আবহাওয়া ঠিক সেইরকম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিকে না তাকিয়েও ঘরের সকলে আমাকে দেখছে। সুদীপ্ত বলে ছেলেটি যেভাবে যে ভাষায় আমাকে আক্রমণ শুরু করেছিল এবং অন্যেরা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাকে বিপর্যস্ততার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল, এখন কিন্তু একজনও তেমন কোন আচরণ করছে না। হঠাৎ করে এ ঘরে কেউ ঢুকে পড়লে, আমার চারপাশ ঘিরে নতমুখ মানুষগুলিকে দেখলে ভাবতেই পারে, সমবেতভাবে এরা এদের কৃতকর্মের জন্য আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে নিশ্ছিদ্র নীরবতার মধ্যে দিয়ে। আমি কিন্তু আমার বুকের মধ্যে পাড়ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভয়াল জলস্রোতের সোঁ সোঁ আওয়াজ বাজছে কানে। একশভাগ পুরোপুরি না হলেও বেশ অনেকটাই আন্দাজ করতে পারছি। হতভাগ্য সেই ছেলেটি যে মৃত্যুর প্রাক্কালে কাতর গলায় 'মাগো' বলে ডুকরে ডেকে উঠেছিল, আমি তাকে চিনতে পারছি। পেটের মধ্যেকার নাড়িভুঁড়ি সব পাক দিয়ে গলার কাছে ঠেলে উঠে শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। অনুচ্চারিত গলায় অনেকবার সেই হতভাগ্য ছেলেটির নাম ধরে ডাকছি, কিন্তু কিছুতেই শব্দ করে তার নাম উচ্চারণ করতে পারছি না।

সাদামাটা মানুষ, মৃত্যুকে কে কবে ডেকে নিয়ে আসে! আবার তা নিশ্চিত করার জন্য পরিচিত কাউকে প্রিয়জনের মতো আপ্যায়ন করে নিয়ে আসে, এমন নিষ্পাপ বোকা পৃথিবীতে কজন আছে? নিহতের জন্য মানুষ বেদনাহত হয়। কিন্তু নির্দোষী যে মানুষটিকে

মৃতের কারণ হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তার সারা শরীর তোলপাড় করে। 'মাগো', 'মাগো' — আর্তনাদে কান্না মাথা ঠুকে মরে। কিন্তু চামড়া ফুঁড়ে কারোর কানে সেই কান্নার শব্দ পৌঁছায় না।

তুমি বিশ্বাস করো অলোকেশ, মৃত্যুর মতো এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্বাদ আস্বাদনের জন্য, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিইনি। মাথার ওপরে আকাশ বা পায়ের নীচের মাটি সরে গেলে, ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যেও যে লড়াই চালায় মানুষ, সে তো কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই। জীবনদাত্রী না হয়ে আমি তোমার নিয়তি হলাম কেমন করে অলোকেশ!

বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল, লোকগুলি চলে গেছে। যাবার আগে ওরা নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু বলেছে আমার বিষয়ে, ভীতি প্রদর্শনের মতো ঘটনাও কিছু ঘটে থাকতে পারে, আমি সেসব কিছুই জানি না। কারণ যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম গতকাল রাতে যাকে খুন করা হয়েছে, আমার বাড়ির দরজার কাছাকাছি রক্তাপ্লুত যে মৃতদেহটি পড়ে আছে, সেটি অলোকেশের প্রাণহীন দেহ, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। অলোকেশের মৃত্যুর জন্য আমি কতটা দায়ী বা আদৌ দায়ী কিনা জানি না। কিছু লোক আঙুল তুলে দেখালেই দোষী সাব্যস্ত হয় না। যে কোন নিষ্ঠুরতার নেপথ্যে অনেক কারণ, অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা থাকে। মালিকের ইনফর্মার ধরে নিয়ে অলোকেশ এবং তার সঙ্গীসাথীরা যে মানুষটিকে মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, আমি সেই লোকটিকে বাঁচিয়েছি। আমি লোকটিকে চিনি না। লোকটি আদৌ ইনফর্মার কিনা তাও জানি না। হয়ত আমাদের মতোই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কোম্পানীর একজন বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে মালিকের আদেশমত খোঁজখবর করতে এসেছিল ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিষয়ে। হয়ত ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মালিকের আদেশ পালন করতে আসতে হয়েছিল তাকে। আবার এসবের কিছুই নাও হতে পারে। ছেলেটি হয়ত অহৈতুকী কৌতুহলে কারখানার গেটে এসেছিল। কী হচ্ছে, কারা রয়েছে, এইসব দেখবে বলে। জীবনকে বাজী ধরে গোপন কাজকর্মের খবরাখবর করতে আসে যারা, ছেলেটি মোটেই সেই জাতীয় পেশাদার নয়। তার চোখের চাউনিতে অপার বিস্ময় ছিল। চলাফেরায় সন্দেহজনক কোন ছাপ ছিল না। তা সত্ত্বেও অলোকেশরা ছেলেটিকে স্পাই ধরে নিয়ে খতম করবে বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। আমি একান্তভাবেই নিজের বিচার বিবেচনায় একতরফা আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ছেলেটি বেঁচে গিয়েছিল। অলোকেশের যে সমস্ত সহকর্মী অলোকেশের খুন হওয়ার সঙ্গে গতকাল বিকালের

ঘটনাটিকে একযোগসূত্রে বেঁধে, আমিই এর জন্য দায়ী, ধরে নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করতে এসেছিল, সাত সকালেই আমার বাড়িতে ছুটে এসেছিল রে রে করে, তারা কেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না, অলোকেশকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যাপারে তার কারখানার মালিক অনেক সুদূরপ্রসারী প্ল্যান প্রোগ্রাম ছকেই রেখেছিল। আমার বা ঐ ছেলেটির উপস্থিত হওয়ার ঘটনাটি নিতান্তই কাকতালীয়। অলোকেশ হয়ত কর্মচ্যুত শ্রমিকদের একটা প্লাটফর্মে জড়ো করার কাজটি এবং মালিকের বিরোধিতা করার জায়গাটা আপোষহীন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দৃঢ় পোক্ত করছিল। সাধারণ মানুষের সমর্থনের জায়গাটাও আস্তে আস্তে তৈরী করে ফেলেছিল, গোপনে। সেটি জানতে পেরেই অলোকেশের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার জন্য মালিক এতটাই মরীয়া হয়ে উঠেছিল যে আমাদের এই শান্ত নিরুপদ্রব শহরে নৃশংস হত্যার মতো একটি চাঞ্চল্যকর ভীতিপ্রদ ঘটনা ঘটাতে সে এতটুকু আগুপিছু চিন্তা করেনি। নজিরবিহীন একটি খারাপ কাজ যে ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটাতে পারে, হয়ত বুঝে জেনেও, সে নিজেকে এতটাই অরক্ষিত ও বিপন্ন বোধ করেছে যে খুন করে অস্তিত্ব মুছে দেওয়াই একমাত্র পথ ধরে নিয়ে, পেশাদার ভাড়াটে খুনীদের সাহায্যে অলোকেশকে হত্যা করেছে।

কিন্তু এই ঘটনার জন্য আমায় দায়ী করা হচ্ছে কেন? কারখানার মালিক যদি মনে করত, একা অলোকেশ নয়, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সকলেই বিপজ্জনক, তার অনুগত কর্মচারীটিকে স্পাই ধরে নিয়ে সকলেই তাকে আক্রমণ করেছে, তাহলে সকলকে ছেড়ে অলোকেশটে টার্গেট করল কেন? এমন তো নয়, একমাত্র অলোকেশই অনুগত কর্মচারীটিকে মারধর করেছে, বা অন্যদের মারতে নির্দেশ দিয়েছে। অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছে। বরং অন্যদের তুলনায় অলোকেশ অনেক ধীরস্থির ছিল। আমার মতো সে'ও হঠাৎ আক্রমণে খানিকটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল। অলোকেশের তো খুন হওয়ার কথা ছিল না।

বারো

আমি জানি এই ধরণের ঘটনার কল্পকাহিনী পেঁজা তুলোর মতো উড়তে শুরু করে এবং বাতাসের চেয়েও আগে ছোটে। এতক্ষণে হয়ত পাড়ার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে, বাজারে সেলুনে রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে অপেক্ষমান নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আমাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যেহেতু অয়ন আমাদের বাড়ি নিয়মিত আসত, সুতরাং

সকলে নাহলেও অনেকে ধরে নিয়েছে, আমিও খতমপন্থায় বিশ্বাসী। অলোকেশ যে পথে আন্দোলনকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ মনে করেই আমি অলোকেশের অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলাম। পরিবর্তে কারখানার মালিক তার একজন কর্মচারীকে কারখানার গেটে পাঠিয়ে, তাকে ফিজিক্যালি অ্যাসল্টকরিয়ে, বদলা নেওয়ার একটি সহজ কারণ তৈরী করে নিল। অলোকেশের সহকর্মীদের ধারণা, মালিকের গোপন পরামর্শ মতো আমি ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। মালিককে পাল্টা আঘাত হানার রাস্তাটি আমিই তৈরী করে দিয়েছি।

অন্যদিন এ সময়ে আমি স্কুল যাবার জন্য তৈরী হই। আজ চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছি। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সব বুঝেও আমি চুপ করে শুয়ে আছি। অলোকেশের মৃতদেহটি আমাদের বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে অলোকেশ নিশ্চয়ই তার বাড়িতে পৌছে গেছে। মৃতদেহটিকে ঘিরে বাড়ির লোক চীৎকার করে কাঁদছে। মেঝেতে মাথা ঠুকছে। ঘটনার আকস্মিকতায় মূর্ছাও গিয়ে থাকতে পারে কেউ। প্রতিবেশী, কারখানার কর্মচারী, পথচলতি মানুষজন, অলোকেশের মৃতদেহটিতে অস্ত্রের আঘাত, রক্তে ভেজা জামাকাপড়, রক্তের ঘ্রাণে উড়ে আসা ডুমো নীলমাছি,এসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাদের কারোর হয়ত হাত পায়ের শিরা ফুলে উঠেছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে। ভয়ে দুহাতে চোখ ঢেকে ভিড়ের মধ্যে থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কেউ। অলোকেশের মৃত্যুর খবর পাওয়ামাত্রই নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়েছে তার মা। প্রতিবেশীরা অলোকেশের মায়ের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। সন্তান হারানো সেই বৃদ্ধা ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েই, বাড়ির উঠোনে মানুষের জটলা, কান্নার শব্দ এবং তাঁকে ঘিরে একঝাঁক উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে, স্মৃতি বিস্মৃতির মাঝামাঝি অদ্ভুত ভাসমান একটি অবস্থায় সাঁতরাতে সাঁতরাতে যে মুহূর্তে তাঁর ভাবনা চিন্তা পাড়ে এসে ঠেকছে, প্রথমে নিশ্চয়ই তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি যা দেখছেন বা শুনছেন, তা বুঝি কাল্পনিক কোন কাহিনী। পরমুহূর্তেই তাঁর ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাওয়া মাত্রই তিনি ডুকরে কেঁদে উঠছেন। শুনেছি অলোকেশের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সংসারে হয়ত অলোকেশ একাই রোজগেরে ছিল। তাকে ঘিরেই বাড়ির সবাই স্বপ্ন দেখত সুখের দিনের। আকাশের নীচে মাটির ওপর অলোকেশ এখন ঘুমোচ্ছে।

যেহেতু এটি একটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাই অলোকেশকে দাহ করার আগে আইন মোতাবেক মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। লাশকাটা ঘরে টেবিলে শুইয়ে রাখা হবে। যতক্ষণ না ডাক্তার এবং তার সহকারী চুরচুর মাতাল ডোমটি এসে পৌচচ্ছে। ডাক্তারবাবুর কাটাছেঁড়ার

পর অযত্নে কাঁথা সেলাই করার মতো, এলোমেলো বড় বড় ফোঁড়ে অলোকেশের দেহের ছিন্ন অংশ সেলাই করবে ডোম। অলোকেশ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠবে না। হাত পা ছুঁড়ে বাধা দেবে না। তীক্ষ্ণ গলায় 'মাগো' ডেকে উঠবে না।

লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই। অর্থ, কীর্তি, সফলতা কোন কিছুর বশ্যতা স্বীকার করে না যে ক্লান্তি, বিপন্ন বিস্ময়ের মতো যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে, আমাদের বেদনাক্লিষ্ট করে, শ্রান্ত করে, সেই অদৃশ্য অনাঘ্রাত ক্লান্তির অনস্তিত্বে অলোকেশ চিত হয়ে শুয়ে থাকবে টেবিলের ওপরে।

সিলিং ফ্যানের দিকে চেয়ে শুয়ে আছি। চোখ বুজতে ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, চোখ বুজলেই জানলাবিহীন ভ্যাপসা গন্ধে ভরা একটি ঘর, রক্তে পিচ্ছিল মেঝে, পলেস্তারা খসা দেওয়াল, দেওয়ালে বিবর্ণ শুকনো মাংস, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ত্বকের টুকরো, আস্তো ঝুলছে পাণ্ডু রুগীর চোখের মতো ঝিমোনো আলোয়। আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটার মাঝ বরাবর আয়তাকার কাঠের টেবিল, যার ওপরতলে অ্যালুমিনিয়ামের চাদর বিছানো, তার ওপরে অলস ভঙ্গীতে দুপাশে দুহাত ছড়িয়ে যেন বড় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে অলোকেশ। হাজার চেষ্টা করেও আমি ছবিটিকে বন্ধ চোখের পাতা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছি না।

মর্গের ভিতরটা সত্যি কেমন দেখতে হয় জানি না। কলেজ সহপাঠী মধুরিমা আত্মহত্যা করেছিল। পোস্টমর্টেম করার জন্য মধুরিমাকে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মধুরিমার মৃত্যুতে আমি এতটাই দিশেহারা হয়ে গেছিলাম যে মধুরিমাকে যখন মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভ্যানরিক্সায় চড়িয়ে, আমি ভ্যানরিক্সার পিছন পিছন অনেকটা পথ গেছিলাম। সারা জীবনে আর মধুরিমাকে দেখতে পাব না, এই কষ্টে আমি এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে যতক্ষণ দেখতে পাই, দেখতে পাওয়া যেতে পারে, এইরকম ভেবেই ভ্যানরিক্সার পিছন পিছন হাঁটছিলাম। শেষ অব্দি যাওয়া হয়নি। বয়স্ক একজন মানুষ রীতিমত জোর করে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন অয়ন আমাদের বাড়িতে আসত। দিনকয়েক পরে কথাপ্রসঙ্গে ওকে এই ঘটনার কথা বলতেই, ও বিমর্ষ গলায় বলেছিল, না গিয়ে ভালই করেছ। মনের ওপর চাপ পড়ত। একটু থেমে বলেছিল, তখন হয়ত মধুরিমার চেহারাটা ভুলতে চাইতে।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, তা কেমন করে হয়? প্রিয়জনকে কেউ ভুলতে চায়?

— চায়। অয়ন ঘাড় নেড়ে বলেছিল, কেন জানো? আতঙ্কের মধ্যে জিজ্ঞাসা অনুসন্ধান

গ্রিল কোন কিছু নেই। লাশ কাটা ঘরের অভিজ্ঞতা বড় নির্মম, ভীতিপ্রদ!

আশ্চর্য! এইসব বলার পরেই অয়ন, আমি শুনতে চাই কি চাই না, তার তোয়াক্কা না করেই, লাশকাটা ঘরের মধ্যেটা কেমন দেখতে হয়, তার একটি নিখুঁত গা-ছমছমানি বর্ণনা শুনিয়েছিল এবং তার সঙ্গে এটাও বলেছিল, আলোবাতাসহীন এই ঘরটায় নাকি অপার শান্তি। টেবিলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে যে, তার নাকি কোন ক্লান্তি থাকে না। এ ক্লান্তি শরীরের নয়। মনের। মনের ভেতরের।

অয়ন আমার খুব কাছে, আমার মুখোমুখি বসেছিল। অথচ এইসব কথাগুলি বলছিল যখন, মনে হচ্ছিল যেন কতদূর থেকে কথা বলছে। ক্ষীণ আবছা গলায়। অয়নের চোখ দুটিও কেমন ভারি এবং আনমনার মতো দেখাচ্ছিল। আমার ভয় করছিল। আস্তো গলায় কোনরকমে, অয়ন প্লীজ আর নয়। এইটুকু বলামাত্রই অয়ন স্বগতোক্তির মতো করে বলতে শুরু করল —

অর্থ নয়, কীর্তি নয়,
সফলতা নয়,
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে,
আমাদের ক্লান্ত করে।
ক্লান্ত ক্লান্ত করে।
লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই।
তাই লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে
টেবিলের পরে।

খুব কষ্ট করে বিছানায় উঠে বসলাম। সমস্ত শরীর জুড়ে অবশ ভাব। মাথার ওপরে যেন দশমণ বোঝা চাপানো। এমনি ভারি লাগছে। ঘরভর্তি আলো। জানলা দিয়ে অল্প বাতাস আসছে ঘরে। বাড়িটা অদ্ভুত শান্ত। মা হয়ত পাশের ঘরেই আছে। নিজের মনে হয় চুপ করে শুয়ে আছে, তা না হলে আনমনার মতো জানলা ধরে দাঁড়িয়ে। কিছুই দেখছে না। শূন্যচোখে এমনিই চেয়ে আছে বাইরের দিকে।

সত্যি কি আমাদের সকলের রক্তের ভেতরে, আরও এক বিস্ময় খেলা করছে! অর্থ যশ সফলতা বা অঙ্গীকার, লড়াই আত্মত্যাগ কোন কিছুর পূর্ণতাই, এই অন্তর্গত বিপন্নতাকে রোধ করতে পারে না! নিবিড় একাকীত্ব, মৃত্যুর সান্নিধ্যেই যার স্পর্শ পাওয়া যায়, আমরা

কি সকলেই অবচেতনে তার কামনা করি! লাশকাটা ঘরে অলোকেশ এখন, অয়ন যেমন বলেছিল, ক্লান্তিহীন প্রশান্তিতে, ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এসবের সীমানা পেরিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে!

কাছেপিঠে কোথাও একটি শিশু কেঁদে উঠল, ওঁয়া ওঁয়া করে। চলমান একটি রিক্সার ঝকর ঝক শব্দ ভেসে এল। রেডিওতে সংবাদ শুরু হয়েছে, দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আগামী দিনগুলিতে আরও কঠোর সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের পার হতে হবে।

বেশ কষ্ট করেই দেওয়াল ধরে ধরে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। রোদ হাওয়া, পাখিদের ওড়াওড়ি, গরুর হাম্বা ডাক রাস্তার কলে বালতি বসানোর শব্দ, রেডিওর সংবাদ, পাঁচিলের গায়ে সাইকেল হেলান দিয়ে রেখে ডাকপিওনের একগোছ চিঠির মধ্যে থেকে নিবিষ্টমনে একটি বিশেষ চিঠি খোঁজা, এইসবের সমন্বয়ে দিনটি অন্যদিনের মতোই। বোঝাই যাচ্ছে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে একটি নারকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। হঠাৎই হাসি পেল। আত্মগ্লানি ও বেদনার হাসি। আমি কেমন তথাকথিত চিন্তাবিদ, চতুর দার্শনিকের মতো, অলোকেশের মৃত্যু যেন তার পরম কাঙ্খিত, যেন বেঁচে থাকার চেয়ে মারা যাওয়াটা তার ক্ষেত্রে অনেক জরুরী ছিল, মৃত্যু তাকে আরাম দিয়েছে, গভীর গভীরতর অসুখের মতো ক্লান্তি থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে, এমনিসব সুররিয়ালিস্টিক ভাবনার আড়ালে, হয়ত অবচেতনে নিজের কাছে নিজেকে নির্দোষী প্রমাণের চেষ্টা করছিলাম। কালবিলম্ব না করে এখনি, মর্গে না হোক, অলোকেশের বাড়িতে বা তার মৃতদেহ নিয়ে চলমান মিছিলে আমার যাওয়া উচিত। অবিন্যস্ত শাড়ীটাকে গুছিয়ে নিয়ে চটীটার খোঁজে আমি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। স্কুল যাওয়ার কাঁধ ব্যাগের মধ্যে পার্সটা আছে। দেওয়ালে ঝোলানো ব্যাগটা নামাতে গিয়ে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে সটান চোখে পড়ল বাগানের দিকে। ঘাসের ওপর আগুপিছু কয়েকটি ছায়া। ইলেকট্রিক ট্রেন যেমন নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত এগিয়ে আসে, অনেকটা সেইরকমভাবে ছায়া কটি ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। এরা কারা, আমি জানি। এদের পোশাকের রং খাকি, মাথায় টুপি। একজনের কোমরে রিভলবার গোঁজা।

— আসতে পারি? বেশ বিনীত ভঙ্গীতে পুলিশ অফিসারটি আমার দিকে চেয়ে কথাটি বললেন। মেদহীন লম্বা চেহারা। পরনে ঝকঝকে পোশাক। কোমরে রিভলবার গোঁজা। পায়ের জুতো জোড়া ভীষণ চকচকে। মনে হয় সকালে ডিউটিতে জয়েন করে, পাটভাঙ্গা পোশাক, পালিশ করা জুতো, এইসব পরে নিজের অফিস ঘরে বসতে যাচ্ছিলেন,

ঠিক সেই সময় অলোকেশের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবরটি তিনি জানতে পারেন এবং কালবিলম্ব না করে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছেন গাড়ি বার করতে। সঙ্গে কয়েকজন স্টাফ নিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ এবং উদ্দেশ্যসহায়ক এইরকম বিবেচনা করে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। পুলিশের পোশাক পরে কনস্টেবলগুলিকে অফিসারটির পাশে ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। তাদের জামা প্যান্ট অপরিষ্কার। জুতোয় ধুলোর আস্তরণ। এমনকি একজন টুপিটি পরেছে উল্টোভাবে। কনস্টেবলদের প্রত্যেকের হাতে আকারে ছোট কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত একটি লাঠি। একজন আমার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শব্দকরে তালি বাজিয়ে খৈনী পাকাচ্ছে। খৈনীর ঝাঁঝ বাতাসে উড়ে আমার নাকে এসে লাগছে। আমি কাশতে শুরু করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার ধমকে উঠলেন, রঘু সিং। ইউ আর অন ডিউটি। ফ্যাল ওটাকে। রঘু সিং কাচুমাচু গলায় বলল, সরি স্যার।

পুলিশ আমার খোঁজ আসবে, এটা জানতাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে ধারণার মধ্যে ছিল না। পুলিশ এলে কী কী করতে পারে এসব নিয়ে সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বেশ নির্লিপ্তের গলায় বলেছিল, অনেক কিছু করতে পারে। তিলকে তাল বানাতে পুলিশের জুড়ি নেই।

পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যেমন ভীতি, আমারও তাই। হয়ত যারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে, দু চার রাত জেল হাজতে কাটিয়ে এসেছে, তারা জানে কী ধরণের প্রশ্ন আসতে পারে পুলিশের পক্ষ থেকে এবং সেইসব প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিতে হয়। আমার এই ধরণের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বিশেষত একটি মানুষের খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইনভেসটিগেসনের জন্য যখন পুলিশ নিজেই ছুটে এসেছে, তখন স্বাভাবিকভাবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, প্রশ্নগুলি যথেষ্ট ঘোরালো প্যাঁচালো হবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আইনি মারপ্যাঁচও জড়িয়ে থাকবে। কাশি থামার পরও আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ভেতরের উত্তেজনায় আমার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক পড়ছে না। এই সময় পাশে একজন কেউ থাকলে হয়ত মনে বল ভরসা পেতাম। আমি গলাটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে পুলিশ অফিসারটিকে বললাম, ভেতরে আসুন। এক মিনিট — বলে সিদ্ধার্থ এবং অনুর খোঁজে বাড়ির ভেতরে গেলাম। আশ্চর্য! এ ঘর ও ঘর খুঁজে দুজনের কাউকেই দেখতে পেলাম না। রান্নাঘরের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে মা ভয় ভয় চোখে আমার ঘরের দিকে চেয়ে রয়েছে। নীচু গলায় আমাকে বলল, পুলিশ এসেছে কেন রে? একটু চুপ করে থেকে বলল, তুই ডেকে পাঠিয়েছিস বুঝি? অন্য সময় হলে মায়ের এ কথায় নির্ঘাৎ হেসে ফেলতাম। হয়ত মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হেসে বলতাম, তোমার মেয়েকে

দেখতে এসেছে। আমি জানি মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য মায়ের কথাবার্তা আচার আচরণ সবই বেখাপ্পা আজগুবি। কিন্তু আজ কী যে হল, হয়ত ভয় এবং উৎকণ্ঠায় নিজেই এমন বেসামাল ভেতরে ভেতরে যে, মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, খুব বিপদ হয়েছে। আমার ঘরে এসো না একবার!

'বিপদ' বলতে মা কী বুঝল কে জানে! নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বলল, স্কুল যাবি কখন? ভাত বসাতে হবে তো।

শুধু ভয় নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে রাগ এবং দুঃখ দুই-ই হচ্ছিল। সিদ্ধার্থ যে নিজের গা বাঁচানোর জন্য সরে থাকবে এটা একশভাগ জানার পরও মনে হচ্ছিল, দিদির বিপদ বা দিদিকে পুলিশ অকারণে হ্যারাস করতে পারে, এইসব বিচার বিবেচনা করে, হয়ত সিদ্ধার্থ থেকে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু অনু গেল কোথায়? ও তো জানে, নিশ্চয়ই বিশ্বাসও করে, খুন হওয়ার মতো একটি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কাজের পিছনে তার দিদির কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। আর যাই হোক এমন অস্বাভাবিক অমানবিক কাজের সঙ্গে দিদি জ্ঞানত কখনোই নিজেকে জড়াতে পারে না। এতসব জেনেও অনুও সিদ্ধার্থর মতো নিজেকে এই ঘটনার বৃত্তের বাইরে রাখাই শ্রেয় মনে কর! এমন হতে পারে সিদ্ধার্থর মতো আগেভাগে আঁচ করতে না পারলেও, দলবল নিয়ে পুলিশ অফিসারকে আসতে দেখেই অনু আমাকে কিছু না বলেই, লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দূরে কোন বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে বসে আছে। অলোকেশের মৃত্যুর সঙ্গে তার যে বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই এটা বোঝানোর জন্যই বাড়ি থেকে পালিয়েছে! সিদ্ধার্থকে ভুলে গিয়ে অনুর কথাই বেশী করে মনে পড়তে লাগল। আমার জায়গায় আজ যদি অনু থাকত, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কখনোই এমন চতুর, সুবিধাবাদীর মতো আচরণ করতে পারতাম না।

হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলে, অতি সাবধানী মানুষও কখনও কখনও হকচকিয়ে যায় এবং হাতের ছাতাটি খুলতে ভুলে যায়। আমার এখনকার অবস্থাও প্রায় সেইরকমই। আমি জানি ঘটনাটির মধ্যে আমার অন্যায় কথাবার্তায় কোনরকম অসংলগ্নতার ছাপ থাকবে না। তা সত্ত্বেও কেবলই মনে হচ্ছে আজকরে দিনটিই আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ দিন। এতদিন এলাকার মানুষজন আমাকে যে দৃষ্টিতে দেখে এসেছে, যে ধারণায় আমার অ্যাসেসমেন্ট করেছে, আর মাত্র কয়েকঘণ্টা পরেই আমার সম্পর্কে পরিচিত এবং আশপাশের মানুষজনের ধ্যানধারণা সব পাল্টে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কে না জানে পুলিশের ডায়েরীতে একবার নথিভুক্ত হলে, প্রতি দশজনে পাঁচজন অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশভাগ মানুষও ধরে নেবে, আমার হাঁটাচলা হাসি কথাবার্তা এসব কিছুর কোনটাই

মৌলিক সহজাত নয়। কার্পেটের নীচে ধুলোর মতো বাইরের আবরণের পিছনে অন্য একজন আমি আছি। যে ষড়যন্ত্র করে, দুর্ঘটনার পটভূমি তৈরী করে, পুলিশ যাকে জেরায় জেরায় নাস্তানাবুদ করে, সর্বোপরি যার সমর্থনে নিজের ভাইবোনও পাশে এসে দাঁড়ায় না। সত্যি আমার কান্না পেতে লাগল।

জীবনের এতটা পথ যে একেবারে মসৃণ ঘাত প্রতিঘাতহীনভাবে পার হয়ে এসেছি, তা নয়। দুঃখ অভিমান, ভয় দুশ্চিন্তা সব রকমের অভিজ্ঞতাই অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু নিরপরাধ একজন মানুষ খুন হয়ে যাবে এবং সেই খুনের তদন্তে আমাকেও একজন অপরাধী ধরে নিয়ে পুলিশ জেরা করার জন্য আমার বাড়ি ছুটে আসবে, এমন ঘটনার দুঃস্বপ্নও কোন দিন দেখিনি। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলাম অনেকটা। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিলাম। আমি যতই ভীত দিশেহারা হয়ে পড়ি না কেন, এটা জানি, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আমাকেই তার মোকাবিলা করতে হবে। জেরার পরে সন্তুষ্ট না হয়ে যদি পুলিশ অফিসারের নির্দেশে তার জিপে চড়ে থানায় যেতে হয়, সে ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে। কারণ সিদ্ধার্থ অনু যেমন, আমি জানি আশপাশের বাড়ির লোকজনও তেমনি জানলার ফাঁক দিয়ে, দরজার আড়াল থেকে দেখে নিয়েছে , পুলিশ ঢুকছে আমাদের বাড়িতে। তারা যদি সত্যি সত্যি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হত, যদি তাদের বিবেচনায় এই ধারণা আসত যে সত্যি মিথ্যে যাই হোক না কেন, একজন প্রতিবেশী বিপদগ্রস্ত, তার সমর্থনে যদি কিছু করি বা না করি, তাকে যতটুকু চিনি বা জানি সেই নিরিখে দুটি একটি সত্যি কথা বলি তার স্বপক্ষে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ছুটে আসত। আসলে দিনকাল বদলে গেছে, কেউ আর চায় না অযাচিত ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে। এটা যেমন ঠিক, সাথে সাথে এটাও সত্যি, ন্যায্যের স্বপক্ষে দাঁড়ানোর মতো মানসিকতারও আকাল পড়েছে। আমি যেমন নয়নচাঁদ এবং অলোকেশদের ব্যাপারে যেটা ঠিক তার সমর্থনে এগিয়ে গেছি, রুখে দাঁড়িয়েছি, ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির কথা ভাবিনি, শতকরা নিরানব্বই জন এটাকে বোকামি, অদূরদর্শিতা বলে মনে করে হয়ত। তাই অন্যায় দেখেও না দেখার ভাণ করে, যেন নিউটন আর্যভট্ট এমনি গভীর চিন্তামগ্নতার মুখোশ এঁটে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

সিদ্ধার্থ অনু এবং প্রতিবেশীদের কৃত্রিম উদাসীনতা এবং স্বার্থপরতার কথা ভেবেই যেন মনের মধ্যে অন্যরকম একটু জোর পেলাম। হঠাৎ করে মনে হল যে ক্ষেত্রে আমি একশভাগ নির্দোষী, সেক্ষেত্রে পৃথিবী আমার বিপরীত দিকে চলে গেলেও আমি পিছোব না। পিছনো উচিত নয়। কাপড়ের আঁচলে চোখমুখ মুছে নিয়ে, নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

খুব স্বাভাবিক গলায় হাতজোড় করে নমস্কার করে পুলিশ অফিসারকে বললাম, কিছু মনে করবেন না, একটু দেরী হয়ে গেল। চৌকির বিছানায় বসতে বসতে অফিসারকে হাতের ইশারায় বেতের মোড়াটা দেখিয়ে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

— আমার নাম সন্দীপন বসু। পুলিশ অফিসারটি নিজে থেকেই বললেন, জলপাইগুড়ি থেকে বদলি হয়ে সদ্য জয়েন করেছি আপনাদের শহর থানায়। অ্যাজ ওসি।

— ও, আচ্ছা। আমি অস্ফুট গলায় বললাম।

— আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গতকাল রাতে একজন মার্ডার হয়েছে এবং ডেডবডিটি পাওয়া গেছে আপনার বাড়ির সামনেই। আমি ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ।

— গতকাল রাতে ঘটনাটি যখন ঘটে — পুলিশ অফিসার নাটকে সিনেমায় যেমন দেখা যায়, অবিকল সেইরকম চোখ সরু করে আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে নীচু গলায় বললেন, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন? না জেগেছিলেন? অযথা ভয় পাবেন না। আমি কিন্তু ক্যাজুয়ালি জানতে চাইছি।

— ঘুমোচ্ছিলাম। আমি বললাম, তবে বোমের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল এবং 'মাগো'বলে করুণ গলার আর্তনাদ শুনেছিলাম।

— আর কিছু?

— কয়েকজন মানুষের দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছিলাম।

— আপনি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন। দ্যাট ইজ ন্যাচারাল। পুলিশ অফিসারটি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন, আপনার জায়গায় আমি থাকলে, আমারও আপনার মতো অবস্থা হত। ভাববেন না, পুলিশ মানেই ভয়ডর শূন্য, হিম্যান বা ফ্যানটম।

সাধারণভাবে দুঁদে পুলিস অফিসার বলতে যে ধরণের চেহারা চেনা ছকের মধ্যে পড়ে, এ লোকটিকে তার বাইরে একটু অন্যরকম দেখতে। চোখমুখে একটু বোকাসোকা ভাব। দাঁতগুলি অসম্ভব ঝকঝকে এবং সুসংবদ্ধ। টিভিতে মাজনের বিজ্ঞাপনে দাঁতের যে ছবি দেখান হয়, মজবুত সুরক্ষিত, ঠিক সেইরকম।

আমি নিজে স্কুলে পড়াই। নয় নয় করে আট বছর হয়ে গেল। কত রকমের মেয়ে। কখনো দুটি মেয়েকে হুবহু একরকম মনে হয় না। স্থূল চোখেও দুটি মেয়ের মধ্যে আচার আচরণ, সাজপোশাক, রুচি পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদি ব্যাপারে পার্থক্যটুকু ধরা যায়। প্রথম প্রথম পারতাম না। ইদানীং অতি অকিঞ্চিতকর কোন ঘটনা থেকেই দুটি একই বয়সের মেয়ের ফারাকটুকু খুব সহজেই ধরে ফেলি। সেক্ষেত্রে কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, কাকে কী ধরণের কথা কতটুকু বলা যাবে, এসব ব্যাপারগুলিতে এখন স্বতসিদ্ধ হয়ে

গেছি। কিন্তু স্কুল পড়ুয়া আর পুলিশ থানার ওসি তো এক নয়। আর এক্ষেত্রে পারস্পরিক তুলনা করে দুজনের মধ্যে কোন একজন অপেক্ষাকৃত ভাল, সজ্জন এমন বিচার করারও স্কোপ নেই। তাই চেহারা হাসি প্রশ্নের ধরণ, এসবের নিরিখে প্রথম সুযোগেই অফিসারটিকে ভাল লোক, নন হার্মফুল এমন কিছুই ভাবতে পারলাম না। আমার ভয় পাওয়া বা অসহায়তার সঙ্গে লোকটি যে নিজেকে জড়িয়ে নিল, এই ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হল না। উল্টে অফিসারটি 'আপনার', 'আমার' এইরকম একাত্মসূচক শব্দ ব্যবহার করে, আমাকে প্রভাবিত করার জন্য জাল ছড়াচ্ছে, এই ভেবে বেশ ভয় করতে লাগল। কথার তোড়ে কী বলতে কী বলে ফেলি এবং আচমকাই লোকটি হ্যাঁচকা টানে জাল টেনে তোলার মতো করে আমাকে পাড়ে টেনে তুলে, আমার অস্ত্রেই আমাকে ঘায়েল করে, হাত পা দুমড়ে মুচড়ে আছড়ে ফেলবে, এইরকম দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে গেল। নিজেকে যতদূর সম্ভব ধরে রাখার জন্য, যতটুকু না বললে নয়, অথচ যার মধ্যে মিথ্যে নেই, এই জাতীয় উত্তর দেওয়ার জন্য নিজেকে ক্রমাগত শাসন করতে লাগলাম। পুলিসের মুখোমুখি বসা মানেই তো অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া। জল গড়াতে গড়াতে কোনদিকে কতদূর যাবে জানি না। যেহেতু এই মুহূর্তে আমার সমর্থনে আমার পাশে কেউ নেই, তাই নিজেকে যথাসম্ভব ভয়শূন্য এবং স্টেডি রাখার চেষ্টা করলাম।

— তারপর, করুণ গলায় 'মাগো' ডাক শোনার পর বা কিছু মানুষের ছুটে পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনে আপনি নিশ্চয়ই বালিশে মুখ গুঁজে, 'আমি কিছু দেখছি না বা শুনছিও না কিছু' এইরকম ভাব করে মড়ার মত শুয়ে রইলেন?

আপাতভাবে প্রশ্নটি নিরীহ মনে হলেও, আমি বেশ বুঝতে পারলাম, পুলিশ অফিসারটি এবার তার নিজের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রশ্নটা কেবল ইঙ্গিতবহ নয়। যথেষ্ট অর্থবহও বটে। সাধারণভাবে পুলিশ যা করে থাকে, ভাল মানুষের ভান করে নরম গলায় প্রথমে এমন একটা ভাব তৈরী করে যেন সে আমার সুহৃদ, আমি বিপদগ্রস্ত হয়েছি জানামাত্রই সে সবকিছু ফেলে রেখে আমার কাছে ছুটে এসেছে, আমাকে সাহস দেবে বলে। পাছে আমি ঘাবড়ে যাই, সেটা আন্দাজ করেই, ঘরোয়া আটপৌরে পরিবেশ তৈরী করে তার প্রশ্নগুলির স্বতস্ফূর্ত উত্তর আদায়ের রাস্তা তৈরী করে নেয়। উত্তরদাতা নিজেও বুঝতে পারে না, কখন সে মাকড়সার জালে আটকে পড়েছে।

— তা কেন! আমি বললাম, করুণ গলার ডাক এবং কিছু মানুষের ছুটে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনেই আমি বিছানা থেকে নেমে ঘরের জানলা খুলে দেখতে গেলাম, কে ককিয়ে কেঁদে উঠল, ছুটে পালিয়ে গেল যারা, তারা কারা!

— বাঃ! বাঃ! পুলিশ অফিসারটি তারিফের গলায় বলল, আপনার যথেষ্ট মরাল কারেজ আছে। এসব ক্ষেত্রে মনে হলেও, ভয়ে অধিকাংশ মানুষ গুটিয়ে যায়। পিছিয়ে আসে। চটজলদি জানলা খোলার কথা তারা ভাবতেই পারে না। একটু চুপ করে থেকে বলল, জানলা খুলে কিছু দেখতে পেলেন?

— না। আমি ঘাড় নাড়লাম, ধমকের সুরে একজন বলল, জানলাটা বন্ধ করে দিন। আমি দিলামও। অন্ধকারে লোকটিকে দেখতেই পেলাম না।

— গলার আওয়াজ শুনে কিছু বুঝতে পারলেন না?

মনে হল গলার আওয়াজটা নকল। কারণ অমন ভারি গলা সচরাচর শোনা যায় না।

— অর্থাৎ লোকটি যেমন আপনাকে চেনে, আপনিও তাকে চেনেন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই গলার স্বরটা পাল্টেছে।

— আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আমি বললাম।

— কেন?

— ঘটনার আকস্মিকতায় আমি এমন পাজলড্ হয়ে গেছিলাম যে সত্যি সত্যি গলার স্বরটা অতটা ভারি ছিল কিনা, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

— দূর! তাই কখনো হয়! বলে পুলিশ অফিসারটি অবজ্ঞার হাসি হাসল, আপনি নিজেকেই নিজে কনট্রাডিক্ট করছেন।

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ক্যাজুয়াল কথাবার্তার নাম করে পুলিশ অফিসারটি ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে। এরপরেই হয়ত দুম করে বলে বসবে, সত্যি করে বলুন, কী দেখেছেন? কে আপনাকে জানলা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে?

আগেই বলেছি যে জায়গায় আমার কোন দোষ অন্যায় বা সত্য গোপন করার প্রশ্ন নেই, সেখানে একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাজারবার জিজ্ঞেস করা হলেও, আমার উত্তরের কোন হেরফের হবে না।

— আচ্ছা একটা কথা! আমি সরাসরি পুলিস অফিসারটির মুখের দিকে চেয়ে বললাম, আশপাশে এত মানুষ থাকতে, আপনি আমাকে জেরা করছেন কেন বলুন তো?

— জেরা! পুলিস অফিসারটি চোখমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, ছিঃ! ছিঃ! যেন আমার কথায় লজ্জা পেয়েছে, এটাকে জেরা বলছেন কেন? ইট ইজ এ পার্ট অফ ইনভেসটিগেশন। শুধু আপনার সঙ্গে কেন, এ ব্যাপারে আমি এলাকার অনেকের সঙ্গেই কথা বলব। হি অর সি মে বী রাম শ্যাম যদু অর রীতা মিতা সীতা।

— আমার প্রশ্নটা তো সেখানেই! আমি বেশ রাগত গলায় বললাম, রাম শ্যাম রীতা

মিতাকে ছেড়ে প্রথমেই আমার কাছে ছুটে এলেন কেন?

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র পুলিস অফিসার এমনভাবে হেসে উঠল যেন আমি একটি অবুঝ বালিকা এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে কেবল হাসাই যায়। এমনি মাথামুণ্ডুহীন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

— আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মুহূর্তে অফিসারের গলার স্বরে ভারিক্কি ভাব, আমি কতকগুলি প্রথমিক ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছি এবং এরপরেও করব। তার মানে এই নয়, আপনার উত্তরের বেসিসে তদন্ত শুরু হবে। তদন্তের কোন এক পর্যায়ে হয়ত আপনার উত্তরগুলি কাজে লাগল। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। দেখা গেল আপনি যা বলেছেন, ইনভেসটিগেশনের ক্ষেত্রে সেগুলি অল বোগাস বা যা বলেছেন আদৌ তা সত্যি নয়।

— তার মানে? বেশ বুঝতে পারলাম এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে গলাটা সামান্য দুলে উঠল। জিভে আড়ষ্টভাব।

— আপনি নিজেই তো বলছেন পাজলড্ হয়ে গেছিলেন। তাই আর কি! অফিসার আস্তো করে কাঁধ ঝাঁকালেন, হয়ত আদৌ কিছুই শোনেননি বা দেখেননি।

যদিও এ কথায় হাসি পায় না, তবু আমি হাসলাম। আমার হাসি দেখে পুলিশ অফিসারের হয়ত ইগোতে লাগল, আমি যা বলছি তার মধ্যে কোন হিপোক্র্যাসি নেই। এমন তো হয়ই। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখার অনেকক্ষণ পরেও কখনও কখনও মনে হয় না, যা দেখলাম সেটাই সত্যি?

— ঘুমোচ্ছিলাম সেটা সত্যি। আমি বললাম, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পরের ঘটনাগুলো যা বললাম, তার মধ্যে কোনরকম ইলুশন নেই। আক্রান্ত মানুষটির করুণ গলার ডাক শুনেছি। আততায়ীদের দৌড়োদৌড়ির শব্দ এবং আমার উদ্দেশে কোন একজনের ধমক শুনেছি। এগুলির মধ্যে কোন ভুল নেই। একটু থেমে বললাম, বা আপনি যেমন বলতে চাইছেন এনচ্যানটেড্ ইন এ নাইটমেয়ার, সেরকমও কিছু নয়।

পুলিশ অফিসারটি আমার কথার জবাব না দিয়ে মাথা নামিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। যেন আমার এমন আক্রমণাত্মক উত্তর সে মোটেও আশা করেনি বা আমার উত্তরের সারবত্তাটুকু স্বীকার করে নিচ্ছে বলেই, উত্তর দেওয়াটা সমীচীন নয়, এইরকম ভেবে চুপ করে আছে। কনস্টেবল কজন কাঠের পুতুলের মতো স্থির দাঁড়িয়ে। আমার জবাব দেওয়াটা তাদের কাছে এমনই অসম্ভব মনে হয়েছে যে তারা চমকে উঠে, পরবর্তী ঝড়টুকুর তীব্রতা আঁচ করে নিথর হয়ে গেছে।

— মানলাম, আপনি যা বলছেন তা একশ ভাগ সত্যি। পুলিস অফিসারটি থেমে থেমে বলল, কিছু এরকম বীভৎস একটি ঘটনা যে ঘটতেই পারে, এমন কিছু আন্দাজ করতে পারেননি ?

— যদি বলি, না, বিশ্বাস করবেন ? আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম।

— গত পরশুদিন কারখানার গেট মিটিংয়ে আপনি হাজির ছিলেন তো? পুলিশ অফিসারটি এমনভাবে প্রশ্নটা করল যেন আমি 'না' বললেও সে সরল বিশ্বাসে আমার উত্তরটা মেনে নেবে।

— হ্যাঁ ছিলাম। তবে নট অ্যাজ অ্যান এ্যাকটিভ পার্টিসিপ্যান্ট।

— তাহলে আপনি ওদের মধ্যে গিয়ে বসলেন কেমন করে? শ্রোতারা তো পার্টিসিপ্যান্টদের থেকে খানিকটা তফাতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

— মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন। স্কুলে ছাত্রীদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রবণতাকে যেভাবে সমর্থন করি, সেইভাবেই বললাম, অলোকেশ মানে যে ছেলেটি মার্ডার হয়েছে, একরকম তার পীড়াপীড়িতেই ওদের মধ্যে গিয়ে বসেছিলাম। আর তারপরেই তো ...।

— তা কী ভাবে হবে? পুলিশ অফিসার আমার কথা শেষ করতে দিল না, কিসের আন্দোলন, কারা করছে বা তাদের আন্দোলন এবং তার কর্মপদ্ধতি এসব সম্পর্কে কিছু না জেনেই, 'মা ডাকিল, ছেলে আসিল' এইরকম একটা লজিকবিহীন শর্তে, নিতান্তই আবেগের বশে, আপনার মতো একজন নামী শিক্ষিকা, বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা না করে, রাজনীতির নামাবলি গায়ে জড়িয়ে নিলেন ?

পুলিশ অফিসারের বক্তব্যটুকু কেবল দীর্ঘই নয়, যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। প্রথমে যেমন ভেবেছিলাম, পুলিশের মুখোমুখি বসে নার্ভাস হয়ে পড়ব। কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যাবে এবং যা থেকে আমাকে দোষী ভাবতে পুলিশের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না, বাস্তবে কিন্তু এত অভিযোগ এমন খোলাখুলিভাবে শোনার পরও মনে হল, অন্য কারোর সহযোগিতার প্রয়োজন নেই, আমি একাই নিজেকে সামলাতে পারি এবং ম্যাচ এখন আমাদের দুজনের হাতেই রয়েছে। ফিফটি ফিফটি, এই অনুপাতে।

সিদ্ধার্থ এবং অনুর ওপর রাগ হওয়ার পরিবর্তে, দুজনের জন্যেই আমার কষ্ট হতে লাগল। দুজনেই বয়সে আমার চেয়ে বেশ ছোট। সুতরাং অভিজ্ঞতাতেও দুজনেই এমন ম্যাচিওর নয়, যা থেকে নির্দোষীর বিপদের তুলনায়, নিজেদের অমূলক ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে। সত্যের স্বপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য মানসিক যে দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, তার জন্য বয়সোচিত অভিজ্ঞতা একটা ফ্যাক্টর।

অয়ন প্রায়ই বলত, নিজের বিবেকের কাছে যে সৎ, তার চেয়ে বড় নির্ভীক আর কেউ নেই। যে কোন অবস্থায় মোকাবিলা করার জন্য একাই রুখে দাঁড়ানো যায়। যদিও ....! বলে একটু থমকে যেত। তারপর আমার আগ্রহী দু'চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলত, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দৃঢ় মানসিকতার একজনকে পাশে পেলে, নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আমার সমর্থনে আমার পাশে একজন কেউ আছে, এই ভাবনাটুকু অনেক কিছু যোগান দেয়। যেমন সাহস, সততা। আমি যে ঠিক পথে আছি, পাশের জনের সক্রিয় উপস্থিতিতে সেটা আরও জোরদার হয়।

আমি যদি বলতাম, কোনদিন বিপদে পড়লে তুমি আমার পাশে থাকবে?

— অবশ্যই। তবে কিনা! একটু চুপ করে থেকে হেসে অয়ন জবাব দিত, আমার বিচারে যদি তুমি নির্দোষী বিবেচিত হও।

আমি জানি পুলিশ অফিসারটি বল লোফালুফি করার মতো করে এলোপাথারি প্রশ্ন ছুঁড়ে যেভাবে আমাকে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার পাশে অয়ন থাকলে, কখনই এমনটি ঘটত না। অয়নের যুক্তি, পালটা প্রশ্ন, এসবের ধারে পুলিশ অফিসারটির প্রশ্নগুলি নরম পেঁজা কাগজের মতো কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। আর অয়ন মজার খেলার মতো করে সেই টুকরোগুলিকে নিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিত বা খামচে ধরে খুশিমত এপাশ ওপাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত।

— কী ভাবছেন বলুন তো? পুলিশ অফিসারের দু ঠোঁটের ফাঁকে সরু সুতোর মতো হাসি, হঠাৎ করে একটা লেবার টারময়েলের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলাটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে?

— এটা তো একটা আপেক্ষিক প্রশ্ন। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আপনার বিচারে যেটা বোকামি, আমার বিচারে সেটা যথার্থ, সঠিক মনে হতেই পারে।

— অবশ্যই। অবশ্যই। পুলিশ অফিসার এমনভাবে মাথা দোলাল যেন আমি তার মনোমত উত্তর দিয়েছি।

— কিন্তু কোন কাজটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক! যাত্রার খলনায়কদের মতো খানিকটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অফিসার, ঠিক সেই মুহূর্তে তো বোঝা যায় না। আফটার এফেক্ট কী হতে পারে, বিচক্ষণ মানুষ আগে সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে।

তার মানে অফিসারটি পরোক্ষে বুঝিয়ে দিল, আমি যা করেছি, তা নিতান্তই হঠকারিতা। বিচক্ষণ দূরদর্শী এসব তো নই-ই, আবেগের ঢেউ-এ হঠাৎ করে ভেসে গিয়ে সস্তার জনপ্রিয়তার লোভে, মূলত নিজের সর্বনাশ আমি নিজেই ডেকে এনেছি।

কিছু সময়ের জন্য হলেও অয়নের সাহচর্যে আমার ভেতরে দুটো ব্যাপার ডেভলপ করেছে। প্রথমটা হল নিজের কাজের প্রতি বিশ্বাস। দ্বিতীয়টা এরই সূত্র ধরে, বোকার মতো হার স্বীকার না করা। যুক্তি দিয়ে, বিশ্লেষণ করে কেউ যদি আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেয়, সঠিক পথটির নির্দেশ দেয়, আমি অবশ্যই সেক্ষেত্রে থেমে যাব। প্রয়োজনে পিছিয়ে যাব। মুখে স্বীকার করতে আড়ষ্ট বোধ করলেও মনে মনে তাকে অভিবাদন জানাবো। অন্যথায় আমি আমার স্যান্ড পয়েন্ট থেকে এক পা'ও নড়ব না।

— কী হতে পারে, কী হলে ভাল হয়, আমি বললাম বেশ সহজ গলায়, তাৎক্ষণিক কোন ডিসিশান নেওয়ার ক্ষেত্রে এত কিছু কি ভাবা যায়? একটু থেমে বললাম, আপনিও কি পারেন?

অফিসারটি অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। পুলিশের প্রশ্নের জবাবে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকেই কেউ পালটা প্রশ্ন করতে পারে, এটা যেন তার ধ্যানধারণার বাইরে ছিল এতদিন। বিস্ময়কর পরিস্থিতিটা সামান্য সামলে নিয়েই অফিসার নড়েচড়ে বসল। প্রথমে গম্ভীর গলায় বলল, হুঁ। তারপর হঠাৎই গলাটা সামান্য চড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, আমি আপনার থেকে কোন সাজেশন বা অ্যাডভাইস চাইছি না। যা জিজ্ঞেস করছি, দয়া করে সেই জবাবটুকু দিন।

আমার মনে হল কে যেন সপাটে চাবুক মারল আমার গালে। ধমকের সুরে নির্দেশের ভঙ্গীতে আজ পর্যন্ত কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কে ছিল অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মতো। অনেক ব্যাপারেই অয়নের সঙ্গে আমার মতভেদ রয়েছে। কিন্তু অয়ন কোনদিনই আমাকে ধমকে কোন কথা বলেনি। সহকর্মীরা জানে আমি অন্তর্মুখী। কম কথা বলি। অনেক ব্যাপারেই আমি যেমন তাদের এড়িয়ে চলি, তারাও আমাকে। এমনকি হাসি ঠাট্টার কথাতেও তারা আমাকে অনেক সময়েই ডাকে না। স্বভাবতই পুলিশ অফিসারটির এ ধরণের আচরণে আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। রাগ ক্রোধ অপমান সব মিলেমিশে যেটা দাঁড়াল, তাতে একরোখা একগুঁয়ের মতো জেদ চেপে বসল। চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, যদি আপনার মনে হয়ে থাকে এই খুনের ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র ইনভলভ্‌মেন্ট আছে, আপনি আমায় অ্যারেস্ট করতে পারেন।

— এ আপনি কী বলছেন? পুলিশ অফিসারটি ঘাড় দুলিয়ে এমনভাবে হাসল যেন আমি রেগে গেছি বুঝতে পেরে বা তার বলার ধারণাটা ঠিক হয়নি আন্দাজ করতে পেরে, খানিকটা বোকা বোকা হাসি দিয়ে অসঙ্গতিটুকু কাটাতে চাইছে।

— আপনার জন্য আমার স্কুল যাওয়া হল না। আমি বললাম।

— আজ নিশ্চয়ই এলাকায় বনধ্ ডাকা হয়েছে। পুলিশ অফিসারটি যেন নিজেকেই নিজে বলছে, এ ধরণের একটা জঘন্য ঘটনার পর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, তার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটাও এসে যায় কিনা! বনধ্ মানে তো একটা প্রতিবাদ। তাই না? একদমে এতগুলো কথা বলার পর, আচমকাই পাকা অভিনেতার মতো গলাটাকে খাদে নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে সরাসরি আমার মুখের পানে তাকাল, অলোকেশবাবুর সঙ্গে আপনার কত বছরের বন্ধুত্ব?

— কেন বলুন তো?

— কলেজে উনি কি আপনার সহপাঠী ছিলেন? একসঙ্গে রাজনীতি মানে ইউনিয়ন টিউনিয়ন .... ?

— অলোকেশ কোন কলেজের ছাত্র ছিল জানি না। আমি বেশ রূঢ় গলায় বললাম, বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমায় দিদি বলে ডাকত।

— তার মানে আপনার ভায়ের বন্ধু নিশ্চয়ই?

— কেন? পরিচয়ের আর কোন সূত্র থাকতে পারে না?

— পারে। বলে পুলিশ অফিসার দুচোখ বুজে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যেন আমার জবাবটা তার একশ ভাগ মনঃপূত হয়নি। পরিচয়ের সম্ভাব্য আর কোন সূত্র থাকতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবছে।

— তবে কিনা এক্ষেত্রে একটা কথা ভাববার আছে। অফিসার চোখ বন্ধ করেই টেনে টেনে বলল, যারাই খুন করে থাকুক না কেন, অলোকেশবাবু তাদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড্। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি। আর আশ্চর্য, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, গেট মিটিং ডেপুটেশন শ্লোগান মিছিল, মানে টোটাল মুভমেন্টটা অনেকদিন ধরে চলছিল। তারপর বন্ধ দুচোখ খুলে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে হাসল, নীরুদেবী যেদিন আপনি গেট মিটিং-এ গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন, ঠিক তার পরদিনই অলোকেশবাবু খুন হলেন এবং খুনীরা স্পট হিসেবে বেছে নিল আপনার বাড়ির সামনেটা। আমার কথা বাদ দিন। একজন নিতান্ত নির্বোধও বলবে, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, একটা ঠান্ডা স্রোত ঘাড়ের কাছ বরাবর থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করছে। দুচোখের পর্দায় ঝাপসা আবছা ভাব। কোনমতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কোনরকমে এক পা দু পা করে পিছিয়ে এসে চৌকির ওপর বসে পড়লাম। দুহাতের করতলে মুখ ঢেকেও কান্না আটকাতে পারলাম না। হাতের চেটো বেয়ে চোখের জলে আমার শাড়ি ভিজে যেতে লাগল।

কতক্ষণ এই অবস্থায় বসে ছিলাম জানি না। হঠাৎই কে যেন আমার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিল, দিদি? কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?

চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থ। আবছা চেহারায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আর তার গা ঘেঁসে লম্বাচওড়া চেহারার একজন মানুষ। যিনি সামান্য ঝুঁকে আমার মাথায় আস্তো হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললেন, কান্নাও একটা অস্ত্র। তবে সেটা কাপুরুষদের।

আগন্তুক অজানা মানুষটির কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। শাড়ির আঁচলে দুচোখ মুছে এবার পরিস্কার দেখতে পেলাম, ধুরন্ধর পুলিশ অফিসারটি আগন্তুক অচেনা মানুষটিকে বিগলিত গলায় বলছে, স্যার আপনি? এখানে?

তেরো

তার মানে সিদ্ধার্থ সম্পর্কে এতক্ষণ আমি যে ধারণাটা করছিলাম, সেটা হয়ত ঠিক নয়। হয়ত বলছি এই কারণে যে সিদ্ধার্থর সঙ্গে আগত ভদ্রলোকটিকে দেখা মাত্রই পুলিশ অফিসারটির আচার আচরণ অন্যরকম হয়ে গেল। এই ঘরটায় যে আমি বাদেও সিদ্ধার্থ এবং অফিসারের অধস্তন কয়েকজন কনস্টেবল রয়েছে এসব বেমালুম বিস্মৃত হয়ে, শুধু ওই একটি মানুষকে খুশি করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এমন ভাব করতে লাগল যেন এই ঘরটা তার অফিস চেম্বার বা নিজের বাড়ি যেখানে আগন্তুক লোকটি একজন সম্মানীয় অতিথি, হঠাৎ করে হাজির হয়েছেন। এখন কোথায় তিনি বসবেন, সিলিং ফ্যানের গতি বাড়াতে না কমাতে হবে, চা নাকি সরবৎ কী দিয়ে আপ্যায়ন শুরু করা হবে, এইসবই এখন অফিসারের একমাত্র এবং প্রধান চিন্তা।

আগন্তুক লোকটির পরণে ধুতি পাঞ্জাবী। পায়ের চটীটি ঘরের বাইরে খুলে রেখে খালি পায়ে ঘরে ঢুকেছেন। চশমাটি বোধহয় আগেই খুলেছেন। জামার বুক পকেটে চশমার খাপটি দেখা যাচ্ছে। অল্পক্ষণ আগেই ভদ্রলোক পান খেয়েছেন নিশ্চয়ই। ঘরের বাতাসে জর্দার সুগন্ধ উড়ছে। অতিরিক্ত পান খাওয়ার জন্যই দাঁতগুলিতে আবছা লাল দাগ। কপালে সাধক বা পুরোহিতদের মতো বড় টিপ। টিপের রং ঠিক গাঢ় লাল নয়। তার মধ্যে আবার চন্দনের আভা। অর্থাৎ সিঁদুরের সঙ্গে চন্দন মিলিয়ে লাল হলুদের কম্বিনেশন তৈরী করা হয়েছে।

আগন্তুক লোকটি সুপুরুষ। কিন্তু পুলিশের উর্দ্ধতন ব্যক্তিদের চোখমুখে যে ধরণের কাঠিন্য থাকে, এই লোকটির চোখমুখের আদল ঠিক তার বিপরীত। টলটলে দুটি চোখ।

নাকটি সামান্য খাড়া বলে চোখ দুটি একটু ভেতরপানে ঢোকা। কিন্তু দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং কমনীয়। আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক পুলিশ বিভাগের হোমরা চোমরা কোন ব্যক্তি নন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পারেন। সাধারণ মানুষ যেমন পুলিশকে ভয় করে শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করে, রাজনীতির দাদাদের আবার পুলিশের সাহচর্য না পেলে চলে না। আসলে পুলিশ তো সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারটেকিং। টক-ঝোল-ঝাল-অম্বল, সবেতেই পুলিস অপরিহার্য। রাজনীতি করেন যাঁরা, সামাজিক সব ব্যাপারেই তাঁরা নাক গলাতে ভালবাসেন। রাজার সেপাই, জমিদারের লাঠিয়াল, বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে রাজনীতিকদের পাইক বরকন্দাজের ভূমিকাটি পুলিশ পালন করে।

যেহেতু সিদ্ধার্থ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, যদিও দলটির কাজকর্মে সরকারী কিছু বিধিনিষেধ থাকার দরুণ, গুপ্ত সংগঠনের আদলে দলের কর্মীরা কাজ করে, তা সত্ত্বেও আমি জানি, সরকার এবং সরকারবিরোধী দুপক্ষের নেতাদের সঙ্গেই সিদ্ধার্থদের গুপ্ত সংগঠনটির যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক আছে। সিদ্ধার্থ হয়ত তার দলের তেমনই কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছে, দিদিকে বিপদমুক্ত করার জন্য।

ভদ্রলোক চৌকিতেই বসলেন। আমার সামান্য তফাতে। তারপর হাসিহাসি মুখ করে বললেন, জানি, তুমি খুব ভেঙ্গে পড়েছ। ভয় পেয়েছ। যা ঘটে গেছে, তা তোমার কল্পনারও বাইরে বলে, আঘাতও পেয়েছ মনে মনে। একটু থেমে বললেন, কিন্তু মা, শক্ত হয়ে ঘুরে না দাঁড়ালে বিপদ তো কাটবেই না, উল্টেমানুষ ধরে নেবে শতকরা এক ভাগ হলেও তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ। আর সেই অপরাধবোধে কাঁদছ।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনিও ভুল বুঝছেন আমাকে?

— কেন? ভদ্রলোকের গলার স্বরে কৌতুকের ছোঁয়া। এটা বুঝতে পেরে রাগ হল যেমন, তার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও। কোথাকার কে একজন অচেনা মানুষ, আমার এই ঘনঘোর বিপদের দিনে, তিনিও আমার অসহায়তাকে নিয়ে মজা করার লোভ সামলাতে পারছেন না? এবার অপেক্ষাকৃত ভারি গলায় বললাম, সাধারণ মানুষ কী ভাবল না ভাবল, তাতে আমি এতটুকু বিচলিত নই। নিজের কাছে নিজে হেরে যাচ্ছি বলেই কষ্ট হচ্ছে। চোখের জলের অন্য কোনও কারণ নেই।

— বাঃ! এই তো চাই। ভদ্রলোকের গলায় উত্তেজনা স্পষ্ট, আমিও তো সেই কথাই বলছি। যে মরা মরা করে, সে মরেই যায়। অকারণে নিজেকে যে পাপী ভাবে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাকে রক্ষা করতে পারে না। কারণ সে তো ধরেই নিয়েছে পাঁকে তার পা ডুবে গেছে। এখন সে যদি নিজে চেষ্টা না করে, হাজার টানাটানি করলেও, সে পাঁকের অতলে

তলিয়ে যাবে। কারণ সে তো নিজে চাইছে। ইচ্ছের তো একটা নিজস্ব জোর আছে! সে পজেটিভ নেগেটিভ যাই হোক না কেন!

ভদ্রলোকের কথা বলার মধ্যে একটা অদ্ভুত আবেশী ভাব। যা সহজেই মনকে ছুঁয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারছি, উনি যা বলছেন তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। বলার ধরণটাও এমন কিছু আহামরি নয়। স্পষ্ট কাটা কাটা উচ্চারণ বা গলার ওঠানামার মধ্যেও পেশাদারী অভিনেতার দক্ষতা নেই। কিন্তু তারপরেও মনে হল, সিদ্ধার্থ যদি আর কিছু সময় আগে ওনাকে নিয়ে এখানে আসত, তাহলে কখনই পুলিশ অফিসারটির মিথ্যা দোষারোপে আমি এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তাম না।

— সমস্ত ঘটনাটি কি আপনি আদ্যন্ত জানেন? বলে পুলিশ অফিসারটির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালাম, এই ভদ্রলোক যেভাবে আমাকে ক্রশ করছেন এবং স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর পাওয়ার পরও, রীতিমত ফোর্স করে আমাকে ঘটনাটার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন, আমার জায়গায় আপনি থাকলে, আপনার অবস্থাও আমার মতোই হোত।

— তাই কী? বলে ভদ্রলোক একটু হাসলেন, আমার 'আমি'-কে যেমন আমি পুরোপুরি চিনি না, তোমার 'তুমি'-কেও তুমি সর্বাংশে চেনো না। যদি এক মুহূর্তের জন্যও সেই আত্মউপলব্ধিটুকু অনুভব করা যায় যে আমি কে, দেখবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাতের মুঠোয়। কথাটা লজিক্যালি একটু ভারি মনে হলেও, ঠিক। একশভাগ ঠিক। হাজারবার ঠিক। যুদ্ধে স্থির ছিলেন বলেই না, কৌরবদের অমন যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুধিষ্টির জয়ী হলেন! এই অব্দি বলে ভদ্রলোক হঠাৎই বললেন, আমি কিন্তু মাইথলজির রেফারেন্স টানলাম মানে এই নয় যে তোমাকেও পৌরাণিক চরিত্রগুলির মতো আচরণ করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পাল্টেছে। কিন্তু পারদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা, স্থৈর্য, সততা আবার তার বিপরীতে মিথ্যাচার, হঠকারিতা, অসততা, এইসব মানবিক ব্যাপারগুলির ভালমন্দ, দোষগুণ, সভ্যতার শুরু থেকে আজ অব্দি অপরিবর্তিতই আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না। বাস্তবিক ভয় উৎকণ্ঠা সব মিলেমিশে আমার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে। অচেনা ভদ্রলোকটির কথাবার্তা আমার কাছে দুর্বোধ্য এবং ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন মনে হচ্ছে। যা আমি করিনি, যার মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই, সেই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে আমাকে মিথ্যে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, আমাকে দোষী ষড়যন্ত্রকারী সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বভাবতই আমি আমার পাশে এমন একজনকে চাইব, যিনি সোচ্চারে আমাকে সমর্থন করবেন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবেন। পরিবর্তে কেউ যদি 'জলে নামবো, চুল

ভেজাবো না' এইরকম মনোভাব নিয়ে, বাদী বিবাদী দুজনের থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রেখে, সুচারু শব্দ ব্যবহার করে পরোক্ষে বোঝাতে চান, তিনি কত কী জানেন, তাতে কার কী উপকার হয় জানি না, আমি নিজেকে নিরপরাধী বা বিপদমুক্ত বলে ভাবতে পারি না। শুরু থেকেই আগন্তুক ভদ্রলোক এমন কায়দা করে কথা বলছেন, যেন যদি আমি 'অমুকটা' এসট্যাবলিশ করতে পারি বা 'তমুকটা' অস্বীকার করতে পারি, তাহলে পুলিশের সাধ্য নেই আমাকে বিব্রত করা। এটা তো খুব সাধারণ ব্যাপার যা মোটা মাথার ভোঁতাবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষও জানে যে, পুলিশ যদি আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয় বা আমি কোনভাবে পুলিশকে বোকা বানাতে পারি, তাহলে আমার আর কোন ভয় নেই। কিন্তু যেখানে আমি নিজেই কীভাবে বোঝাব, বিশ্বাস করাবো তার পথ খুঁজে পাচ্ছি না, সেখানে দ্বিতীয় একজনের সক্রিয় সহযোগিতার পরিবর্তে ভারি ভারি জ্ঞান উপদেশ কেবল বিরক্তিকর নয়, যথেষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি ইশারায় সিদ্ধার্থকে ডেকে বললাম, এই লোকটা কি পুলিশের কোন বড়কর্ত্তা, সিভিল পোশাকে এসেছেন ? নাকি তোদের দলের কেউ ? সত্যি করে বল।

সিদ্ধার্থ অল্প একটু হেসে বলল, ইনি যখন এসে গেছেন, তোমার আর কোন ভয় নেই। পুলিশ তোমার টিকিও ছুঁতে পারবে না।

— তুই হঠাৎ করে এনাকে নিয়ে এলি কেন ? আমি সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন যদি এমন হয়, এই লোকটি পুলিশের কাছের লোক হন! দেখলি না 'স্যার' বলে কথা বলছে অফিসার।

— সেইজন্যই তো খুঁজে পেতে নিয়ে এলাম। সিদ্ধার্থ ফিসফিস করে বলল, এনাকে চেনে না, হেন কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা কী জান ? সিদ্ধার্থ প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, সরকারের যে কোন দপ্তরের উঁচু দরের যে কোন অফিসার এনাকে চেনে, কেবল চেনেই না, খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

— তার মানে গুরু টুরু জাতীয় কেউ ?

— *চুপ-প-প্। সিদ্ধার্থ মুখ দিয়ে হিস-স্-স্ জাতীয় একটা শব্দ করল। নিজের ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে ঈশারায় আমায় বোঝাল, আমি যেন কোন কথা না বলি।*

— উনি কি পুরো ব্যাপারটা জানেন ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— জানার প্রয়োজন নেই। সিদ্ধার্থ বলল, পরিবেশ দেখেই ইনি বুঝতে পারেন। কপালে হাত জোর করে ঠেকাল সিদ্ধার্থ, বিশাল মাপের মানুষ। বলতে পার, মানুষের দেহধারী সাক্ষাত বিপদতারণ।

— আমি রাজনীতি করি না। সোস্যাল রিফরমারও নই। সমাজের মূল অসুখটা কোথায় বা কীভাবে তার মোকাবিলা করা যেতে পারে, এসব সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণা নেই। একটু থেমে বললাম, আগ্রহও নেই।

— সেটাই তো স্বাভাবিক। ভদ্রলোক আমায় সমর্থন করলেন, উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে চায় বল? তবে কিনা! বলে চোখের ইশারায় পুলিস অফিসারকে দেখিয়ে বললেন, একটু গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করছি। কিছু মনে কোর না। বাহ্যে পেলে কাউকে ডেকে দিতে হয় না। আবার খেলা সাঙ্গ হলে তখন একটিই আব্দার, মায়ের কাছে যাব। কথা শেষ হলে ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়াটুকু দেখবেন বলে বা তাঁর কথার সমর্থনে আমার ছোট্ট 'হ্যাঁ'টুকু শোনার পরেই 'বেশ' বা 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে উঠে দাঁড়াবেন।

আমি ভদ্রলোকের কথার ভেতরের অর্থটুকু সম্যক বুঝতে পেরেও, 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বললাম না। পরিবর্তে সিদ্ধার্থর উদ্দেশে বেশ জোর গলায় বললাম, তুই কি বেরোবি? আমি একটু বিশ্রাম নিতাম।

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই ভদ্রলোক সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালেন, চল হে। দা-কাটা রোগা সাহেব, তোমার আরও কিছু জানার থাকলে পরে একসময় এসো। অফিসারটি যে তার জিজ্ঞাসাবাদ এবং ঘটনা সম্পর্কিত আরও কিছু জরুরী কাজ শেষ করতে পারল না বলে মনে মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট, সেটা একরকম প্রকাশই করে ফেলল, আর দু একটি মামুলি প্রশ্ন ছিল দাদা এবং বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা। সামান্যক্ষণ থেমে আফশোসের সুরে বলল, আপনি যখন উঠে পড়েছেন, তখন আমাকেও তো ...! কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকাল যেন নিরুপায়, দাদার আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারছে না বলে। এমন কড়া চোখে আমার দিকে তাকাল, যা থেকে অতি ভালমানুষ, যার মধ্যে এক টুকরোও ঘোরপ্যাঁচ নেই, সেও বুঝতে পারবে, দাদার কথার সম্মানার্থে সে আমাকে নিতান্তই এ যাত্রায় ক্ষমাঘেন্না করে গেল। তবে তেমন সুবিধাজনক অবস্থায় পেলে আমার থেকে গুণে গুণে সুদে আসলে উসুল করে নেবে।

বারান্দায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্পরত চারজন কনস্টেবল ইতিমধ্যে উঠোনে নেমে সদর দরজার দিকে চলতে শুরু করেছে। সামনের দিকে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে, একজন হেরো মানুষের ভঙ্গীতে ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে, অফিসার বারান্দায় বেরিয়ে গেল। তখন আগন্তুক লোকটি নিজের জায়গা থেকে সামান্য সরে, আমার প্রায় গা ঘেঁষে এসে ফিসফিস

করে বললেন, তুমি নাস্তিক না আস্তিক জানি না। এ সবই মহামায়ার খেলা। কতদূর পর্যন্ত সুতো ছাড়তে হবে বা কখন গোটাতে হবে, এসবই তিনি আগে থেকে ছক করে রেখেছেন। তুমি আমি তো নিমিত্তমাত্র। তা না হলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে আমার তো দেখা হওয়ার কথাই নয়। তার উপর আমার খোঁজে সিদ্ধার্থ যে ওখানে গিয়ে হাজির হবে ...। কথা অসম্পূর্ণ রেখে লোকটি বেশ শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে অনুরাগী সুরে বললেন, সিদ্ধার্থ জানল কেমন করে যে আমি এই শহরেই আছি এবং অমন একটি জায়গায়!

সিদ্ধার্থ জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। কিন্তু লোকটির কথার কোন জবাব দিল না। অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক ঘরের দরজার কাছ বরাবর এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর যেন ঘরের সবাই, সম্ভব হলে প্রতিবেশীরাও শুনুক, এমনি জোরে বললেন, বুড়ি ছুঁয়ে থাকলে কোন ভয় নেই। তখন রাজার সেপাই লাঠিয়াল যে কেউ আসুক না কেন, ছায়া মাড়াতেও সাহস পাবে না।

ভদ্রলোকের প্রবেশ, অবস্থান এবং প্রস্থান তিনটিই আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছিল। মানুষটির সঠিক পরিচয় কী, পুলিশ অফিসার তাঁর সামনে হঠাৎ করে গুটিয়ে পাকিয়ে গেল কেন, ভদ্রলোকের কথাবার্তায় আধা দার্শনিকতার ছোঁয়া, যদিও তার মধ্যে আত্মপ্রচার, আত্মমহিমার ঝোঁক স্পষ্ট, সর্বোপরি সিদ্ধার্থ এমন একজন মানুষের সন্ধান পেল কেমন করে এবং 'অমন একটি জায়গা' বলতেই বা উনি কী বোঝাতে চাইলেন! সব কিছুই আমার কাছে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে মনে হতে লাগল।

সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করলাম, ভদ্রলোকের নাম কী রে?

— জানি না। সিদ্ধার্থ ছোট জবাব দিল।

— সে আবার কী কথা! আমি বললাম, নাম-না-জানা অচেনা একজন মানুষকে অন্দর মহল অব্দি দেখিয়ে দিলি!

— নাম না জানলেই বুঝি অচেনা হয়? সিদ্ধার্থ গলাটাকে ইচ্ছে করে বিকৃত করে বলল, আমাদের বাড়ির আশেপাশে তো অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁদের নাম আমরা জানি এবং তাঁরাও আমাদের জানেন। একটু থেমে বলল, আমাদের বাড়িতে পুলিশ ঢুকছে দেখেও তো একজন নামজানা মানুষও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। আমি জানি জানলা দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে তারা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রেখে চলেছে। সিদ্ধার্থর এ কথার জবাব দিতে পারলাম না। কারণ ও যা বলছে তা একশ ভাগ ঠিক। এখানেই আমার সন্দেহটা বেশী করে জোরালো। কোথাকার কে একজন হঠাৎ করে

আমাকে রক্ষা করতে মরণপণ দৌড়ে এলেন। আমার স্বপক্ষে কথা বললেন। পুলিস অফিসারকে রীতিমত পরোক্ষে হুঁশিয়ারী দিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে যা, তা অযৌক্তিক, অমানবিক। পরিশেষে আমাকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করে, আবার আসার অঙ্গিকার করে বিদায় নিলেন।

— ভদ্রলোক তোর কথা শুনে ছুটে এলেন? আমি সিদ্ধার্থকে বললাম, নাকি তুই পীড়াপীড়ি করে টেনে নিয়ে এলি?

— তুমি আমায় কী ভাব বল তো! সিদ্ধার্থ উত্তেজিত গলায় বলল।

— না, মানে উনি যেভাবে বললেন ...!

— সেটা ওনার সৌজন্যবোধ।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাই কি'? কথাটাকে গিলে নিয়ে বললাম, উনি কি আমাদের শহরে নতুন এসেছেন?

— তাই হবে বোধ হয়।

— তোর সঙ্গে আলাপ হল কেমন করে?

— তোমাকে সব বলতে হবে? সিদ্ধার্থ রাগত গলায় বলল, তুমি ভুলে যাও কেন দিদি, আমি এখন তেমন নাবালক নই যে, 'কোথায়', 'কীভাবে', 'কবে', সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ভেতরে ভেতরে সিদ্ধার্থ যে এত বড় ভাবতে শুরু করেছে নিজেকে, আমার কল্পনাতেও ছিল না। এখনও শুনে মনে হচ্ছে ও যা বলছে, তার সব না বুঝেই বলছে। দুঃখ হল। অভিমান হল। এমনও মনে হল, তবে কি আমিই পিছিয়ে পড়ছি ধ্যান ধারণায় ভদ্রতা শালীনতায়? আমার অজান্তেই সময় এত দূর এগিয়ে গেছে? এতখানি পাল্টে গেছে পারস্পরিক সম্পর্কবোধ? এত সব ভাবনাচিন্তার পরও মনে হল একটা প্রশ্ন সিদ্ধার্থকে করতেই হবে, করা উচিত, 'ওখানে' বলতে ভদ্রলোক কোন জায়গার কথা বললেন? সিদ্ধার্থ সোজা চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর নির্ভীক গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, বাজারের মোড়ে সুরিয়ার মদের ঠেক। আমার মনে হল গত রাতের মতো বিকট শব্দে আর একটি বোম ফাটল আমার কানের পাশেই।

'মাগো'! এই উচ্চারণটুকু নিজের কানেই আর্তনাদের মতো শোনাল। কোনরকমে বললাম, তুই ওখানে গেছিলি? আমার জন্যে?

— কেন? বলে সিদ্ধার্থ মুচকি হাসল, তুমি বুঝি অয়নদার মতো ছুঁৎমার্গী?

চোদ্দ

বাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে দেখে সিদ্ধার্থ সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছিল। অলোকেশের রহস্যজনক মৃত্যুর খানাতল্লাশিতে পুলিশ আসবে এ ব্যাপারে সিদ্ধার্থ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেও পুলিশ তাদের বাড়িতে আসবে কেন, এ অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। অলোকেশকে মৃত অবস্থায় তাদের বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু তাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তো নয়। আর অলোকেশকে কে বা কারা হত্যা করেছে, তার প্ল্যান প্রোগ্রাম ছকেছে কে, এ পাড়ার সবাই সেটা আন্দাজ করতে পারছে। হয়ত সাহস করে এগিয়ে এসে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এমনিতে বড়দি স্পষ্টবাদী হলেও রহস্যজনক খুনের সঙ্গে নিজেকে স্বেচ্ছায় জড়াবে না বা কোনরকম বাহবা পাওয়া যাবে ভেবে নিয়ে পুলিশকে সাদরে ডেকে আনবে, এটা মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

সিদ্ধার্থর ধারণা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের হয়রানি করার জন্য আশপাশের প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকেই কোন একজন পুলিশকে মিথ্যে খবর দিয়েছে। সিদ্ধার্থ নিজে একটি গুপ্ত সংগঠনের সদস্য হলে কী হবে, পুলিশ সম্পর্কে ভীতি আছে। তার ধারণা পুলিশ 'হয়'-কে 'নয়' করতে পারে। প্রয়োজনে জেলহাজতে পিটিয়ে হত্যা করে মনগড়া একটা কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে। আর এসব ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে কিছুদিন লেখালিখি হয়। বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা লোকদেখানো চিৎকার চেঁচামেচি করেন কিছুদিন। তারপর সব থিতিয়ে যায়। নতুন কোন ঘটনা বা সমস্যার আড়ালে সরকারী ঘাতকদের কেচ্ছা কাহিনী চাপা পড়ে যায়। পাবলিক এক অদ্ভুত জীব। সব ধরণের ব্যাপারেই তার প্রবল উন্মাদনা। ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, রাজনৈতিক নেতাদের দলবদল থেকে শুরু করে, ম্যাচ গড়াপেটা, বহুতল বাড়ি ভেঙ্গে পড়া, সিনেমার হিরো হিরোইনদের কেচ্ছাকাহিনী, যে কোন খবরে পাবলিক হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ট্রেনে বাসে মাঠে ঘাটে সেলুনে চায়ের দোকানে যখন যেটা উত্তেজক খবর, তা নিয়ে কিছুদিন তর্ক বিতর্ক করে, রেফারেন্স আওড়ায়, এমনকি সমাধানসূত্র পর্যন্ত বাতলে দেয়। এসব ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না টাটকা গরম ভিন্ন স্বাদের অন্য একটি বিষয় বাজারে আসে।

সিদ্ধার্থ জানে অলোকেশের মৃত্যু বিষয়ক খবরটিও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাসি হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন না সেটি হয়, ততদিন যাবতীয় হ্যাপা তার দিদি এবং তাদের পরিবারকে ভোগ করতে হবে। এইসব সাতপাঁচ চিন্তা করেই সিদ্ধার্থ, পুলিশকে বাড়িতে

ঢুকতে দেখেই দ্রুত চুপিসারে বাড়ির পিছন দিকের পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেছিল। দিদিকে পুলিশের মুখোমুখি একা ফেলে রেখে যাওয়াটা উচিত কাজ হয়নি জেনেও সে পালিয়ে গেছিল। মূলত দুটি কারণে। এক, তার মনে হয়েছিল একা একজন মহিলাকে পুলিশ যেভাবে জেরা করবে, একজন পুরুষ হিসাবে তাকে নাগালের মধ্যে পেলে পুলিশের কার্যপদ্ধতি আমূল পাল্টে যাবে। কথাবার্তায় অযথা সময় ব্যয় না করে, পুলিশ প্রথমেই তাকে আটক করবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে জালঘেরা গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যাবে। প্রয়োজনে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তাকে রীতিমত হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাবে। দুই, সিদ্ধার্থর মনে হয়েছিল শাসক দলের কোন দাদার কাছে খোলাখুলি সব বললে, হয়ত তিনি ফোন থুলে থানায় দু চার ধমক ধামক দিলেই পুলিশ কেন্নোর মত গুটিয়ে যাবে। 'সরি ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না!' এইভাবে ক্ষমা চেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে। যদিও শাসক দলের কোন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেই তার কোনরকম আলাপ পরিচয় নেই। তার না থাক, অন্য কারোর তো আছে। যদি এমন হয় যে সেই দ্বিতীয়জন সিদ্ধার্থকে ভালবাসেন! স্নেহ করেন! প্রয়োজনে তাঁকে ধরে দিদিকে রাজার সেপাইদের আক্রমণ থেকে মুক্ত করা যায় যদি!

অন্যমনস্কের মতো এবং একটু জোরেই হাঁটছিল সিদ্ধার্থ। তাকে বেশ বিধ্বস্ত এবং ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল। শচীন ডাক্তারের চেম্বারের সামনে দিয়ে যখন সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে, সেই সময় চেম্বারের ভেতর থেকে ডাক্তারবাবু তাকে ডাকলেন, বেশ উঁচু গলায়, কী ব্যাপার, সিদ্ধার্থ? সিদ্ধার্থ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাক্তারবাবুর মুখের পানে অল্পক্ষণ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকার পরে, ডাক্তারবাবু ঠিক যেন কোন ইমারজেন্সী রোগী এসেছে, এমনি ব্যস্ততায় চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এসে বেশ রাগত গলায় বললেন, তোমায় ডাকছি। শুনতে পাওনি? একটু থেমে বললেন, সাতসকালে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ?

সিদ্ধার্থর মনের মধ্যে ঝড় বইছে। দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ভয় সব মিলেমিশে তাকে এমনই বেসামাল করে দিয়েছে যে অকারণে ডাক্তারবাবু তাকে অমন কড়া গলায় ডাকলেন কেন বা ডাকামাত্রই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। জড়ানো গলায় কোনরকমে বলল, বাড়িতে পুলিশ এসেছে কিনা তাই ...!

শচীন ডাক্তার দু চোখ কুঁচকে বললেন, পুলিশ! হঠাৎ করে তোমাদের বাড়িতে কেন?

— কী জানি! সিদ্ধার্থ নিতান্তই ছেলেমানুষের মতো বলল।

— কি জানি মানে? ডাক্তারবাবুর গলার সুরে জেরার আভাস, তুমি একজন অ্যাডাল্ট

ছেলে, জানো না, পুলিশ কেন আসে? শচীন ডাক্তারের প্রশ্নের ধরণ ধারণে সিদ্ধার্থর হঠাৎ করে মনে হল, এই সেই লোক, যাঁর খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। এবার সে নিজেকে যথাসম্ভব বেপরোয়া নির্ভীক প্রতিপন্ন করার জন্য বেশ চড়া গলায় বলল, পুলিশ কেন এসেছে এবং এ ব্যাপারে ইনফর্মার কে সব জানি।

সিদ্ধার্থ যেন আধক্ষ্যাপা কোন মানুষ যার কথাবার্তার কোন মাথামুণ্ডু নেই এবং যার কথায় মুখ টিপে হাসা যায়, এমনি ভঙ্গীতে শচীন ডাক্তার চাপা দু ঠোঁটে হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, এখন চললে কোথায়? ইনফর্মারের খোঁজে, নাকি অবস্থাটা কীভাবে সামাল দেওয়া যায়, তার জন্য কোন নেতাটেতার বাড়ি? কথা শেষ করে শচীন ডাক্তার আধভাঙ্গা ছ্যাৎলাধরা দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবুর এ ধরণের রহস্যজনক ব্যবহারে সিদ্ধার্থ ভেতরে ভেতরে রেগে গেল খুব। শচীন ডাক্তার তার বাবার বন্ধু বা তাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান নন। সে বা তার বাড়ির কেউ শচীন ডাক্তারের কাছে কোনদিন চিকিৎসাও করায়নি। সর্বোপরি ডাক্তার হিসেবেও মোটেও তেমন নামি নন, যাঁর সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে, সামান্য কুশল বিনিময়ের সুযোগ পেলে নিজেকে যথেষ্ট ধন্য গর্বিত বলে মনে হতে পারে। শচীন ডাক্তারের সঙ্গে সে নিজে যেচে কোনদিন কথা বলেনি। ডাক্তারবাবুও হঠাৎ করে তাকে ডেকে 'কী ব্যাপার', 'কী বৃত্তান্ত' এই ধরণের কোন প্রশ্ন কোনদিন করেননি। স্বভাবতই সিদ্ধার্থ নিশ্চিত হয়ে গেল, এই সেই শয়তান বিশ্বাসঘাতক, যিনি গোপনে দিদি বা তাকে অলোকেশের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী বা হত্যার কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এইভাবে পুলিশকে বুঝিয়েছে। তা না হলে যার সঙ্গে সিদ্ধার্থর সামান্য বাক্যালাপও পর্যন্ত হয় না কোনদিন, তিনি নিজে থেকে সিদ্ধার্থকে ডেকে হাজারো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন? সত্যি সত্যি পুলিশ গেছে কিনা বা সেই ভয়ে সিদ্ধার্থ পালিয়ে যাচ্ছে কিনা, এ ব্যাপারটায় নিশ্চিয় হওয়ার জন্যই চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এসে, সিদ্ধার্থকে দাঁড় করিয়ে এত কথা জানতে চাইছেন।

— বাড়িতে তো তোমার দুই দিদি আর মা! এইটুকু বলে শচীন ডাক্তার এবার যেন একজন প্রকৃত সুহৃদ এটা বোঝানোর জন্য অনুযোগের মেজাজে বললেন, আফটার অল তুমি একজন পুরুষ মানুষ। একটু থেমে বললেন, এইরকম ক্রিটিকাল একটা সময়ে তিনজন মেয়ে মানুষকে একা ফেলে রেখে, তোমার বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। শচীন ডাক্তার দুচোখ বন্ধ করে অল্পক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর ধীর গলায় বললেন, কোন প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে আপাতত বিপদমুক্ত হতে পার।

শচীন ডাক্তারের মুখে 'বিপদমুক্ত' কথাটা শোনা মাত্রই বরফ শীতল ভয়ে সিদ্ধার্থ হাত পায়ে একটা ঠাণ্ডা ভাব টের পেল। মুহূর্ত আগের রাগ সে ভুলে গেল। এমনকি শচীন ডাক্তার সম্পর্কে কু ধারণা যা তার মনে তৈরী হয়েছিল, সেটিও বিস্মৃত হল। সে যেন শচীন ডাক্তারের কাছেই এসেছে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য এমনি ব্যাকুল গলায় বলল, কার কাছে যাই বলুন তো? একটু চুপ করে থেকে আপন মনেই মাথা নাড়াল, তা না হলে দিদি বেচারা একলা! তার সঙ্গে হয়ত অনুকেও ...।

— বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। শচীন ডাক্তার গলায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, ভেতরে এস। আগে ইন ডিটেলস সব শুনি। তারপর তো পথ একটা খুঁজে বার করতেই হবে। অহেতুক পুলিশ তোমাদের হয়রানি করবে, এটা তো হতে পারে না। তোমরা আমার প্রতিবেশী। তাছাড়া তোমার বাবাকেও আমি যথেষ্ট স্নেহ করতাম।

শচীন ডাক্তারের চেম্বারের ভেতরটা যে এমন দীনহীন চেহারার, সিদ্ধার্থর ধারণা ছিল না। সেকেলে একটি টেবিল এবং দুটি হাতলওলা কাঠের চেয়ার। দিনের বেলাতেও আধো অন্ধকার। টেবিলের ওপর ছোট একটি টর্চ এবং ওষুধের চামড়ার বাক্স একটি। কাঁচভাঙ্গা একটি কাঠের আলমারি ঘরের কোণে। আলমারির মধ্যে সেকেলে কাপড়ের মলাটে বাঁধানো ডাক্তারীশাস্ত্রের কয়েকটি বই। বইগুলির ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ। চিনেমাটির খলনুড়ি এবং ডগাভাঙ্গা একটি মেজারিং সিলিন্ডার। মেঝেতে একটি জলের কুঁজো যার গায়ে শ্যাওলার আস্তরণ। কুঁজোর মুখে এবড়ো খেবড়ো এক টুকরো পিচবোর্ড ঢাকা দেওয়া। ওয়েটিং রুম এবং চেম্বারের মধ্যবর্তী প্লাইউডের পার্টিশানটি সোজা নয়, সামান্য হেলে দাঁড়িয়ে। তার বুক চিরে চেম্বারের ভেতর ঢোকার দরজাটি, উচ্চতা এবং চওড়া দুয়েতেই বেশ ছোট। সেখানে বিবর্ণ ছেঁড়া, বহুদিন কাচা হয়নি এমন নোংরা একটি পর্দা ঝুলছে। চেম্বারের মধ্যে একটি বাল্ব জ্বলছে। বড়জোর পঁচিশ ওয়াটের। তার ওপর ময়লা জমেছে বাল্বের ওপর। ফলে হঠাৎ করে ঢুকলে, সত্যি কোন আলো জ্বলছে কিনা ঠাওর করা যায় না। পুরনো চুনখসা দেওয়ালের খাঁজে ভাঁজে মরা চোখের চাউনির মতো ফ্যাকাসে আবছা লালচে আলো, ঘরটার চেহারার দীনতার সঙ্গে সঙ্গে হালকা রহস্যময়তা এনেছে।

চেম্বারে মানুষ বলতে একজনই। ডাক্তার নিজেই। হাতের ইশারায় সিদ্ধার্থকে একটি চেয়ারে বসতে বললেন। নিজে বসলেন সিদ্ধার্থর মুখোমুখি এবং বেশ খানিকটা ঝুঁকে। হঠাৎ করে ঘরের মধ্যে যে কেউ ঢুকে পড়লে নির্ঘাৎ ধারণা করবে ডাক্তার এবং সিদ্ধার্থ গোপনে বসে নীচু গলায় কোন গভীর ষড়যন্ত্রের ছক কষছে।

শচীন ডাক্তার কথা শুরু করলেন অপ্রত্যাশিত ছকে। সিদ্ধার্থকে প্রথমেই বললেন, রিল্যাক্স করে বস। চা খাবে নাকি?

সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে 'না' বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ডাক্তার গলা তুলে কার উদ্দেশে যে বললেন কে জানে! নকুল দু কাপ চা। চারটে নোনতা বিস্কুট।

সিদ্ধার্থর অনুসন্ধিৎসা আন্দাজ করেই যেন বললেন, যাকে বলেছি সে ঠিকই শুনেছে। একটু থেমে বললেন, এখানে ভূতে কাজ করে। সব রকমের কাজ। ওই যে বললে না, ইনফর্মার না কি যেন, এখানে ভূতুরে ইনফর্মার আছে।

— হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শচীন ডাক্তার যেন হারিয়ে যাওয়ার কথার খেই ধরার চেষ্টা করছেন, মার্ডার হোল অলোকেশ, তুমি বা তোমার বাড়ির কেউ-ই ওই কারখানার শ্রমিক নও। সরাসরি রাজনীতি করতেও তোমাদের দেখিনি কোনদিন। একটু থেমে চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন। তারপর দুম করে বলে বসলেন, হঠাৎ করে পুলিশ তোমাদের বাড়িতে এল কেন? এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

সিদ্ধার্থর দিকে আর একটু ঝুঁকে পড়ে গলাটাকে যথাসম্ভব দেবে বললেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কারোর উস্কানি আছে। নরম মাটি না হলে তো বেড়ালের বাহ্যে করে সুবিধা হয় না। জানে তোমাদের মাথার ওপর গার্জেন বলতে কেউ নেই। যিনি রুখে দাঁড়াবেন বা ব্যক্তিগত ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ব্যাপারটাকে আঁতুড় ঘরেই গলা টিপে শেষ করে দেবেন।

সিদ্ধার্থ পলকহীন চোখে শচীন ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। শচীন ডাক্তার হঠাৎ করে এই ঘটনাটির মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইছেন কেন বা তিনি ডাকামাত্রই সে-ই বা সম্মোহিতের মতো চেম্বারে ঢুকে তাঁর মুখোমুখি বসল কেন, কোনভাবেই এ দুয়ের কোনটিরই যুক্তিসম্মত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি সত্যি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে? খড়কুটো নাকি বাঁশ পাটাতন এসব গুলিয়ে ফেলে যে কোন একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরতে চাইছে? তার মাথার উপর দিদি। কিন্তু তার ওপর আর কেউ নেই। যে কোন বিপদে বা ভয়াবহতায় বয়স্ক একজন মানুষের সান্নিধ্য অনেকখানি সাহস যোগায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ডাক্তারবাবুর কথাটা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। হয়ত বাবা বেঁচে থাকলে এমন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাদের হতেই হোত না। বাবার সাহচর্যে দিদির মানসিক গঠনটাই পালটে যেত। দিদি তখন সামাজিক অন্যায় অবিচার, মানুষের ন্যায্য দাবি লড়াই, এ সবের থেকে অনেক দূরে ফ্যানটাসির জগতে অদ্ভুত অলৌকিক সব ঘটনার সম্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। অয়নদার প্রথাবিরুদ্ধ বেখাপ্পা বেমক্কা কথাবার্তায় দিদি সাময়িক প্রভাবিত হয়েছিল সত্যি, কিন্তু বাবা আরও কিছুদিন বেঁচে

থাকলে, অয়নদা সম্পর্কে দিদির মোহভঙ্গ হোত। এটা অবশ্য সিদ্ধার্থর নিজের বিশ্বাস। অয়নদার উদ্দামতা স্তিমিত হয়ে যেত। বাবার প্রবহমান অনুপম শিল্পবোধে দিদি সম্পৃক্ত হোত।

— দেখছ কী? শচীন ডাক্তার ভ্রূ নাচালেন, নাড়ি টিপে চিকিৎসা করি। সমাজের কিছু রোগব্যাধি আছে। তারও নানারকম লক্ষণ আছে। ভেবো না চেম্বারের মধ্যে বসে থাকি বলে, সেসব আমার চোখে পড়ে না। নিজের কথায় নিজেই হাসলেন খিক খিক করে। হাসি থামিয়ে বলল, নাও, চা-টা খেয়ে নাও। তারপর তোমাকে একটা উপায় বাতলাচ্ছি।

সিদ্ধার্থ হঠাৎ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল চা হাতে রোগা লম্বা চেহারার একটি লোক প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। এত লম্বা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। বেড়ালের মতো শব্দহীন পায়ে, ছোট দরজা দিয়ে মাথা হেঁট করে, লোকটি কখন ঘরে ঢুকেছে সিদ্ধার্থ টেরই পায়নি। লোকটিকে সে আগে কোথাও দেখেছে বল মনে হল না। চেহারায় লম্পট এবং দুর্বৃত্তের ছাপ। পানের লাল চোপ ধরা দাঁত মেলে লোকটি হাসল সিদ্ধার্থর পানে চেয়ে। বাতাসে নাক টেনে সিদ্ধার্থ মদের গন্ধ পেল। তার মানে এই লম্বা লোকটি, শচীন ডাক্তার যাকে নকুল বলে ডেকেছেন অল্পক্ষণ আগে, এই সাতসকালেই দু এক গ্লাস চড়িয়ে বসে আছে। এই ধরণের মাতাল সন্দেহজনক চেহারার কোন মানুষ শচীন ডাক্তারের কাছের মানুষ না হোক, পরিচিতই বা হয় কেমন করে? ডাক্তার মানে তো কেবলমাত্র রুগীর চিকিৎসক নয়। সমাজে তার একটি অন্যরকম মর্যাদা, তার সঙ্গে ভূমিকা এবং দায়িত্বও আছে। সিদ্ধার্থর মন খারাপ হয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে হাত বাড়িয়ে দিল। ঘাড় নেড়ে অনুচ্চ গলায় বলল, বিস্কুট লাগবে না।

— ঠিক আছে। শচীন ডাক্তার সিদ্ধার্থর কথা শেষ হওয়া মাত্রই হেসে ঘাড় কাত করলেন, ওর বিস্কুটদুটো আমাকে দাও।

শচীন ডাক্তার এত দ্রুত চা খেলেন যেন কোনক্রমেই চায়ের গ্লাসটা শেষ করেই তাঁকে দৌড়তে হবে জরুরী কোন কাজে। সিদ্ধার্থও যথেষ্ট গরম চা খায়। তবে তার ধারণা ছিল বয়স্ক মানুষেরা চা খান বেশ তারিয়ে তারিয়ে। বয়স বেড়ে যাওয়ার জন্য একাধিকবার চা খেতে পারেন না বলেই হয়ত, যে কবার খাওয়ার সুযোগ পান, ধীরে ধীরে শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত খান। শচীন ডাক্তারের সব কিছুই আজ সিদ্ধার্থর চোখে অন্যরকম মনে হচ্ছে।

চোখের ইশারায় শচীন ডাক্তার লম্বা লোকটিকে চেম্বারের বাইরে যেতে বললেন।

সিদ্ধার্থর দিকে চেয়ে গলাটাকে গম্ভীর করে বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, চটপট একটা ব্যবস্থা করা দরকার। পুলিশকে নিশ্চয়ই জান, হারামজাদার গাছ। আর এ গাছের শেকড় শক্ত যেমন, বাড়েও তেমনি চড়চড় করে।

চুক চুক শব্দ করে সিদ্ধার্থ চা খেতে লাগল। শচীন ডাক্তারের কথার জবাব দেবে কি! এখনও অব্দি সে তো কিছু আন্দাজই করতে পারছে না।

— আমি বলি কি! শচীন ডাক্তার চোখ বুজে নিজের কপালে আস্তো করে টোকা মারতে লাগলেন। অবিকল চিন্তাশীল মানুষের ভাবভঙ্গী, কোন রাজনীতির দাদার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। যার কাছে যাবে, তার বিপক্ষ দল ব্যাপারটা হাজারবার ঠিক মনে করলেও, স্রেফ ভোটের দিকে তাকিয়ে তোমার বিপক্ষে চলে যাবে। তারপর ধর হঠাৎ করে কোন কারণে যদি ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়, তখন এই ব্যাপারটাই ভোটের অন্যতম প্রধান একটি ইস্যু হয়ে যাবে। হাটে মাঠে ঘাটে এই ব্যাপারটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াবে। এই অব্দি বলে একটু চুপ করে গেলেন। মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে ফেলে বললেন, ডোন্ট মাইন্ড, এমনও মনে হতে পারে, তোমার দিদিকে খুনী হিসেবে তো চিহ্নিতই করবেই, উপরন্তু নীরু মা'র চরিত্রহানি করতেও এ বাস্টার্ডদের মুখে আটকাবে না।

সিদ্ধার্থ চমকে উঠল। তার শরীরের মধ্যে যেন হঠাৎ করে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। সারা শরীর কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল মাথার মধ্যে হঠাৎ করে একটা ঝাঁকুনি বোধ হল। সত্যি, এদিকটা তো সে ভেবে দেখেনি। রাজনীতির নেতাদের ভোল পাল্টাতে মুহূর্ত দেরী হয় না। আজ যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশরক্ষার শপথ করে, কাল তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধার তোড়জোড় করে। সিদ্ধার্থ মনে মনে শচীন ডাক্তারের দূরদৃষ্টির তারিফ করল এবং এই প্রথম তার মনে হল, ডাক্তারবাবুর ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে গেলে আখেরে তার ক্ষতিই হোত। যে উদ্দেশ্যে পুলিশকে লুকিয়ে তার বেড়িয়ে আসা, উদ্দেশ্যটা সফল তো হোতই না, বরং তার সুদূরপ্রসারী উল্টো প্রতিক্রিয়া হোত। মূলত দিদির সে ক্ষতিই করতে যাচ্ছিল। হয়ত অজান্তেই। আবার এমনও হতে পারে ভবিষ্যতে অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিদিও হয়ত বলত, সব জেনেবুঝেই সে এইরকম বিপজ্জনক একটি পথে এগিয়েছিল। তার ভয় উদ্বেগ আন্তরিকতা সব ধূর্তমি হিসাবে চিহ্নিত হোত সবার চোখে। এমনকি দিদিরও।

সিদ্ধার্থ ভয়ার্ত গলায় থেমে থেমে বলল, আপনি কি সাজেস্ট করেন? কার কাছে গেলে কাজ হবে? একটু চুপ করে থেকে বলল, যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়।

— ক্ষেপেছ? শচীন ডাক্তার আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন, তুমি আমাকে এতটা কাঁচাকোঁচা খোলা মানুষ বলে মনে কর? আমার কোন দায়িত্ব নেই? আর তেমন কিছু হলে তুমি আমাকে ছেড়ে কথা বলবে?

শচীন ডাক্তারের এ কথায় সিদ্ধার্থ লজ্জা পেল। সংকুচিত গলায় বলল, এসব বলে লজ্জা দেবেন না। কিন্তু! বলে একটু হাসল, রাজনীতির নেতাদের বাইরে কে এমন লোক আছে বলুন তো? পুলিশ যার কথা শুনবে? ওবে করবে?

— আছে। আছে। শচীন ডাক্তার সরু মোটা আওয়াজ মিশিয়ে অদ্ভুত সুরে হাসলেন, আগে বল, তুমি আমার কথায় ভরসা পাচ্ছ কিনা? যাঁর কাছে পাঠাব, তাঁর হৃদয়খানা বিশাল মাঠের মতো। আবার সমপরিমাণে অভিমানীও। একটু ট্যারাবাঁকা ছোট বড় আচরণ করলে, যতই লাভের গল্প, লোভের গল্প শোনাও না কেন, পিছন ফিরেও তাকাবেন না।

— না, না। সিদ্ধার্থ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আপনি যখন রেফার করছেন আর সর্বোপরি বিপদটা তো আমার দিদির, আমাদের গোটা পরিবারের। সেক্ষেত্রে ...!

— ব্যাস, ব্যাস। হাত নেড়ে শচীন ডাক্তার বিরক্তি এবং সম্মতি দুই জানালেন, নকুলকে সঙ্গে দিচ্ছি। সোজা চলে যাও। একটু চুপ করে থেকে ছোট করে হাসলেন, কাজ মিটে গেলে, যদি মনে কর, আমাকে একটা খবর দিও।

শচীন ডাক্তার, নকুল বলে লোকটিকে ডাকলেন। লোকটি অনেকখানি ঝুঁকে ডাক্তারের মুখের কাছে নিজের কানটিকে নিয়ে এল। শচীন ডাক্তার অত্যন্ত নীচু স্বরে লোকটিকে কোন নির্দেশ দিলেন। তারপর সিদ্ধার্থর দিকে ফিরে বললেন, নকুলের সঙ্গে যাও। ওকে সব বলে দিয়েছি।

সিদ্ধার্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, যা সে প্রায় করেই না, শচীন ডাক্তারকে হাত জোড় করে প্রণাম করল, আপনি অনেক উপকার করলেন।

শচীন ডাক্তার সিনেমার ভিলেনরা যেমন অকারণে গলা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, সেইরকমভাবে শব্দ করে হেসে উঠলেন, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সে আমার কাছেই ছুটে আসত। তোমাকে তো আমি নিজে থেকেই ডাকলাম।

সদর্থে শচীন ডাক্তারের একথার কোন জবাব চলে না। তবু সে ঘাড় ফিরিয়েছিল। অস্বাভাবিক ভারি গলায় নকুল বলে লোকটি তাকে ডাকল, আসুন।

প্লাই পার্টিশানের কাছে গিয়ে লোকটি নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল মেঝের দিকে। সেই অবস্থাতেই বলল, মাথাটা নাবিয়ে আসুন।

রোগাটে গড়নের শ্রীহীন চেহারার কোন মানুষের এমন জলদগম্ভীর গলার আওয়াজ, সিদ্ধার্থ আগে কোনদিন শোনেনি।

চেম্বার ছেড়ে বাইরে এসে সিদ্ধার্থর মনে হল বেলা যেন অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। সকালের নরম রোদ্দুর চড়া হয়েছে। রীতিমত গায়ে লাগছে। রাস্তায় সাইকেল রিক্সা স্কুটার স্টেশনবাস, বালি বোঝাই লরি ইত্যাদির ভিড়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অফিসযাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, বাজারের থলি হাতে সাধারণ মানুষ — সব মিলেমিশে বেশ একটা হৈ চৈ-এর ভাব। নিত্যদিনের ছবি। বোঝাই যাচ্ছে না মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই শহরেরই একটি তরতাজা ছেলে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে এবং ঘটনাটি ঘটেছে এই শহরের বুকেই। চারপাশ জুড়ে এত ব্যস্ততার মধ্যে নিষ্ঠুর ঘটনাটি বেশ তুচ্ছ গা-সওয়া হয়ে যাওয়া গোছের কিছু একটা। দুঃখ বেদনা দূরে থাক, সিদ্ধার্থ নিবিড়ভাবে কয়েকজনের চোখমুখ নিরীক্ষণ করে, সামান্য ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপও খুঁজে পেল না। তার মানে সে নিজে, তার দিদি, কয়েকজন প্রতিবেশী এবং শচীন ডাক্তার ছাড়া আর কেউ কি কিছু শোনেনি! জানে না! সিদ্ধার্থ নিজের মনেই ঘাড় দোলাল, না জানে। সকলে না হোক, অধিকাংশ লোক জানে। কারণ তাদের এই ছোট মফস্বল শহরটা কোন উপদ্রুত অঞ্চল নয়। যখন তখন বোম ছোঁড়াছুঁড়ি বা দেখ-না-দেখ মানুষ খুনের ঘটনা এখানে ঘটে না। শাসক এবং বিরোধী দু দলের রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকজন আছে। কিন্তু সজ্জন প্রতিবেশীর মতোই তারা গায়ে গা লাগিয়ে বসবাস করে। ভোটের সময় মিছিলে মিটিংয়ে শহরটা সরব হয়। ভোট মিটে গেলে প্রতি আক্রমণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া বা অপহরণের মতো গা শিউরে ওঠা কোন ঘটনা আজ অব্দি ঘটেনি। যে দলই বন্ধ ডাকুক না কেন, যে যার ইচ্ছেমত সেটা পালন করে বা করে না। এ ব্যাপারে জোর জবরদস্তির কোন গল্প নেই।

এইরকম সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অলোকেশের খুন হওয়া একটা চমকে ওঠার মতো ঘটনা। সিদ্ধার্থ আর একবার খুব ভাল করে পথচলতি মানুষজনকে দেখল। প্রত্যেকের চোখমুখ এবং চলাফেরায় নিজস্ব ব্যস্ততার ছাপ। সিদ্ধার্থর মন খারাপ হয়ে গেল। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ এমন সংকুচিত আত্মকেন্দ্রিক হলে, ছড়িয়ে দেওয়ার বা কাছে টানার আদর্শ বলতে সত্যি কি কিছু বোঝায়? নাকি সর্বহারার বিপ্লব বা বিশেষ একটি ধর্মান্ধদের বিশ্বজয়ের মতো 'বিশ্বায়ন' একটি অন্তঃসারশূন্য অলীক কল্পনা মাত্র!

নকুল নামের লোকটি যথেষ্ট লম্বা হলে কি হবে, পদক্ষেপে সংক্ষিপ্ত। গতিতেও ধীর। ফলে যানবাহন এবং মানুষজনের ভিড় কাটিয়ে নকুলকে অনুসরণ করতে সিদ্ধার্থর

কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। বরং আস্তে চলার জন্যই, সিদ্ধার্থ তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে যেসব মানুষগুলি, তাদের খুব ভালভাবে নজর করতে পারছে এবং এই ঘোরতর সঙ্কটের মধ্যেও মানুষগুলিকে বিশ্লেষণ করতে পারছে। বিশ্বায়নের মতো একটি বিতর্কিত বিষয়েও কিছু ভাবনাচিন্তা তার মাথায় আসছে।

শচীন ডাক্তার নকুলকে গোপন নির্দেশে জানিয়ে দিয়েছেন, সিদ্ধার্থকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধার্থকে এবিষয়ে ছিঁটেফোঁটাও কিছু জানাননি। তার মানে সিদ্ধার্থর কাজ নকুলকে অনুসরণ করা মাত্র। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, কার কাছে, আদৌ তিনি কোন উপকারে আসবেন কিনা, সিদ্ধার্থ কিছুই জানে না। সাহস করে নকুলকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছে না সে। পাছে লোকটি রেগে যায় বা রেগে না গেলেও ঠাণ্ডা মাথায় বিনীতভাবে বলে, 'বলতে পারব না, ডাক্তারবাবু নিষেধ করেছেন'। যা শুনে সিদ্ধার্থ আহত হতে পারে আত্মসম্মানবোধে, এইসব ভেবেই সিদ্ধার্থ নীরবে নকুলকে ফলো করে চলেছে মাত্র।

বিপদটা তার দিদির বা তাদের পরিবারের না হয়ে অন্য কারোর হলে সিদ্ধার্থ অন্তত তার গন্তব্যস্থলটুকু জানতে চাইত নকুলের কাছে।

বাসস্ট্যান্ডে কিছু মানুষের ভিড়। অধিকাংশই বাইরের মানুষ। কোর্টের কাজে বা সদর হসপিটালে চিকিৎসা করাবার জন্য প্রতিদিনই শহরের বাইরের বিশেষত লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে এবং নদীর ওপারের কাগজ আর চটকলের শ্রমিক পরিবারের মানুষগুলি এ শহরে আসে। যে কারণে বাসস্ট্যান্ডে এবং লঞ্চঘাটে সব সময়েই ভিড়। দুটি জায়গাতেই বড় ঠাকুরের মন্দিরে পুজো বাবদ ভাল পরিমাণ অর্থের আমদানি হয়। সন্ধ্যের পর মন্দিরের পিছনে গাঁজা এবং চোলাই মদের ঠেকে ভনভনে মাছির মতো ভিড় হয়। তাতে বাইরের মানুষ যারা ঘরে ফিরে যাবে, তারাও আসর মাতায়। পুলিশ স্থানীয় মস্তান এবং অবশ্যই রাজনৈতিক দাদাদের মিলিত প্রচেষ্টায় ঠেকগুলির রমরমা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সিদ্ধার্থ শুনেছে শহরের নামি দামি কিছু ব্যক্তিও এইসব ঠেকের নিয়মিত খরিদ্দার। ভেজা ছোলা, আলুকাবলি সহযোগে, মুটেমজুর রিক্সাওলাদের সঙ্গে একাসনে বসে বাবুরা মসকরা করে, সুরুৎ সুরুৎ করে গেলাসে চুমুক মারে। খিস্তি দেয়। ঝোড়ো হাওয়ার মতো গান গেয়ে ওঠে। বাওয়ালি করে। হাভাতের দল যারা কোন কোন বাবুকে এমন একাত্মে পায়, সেটা তাদের কাছে যথেষ্ট শ্লাঘার ব্যাপার। রসিয়ে রসিয়ে গল্প করার মতো বিষয়।

বাসস্ট্যান্ডে ভিড়ের মধ্যে নকুল যেন হঠাৎই হারিয়ে গেল। অমন লম্বা একজন মানুষের আচমকা উবে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। অসহায়ের মতো সিদ্ধার্থ

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। চারপাশে এত শব্দ যে 'নকুল নকুল' বলে চিৎকার করলেও কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। যেহেতু সারাটা পথ নকুলের সঙ্গে সিদ্ধার্থর একটি বাক্য উচ্চারিত হয়নি, তাই নকুলের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সিদ্ধার্থ কিছুই জানে না। যদি এমন হয় একটি বিশেষ রুটের বাসে চেপে কিছু পথ গেলেই, তবেই সেই বিশাল হৃদয়ের মানুষটির কাছে পৌঁছানো যাবে, নকুল সেই বাসটির খোঁজখবর করতেই টাইম অফিসের দিকে ঘুরে গেছে হঠাৎই! সিদ্ধার্থ খেয়াল করতে পারেনি! বা বাসের পরিবর্তে ট্রেকার বা অটোর লাইনের দিকে ছুটে গেছে বোঁ করে, বসে যাওয়ার জন্য জায়গা দখল করতে! সিদ্ধার্থর মনে হল নকুলের অন্তর্ধান রহস্যের এই দুটির যে কোন একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে অনেকগুলি লাইন বিভিন্ন বাসরুটের। অটো এবং ট্রেকার ছাড়ে বাসস্ট্যান্ডের সামান্য তফাতে পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে। সিদ্ধার্থর দৃষ্টি যতদূর পৌঁচচ্ছে, তাতে মাঝারি মাপের মানুষই তার নজরে পড়ছে। সাধারণের চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা কোন মানুষকে সে দেখতে পাচ্ছে না। নকুল নিশ্চয়ই দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে পড়েনি লাইনে, কপালে হাত দিয়ে। অনেক সময় অসুস্থ বা বয়স্ক মানুষেরা যেমন করে থাকে। তাহলে মানুষটা গেল কোথায়? বাসস্ট্যান্ডের ধার ঘেঁষে মাঝারি মাপের একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়াটি গোল করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে পুরসভা। ক্লান্ত মানুষজন বাঁধানো চত্বরে গাছের ছায়ায় শরীরের ঘাম শুকায়। ভর দুপুরে সদ্য প্রেমে পড়া কিশোর-কিশোরী এখানে গায়ে গা লাগিয়ে বসে খুব নীচু গলায় গল্প করে। পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। সন্ধ্যের পর দখলদারি চলে যায় সাট্টার বুকি আর চোলাই মদের কারবারিদের হাতে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অসামাজিক লেনদেন, কেনাবেচার কারবার দিনের পর দিন চলে কেমন করে, সিদ্ধার্থ ভেবে পায় না। প্রশাসনের কর্তাদের সহায়তা ছাড়া যে এটা কখনই সম্ভব নয় এ ব্যাপারে সিদ্ধার্থ একশভাগ নিশ্চিত। অথচ মজার ব্যাপার বাঁধানো চত্বরটি জুড়ে, এমনকি অশ্বত্থ গাছটির গা ভর্তি করে, ঘাড় উঁচু করে যতদূর পড়া যায়, শাসক বিরোধী ডান বাম অতিবাম সব ধরণের রাজনৈতিক দলের অসংখ্য পোস্টার সাঁটা। কোনটিতে বেআইনি কারবারিদের প্রতি হুঁশিয়ারি। কোনটিতে কাদের মদতে এইসব অসামাজিক কাজকারবার চলছে তা জানতে চাওয়া। নিরামিষ আবেদনও আছে কোন কোন পোস্টারে — বর্জন করুন, এড়িয়ে চলুন। সর্বনাসা, কর্মনাসা, উদ্দেশ্যেপ্রনদিত — ভুল বানানে এমন লেখাও আছে। লাল সবুজ সোনালী কালিতে।

অনন্যোপায় সিদ্ধার্থ নকুলকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় শেষমেশ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বাঁধানো চত্বরের ওপরে উঠে গলাটাকে যতদূর সম্ভব লম্বা করে চারপাশে

তাকাতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পাবলিক ইউরিন্যালের ভাঙ্গা পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে নকুল সামনের দিকে ঝুঁকে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে হাত পা নেড়ে কীসব বোঝাচ্ছে। নিরুপায় সিদ্ধার্থ বেশ জোরে 'নকুল' বলে ডাক দিল। চকিতে নকুল ঘাড় ফিরিয়ে সিদ্ধার্থকে দেখল এবং যেন সিদ্ধার্থ তার মনিব বা ওপরওলা, ডাক শোনা মাত্রই যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, এক ছুটে আসতে হবে, এমনি ব্যস্ততায় তার সামনে দাঁড়িয়ে মহিলাটির একটি হাত খপ করে খামচে ধরে, একরকম জোরজবরদস্তি করে তাকে সিদ্ধার্থের দিকে টেনে আনতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন ছেলে হেসে উঠল হো-হো করে। 'কী হচ্ছে বে' বলে ধমকের সুরে একজন গর্জে উঠল। নকুল যেন আশপাশে কে দেখছে, কে কী বলছে এসব বিস্মৃত হয়ে বা কারোর আদেশ কিম্বা ধমককে আদৌ কোনরকম পাত্তা না দিয়ে, মহিলাটিকে সিদ্ধার্থর দিকে টেনে আনতে লাগল।

পাছে আবার নকুল দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, এই আশঙ্কায় বাঁধানো চত্বরের ওপরই দাঁড়িয়ে রইল সিদ্ধার্থ। অনেকেই নকুল এবং তার হাতে বন্দী মহিলাকে দেখছে। মহিলাটির অনিচ্ছা তেমন প্রকট নয় বলেই নকুল তাকে টেনে আনতে পারছে। চারপাশের লোকজন তাকে দেখছে বলে হয়ত মহিলাটি সামান্য লজ্জা পেয়েছে। আর সেজন্যই নকুলকে অনুরোধ করছে তার হাতটি ছাড়তে। সিদ্ধার্থর কাছাকাছি এসে নকুল বেশ গলা উঁচু করেই বলল, ভাগ্যিস এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নকুলের গলার স্বরে আত্মতৃপ্তি, তার সঙ্গে উদ্দেশ্য পূরণের চাপা আনন্দ।

কাছাকাছি আসতে সিদ্ধার্থ মহিলাটিকে চিনতে পারল। মাঝারি বয়স। চোখটাটানো চেহারা। চোখেব দৃষ্টিতে যেন শান দেওয়া। বুকের কাপড় সামান্য এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় জ্যালজেলে ব্লাউজ ফুড়ে তীব্র দুটি স্তন দেখা যাচ্ছে। তাতে মহিলাটির চোহারায় দুর্দান্ত বন্যতা ফুটে উঠেছে। যা থেকে কোনমতেই চোখ ফেরানো যায় না।

মহিলাটিকে সিদ্ধার্থ চেনে। এ শহরের সকলেই চেনে। কিন্তু অনেকবার ভেবেও সিদ্ধার্থ মহিলাটির নাম মনে করতে পারল না কিছুতেই।

নকুল এবং মহিলাটি আগে আগে চলেছে। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে সিদ্ধার্থ দুজনকে অনুসরণ করছে। মহিলাটি মোটেই কিশোরী এমনকি যুবতীও নয়। কিন্তু তার চলনে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা। যার সঙ্গে কমবয়সী মেয়েদের চপলতার তুলনা করা চলে। অন্যথায় মহিলা বয়সের হিসাবে যৌবনের মধ্যপথ পার করেছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একটু স্থির ভাবে দেখলেই নজরে পড়ে, চোখমুখের চেহারায় বয়সের আস্তো প্রলেপ, ছুঁয়ে যাওয়া ক্লান্তি।

পিছন থেকে দেখলে বা হঠাৎ করে দেখলে যে কেউ তাকে কমবয়সী বাঁধাবাঁধনহারা, কিছুটা অবাধ্য এবং তার সঙ্গে বেপরোয়া, এমন একটি মেয়ে বলে ভাবতেই পারে।

সিদ্ধার্থর বয়স এমন কিছু বেশী নয়। এই মহিলাটির চেয়ে সে কোনভাবেই বয়সে বড় নয়। বরং কয়েক বছরের ছোটই হবে। এ কথাটি স্মরণে থাকা সত্ত্বেও সে বেশ কয়েকবারই মহিলাটির অনুসরণকারী এটা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। এমনকি একবার প্রায় তার গায়ে গা লাগিয়ে চলা মাঝবয়সী একটি লোককে যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে মনেও তার হল। লোকটি তার সঙ্গে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমেছে মহিলাটিকে নাগালের মধ্যে পাবে বলে এবং তার গায়ে গা লাগিয়ে নিরুচ্চার হেঁটে চলেছে। নকুল লোকিট আচ্ছা আহাম্মক তো! সিদ্ধার্থর মনে হল একবার। আসলে সে যে নকুলের মেহমান, বেমালুম এটা ভুলে নকুল মহিলাটিকে নিয়ে এমন মত্ত হয়ে পড়েছে যে, এখন যদি সিদ্ধার্থ চুপিসারে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় বা নকুলদের ওপর থেকে সামান্যক্ষণের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়ে অসংখ্য মানুষের দলে মিশে যায়, নকুল ভুলক্রমেও জানতে পারবে না। তখন হয়ত ফিরে গিয়ে শচীন ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করবে যে সিদ্ধার্থ জনঅরণ্যে হারিয়ে গেছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে অপদস্থ করবে বলে টুক করে পাশে সরে গিয়ে, হনহন করে পা চালিয়ে উল্টোমুখো হাঁটতে শুরু করেছে।

আলাপ কিম্বা বন্ধুত্ব কিছুই নেই এমন একটি পুরুষ এবং একটি মহিলাকে অন্ধের মতোই অনুসরণ করছে সিদ্ধার্থ। এটি তার জীবনে একটি নতুন অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। সিদ্ধার্থ এই নতুন ধরণের কাজটিতে কিছুটা মজাও পাচ্ছিল। এর মধ্যে রহস্য আছে। ভিন্ন অভিজ্ঞতার রসাস্বাদনের একটা ব্যাপার আছে। সর্বোপরি সব কিছু হিসেবমত ঠিকঠিক মতো হলে একটি ভয়ঙ্কর বিপদ উতরে যাবার সম্ভাবনা আছে। এই ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে একটি অপরিচিত মহিলার প্রতি দুর্বলতা বোধ করার কারণে নিজেকে স্বার্থপর, ছোট এইরকম ভেবে সিদ্ধার্থর নিজের ওপর বেশ রাগ হল। অধঃপতনের শব্দও যেন শুনতে পেল সে। মুহূর্তে সাবধান হয়ে গেল। নিজেকেই নিজে শাসন করল। এ ধরণের কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্বলতা তাকে মানায় না। এ সময়ে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা শয়তানের নিষিদ্ধ ফলভক্ষণের মতো একটি বিপজ্জনক পরীক্ষা।

বাসস্ট্যান্ডের সীমানা ছাড়িয়ে সিদ্ধার্থরা একটি সরু গলির মধ্যে ঢুকেছে। গলিটির দু পাশে সটান দেওয়ালের উঁচু বাড়ি। রোদ এবং হাওয়া এখানে দুই-ই কম। ফলে ইঁটপাতা রাস্তাটি সামান্য স্যাঁতসেঁতে। যদিও আকাশে জলভরা মেঘ নেই। তাই ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও নেই। রোদ ঝলমল সকালেও গলিটা আবছা অন্ধকারাচ্ছন্ন। সিদ্ধার্থর যেন মনে হল তার

সামনে নকুল এবং মহিলাটি পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পরস্পর দিক বদল করল। সে সময়ে দুজনেই একে অপরের দেহটি ছুঁল আস্তো করে। নকুলের হাত মহিলাটির কোমরের কাছাকাছি এবং মহিলাটি কাঁচের চুড়িভর্তি তার লম্বা হাতটি দিয়ে নকুলের গলাটি আড়াআড়িভাবে জড়িয়ে ধরল। মহিলাটির মৃদু হাসির আওয়াজও শুনতে পেল সিদ্ধার্থ। এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং গাঢ় দৃশ্য আজকাল পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে পথ প্রদর্শকের এ হেন আচরণে সিদ্ধার্থের রেগে যাওয়া বা চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন কারণই নেই। কিন্তু যেহেতু সে মাত্র কিছুক্ষণ আগে নিজেকে ধমকেছে এবং সময় যত গড়াচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার নিজের বিপদের ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা বেশী করে মনের মধ্যে চেপে বসছে, এ এক ধরণের আক্রোশ যার মূলে রয়েছে সম্বলহীনতা, 'নকুল একটু জোরে। পা চালিয়ে' — এইরকম হুঁশিয়ারিতে যার বহিঃপ্রকাশ।

নকুল তার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি, সিদ্ধার্থর এমন হঠাৎ কারণহীন কর্কশ ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকাল। সিদ্ধার্থ বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল। নকুলের চেহারাটাই বড়সড়। মূলত লোকটি ভিতু। তা নাহলে সিদ্ধার্থর মতো একটি অল্পবয়সী ছেলের ডাকে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি তো আপনার নজরের মধ্যেই আছি বাবু।

— তা নয়। সিদ্ধার্থ অপ্রস্তুত বোধ করল, আসলে আমি তো ঠিক জানি না, কোথায় যেতে হবে।

— কেন? নকুলের পাশে দাঁড়িয়ে মহিলাটি দু চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি তো আমার কোঠিতে যাবেন। এ আদমি — বলে নকুলের গায়ে আস্তো করে টোকা মেরে বলল, আপনাকে কুছু বলেনি?

— ঠিক আছে। সিদ্ধার্থ ব্যাপারটা সহজ করবার জন্য আবার একবার বলল, ঠিক আছে। চল।

সিদ্ধার্থর অনুমান মিলতে শুরু করেছে। মহিলার সাজপোশাকে রঙ্গিলা নারীর ছাপ আছে। এটা সে প্রথমেই লক্ষ্য করেছিল। বা যেভাবে নকুল তাকে বাসস্ট্যান্ডের দঙ্গল লোকের মধ্যে টেনে আনছিল, তাতে সিদ্ধার্থর প্রথমেই মনে হয়েছিল ভদ্র গৃহবধূ বলতে যা বোঝায়, এ মহিলাটি সেই গোত্রীয় নয়। চোখের চাউনির মধ্যেও হাতছানির ইঙ্গিত। অনেক পুরুষ যে নারীকে ঘিরে থাকে, তাদের দেখলেই চেনা যায়। ভিড়ের মধ্যেও একটু আলাদারকম দেখতে লাগে। প্রত্যেক শহরেই আছে। সংখ্যায় কম বেশী। লোকের

মুখে মুখে এদের গল্প ফেরে। প্রথম দর্শনেই সিদ্ধার্থর মনে হয়েছিল, এই মহিলাটিকে সে চেনে। নামটা স্মরণ করতে পারছিল না।

তারপরেও তার মনে 'কিন্তু' ছিল। সিদ্ধার্থর মনে হয়েছিল এই নষ্ট মেয়েমানুষটিকে ঘিরে পুরুষের যে দলটি ভনভনে মাছির মতো চারপাশে পাক খায়, নকুল হয়ত সেই দলের সবচেয়ে কমজোরী পুরুষটি, অন্যসময়ে যে কাছে ঘেঁসতে পায় না, আজ ভাগ্যগুণে একা পেয়ে সুদে আসলে মনোবাসনা পূর্ণ করবে বলে, হাত ধরবার বা সঙ্গে সঙ্গে যাবার লোভটুকু সম্বরণ করতে না পারার জন্যই, খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করছে। কিন্তু এইমাত্র মহিলাটি যা বলল তা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ তার বাড়িতেই নকুলের সঙ্গে সঙ্গে সেও চলেছে, তাহলে তো 'অ' থেকে 'ঔ' অব্দি কোন হিসেবই মিলছে না। এই নোংরা মেয়েমানুষটা তার কোন উপকারে আসবে? শচীন ডাক্তার কি সত্যি তাদের বিপদমুক্ত করার মতো কোন উপকার করতে চান? নাকি হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙাচিও যেমন লাথি মারার দুঃসাহস দেখায়, শচীন ডাক্তারও তেমনই তার দিদিকে আরও ঘনঘোর বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্যই, নিজে থেকেই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, আদ্যন্ত মিথ্যের জাল বুনে তাকে, তার দিদিকে, তাদের সমগ্র পরিবারকে পিষে ফেলার জন্য দুর্দান্ত ছক কষে, নিখুঁত ঘুঁটি সাজিয়ে মাঠে নেমে পড়ছেন!

শচীন ডাক্তারের সঙ্গে যেমন সিদ্ধার্থ বা তার দিদির কোন হৃদ্যতা নেই, আবার শত্রুতাও তো নেই। শচীন ডাক্তারের যে মেয়ে দিদির ক্লাসমেট ছিল, তার তো কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। এমন নয় যে পড়াশুনা, চাকরি পাওয়ার প্রতিযোগিতা বা প্রেমের অঙ্গনে শচীন ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে দিদির কোনরকম প্রতিযোগিতা ছিল। তাহলে?

সিদ্ধার্থ, নকুল এবং মেয়েমানুষটির দিকে না তাকিয়েও ছোট ছোট পা ফেলে দুজনের পিছু পিছু বেশ হাঁটছিল, চুপচাপ। হঠাৎই তার চোয়াল এবং হাত পায়ের শিরা শক্ত হয়ে উঠল। আপন মনেই দাঁতে দাঁত ঘষল। গম্ভীর গলায় ডাকল, নকুল?

— জী বাবু? নকুল ঘাড় ফেরাল।

— সত্যি করে বল তো কার কাছে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

— বাবু ...!

— এর ঘরে? বলে সিদ্ধার্থ চোখের ইশারায় মহিলাটিকে দেখাল, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কেন? কে আছে সেখানে?

— আই বাপ! হুবহু বাজারী মেয়েমানুষের মতো ভ্রূ নাচিয়ে গালে হাত দিয়ে সত্যি সত্যি যেন চমকে উঠল নকুলের পার্শ্ববর্তিনী, ডাগদারবাবু কি ঝুটমুট আদমি যে আপনাকে

কোন বেকুফের কাছে ভেজবে? একটু থেমে বলল, ডাগদারবাবু যেমন ইমানদার পওয়রফুল আদমি, ও ভী! নিজের কপালে হাত ছোঁয়াল মহিলা, হামার কোঠিতে যে আছে, ডাগদারবাবু মাফিক পওয়ারফুল রিস্তেদার আদমি আছে।

সিদ্ধার্থ জবাব দেবে কি, অবাক বিস্ময় মহিলাটিকে দেখছে। সিদ্ধার্থর মনের কথা এ মহিলা টের পেল কেমন করে! আর যদি পেলই, এমন নাটকীয় ব্যঞ্জনায় তা প্রকাশ করার কলাকৌশল ওকে শেখাল কে! চোখমুখ পোশাকআশাক আচারআচরণে বাজারী হাতফেরতা মেয়েমানুষের ছাপ যার মধ্যে প্রকট, মধ্যবয়সী এমন একজন, নিছক সাদামাটা শব্দের ব্যবহারে এমন ক্লাইম্যাক্স তৈরী করতে পারে! চোখ ফেরানো যায় না এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, যে কোন বয়সী পুরুষের চোখে!

সিদ্ধার্থ, মহিলাটির সঙ্গে যার বিস্তর বয়সের ফারাক, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে, তাকিয়েই আছে দেখে, একসময়ে মহিলাটি অপ্রস্তুত বোধ করল। লাজুক হেসে বলল, চলুন বাবু। ডর করবেন না।

— হ্যাঁ। নকুল তার স্বাভাবিক ভারি গলায় সাড়া দিল, চলুন বাবু। মহিলাটির গায়ে আস্তো ঠেলা দিল, তুমি আগে আগে চল সুরিয়া।

সিদ্ধার্থ যেন তাঁর কত পরিচিত এমনি ভঙ্গীতে দু হাত বাড়িয়ে ডাকলেন, এসো সিদ্ধার্থ। দোড়গোড়ায় কেন? ঘরের ভেতরে এসো।

সিদ্ধার্থ ইতস্তত করছিল। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছিল, অন্য কোন লোক তাকে দেখছে কিনা। সিদ্ধার্থ রাজনীতি করে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় তার কোন জড়তা নেই। কিন্তু শচীন ডাক্তারের নির্দেশমত নকুলের সঙ্গী হয়ে সে যেখানে এসে থেমেছে, এখানে তাকে দেখলে যে কেউ তার সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা করবেই। সেই ধারণাটা কোনভাবেই কোন অবস্থাতেই তার ফেভারে যাবে না, যেতে পারে না। এ শহরের সকলেই জানে সুস্থ স্বাভাবিক কোন ভদ্রলোক এখানে আসে না। লম্পট মাতাল চোর গুণ্ডা সাট্টার বুকি, এই শ্রেণীর মানুষের মহামিলন কেন্দ্র বাজারের মোড়ে সুরিয়ার চোলাই মদের আড়ত এই গুমটি ঘরটি। এই ঘরটি এবং তার মালকিনের দৌলতে চোলাই মদের মৌতাতে রাতের বেলায় ঘরটির চারপাশ জুড়ে অনেকখানি এলাকা নরকের রূপ ধরে। দিনের বেলায় আপাত শান্ত। চলে কি চলে না এমনি শ্রীহীন চেহারার একটি পান বিড়ির দোকান এবং বিক্ষিপ্তভাবে অল্প কয়েকজন মানুষের আনাগোনা। কিন্তু সিদ্ধার্থ জানে দিনের আলোতেও জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বরং এক অর্থে রাতের

চেয়েও বিপজ্জনক। পানীয়ের কেনাবেচা নেই। কিন্তু একজন আছে। যার আকর্ষণ পানীয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পথচলতি কোন মানুষ সিদ্ধার্থকে এখানে দেখে যদি ধারণা করে বসে, মধুর লোভে নয়, মক্ষিরানীর টানে সিদ্ধার্থ ভয় লজ্জাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সাত সকালে ছুটে এসেছে, সে বড় কষ্টের ব্যাপার হবে। ব্যাখ্যা করে বোঝালেই যে সবাই বুঝবে বা বিশ্বাস করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু এত ভাবনাচিন্তার পরেও সিদ্ধার্থ বেশ বুঝতে পারছে ঘরের ভেতরে না ঢুকে মুখ ঘুরিয়ে উল্টোমুখে হাঁটতে শুরু করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। ঘরের মধ্যে থেকে যে মানুষটি তাকে ডাকছেন তিনি যেন শক্তিশালী একটি চুম্বক। হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই সিদ্ধার্থর নিয়তি সেই টানের অনুকূলে এগিয়ে যাওয়া।

ঘরটি আয়তনে ছোট। আসবাব বলতে প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছোট একটি চৌকির ওপরে হাঁটু মুড়ে যে মানুষটি তাকে ডাকছেন, চেহারার জৌলুসে এবং সুচারু বাচনভঙ্গির দৌলতে এ ঘরটির সমস্ত কালো ছোপগুলিকে তিনি যেন আড়াল করে দিয়েছেন। পার্থিব 'নেই'গুলি চোখে পড়ছে, এই অব্দি। কিন্তু তার জন্য মনের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হচ্ছে না। দামী কোন রত্ন যত নোংরা আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকুক না কেন, সেটির নাগাল পাবার জন্য পাঁক বিষ্ঠা মাড়িয়ে যেতেও মানুষ কোন দ্বিধা করে না। সিদ্ধার্থর অবস্থাও অনেকটা সেইরকমই। লোকলজ্জা দ্বিধা এমনকি গা ঘিনঘিনে ভাব পর্যন্ত সব যেন কেমন সরে যাচ্ছে। তুচ্ছ অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। বিচার বিশ্লেষণ, ভবিষ্যতের হিসেব নিকেশ, সব গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল, ডাক্তারবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।

— জানি, জানি। ভদ্রলোক হেসে ঘাড় দোলালেন, একবার বুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছ, চিন্তার আর কোন কারণ নেই।

গুটিগুটি পায়ে সিদ্ধার্থ চৌকাঠ ছেড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ভদ্রলোক সামান্য সরে গিয়ে চৌকির ফাঁকা অংশটুকু দেখিয়ে বললেন, এখানে বসো। সিদ্ধার্থ জড়োসড়ো হয়ে চৌকির ওপরে নির্দেশমত জায়গাটিতে বসল। মাটিতে পা দুটি রেখে। ভদ্রলোক সিদ্ধার্থর কাঁধে হাত রেখে আস্তো করে হাসলেন, কেন এমন হয় বল তো? যেখানেই যাই না কেন, কোন না কোন সমস্যা জ্যৈষ্ঠের ঝোড়ো বাতাসে শুকনো পাতার মতো উড়তে উড়তে এসে, ঠিক আমার সামনেটিতে টুপ করে পড়ে। একটু থেমে বললেন, তা বলে ভেবো না, তাতে আমি বিচলিত হই বা বিব্রত বোধ করি। যে কোন সমস্যার জট ছাড়াতে

আমার ভালই লাগে। এই অব্দি বলে ভদ্রলোকে হঠাৎই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসির ধরণ অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো। সিদ্ধার্থ সামান্য চমকে উঠল। যদিও সে তার চোখমুখের চেহারা স্বাভাবিক রাখার জন্য নিজেও সামান্য হাসল। কোনরকম শব্দ না করে।

— তা যা বলছিলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন মাথা নেড়ে, এমন একটা ঘটনার সঙ্গে তোমার দিদি জড়িয়ে গেছে, যার সুনাম কিম্বা দুর্নাম বড় সুদূরপ্রসারী। দীর্ঘ আয়ুষ্কাল। রেডিও অ্যাকটিভ এলিমেন্টের মতো।

— আমরা কি মনে হয় জানেন? সিদ্ধার্থ উদ্বেগভরা গলায় বলল, দিদিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা ষড়যন্ত্র।

— হতে পারে। ভদ্রলোক আস্তো করে হাসলেন, আবার নাও হতে পারে। একটু থেমে বললেন, সত্যের আঁট বড় মোক্ষম। পৃথিবী অন্যপাশে চলে গেলেও সত্যবাদী কখনও নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবেন না। তোমার দিদি কি মনের দিক থেকে খুব ভেঙ্গে পড়েছে?

এ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' কী বলা উচিত, সিদ্ধার্থ জানে না। দিদি বিচলিত হয়ে পড়েছে, ঘাবড়েও গেছে খানিকটা, এটা সিদ্ধার্থর নজর এড়ায়নি। কিন্তু তা থেকে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, দিদির মনের মধ্যেটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। অস্বাভাবিক কোন ঘটনার আকস্মিকতায় অতি বড় সাহসী মানুষও ঘাবড়ে যেতে পারে। ভয় পেতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। বরং সে যদি এর বিপরীত আচরণ করে, তাতে অন্যরকম ধারণা, এমনকি সন্দেহও দানা বাঁধতে পারে মানুষের মনে। চমকে ওঠা, ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া, নার্ভাস হয়ে পড়া বা কেঁদে ফেলা, এগুলি তো অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। আকস্মিক কোন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে স্বাভাবিক মানুষের আচরণ এমনতরই হয়।

— ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সিদ্ধার্থ থেমে থেমে বলল, এমনিতে দিদি খুব স্টেডি। কিন্তু ব্যাপারটা কত দূর গড়াতে পারে ...! মানে কোনদিকে মোড় নিতে পারে ...! পুলিশ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ...!

— তুমি না ...! সিদ্ধার্থকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক চোখমুখে বিরক্তিভাব ফুটিয়ে বললেন, তোমার দিদির চেয়েও বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছ। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যে কোন ঘটনাই নদীর স্রোতের মতো উৎসমুখ থেকে একবার বেরিয়ে পড়লে, কোন খাতে বইবে, কোথায় জনপদ গড়বে, ভাঙ্গবে কোথায়, কেউ বলতে পারে না। তবে কিনা সতর্কতার প্রয়োজন হয়। যেমন প্রয়োজনে মানুষ নদীতে বাঁধ দেয়।

শেষের দিকের কথাগুলি ভদ্রলোক এমন সুর করে বললেন, সিদ্ধার্থ রীতিমত মুগ্ধ বোধ করল। সে তার ভালোলাগাটুকু চাপতে না পেরে উচ্ছসিত গলায় বলে উঠল, বিশ্বাস করুন আমার আর একটুও ভয় করছে না।

— সত্যি? ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন, যাচাই করে দেখলে না তো বাঁধটা! বলে নিজের বুকে আস্তো আঙ্গুল ঠেকালেন, শক্তপোক্ত পাথরের, না ঝুরঝুরে বালির? শোন বাপু — ভদ্রলোক ভারিক্কি চালে মাথা নাড়লেন, বিশ্বাস ভালো। তবে তার আগে যাচাই করে নেওয়া আরও ভাল। গিল্টি সোনাও আসলের মতোই দেখতে লাগে।

সিদ্ধার্থ হেসে ফেলল, আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে পাকা ক্রেতাও ধন্দে পড়ে যাবে। তবে কিনা বিক্রেতাই বা তার গুড উইলের বিষয়টা ভাববে না কেন?

ভদ্রলোক যেন সিদ্ধার্থর কথায় চমকে উঠলেন, বেড়ে বলেছ হে! তুমি নির্বোধ বলিয়া আমি সুবোধ হইব না কেন? ভদ্রলোক চোখ বুজে মাথা ঝাঁকালেন কয়েকবার। সিদ্ধার্থর জবাবে যে তিনি খুশি হয়েছেন, তৃপ্ত বোধ করছেন, এটা বুঝতে পেরে সিদ্ধার্থর নিজেকে অনেকটা বিপদমুক্ত বলে মনে হল। অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যতায় সে ভদ্রলোককে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করে ফেলল, কিছুটা শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেই।

— আপনার আসল পরিচয়টা জানতে পারি কি?

— পুলিশের ওপর মহলে আপনার অবাধ যাতায়াত আছে নিশ্চয়ই?

এবং

— আমাদের শহরে আপনি নতুন এসেছেন, তাই না?

একদমে তিনটি প্রশ্ন করে সিদ্ধার্থ জবাবের আশায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইল এবং মুহূর্তে তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটি ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। ভদ্রলোক ড্যাবডেবে দু চোখে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় বা ভালোলাগার কোন ছোঁয়া নেই। পরিবর্তে রাগ ঠিকরে বেরোচ্ছে। বুকের অনেক ভেতর থেকে শ্বাস টানছেন বলে নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চাপার জন্য চোয়ালের হাড় দুটি শক্ত দেখতে লাগছে। সিদ্ধার্থ রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। ভয় পাওয়ার জন্য কথা জড়িয়ে গেল তার, কিছু মনে করবেন না। প্রশ্নগুলো একটু বেশিরকম ব্যক্তিগত হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক সিদ্ধার্থর কথার কোন জবাব দিলেন না। বিছানা থেকে নেমে নীচু হয়ে চৌকির তলা থেকে পা ঢাকা সোয়েটের এক জোড়া জুতো টেনে আনলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। ঘরের মধ্যে তাঁকে বাদ দিলে দুজন মানুষ। সিদ্ধার্থ এবং

সুরিয়া। সুরিয়ার মতো বাচাল ডাকসাইটে মেয়েমানুষও থম মেরে গেছে। সাবধানে চোখ ঘুরিয়ে একবার সিদ্ধার্থ এবং পরমুহূর্তেই ভদ্রলোকের মুখের পানে তাকাচ্ছে। যেন সে নিজেই কোন গর্হিত কাজ করে ফেলেছে এমনি অপরাধীর মতো মুখ করে প্রথমে ভদ্রলোকের চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসার চেষ্টা করল এবং তারপরে সিদ্ধার্থকে ইশারায় যা দেখাল এবং বোঝাল তার মর্মার্থ এই যে, হাতে পায়ে ধরে বা কান্নাকাটি করে সিদ্ধার্থ যেন ভদ্রলোকের বিগড়ে যাওয়া মেজাজটাকে ঠিকমত ভালমত জায়গায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। এমনিতে সিদ্ধার্থ একগুঁয়ে। কিছুটা জেদীও। কোন কাজ করার পর যদি তার একবারও মনে হয় সে ভুল করেছে, তার জন্য বিবেকের যন্ত্রণা বোধ করে। কিন্তু ভুল স্বীকার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করার কথা সে ভাবতেও পারে না। অন্তর্দহনই মানুষকে শুধরে দেয়, অপরাধ লাঘব করে, সিদ্ধার্থ এই থিওরিতে বিশ্বাসী। কিন্তু আজ তার কী যে হয়েছে, ভদ্রলোকের অমন হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে কেমন ভয় করতে লাগল। যদিও একবারের জন্য হলেও তার মনে হল, অবচেতনে অসহায়তা খেলে বেড়াচ্ছে মনের ভিতরে যা কিনা তাকে দুর্বল ভীতু করে দিচ্ছে। কিন্তু কোনভাবেই সিদ্ধার্থ একলা চলা, একা রুখে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারছে না। আবার সুরিয়ার সাংকেতিক নির্দেশমত ভদ্রলোকের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কান্নাকাটি করে ক্ষমাপ্রার্থনা করার মতো স্বভাববিরুদ্ধ একটি পদ্ধতিতে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার কথাও মানতে পারছে না। সিদ্ধার্থ স্থির পলকহীন চাউনিতে ভদ্রলোকের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখছে। তার প্রশ্নগুলির ডেলিভারিতে কিছু অসংগতি থাকতে পারে, আচমকা শুনলে মনে হতেই পারে শালীনতার ঘাটতি আছে ভাষার ব্যবহারে বা ভদ্রলোকের সঙ্গে তার যেভাবে এবং যতক্ষণের আলাপ সেই নিরিখে বিচার করলে প্রশ্নগুলি বড় বেশী ব্যক্তিগত হয়ে গেছে, তারপরেও একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। তা হল তার প্রশ্নগুলি কি সত্যি এতটাই অবাস্তব অযৌক্তিক, যে কারণে হাসিখুশি ভদ্রলোকের চোখমুখের চেহারা, শরতের নীল আকাশ থেকে এক লহমায় কালো মেঘে ছাওয়া বর্ষার আকাশের মতো হয়ে যেতে পারে? ভদ্রলোক যদি একান্তই মনে করে থাকেন, সিদ্ধার্থ অকারণে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, সীমারেখা বিস্মৃত হয়েছে, পথে আসতে আসতে সুরিয়া যেভাবে বোঝাল ভদ্রলোকের দিল বড়, রিস্তেদার আদমি, তাতে সিদ্ধার্থর মতো একটা অল্পবয়সী ছেলের অভব্য আচরণে তিনি যে ব্যথিত বা রুষ্ট হয়েছেন, এটা বোঝানোর জন্য হাজারো রাস্তা আছে। তাৎক্ষণিক রাগ অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেলেন যিনি, কোনমতেই তাঁকে বিবেচক, বুদ্ধিমান বলে ভাবা যায় না। উদারচেতা তো নয়ই।

সিদ্ধার্থ একটি মানসিক দোটানায় রয়েছে। ঠিক না বেঠিক, উচিত না অনুচিত, এইসব ভাবছে। সময় কিন্তু দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে এবং ভদ্রলোক এমন ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজগুলি করছেন যেমন জামাজুতো পরা, রুমাল এবং ছোট চিরুনি পাঞ্জাবীর ডান এবং বাঁ পকেটে ভরে নেওয়া, দেওয়ালে ঝোলানো ভাঙ্গা একটা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো, মানি ব্যাগটি খুলে তার ভিতরের অবস্থাটা দেখে নেওয়া ইত্যাদি, ঠিক মনে হচ্ছে কোন দূর ভ্রমণে বেরোচ্ছেন এবং তার জন্য যতদূর সম্ভব আবশ্যিক জিনিসগুলি মিলিয়ে নিচ্ছেন।

— এই যে ? সিদ্ধার্থ কিছু বলার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে এমন বিস্মিত চোখে সিদ্ধার্থর মুখের পানে তাকালেন যেন সিদ্ধার্থকে তিনি এইমাত্র এবং এই প্রথম দেখছেন।

— আমি বলছিলাম কি ...! এবারেও সিদ্ধার্থকে কথা শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক, তুমি আবার কী বলবে ? চল। ভদ্রলোক সিদ্ধার্থর হাত ধরে অল্প টান দিলেন, দেরী হয়ে যাচ্ছে তো। যদি আমরা পৌঁছানোর আগেই পুলিশ তোমার দিদিকে ধরে নিয়ে যায়! একটু থেমে বললেন, তাতে আবার ডবল হয়রানি হবে। একবার তোমাদের বাড়ি। সেখান থেকে থানা। আর সত্যি কথা বলতে কি জানো, দিনের আলোয় যখন সবাই জেগে আছে, তখন থানা উকিলবাড়ি বা কোন রাজনীতির দাদার আখড়ায় যাওয়ার ব্যাপারে আমার অ্যালার্জি আছে।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক সিদ্ধার্থকে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এসেছেন। ঘাড় উঁচু করে দ্রুত এপাশ ওপাশ চেয়ে মুখ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করে বললেন, কাছে পিঠে কোথাও রিক্সা নেই। নকুলের দিকে চেয়ে হাসলেন, একটু এগিয়ে দেখ না, কোন রিক্সা পাওয়া যায় কিনা। ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করবে না। তাতে দেরী হবে।

নকুলকে এই প্রথম সিদ্ধার্থ দেখল, চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে। নকুলের হাঁটা চলার মধ্যে খুশি উপচে পড়ছে। ভদ্রলোক নকুলকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তা সে যেমন কাজই হোক না কেন, তাতেই যেন নকুল ধন্য হয়ে গেছে। যেখান থেকে যেমন করে হোক, একটা রিক্সা তাকে ডেকে আনতেই হবে, প্রয়োজনে অনিচ্ছুক রিক্সাওলার ঘাড় ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনতে হবে এমনি ব্যস্ততা তার হাঁটায়। চাপা আনন্দ এবং কী হয় কী হয় উত্তেজনায় নকুলের মুখচোখের চেহারাই পাল্টে গেছে। একজন ইমানদার খিদমদগারের জেদ এবং

আনুগত্যের ছায়া নকুলের সারা মুখ জুড়ে।

কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোক হঠাৎ করে রেগে গিয়েছিলেন। এখন সেই রাগের ছিটেফোঁটা অধঃক্ষেপও নেই তাঁর কথাবার্তায়, আচার আচরণে।

সিদ্ধার্থর হাতটি আস্তো করে ধরে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন রিক্সার অপেক্ষায়। দিনের আলোতেও এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে সিদ্ধার্থর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তার মনের কথাটি আঁচ করতে পেরেই যেন ভদ্রলোক হঠাৎ করে বললেন, তোমার ভেতরে এখনও অনেক সংস্কার আছে।

সিদ্ধার্থ চমকে উঠে বলল, কী বিষয়ে?

— এই যেমন স্থান ব্যক্তি। বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই জানতে না, ডাক্তারবাবু তোমায় এইখানে, আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

— না, মানে! সিদ্ধার্থ নিজের অজান্তেই বার দুই ঢোঁক গিলল, আমায় তো ভেঙ্গে কিছুই বলেননি।

— বললে আসতে না, তাই তো? ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন, কিন্তু যখন একবার এসে পড়েছ, তখন তো পিছু হাঁটা দেবার আর কোন প্রশ্ন নেই, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

ভদ্রলোকের কথা বলার মধ্যে এমন একটা জোর এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ যেন তিনি যা বলছেন, হাজারো যুক্তিতেও তা খণ্ডন করা যাবে না। আর সিদ্ধার্থ তো নিজেই বেশ বুঝতে পারছে, তার প্রয়োজনটা যেমন একটা কারণ, সাথে সাথে ভদ্রলোকের দুর্বার আকর্ষণও কোনমতেই অগ্রাহ্য করা যাবে না। তার অবস্থা অনেকটা জালে আটকে পড়া মাছের মতো। জেলেরা বিছানো জাল যখন হুড়হুড় করে টানতে শুরু করে, তখন বন্দি মাছগুলি জাল ছিঁড়ে বেরোনোর অন্য কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে, মুখ দিয়ে জাল কামড়ে ধরে পড়ে থাকে আর ভাবে, যা আছি, বেশ আছি। মাত্র একটি দুটি মাছ জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারে। সেক্ষেত্রেও ভাগ্যের সহায়তার একটি প্রশ্ন বোধহয় থেকেই যায়। অন্যসময় সিদ্ধার্থ ভাগ্য ভবিতব্য এসব মানে না। যারা মানে তাদের মধ্যে পুরুষাকারের অভাব আছে এমনটিও সে ভাবে। কিন্তু একটি অভাবনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ মনের দিক থেকে এতটাই আপসেট হয়ে গেছে যে, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় যে দুটি চারটি মাছ, তাদের দলে নিজেকে ভাবতেই পারছে না। বরং তার মনে হচ্ছে ভাগ্য নিয়তি এগুলি দেহের মধ্যেকার জিন, প্রবাহিত রক্ত স্রোতের মতো, যা অনিবার্য এবং ধারাবাহিক। এই মানসিক ভাঙ্গনটির কথা সে মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারছে না। কিন্তু তার বহুদিনের

লালিত ধ্যানধারণা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা যে ক্ষয়ে যাচ্ছে, এমনকি বদলেও যাচ্ছে এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসা মাত্রই, এ কথা সে কাউকেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। বোঝালেও সকলে বিশ্বাস করবে না। এ তার সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অনুভূতি।

— বিশ্বাস! এবারেও ভদ্রলোক সিদ্ধার্থর অনুক্ত কথাগুলি কীভাবে টের পেয়ে টেনে টেনে বললেন, বিশ্বাসের চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি গেলেও, তিনিই নিত্যানন্দ রায়। এমন পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসটুকু যার মূলধন, হাজার বিপদ ঝড় ঝাপ্টা আসুক না কেন, সে এই বিশ্বাসটুকুর জোরেই উতরে যাবে। এক্ষেত্রে কার কাছে কীভাবে কার মাধ্যমে এলাম, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, যিনি স্বতস্ফূর্তভাবে ঘাড় পেতে দায়িত্বটুকু নিলেন, তাঁর দ্বারা আমার বিপদ কেটে যাবেই যাবে, এই ভরসাটুকু অন্তরের অন্তস্থল থেকে যদি উঠে আসে, তাহলেই জানবে কেল্লা ফতে। আর দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন, তিনি যে স্তরের মানুষ, যেখানেই তাঁর বসবাস হোক না কেন, উদ্ধারকর্তা হিসেবে ঈশ্বরই তাঁকে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তোমার সাধ্য কি ঈশ্বরের কাজের ব্যাখ্যা মহিমা জানতে চাওয়া, যাচাই করতে যাওয়া!

সিদ্ধার্থ যদিও এদিক ওদিক দেখছিল, কারা আসছে যাচ্ছে, পরিচিত কেউ চেরাচোখে তাকে দেখছে কিনা, কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছে, পারলে তার দিদিকে, রক্ষা করতে ইনিই পারেন।

সিদ্ধার্থ খেয়াল করেনি, চুপিসারে কখন সুরিয়া এসে তাদের পিছনটিতে দাঁড়িয়েছে। সুরিয়া সম্পর্কে সিদ্ধার্থ অনেক গল্প শুনেছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার মনে হল, সুরিয়া আর পাঁচজন গৃহস্থ বধূর মতোই, যে প্রয়োজনে দু হাতের আড়ালে নানান অসংগতি অপবাদ আড়াল করে রাখতে পারে। এই যেমন এখন সুরিয়া ব্রীড়াবতী নারীর মতো মাথায় ঘোমটা দিয়ে চুপ কর দাঁড়িয়ে আছে। যেন দুজন পুরুষ মানুষের কথোপকথনের সময় চুপচাপ থাকাটাই শিষ্টাচার। থেকে থেকে মাথা তুলে একবার ভদ্রলোকের মুখের পানে, পরমুহূর্তে আপাদমস্তক সিদ্ধার্থকে দেখছে। সুরিয়ার চোখের দৃষ্টিতে কোন খরভাব নেই। নরম কোমল চাউনি।

হঠাৎ করে সুরিয়ার দিকে ফিরে ভদ্রলোক অল্প হাসলেন। কোন ব্যাপারে ভালবাসা বা প্রশ্রয় উতলে না উঠলে মানুষ যেভাবে হাসে, অনেকটা সেইরকম। সুরিয়া দু চোখ বড় বড় করে বলল, জী বাবুজী।

— শ্রীময়ী? বলে ভদ্রলোক গলাটাকে যথাসম্ভব নীচুতে নামিয়ে বললেন, জলে নামব অথচ চুল ভিজবে না, তা তো হয় না। একটু থেমে বললেন, যদি এরপরে আমার নামে দু চারটে খারাপ কথা শোন, ঘাবড়ে যেও না। কাজলের ঘরে ঢুকলে একটু আধটু দাগ তো লাগবেই। সুরিয়া একথার কোন অর্থ ধরতে পারল না, সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল, ভদ্রলোকের মুখের দিকে সুরিয়ার ফ্যালফেলে শূন্য চোখে চেয়ে থাকা দেখে। সুরিয়া ভদ্রলোকের কথার কোন উত্তর দিল না। ফিরতি কোন প্রশ্নও তুলল না।

আচমকা রিক্সার হর্ণ শুনে সিদ্ধার্থ ফিরে তাকাল। নকুল একটি রিক্সা ডেকে এনেছে মোড়ের মাথা থেকে। সিদ্ধার্থদের সামনে এসে রিক্সাটি দাঁড়ানো মাত্র নকুল রিক্সার সিট ছেড়ে টুক করে পথে নেমে পড়ল। ভদ্রলোক সিদ্ধার্থকে ডাকলেন, এসো। নকুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি এগিয়ে যাও। বড় বড় পা ফেলে আমাদের আগে পৌঁছে গিয়ে খবর দাও।

সিদ্ধার্থ এবং ভদ্রলোক রিক্সায় পাশাপাশি বসল। নকুলের লম্বা শরীরটা দূরে সরে যেতে যেতে ক্ষুদ্রতর হতে হতে একসময় ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল। সুরিয়া ডান হাতটি নাড়তে লাগল অল্প অল্প। একজন নিখাদ মধ্যবিত্ত গৃহিণী যেভাবে তার অতিথিকে বিদায় জানায়, অবিকল সেই ভঙ্গী। রিক্সাটি মোড়ের মাথা ঘুরে যাওয়ার পর সিদ্ধার্থর বুক খালি করে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল। রিক্সাওলা প্রাণপণ শক্তিতে তার বয়স্ক রিক্সাটিকে টানছে। রিক্সার শরীর ফুঁড়ে ধাতব কান্নার শব্দ বের হচ্ছে। রিক্সাওলার রগের শিরা দপদপ করছে। চামড়া ভেদ করে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে মাথা থেকে, ঘাড় বেয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভদ্রলোক নাটকীয় গলায় আস্তে করে ডাকলেন, নয়নচাঁদ, তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? কোথায় যেতে হবে জানো তো? রিক্সা চালাতে চালাতেই নয়নচাঁদ জবাব দিল, নীরুদির বাড়ি তো? সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, আপনি গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

— বলছ? ভদ্রলোকের গলায় শ্লাঘার সুর।

— আলবাৎ। নয়নচাঁদ এই প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি সিদ্ধার্থকে দেখল। সিদ্ধার্থর বিবেচনায় নয়নচাঁদ এখন একটি আলোচিত নাম। এই প্রথম নয়নচাঁদকে দেখছে সিদ্ধার্থ। মাংসের স্বল্পতার জন্য চোখমুখে কেমন একটা শুকনো ভাব। যা থেকে নয়নচাঁদের আসল বয়সটা আন্দাজ করা বেশ কঠিন কাজ।

আজ নিয়ে তিনদিন হয়ে গেল, থানা থেকে কেউ আমার খোঁজ করতে আসেনি। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে থেকেছি। বাগানের দরজা ঠেলে কাউকে ঢুকতে দেখলেই মনে হয়েছে, এ নির্ঘাৎ পুলিশের লোক, আমার খোঁজখবর করতে এসেছে। সামান্য দূরে জালঘেরা কালো গাড়ি নিদেনপক্ষে মাথায় লালবাতি লাগানো জিপ অপেক্ষা করছে, আমায় সসম্মানে তুলে নিয়ে যাবে বলে। আসলে থানা পুলিশ কোর্ট এজলাশ এ সব বিষয়ে আমি এতটাই অনভিজ্ঞ যে সত্যি সত্যি কোনরকম সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, এ ব্যাপারে আমার কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই। সিদ্ধার্থকে একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই ও আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে চোখ ছোট করে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি গিলটি কনসাস। ভাণ করে ওর থেকে এসব জানতে চাইছি। আমি যখন আবার বললাম, বল না, এইভাবে সন্দেহের বশে যাকে তাকে অ্যারেস্ট করা যায়? কোনরকম সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই? যদি ধর এমন হোল, পুলিশের অনুমান ভুল, সেক্ষেত্রে পুলিশ কি তার কাজের জন্য ক্ষমা চায়?

আমার মনে হয় সিদ্ধার্থ আমার গলায় ভাঙ্গনের সুর শুনতে পেয়েছিল। কিম্বা আমার চোখমুখের করুণ ভয়ার্ত অবস্থা দেখেই, ও বুঝতে পেরে গেছিল যে ভয় এবং উৎকণ্ঠা আমার শরীরের মধ্যে খেলা করছে। চোখের চাউনিতে বা প্রশ্ন করার ধরনধারণ দেখেই সিদ্ধার্থ আন্দাজ করতে পেরে গেছিল। ও বেশ শব্দ করে হেসে, কোনদিন যা করেনি, তাই করল। আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার পিঠে আস্তো করে হাত রাখল, ভদ্রলোক তোমায় কী বলেন গেলেন দিদি? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? একটু থেমে বলল, থানার ও.সি. কেন, স্বয়ং এস.পি. সাহেবেরও ক্ষমতা নেই, তোমায় সামান্য হ্যারাস করার! ভদ্রলোকের হাত কতদূর লম্বা তুমি ধারণাই করতে পারবে না।

আমি লক্ষ্য করেছি, ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর থেকেই সিদ্ধার্থ প্রতি কথায় ভদ্রলোকের রেফারেন্স দিচ্ছে। অনেকটা ঘুরে ফিরে গরুর রচনা লেখার মতো ব্যাপারটা। আমি তো বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছি। সিদ্ধার্থ আমার সঙ্গে যে কোন বিষয়ে কথা বলতে গেলে পরোক্ষে বুঝিয়ে দেয় যে ও যথেষ্ট বড় হয়েছে। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে। আর প্রায়ই বলে, এত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় যে অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে বেশী নয়, দু চার কথা বললেই ও নাকি বুঝতে পেরে যায়, ভদ্রলোকের অবস্থান কোন শ্রেণীতে। এমনকি তার স্বভাব চরিত্রও থট রিডিংয়ের মতো চট করে ধরে ফেলতে পারে।

এ হেন সিদ্ধার্থ ভদ্রলোকের মধ্যে কী এমন পেল যে, তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাসে টইটম্বুর! ভক্তি ভালবাসা উপচে পড়ছে!

ভদ্রলোক সম্পর্কে আমারও যে কোনরকম কৌতূহল জাগছে না মনে, সে কথা বলব না। সত্যি যদি আমায় থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হোত, তাতে আমার আদৌ কোন ক্ষতি হোত কিনা, নাকি অন্যরকম অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে লাভবান হতাম সেটা অনুমান সাপেক্ষ। বাস্তব সত্য যেটা তা হল, ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় থানা পুলিশের ছোঁয়া থেকে আপাতত রেহাই পেলাম। কিন্তু কীভাবে কী হল, মানে আমাকে অযথা হয়রানি করানোর জন্য পুলিশ লজ্জা পেয়ে চলে গেল, নাকি ভদ্রলোকের প্রভাবে, তাঁর মান সম্মান রক্ষার খাতিরে পুলিশ আমায় আপাতত করুণা দেখাল, সেটাও ঠিকমত পরিষ্কার হচ্ছে না। নিজের বিবেকের কাছে আমি স্বচ্ছ। সেই হিসাবে কারোর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে দ্বিতীয় একজন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা অন্যায় বুঝেও আমায় দয়া দেখাবে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বোধ করে হিসেবের মধ্যেই আনবে না, নিজেকে এতটা দীনহীন এবং অপাংক্তেয় ভাবতে কিছুতেই মন চাইছিল না।

সিদ্ধার্থকে বললাম, ভদ্রলোককে আর একদিন আসতে বলিস তো, কিছু কথা জানার আছে।

সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, কী বিষয়ে?

— ব্যক্তিগত কিছু কথা। আমি বেশ গম্ভীর গলায় বললাম।

— ব্যক্তিগত! সিদ্ধার্থর গলায় রীতিমত বিস্ময়ের সুর, তুমি ওনাকে কতটুকু জানো? উনিই বা তোমাকে কতটুকু জানেন?

— পরস্পরকে ইন ডিটেলস না জানলে বুঝি নিজের কথা বলা যায় না? প্রশ্নটা আমি এমনভাবে করলাম যেন সত্যি এ বিষয়ে আমি সিদ্ধার্থর মতামত চাইছি। সিদ্ধার্থ আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ধরতে না পেরে, বেশ সহজ গলায় বলল, আমার তো সেইরকমই ধারণা ছিল। একটু থেমে বলল, এমনি একদিন আসতে বলব। ব্যক্তিগত কথা তুমি ওনাকে বলতেই বা যাবে কেন?

— তুই-ও তো ব্যক্তিগত দরকারেই ওনার কাছে গেছিলি। আমি বেশ দক্ষ উকিলের জেরার ভঙ্গীতে বললাম, তোর সঙ্গেও তো কোনরকম আলাপ ছিল না।

— আমি গেছি তোমার প্রয়োজনে। সিদ্ধার্থ সামান্য রেগে গেল আমার জবাবে, ইস্কুলের দিদিমণি হিসাবে তো শুনেছি তুমি খুব পপুলার। কোন ছাত্রছাত্রী বা একজন প্রতিবেশীও তো ঘরের জানলা খুলে দেখলো না। তোমার খোঁজে পুলিশ এসেছিল,

জানবে এ খবরটা শহরের সবাই জেনে গেছে। তারপরেও একজন গার্জেন অব্দি এল না। সিদ্ধার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, অথচ দেখ যে লোকটি তোমায় চেনেন না বা যাঁকে তুমিও চেনো না, তিনি নির্দ্বিধায় চলে এলেন। সিদ্ধার্থ একটু থামল। তারপর পাকা অভিনেতার মতো নাটুকে গলায় বলল, তোমার মধ্যে অনেক ইগো আছে। অপরের উপকার নিতে তোমার বাধে না। কেউ জানতে চাইলেও, সত্যি কথাটা জানাতে জিভ জড়িয়ে যাবে না তো?

ইদানীং সিদ্ধার্থ চাঁচাছোলা ভাষায় কথা বলে। বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সরাসরি আমাকে এইভাবে বলবে, কোনদিন ভাবতেও পারিনি। স্বভাবতই রাগ হল। পরমুহূর্তেই মনে হল তবে কি আমার আচার আচরণে অসংগতি ফুটে উঠেছে লক্ষ্যণীয়ভাবে! ঢোঁক গিলে থুতু গেলার মতো রাগটুকু দমিয়ে হেসে বললাম, আমার সম্পর্কে তোর এমন ধারণা কেন হলো বল তো?

— ধারণা তো এমনি এমনি গড়ে ওঠে না। সিদ্ধার্থর গলায় এখনও রাগের ঝাঁঝ, ভদ্রলোককে তুমি একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানালে না। একটু থেমে বলল, নিজের মুখে আর একদিন আসার কথা বলতে তোমার বাধ বাধ ঠেকেছে নিশ্চয়ই। সেইজন্যই আমাকে বলছ।

— আলাপটা তো তোর সূত্রেই। আমি আবার হাসার চেষ্টা করলাম, তুই বললেই ব্যাপারটা মানানসই হয়। এই ধারণায় বলছি। এর মধ্যে কোনরকম ছলচাতুরি জটিলতা ইগো, এসব কিছুই নেই।

সিদ্ধার্থ খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল। কাগজের আড়ালে ওর মুখ ঢাকা। ফলে আমার জবাবের প্রতিক্রিয়ায় ওর চোখমুখের চেহারা কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওর কথা শুনতে পেলাম স্পষ্ট, অয়নদাকে বিদায় জানানোর জন্য তুমি বাগানের দরজা খুলে মোড়ের মাথা পর্যন্ত যেতে। আর এক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে স্ট্যাচুর মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলে।

ইদানীং সিদ্ধার্থ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। ও হয়ত ভাবে অয়নের কথায় আমি হঠাৎই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ব বা দুঃখে কষ্টে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে কোনমতে ওর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাব। সিদ্ধার্থ যথেষ্ট বড় হয়েছে। অয়নের সঙ্গে অমার সম্পর্কটা কিসের এবং কোন পর্যায়ে এটা ও ভালভাবেই জানে। অয়ন আমাদের বাড়ি আসে না বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। ও তো এখানে থাকেই না। মতাদর্শ যাই হোক না কেন, অয়ন তো পাতি মধ্যবিত্ত জীবনের

ন্যূনতম আরাম এবং নিরাপত্তাটুকু অগ্রাহ্য করে, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছে। যে কোন দিন ওর মৃত্যুসংবাদ আসতে পারে। আমার তো মনে হয় যেহেতু সিদ্ধার্থ নিজে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং ওদেরও মূল লক্ষ্য দেশের ভালো করা, সেই হিসাবে অয়নকে তো সিদ্ধার্থর সম্মান করা উচিত। পরিবর্তে সুযোগ পেলেই অয়নের কথা তুলে ধরে এমন ট্যারাবাঁকা মন্তব্য করে যেন অয়নকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা যায় না, এমন একজন নগণ্য ছোট মাপের মানুষ। আর তার সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে দিয়ে হয়ত পরোক্ষে বোঝাতে চায় যে অয়নের সঙ্গে আমি যেমন যেমন আচরণ করেছি সেটা বেশ বাড়াবাড়ি পর্যায়ের আদিখ্যেতা বা ঐ জাতীয় কিছু হয়েছে। অয়ন কিন্তু কোনদিনই সিদ্ধার্থ সম্পর্কে কোন মন্দ মন্তব্য করেনি। এমনকি সিদ্ধার্থর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কোনরকম শ্লেষ বিদ্রূপ করেনি। কেউ না জানুক, আমি জানি অয়নের সৌজন্যবোধ আর পাঁচজনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ করে যত দিন গড়িয়েছে, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে, আত্মঅহংকার বোধ তত কমেছে এবং অন্যের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল না হোক, সহনশীলতা বেড়েছে। সিদ্ধার্থকে এমন কথা বলতে গেলে ও বিশ্বাসই করবে না। বা মনে মনে বিশ্বাস করলেও মুখে সেটা কোনমতেই প্রকাশ করতে পারবে না। এইখানেই সিদ্ধার্থর লিমিটেশন।

যাই হোক, সিদ্ধার্থর কথায় আজ আমি যেমন সামান্য রাগও বোধ করলাম না, সাথে সাথে দুঃখও পেলাম না এতটুকু।

ঠিক হয়েছে বাবা, ভুল হয়েছে আমার। বুঝতেই তো পারছিস তখন আমার মানসিক অবস্থা মোটে ভাল ছিল না, হয়ত সে কারণেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক যদি দয়া করে আর একদিন আসেন, তখন দেখবি এমন ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

— তাহলে আগামী শনিবার আসতে বলি? সিদ্ধার্থ মহানন্দে বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে কথা বললেই বুঝতে পারবে, কি অসম্ভব সম্মোহনী ক্ষমতা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরেও কতরকম ভাঙ্গচুর হচ্ছে। অবশ্য এসবের জন্য একটু সেনসিটিভিটির প্রয়োজন। একটু থেমে বলল, আশা করি, সেটুকু তোমার আছে।

আমি কোনও জবাব দিলাম না সিদ্ধার্থর কথায়। মুচকি হেসে বললাম, ঠিক আছে। আমার স্তুতি তোকে করতে হবে না। তার চেয়ে বরং একদিন নিয়েই আয় না।

পনেরো

দু তিন দিনের মধ্যেই সিদ্ধার্থ একদিন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এল। আমি তখন সবে স্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে শাড়ি বদল করেছি। চায়ের কাপ হাতে এই সময় চুপচাপ বসে থাকলে দেহ এবং মন, দুয়েরই আরাম হয়। কী আর করা যাবে! আমি ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধার্থকে অনুরোধ করেছি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে আনার জন্য। স্বভাবতই অকারণে মিথ্যে করে হেসে ভদ্রলোককে বললাম, কী সৌভাগ্য! আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন!

ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, এর উল্টোটাও সত্যি। আমার মতো একজন চালচুলোহীন এলেবেলে মানুষ আপনার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেল।

— অকারণে বিনয় প্রকাশ করছেন। হাসতে হাসতে বললেও নিজে বুঝতে পারলাম, তেমন তীক্ষ্ণ না হলেও আমার কথায় শ্লেষের তীর রয়েছে।

ভদ্রলোক চোখ কাত করে আমায় দেখলেন। কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে সুতোর মতো হাসি ঝুলছে। ফাঁকা একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসতে পারি?

— নিশ্চয়ই। এবার আমি কিন্তু সত্যি সত্যি লজ্জা পেলাম। যে স্তরের মানুষই হোক না কেন, আমার বাড়িতে যখন এসেছেন, তখন বসতে বলাটা আমার সৌজন্য।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার করে আমার দিকে চেয়ে বললেন, সিগারেটের ধোঁয়ায় আপনি অস্বস্তি বোধ করেন না তো?

— মুখোমুখি না বসলেই হল। আমি হালকা চালে হেসে বললাম।

— না থাক। ভদ্রলোক পাঞ্জাবীর পকেটে সিগারেট দেশলাই পুরে ফেললেন, দুজনের কথাবার্তার মধ্যে ধোঁয়ার উপস্থিতি! একটু থেমে ঘাড় নেড়ে বললেন, আর যাই হোক, মোটেই শুভ ইঙ্গিতবহ নয়।

ভদ্রলোকের রসবোধ আছে। তার সঙ্গে এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো উপস্থিত বুদ্ধিটিও প্রশংসনীয়।

— সেদিন আমি এতটাই পাজলড্ হয়ে গেছিলাম যে আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানানোর মতো সৌজন্যটুকুও ভুলে গেছিলাম। আশা করি ...!

ভদ্রলোক আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। চোখ বুজে হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে বললেন, ল্যাজ যতো খসে যায়, ততই মঙ্গল। এইসব মেকি ফরম্যালিটিগুলো বড় ক্লিশে হয়ে গেছে।

— তাহলেও ...!

— বললাম তো! ভদ্রলোক এবার একটু জোর গলায় বললেন, সরি, থ্যাঙ্ক য়্যু, এসবের বাংলাগুলোও বড় কানে লাগে। মুখোশের আড়ালে মুখগুলো সব হারিয়ে যাচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, যার জন্য যে কাজটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ঈশ্বর তাকে দিয়েই সেটা করাবেন। আবার যত সাবধানী হও না কেন, চোখ-কান যত খোলা রাখ না কেন, অপদস্থ অপমান যেটুকু লেখা আছে, তার দুর্ভোগ বইতেই হবে।

তার মানে ভদ্রলোকের ধারণায় যে জট পাকিয়েছে এবং তার জন্য আমি যতখানি বিপর্যস্ত হয়েছি, সবই আমার ক্ষেত্রে পূর্বঘোষিত। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। অয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না। নানাভাবে ও আমার মধ্যে নাস্তিকতার বীজ চারিয়ে দেবার চেষ্টা করত বিভিন্ন ঘটনার কথা বলে। অয়ন বিশ্বাসী ছিল সামাজিক বস্তুবাদে। ও বলত দারিদ্র বৈষম্য শুধুমাত্র একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের একতরফা ভোগ দখল এবং শাসনের লিপ্সার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আর শোষিত নিপীড়িত মানুষরা তাদের দুর্দশার কারণগুলি যখন উপলব্ধি করতে পারে এবং সেটাকে নির্মূল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন তা বিপ্লবের চেহারা নেয়। আমি যদি বলতাম নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও একজন মানুষের প্রয়োজন হয়। সবাই তো আর নেতা হতে পারে না। ঈশ্বর সবার মধ্যে সেই ক্ষমতাও দেননি। অয়ন হেসে বলত, ঈশ্বর মানুষটাকে দেখতে কেমন তাই আজ অব্দি কেউ জানল না। জন্মসিদ্ধ কোন মহাপুরুষের মতো নেতাসিদ্ধ হয়ে কেউ-ই পৃথিবীতে আসে না। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কারোরই জন্মগত অধিকার বা প্রাপ্তি নয়। পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে থেকেই কোন কোন মানুষের মধ্যে প্রবল জেদ ঘৃণা এবং বিদ্বেষ তৈরী হয়। আর পাঁচজনকে যখন সে সেগুলিকে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে সঠিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে, তখনই লোকে তার নির্দেশিত মত এবং পথের শরিক হয়। জানবে একজন নেতা কেবলমাত্র একজন ভাল লড়াকু নয়। লড়াই করার মতো জেদ এবং ধৈর্য যেমন তার থাকে, তার সঙ্গে সে একজন বড় শিক্ষক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও। তোমার আমার মতোই নেতাও রক্তমাংসের মানুষ। তার মধ্যে জেদ সাহস যেমন থাকে, আবার লোভ লালসা ধূর্তমিও থাকতেই পারে। যে কারণে অনেক নেতার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়। তখন সে শয়তানের শয়তান হয়ে যায়। নানারকম কুকাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সততার ভাণ করে।

অয়ন একদমে অনেক কথা বলতে পারত। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারত। শুনলে মনে হোত ও যা বলছে তা নির্ভুল এবং কোনভাবেই ওর যুক্তিকে কাটাছেঁড়া

করা যাবে না। তারপর কখনও একলা সময়ে ধীরস্থির ভাবে অয়নের বিশ্লেষণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে 'এটা যদি', 'ওটা যদি', বা 'যদি এমনটা হয়' এই ধরণের প্রশ্ন আপনিই তৈরী হোত মনে। যেমন একবার ওকে বলেছিলাম, নেতাদের পদস্খলন হয়। কই, কোন মহাপুরুষের ক্ষেত্রে তো এমনটা হয় না। বরং যত দিন যায় একজন মহাপুরুষ সাধনার স্তরে উন্নীত হতে হতে নির্বাণ লাভ করেন।

আমি যেন নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো আগেপিছে চিন্তা না করে হাস্যকর অযৌক্তিক একটা প্রশ্ন করে বসেছি এমনি তুচ্ছতায় অয়ন হাসি হাসি মুখে আমার দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে থেমে থেমে বলেছিল, মহাপুরুষরা তো মহাপুরুষ হয়েই জন্মেছেন। লোভ কাম ক্রোধ সব মায়ের পেটের মধ্যে ফেলে রেখে পৃথিবীতে এসেছেন। একটু থেমে বলেছিল, রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এমনটি তো হয় না। তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচিত হন। বর্ন ম্যানুফ্যাকচারড্ নন।

আচ্ছা ধরুন! আমি ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললাম, দুঃখ কষ্ট অপমানের মতো, সুখ আরাম সুনাম, এসবও পূর্ব নির্ধারিত? তার মানে কোন ঘটনার পিছনে কারণ উদ্দেশ্য এসবের অনুসন্ধান করা অর্থহীন?

— মূলত তাই। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, তবে কিনা আমরা তো সাধারণ মানুষ, তাঁর মহিমা বোঝার বা উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। ফলে বাতাস খামচে ধরার মতো, যে কোন ঘটনার কারণ খুঁজতে যাই। এলোমেলো হাত পা ছুঁড়ি। যুক্তি তক্কের কূটকচালি করি। তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আস্থা এসে গেলে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। তখন যাই ঘটুক না কেন, 'তিনি তো আগেই মেরে রেখে দিয়েছেন' -- এই সত্যে অবিচল থাকা যায়। একটু থেমে বললেন, তাতে মনের অস্থিরতা কমে। অযথা হাতড়ে বেড়াতে হয় না।

— কিন্তু আপনার খোঁজে তো সিদ্ধার্থকে যেতে হয়েছিল। আমি হেসে বললাম, এক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকলে কী হোত বলুন?

— কিছুই হোত না। ভদ্রলোক হাত ঘুরিয়ে বললেন।

— তাই কি!

— একশোবার। আমার পরিবর্তে অন্য কেউ কোনো অন্য কোনভাবে এসে অবস্থার মোকাবিলা করত। এক্ষেত্রে এই কাজটির জন্য আমার আসার পালা ছিল। তাই আসা।

আপাতভাবে শুনলে মনে হবে ভদ্রলোকের কথাবার্তায় কোন যুক্তি নেই। ভাষাও খুব সাদামাটা। কিন্তু বলার মধ্যে অদ্ভুত জোর। ঠিক যেন যা বলছেন তার কোন নড়চড়

হতে পারে না। সিদ্ধার্থ বলেছিল ভদ্রলোকের কথায় জাদু আছে, যা নাকি সেনসিটিভ মানুষকে সম্মোহিত করে। আমার কিন্তু তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। সরল ভাষায় সিধে ভঙ্গীতে লেখা কোন গল্প পড়লে অনেক সময়েই মনে হয়, লেখালেখি এমনই হওয়া উচিত যা সবার বোধগম্য হবে। এতটুকু হলেও কোথাও একটু ছুঁয়ে যাবে। ভদ্রলোকের ভাষা এবং বলার ভঙ্গীতে সহজবোধ্যতা আছে। অল্পস্বল্প ভাবনার উপকরণও আছে। সোজাসাপ্টা গল্পের মতো।

আগের দিন এবং আজ দুদিনই লক্ষ্য করছি, ভদ্রলোক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলায় আগ্রহী নন। প্রশ্ন করলে যতটুকু উত্তর যত সোজাভাবে দেওয়া যায়, তাই করেন। যেমন প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, চা খাবেন? নাকি সরবত?

— চা। ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন।

— আপনি বুঝি চা খেতে ভালবাসেন খুব?

— কেন বলুন তো?

— না, মানে! আমি সামান্য অস্বস্তি বোধ করলাম, বেশ গরম পড়েছে কিনা! ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, অত ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করি না। একটু হেসে বললেন, মানে কোনকালেই করিনি।

— আপনার বাড়ির লোক রাগ করেন না?

— বাড়ির লোক? বলে ভদ্রলোক অল্পক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপর ওইভাবেই মেঝের দিকে চেয়েই অস্ফুট গলায় বললেন, রাগ করার মতো কে আছে বলুন? এ জাতীয় প্রশ্ন আপনিই আজ প্রথম করলেন।

আমি চমকে উঠলাম। নিজের মনেই বললাম, ছি! ছি! এ আমি কী করলাম! আলাপের প্রথম দিনেই ভদ্রলোকের মনের দুঃখকষ্টের জায়গাটিতে আঘাত দিয়ে ফেললাম? যদিও সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হল, আমার প্রশ্নটি খুবই সাধারণ মানের এবং কোনরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ প্রশ্নটি করিনি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবে উনি যে ভঙ্গীতে যে কথা কটি বললেন, তারপর এ বিষয়ে আর একটি কথা জানতে চাওয়াও সমীচিন হবে না। ক্ষতস্থানে হাত বোলাতে গেলে অনেক সময়েই আরামের পরিবর্তে তা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। অসহ্য সুখের মতো ব্যাপারটা। আমার ভুলটুকু শোধরানোর জন্যই তাড়াতাড়ি বললাম, আমি একটু চা করে নিয়ে আসি? চিনি ক'চামচ?

— এক কাপ চায়ে ক'চামচ চিনি খাওয়া উচিত বা খেলে ভাল লাগবে! ভদ্রলোক

আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন, এ ব্যাপারটাও কোনদিন ভেবে দেখিনি। সবরকমই অভ্যাস আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলাম। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। সন্ধ্যার মুখে পাখিরা বাড়ি ফিরে আসে। আমাদের বাগানের গাছগুলিতে অনেক পাখির বাস। সারাদিন ঘুরে ফিরে এসে ওরা কী যে এত কথা বলে নিজেদের মধ্যে? নাকি ঝগড়া করে? দিন শেষ হয়ে রাত্রি নামছে। আলো অন্ধকারের এই সন্ধিক্ষণে পাখিদের মিলিত স্বর একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এখানে ওখানে টিপটিপ করে একটি দুটি জোনাকী জ্বলছে। এক একদিন আবার এই সময়ে বুড়ো মাংগিলাল সুর করে রামায়ণ মহাভারত আওড়ায়। কোন বই থেকে নয়। নিজের বিবেচনায় যে চরিত্রগুলিকে মাংগিলালের যেমন মনে হয়, সেইভাবে নিজের মতো করে বাক্য তৈরী করে। কোনদিন রামচন্দ্রকে অবতার বলে গান ধরল হয়ত। একটু কান করে শুনলে দেখা যাবে কয়েকবার 'অবতার শ্রীরামচন্দ্রজী' বলার পরেই হয়ত, গলা আরও উঁচুতে তুলে রামচন্দ্রের নামের আগে পিছে এমন একটি শব্দ জুড়ে দিল, যার অর্থ দাঁড়ায় রামচন্দ্র ভীতু কাপুরুষ এবং সীতাকে একটুও ভালবাসতেন না। মাংগিলালকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি এমন উল্টোপাল্টা গান গাও কেন? সবাই জানে রামচন্দ্র অবতার। আর তুমি তার নামে আজেবাজে কথা বল। ভয় করে না?

— ডর? মাংগিলাল বেশ অবাক হয়ে বলেছিল, কেন?

— বলা যায় না। আমি যেন কত ভয় পেয়েছি এমন ভান করে বলেছিলাম, ঠাকুর দেবতার নামে যা তা বললে পাপ হয়। মাংগিলাল চুপ করে রইল আমার কথা শুনে। আমি লেখাপড়া জানি। স্কুলে পড়াই। পাঁচজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আমার ওঠাবসা। সে-ই আমি ভয় পাচ্ছি, তখন ব্যাপারটা ভাববার বৈকি।

মাংগিলাল দু চোখ বন্ধ করে অল্প অল্প মাথা দোলাতে লাগল। অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে ভীতু, কাপুরুষ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাহীন এমন সব উচ্চারণ করাও মহাপাপ, এইরকম ভেবেই হয়ত চোখ বন্ধ করে কৃতকর্মের পাপ দূর করার জন্য মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করছিল রামচন্দ্রজীর কাছে। মাংগিলালকে অমন চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে আমি ওকে সাহস দেবার জন্য বললাম, ক্ষমা চেয়ে নিলে কোন পাপ হয় না। মাংগিলাল প্রথমে গম্ভীর গলায় বলল, হুঁ। তারপর বন্ধ চোখের পাতা খুলে মুচকি হাসল, আসলে আমি ভেবে দেখছিলাম, রামচন্দ্রজী আর কোন কোন গলতি কাম করেছে। ভাই লছমন আর সীতা মাইয়াকে নিয়ে রামচন্দ্রজীর মনে অবিশ্বাস আসছে। খারাপ ভাবছে।

সীতা মাইকে অগ্নি পরীখস্‌মা দিতে বলছে। একটু থেমে বলল, অবতার আদমীর কোই গলতি থাকতে পারে না?

আজ মাংগিলালের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। আফিমের গুলি মুখে পুরে আজ হয়ত সন্ধ্যা থেকেই বিছানা নিয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে আবগারী দপ্তর থেকে মাংগিলালের নামে আফিমের কার্ড করে দিয়েছিলেন। প্রতি মাসের পাওনাটাকে জড়ো করে, বছরে দুবার কি তিনবার হুগলী আবগারী অফিস থেকে কোটা অনুযায়ী প্রাপ্ত আফিমটুকু মাংগিলাল নিয়ে আসে। বাবা মাংগিলালের জন্য সামান্য দুধেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আফিম খেলে নাকি দুধ খেতে হয়। তাতে নেশার ক্ষতিটুকু পুষিয়ে যায়। বাবা মারা যাওয়ার পর দুধটুকু বন্ধ হয়ে গেছে। মাংগিলালও এ নিয়ে কোনদিন একটি কথাও বলেনি। লেখাপড়া না জানলে কি হবে, ও বেশ বিচক্ষণ। বুঝতে পেরে গেছিল বাবার অবর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক টানাটানি শুরু হয়েছে। কিম্বা হয়ত ওর মনে হয়েছিল, বাবার কাছে যে জোরটুকু খাটানো যেত, আমরা সেটা নাও মানতে পারি।

মা যথারীতি ঘর অন্ধকার করে বিছানায় চুপ করে বসে আছে। মায়ের অসুখের মূল কারণটাই হল ভয়। যে কোন বিষয়ে মা ভয় পায়। এমনকি জোরে কথা বলতে অব্দি ভয় পায়। ডাক্তারবাবু বলেন ফিয়ার নিউরোসিস। এ জাতীয় রুগীরা নাকি আলোকেও ভয় পায়। এদের ধারণা আলোয় সবকিছু দৃশ্যমান হয় এবং যা দেখে তার মন্দ দিকটা এদের মনে ধরে। হাজার বোঝালেও, এমনকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও, এরা কখনোই পজেটিভ দিকটা দেখতে পায় না। কিছুতেই মানতে চায় না। আর তাই সবেতেই ভয়।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শুনতে পাচ্ছি সিদ্ধার্থ বেশ উঁচু গলায় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে। এতক্ষণ আমি ছিলাম বলেই হয়ত সিদ্ধার্থ চুপ করেছিল। ভদ্রলোক কথা বলেন আস্তে আস্তে নীচু স্বরে। মাঝে মাঝে তাঁর হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মাঝের কটা দিন যেন এক ঘোরতর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাটল। কাজকর্ম করেছি, স্কুলও গেছি। কিন্তু সব সময়েই অজানা একটা ভয় মনের ওপর চেপে বসেছিল। আর আশ্চর্য, কোন প্রতিবেশী তো নয়ই, এমনকি কোন সহকর্মীও আমার থেকে কিছু জানতে চায়নি। বরং তারা যে আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে, এটা তাদের হাবভাব অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই আমি কাউকে কিছু জানাতে কোনরকম আগ্রহ বোধ করিনি। অনেক সময়েই মনে হয়েছে ওরা হয়ত আমাকে অপরাধী ঠাওরেছে। বা ভেবেছে আমি রাজনীতিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সামাজিক

সমস্যায় নিজেকে ইনভলভড্ করার মধ্যে দিয়ে। রাগ অভিমান নয়। এক ধরণের বিতৃষ্ণভাব তৈরী হয়েছে। কোন ঘটনার কারণ উদ্দেশ্য এসব তলিয়ে না দেখে, মানুষ চট করে একটা সিদ্ধান্তে পৌছে যায় কেমন করে? অয়নের ধারণা, প্রবল জলোচ্ছ্বাস যখন আসবে তখন ঠুনকো পলকা যা কিছু সব ভেসে বেরিয়ে যাবে। অবশিষ্ট যেটুকু পলি পড়ে থাকবে, তারাই রচনা করবে সত্যিকারের কৃষিভূমি।

এখন অয়নের এইসব কথাগুলো মনে পড়লে অয়নকে মনে হয় অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমানুষ। আর তা নাহলে কল্পনার জগতে বসবাসকারী একজন আবেগসর্বস্ব আজগুবি মানুষ। সে তুলনায় ভদ্রলোককে অনেক বেশী প্র্যাকটিক্যাল বলা যেতে পারে। কেন হল, এটা না হয়ে ওটা হতে পারত বা আর্থ সামাজিক কাঠামোয় এটাই অবশ্যম্ভাবী, এই জাতীয় যুক্তির জাল বিছানোর পরিবর্তে ভদ্রলোক তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে যতটুকু করেছেন, আমার মতো বিপদগ্রস্ত একজন মানুষের কাছে এটাই কাম্য।

বহুদিন পরে আজ বাড়িতে হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি হিসেব করে চায়ে চিনি দিচ্ছি, কাপ প্লেট সাজাচ্ছি, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে যেন চেনা পরিবেশে জানা কাজ, অথচ কোন কারণে বিস্মৃত হয়েছিলাম, আজ আবার করছি, এইরকম একটা পুরনো জিনিস ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে।

চায়ের কাপ প্লেট হাতে আমাকে ঢুকতে দেখে সিদ্ধার্থ এগিয়ে এল, আমার হাতে দাও। আমি কপট রাগের ভঙ্গি করলাম, কেন, আমি হাতে করে দিলে কি ওনার অপমান হবে?

আমার কথায় ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, মান অপমান বোধটা এত ঠুনকো জিনিস নয়। অন্তত আমি তাই মনে করি।

— কথাটা ক্যাজুয়ালী বলেছি। আমি বললাম।

— জানি। ভদ্রলোক আবার হাসলেন, আমাকে যাচাই করার জন্য বলেননি।

— সেটাও কি খুব সোজা কাজ? এবার আমি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

— মোটেও না। ভদ্রলোক সমর্থনের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লেন, দশ বিশ বছর নয়, কখনও কখনও একটা যুগ কেটে যায় একজন মানুষকে অ্যাসেস করতে। তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে। একটু থেমে বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, এই সত্যটাকে এসট্যাবলিশ করতে কতজন মনীষীকে তাঁদের জীবনকালে নিগৃহীত হতে হয়েছে, বলুন তো?

— চমৎকার বলেছেন। সিদ্ধার্থ উচ্ছ্বাসের গলায় বলে উঠল।

— বলার চেয়েও ঘটনাপ্রবাহ আমাদের চমৎকৃত করে। ভদ্রলোক ধীর গলায় বললেন। তারপর হঠাৎই আমার দিকে চেয়ে, দুঃখিত, খেয়াল করিনি এখনও আপনার হাত থেকে কাপটা নেওয়া হয়নি। বলে তাঁর ডান হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। পুরুষ মানুষের এমন চমৎকার আঙ্গুলের গড়ন সচরাচর দেখা যায় না। লম্বা। মাথার দিকটা সরু। মধ্যমায় সোনা দিয়ে বাঁধানো পাথরের আংটি। পাথরের রং পুষ্ট বেদানার মতো। আমি জানি না এটা গোমেদ, না পান্না, নাকি অন্য কিছু। নীলাভ ফর্সা আঙ্গুলে পাথরটা যেন নিজে যতটা তার চেয়েও বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করলেন, বাঃ! চা-টা নিশ্চয়ই খুব দামী?

আমি বললাম, তার মানে চায়ের গুণে খেতে ভাল লাগছে? দুধ চিনি লিকার এসবের অনুপাত ঠিকমত হয়নি, তাই তো?

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, তা কেমন করে হবে? একটির সঙ্গে আরও কয়েকটি যখন সম্পর্কিত, তখন গুণগত বিচারে প্রতিটিই যদি সমমানের বা উনিশ বিশ ফারাক এইরকম একটি অবস্থায় থাকে, সামগ্রিক প্রোডাক্টটি ভাল হয়। শুধুমাত্র একটি ভাল উপকরণ, কমজোরী বাকি তিনটির দায়ভার কতটা বহন করতে পারে, বলুন?

আমি চমকে উঠলাম। সাধারণ একটা ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভদ্রলোক যেন চিরকালীন একটি সত্যকে তুলে ধরলেন। মনে হল সিদ্ধার্থর মতো করে বলি, চমৎকার বলেছেন। পারলাম না। অস্ফুটস্বরে কোনরকমে বললাম, ঠিকই তো।

আমার মনে হল চা চিনি লিকার দুধ, এসব এখানে গৌণ। কাকতালীয়ভাবে প্রসঙ্গটা এসে পড়েছে সত্যি। ভদ্রলোক কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে উত্তরটা দিয়েছেন। পরোক্ষে হয়ত আমাকেও বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে দুঃসাহসিকের মতো আমি যে কাজেই এগিয়ে যাই না কেন, আমার পাশের জনেরা কমজোরী বা দুরাচারী হলে একার ক্ষমতায় তাদের সকলের ঘাটতিগুলি পুষিয়ে দেওয়া বা চক্রান্তের মোকাবিলা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন বুঝতে পারছি সিদ্ধার্থ কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে ভদ্রলোকের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছে। সম্মোহনী ক্ষমতা না থাকুক, অন্যকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভাবিয়ে তোলার ক্ষমতা ভদ্রলোকের আছে। এমন হতে পারে কিছুকাল বা কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়ত ভদ্রলোকের কথাবার্তার অসংগতি বা পারস্পরিক বিরোধীতা আমি নিজেই আবিষ্কার করে ফেলব। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওনার জবাব কেবল যুক্তিপূর্ণই নয়, যথেষ্ট মনোগ্রাহীও। কোনভাবেই এর ওপর বিতর্ক করা যাবে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে অয়নের কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। অমিল যেটুকু আমার ধারণায়, তা হল, অয়নের কথাবার্তায় 'আমি'-টা বড় হয়ে উঠত। ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে 'অহম' শব্দটির কোনরকম প্রকাশ নেই। থাকলেও সেটা এমন নিরুচ্চারিত স্তরে যে মোটেও কানে লাগে না।

চা খাওয়া শেষ করে ভদ্রলোক বললেন, আজ তাহলে উঠি?

আমি বলাম, সেকি? এর মধ্যেই চলে যাবেন?

— তা বলে ভাববেন না, আমার খুব কাজের তাড়া আছে। ভদ্রলোক হাসলেন, সিদ্ধার্থ না বললেও আমি নিজেই আসতাম। আপনার সঙ্গে আলাপ করার তাগিদ বোধ করছিলাম।

শেষের কথাটা আমার কানে কেমন বেখাপ্পা লাগল। বললাম, তাগিদ বলছেন কেন?

— বারে! ভদ্রলোক দু চোখ বড় বড় করে বললেন, নয়নচাঁদের মুখে আপনার গল্প শুনেছি। তারপর ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সে কথাও আমার কানে এসেছে। একটু থেমে বললেন, কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের তোয়াক্কা না করে যিনি একার ক্ষমতায় এগিয়ে যাওয়ার মতো মনের জোর ধরেন, তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল জাগা কি অস্বাভাবিক কিছু?

ভদ্রলোকের কথায় আমি লজ্জা পেলাম। মনে হল আমার সম্পর্কে উনি যা বলছেন, তা ওনার মনের কথা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয়, সামনাসামনি কেউ প্রশংসা করলে, মনে হয় উল্লেখযোগ্য কিছু বলার নেই বলেই, অহেতুক কিছু ভাল ভাল বিশেষণ ব্যবহার করে পরোক্ষে তীর্যক শ্লেষে বিদ্ধ করছেন। নয়নচাঁদ এবং অলোকেশ, এই দুজনের ক্ষেত্রেই আমি যা করেছি, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ তাই করত। বরং পরবর্তী পর্যায়ের সন্দেহ অবিশ্বাস এবং অহৈতুকী ঝামেলাগুলি যে এমন বিরাট চেহারা নিয়ে হাজির হবে, এটা জানা থাকলে আমিও হয়ত ছুটে যাওয়ার আগে দুচারবার ভাবতাম। 'ভাবিয়া করিও। করিয়া ভাবিও না' — এই আপ্ত বাক্যটি সব সময়ে স্মরণে রাখা যায় না কিনা!

আমি বললাম, আপনার সম্পর্কে আমারও কিন্তু অনেক কৌতূহল জমেছে মনে।

— আমার সম্পর্কে? ভদ্রলোক হেসে ঘাড় দোলালেন, সেটাই স্বাভাবিক। কে আমি, কী আমার পরিচয়, ডাকা মাত্রই ছুটে এলাম কেন? একটু থেমে বললেন, এই সব তো?

— ঠিক তাই। আমি বললাম, আমাদের শহরে আপনার মতো একজন রুচিবান, পরোপকারী মানুষ আছেন, সত্যি আমার জানা ছিল না।

— আপনি কিন্তু যতটা বলছেন, আমি মোটেই সেই উচ্চতার মানুষ নই। তবে হ্যাঁ, কেউ বিপদগ্রস্ত হয়েছে শুনলে ছুটে যাই। বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করি। সব ক্ষেত্রে যে সফল হই, তাও নয়। সব অংকেরই উত্তর আছে। তা বলে সবাই তো আর সব অংকের সঠিক উত্তরটা মেলাতে পারে না।

— সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি বললাম।

— আর একটা ব্যাপারও আছে। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন, গায়ে চাপকান জড়ালে সাধারণ মানুষ ওই চাপকানটাকেই বড় করে দেখে। পেন্নাম দেয়। সেলাম ঠোকে। সরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেয়। আর এতে হয় কি চাপকানধারীর মনেও অহমিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত জোর আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ভদ্রলোক একটু হাসলেন। তারপর যেন হঠাৎ করে মনে পড়ে গেছে যে ঘরে আমি ছাড়াও আর একজন আছে, সেও কিছু শুনতে চায়, এমনি ভেবেই হয়ত পাশ ফিরে সিদ্ধার্থর দিকে চেয়ে বললেন, পুলিশ শুনলেই যেমন মানুষ ভয় পায়, মহাপণ্ডিত জানতে পারলে সোজা প্রশ্ন করতেও সিঁটিয়ে যায়, আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই হয়েছে। লোকে ধরেই নিয়েছে বেণুবিনোদ মিশ্র মানেই সে সব কিছু পারে। তার হাতে যাদুকাঠি আছে। তার ছোঁয়ায় যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করতে তুলতে পারে। এমনই তার প্রতাপ যে বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারে।

একটানা এতগুলি কথা বলে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। হয়ত তাঁর হঠাৎই স্মরণে এসেছে যে কথার তোড়ে তিনি তাঁর নামটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। বা নিজের সম্পর্কে অনেক বড় কথা বলে ফেলেছেন। যা শুনতে লাগছে আত্মগরিমা প্রকাশের মতো।

বেণুবিনোদবাবু? আমি রসিকতার সুরে বললাম, এখনও আমার কিন্তু অনেক জানার আছে। মানে জানতে ইচ্ছে করছে। যেমন সত্যি সত্যি আপনার নাম বেণুবিনোদ কিনা? বা নিজের সম্পর্কে যেভাবে বললেন, মানুষ ভাবে, মানুষ ধরে নেয়, এটা আপনার বিনয়? নাকি ...?

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। যেন আমি কোন রসিকতা করেছি বা বোকার মতো হয়েছে আমার প্রশ্নগুলি। অকারণে কেউ মজা করলে মনে হয় লোকটি উন্নাসিক, তা না হলে নির্বোধ।

কিন্তু যিনি এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, তাঁকে আর যাই হোক, বোকাবুদ্ধিহীন ভাবা যায় না। মূলত ভদ্রলোক আমার অ্যাসেসমেন্টে, রীতিমত চতুর এবং অন্যের তুলনায় নিজেকে অনেক উঁচুতে আছেন, এইরকম ভাবেন।

এবার আমি গলায় পেশাগত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম, হাসি দিয়ে সব কিছুকে আড়াল করা যায় না।

— ঠিক। একশভাগ ঠিক। ভদ্রলোক সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন, যে জেগে ঘুমোয়, হাজার চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙ্গানো যায় না। তেমনি যেটা সত্যি, হাসিঠাট্টায় সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অপবাদ নিন্দা তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোন কিছুর দ্বারাই সত্যের সত্যতাকে আড়াল করা যায় না। আমার নাম বেণুবিনোদ। শুনেছি আমার মাতামহ আমার নামকরণ করেছিলেন। অবশ্য এর বাইরেও আমাকে আরও অনেকগুলি নামে মানুষ চেনে। যেমন বড়দা, টৌনিদা। কয়েকজন আমাকে বিপদতারণ নামেও ডাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। তবে আমার পারিবারিক নাম বেণুবিনোদ। এই নামটা বরং হারিয়ে যাচ্ছে।

— হারিয়ে যাচ্ছে মানে? আমার অবাক লাগল, আপনার বাড়ির লোক, মানে আপনার ভাই বোনেরা তো জানেন তাঁদের দাদার নাম বেণুবিনোদ। বা আপনার ছেলেমেয়েরা কেউ জিজ্ঞেস করলে বা কোথাও লেখার প্রয়োজন হলে তো বাবার নামের জায়গায় বেণুবিনোদ মিশ্রই লেখে!

— আঃ! ভদ্রলোক দু চোখ বন্ধ করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, আপনাকে আগেই বলেছি, নিজের লোক অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক আছে, এমন কেউ নেই আমার। মা মারা গেছেন যখন আমার বয়স দুবছর। বাবা আবার বিয়ে করলেন বলে, রাগে অভিমানে ঘর ছেড়ে বেরোলাম সাত আট বছর বয়সে। তারপর থেকেই একা। জানিনা, বাবা এবং বিমাতা দুজনেই এখনও জীবিত নাকি মৃত! নাকি দুজনের কোন একজন গত হয়েছেন! দ্বিতীয়জন সঙ্গিহীন দিন কাটাচ্ছেন! আর আমার মতো ঠাঁইপরিচয়বিহীন গোত্রপরিচয়হীন ছেলের সঙ্গে কোন বাপ স্বেচ্ছায় মেয়ের বিয়ে দেবেন বলুন? তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরলে বোধহয় মেয়েটি সদগতিপ্রাপ্ত হয়।

আমি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক যখন এইসব কথাগুলি বলছেন, তখন তাঁর বুকের গভীর থেকে যেন কান্না ঠেলে উঠছে। কিছুক্ষণ আগের ভদ্রলোকটি আর এই লোকটি যেন দুটি আলাদা মানুষ, পৃথক সত্ত্বা দুজনের।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে বাবার কথা মনে পড়ছে। চিন্তায় ভাবনায় আবেগে কল্পনায় বাবা মায়ের থেকে অনেক এগিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, মানসিক সঙ্গদান বলতে যা বোঝায়, আমরা বাবা কোনদিনই তা মায়ের থেকে পাননি। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের কিছু কষ্ট থাকে। কিন্তু কষ্টেরও তো রকমফের আছে। পার্থিব চাহিদার শোকে যে মানুষটি

গুমরে মরছে, তার সঙ্গে আমার বাবার অন্তরের বেদনা বা গোপন দীর্ঘশ্বাসকে কোনমতেই মেলানো যায় না। মনের মতো সঙ্গী না হলেও হাঁটা যায় বা হাঁটতে হয়। কিন্তু সে পথ চলায় স্বতস্ফূর্ত আনন্দ থাকে না।

ভদ্রলোকের বুকচাপা কষ্টটুকু আমি পুরোটা না হলেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। কারণ শেষের দিকে আমি-ই ছিলাম বাবার সবচেয়ে কাছের মানুষ। বাবার দুঃখ বেদনা, অপূর্ণতার দীর্ঘশ্বাস আমি অনুভব করতে পারতাম। বাবাও সেটা বুঝতে পারতেন। পারতেন বলেই, আমার বয়সী কিশোরী একটি মেয়েকে যে কথা বলা যায় না, বলা শোভা পায় না, তেমন সব একান্ত গভীর গোপন কথা আমাকে বলতেন। বাবা হয়ত আমার উত্তরের অপেক্ষা করতেন। উত্তর দেব কি, আমি তো ছাই অর্ধেক কথার অর্থই ধরতে পারতাম না। চুপ করে থাকতাম। তারপরেও বাবা একতরফা আমাকে বলতেন। কখনও সখনও হয়ত মৃদু অনুযোগের সুরে বলতেন, তুই কিছু বল। আমি মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বাবার পাশাপাশি হাঁটতাম। সাবধানে মাথা তুলে বাবার চোখমুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতাম। বাবাকে তখন চেনাই যেত না। যেন চোখের দৃষ্টি পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে। আমি যে তাঁর পাশাপাশি হাঁটছি, এটাও বিস্মৃত হয়েছেন। আমার অনুমান ভুল নয়। কারণ আমাকে প্রশ্ন করে তার কোন উত্তর না পেয়েও বাবা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতেন না। বা কোনরকম পীড়াপীড়ি করতেন না। এখন মনে হয় বুক খালি করে বলতে পারার মধ্যে দিয়েই বাবা আত্মউন্মোচনের তৃপ্তি পেতেন।

আমার সামনে বসে ভদ্রলোকটিকে কোন অবস্থাতেই বাবার সঙ্গে মেলানো যায় না। আমি এনাকে কতটুকুই বা চিনি! কিন্তু উনি যেভাবে নিজের একাকীত্বকে মেলে ধরলেন, তাতে মনে হল, বাবার মতো উনিও বুকের মধ্যে গোপন কষ্ট বয়ে বেড়ান। ভদ্রলোককে দেখতে আমার বাবার বিপরীত। সুপুরুষ, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। কথাবার্তাও বলেন বেশ আটঘাট বেঁধে। কথার মধ্যে টিপটিপ জোনাকির মতো আত্মম্ভরিতার টুকরো টুকরো প্রকাশ। এর কোনটিও বাবার সঙ্গে মেলে না। কেবল ওই একটি জায়গায়, যেন বিশেষ একটি তারে ঘা পড়ামাত্রই, চিরকালীন করুণার সুরটুকু বেজে উঠল। যা শোনাল কিছুটা আর্তনাদ। কিছুটা অনুচ্চ সুরে কান্নার মতো।

— আপনাকে আমার বাবার মতো মনে হচ্ছে। আমি বললাম, অবিকল।

— সত্যি? ভদ্রলোকের চোখমুখে আলো চলকে উঠল, সঠিক সময়ে বিয়ে থাওয়া করলে, আমার মেয়েও আপনার কাছাকাছি বয়সের হতো।

— আমিও তো আপনার মেয়ে হতে পারি। কথাটা আমি খুব হালকা চালে বললাম।

— হ্যাঁ, তাই তো! ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন কথাটা এতক্ষণ তাঁর নিজেরই খেয়ালে আসেনি কেন, এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

— আপনি যা উপকার করলেন। সিদ্ধার্থ একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না, আমার বাবা থাকলে তিনি নিজেও এতখানি করতে পারতেন না হয়ত।

সিদ্ধার্থর এই ভারি দোষ। একবার কোন কারণে কাউকে ভাল লেগে গেলে, ও নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। শুধু তাই নয়, চিন্তাভাবনা না করেই এমন মন্তব্য করে বসে, সময় বিশেষে সেটাকে খোশামদের মতো শোনায়। সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব কিছু ব্যাপার আছে। যে কারণে দুটি মানুষ হুবহু এক হতে পারে না। নিছক বিজ্ঞাপনের মতো শোনায়, 'আপনিও অমুকের মতো হতে পারেন।' ভদ্রলোক বোধহয় আন্দাজ করতে পারলেন, বাবার চেয়েও তাঁকে উঁচুতে স্থান দেওয়ার ব্যাপারটা আমি মোটেই খোলা মনে নিতে পারছি না। সিদ্ধার্থর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও বললাম না, বাবা আপনার মতো করতে পারতেন না। আমার নিস্পৃহ ভাবটা দেখেই ভদ্রলোকের এমন ধারণা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অবস্থাটার মোকাবিলা করলেন এইভাবে। প্রথমে অপরাধীর মতো মুখ করে আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। যেন সিদ্ধার্থর অর্বাচিন মন্তব্যের জন্য তিনি নিজে লজ্জা তো পেয়েছেনই এবং সিদ্ধার্থর এমন বেহিসেবী কথাবার্তার দায়ভাগও তাঁর নিজের। নীরব হাসির মধ্যে দিয়ে তিনি যার জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছেন। এরপর উনি সিদ্ধার্থর দিকে চেয়ে মৃদু ধমকের সুরে বললেন, বাব-মা'র বিকল্প কেউই হতে পারেন না। এমনকি কোন ঠাকুর দেবতাকেও বাবা কিম্বা মায়ের আসনে বসানো যায় না। তোমার দিদি যেমন বললেন, উনি আমার মেয়ে হতে পারেন, এই 'মতো' বা 'হতো' অব্দি মানা যায়, একটু চুপ করে থেকে বললেন, যে কারণে গুরু কত্তা বাবা এই তিন নামে কেউ আমায় ডাকলে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমি বললাম, আপনি তাহলে আমাদের মেশোমশাই হতে পারেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, কাকাবাবু কিম্বা জ্যাঠামশাইও বলতে পারেন।

— বাবা বেঁচে থাকলে অবশ্যই আপনার চেয়ে বয়সে বড় হতেন। আমি বললাম, তবে বাবার সঙ্গে আপনার ভীষণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠত।

— কারোর সঙ্গেই আমার শত্রুতা নেই। ভদ্রলোক চটপট জবাব দিলেন, অবশ্য সব সময়ে যে একজনের দোষে শত্রুতা গড়ে ওঠে, এমন বিশ্বাসও আমার নেই। একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যিনি আমার শত্রু, তাঁর বিচারেও আমার কিছু

অসঙ্গতি আছে। সেটা আমার ভালোমানুষি, নির্বুদ্ধিতা, বিচারহীন সরলতা, এইরকম কিছু হয়ত। যা মেনে নেওয়া বেঠিক অসহ্য।

তর্ক করা আমার ধাতে নেই। কোন ব্যাপার মেনে নেওয়া অসম্ভব মনে হলে, আমি শুধু প্রতিবাদ করি। যদি দেখি তাতেও বিরুদ্ধজন অনমনীয় মনোভাব আঁকড়ে ধরে রয়েছে, আমি চুপ করে যাই। বিনা যুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এমনতর বিষয়ে কোনদিন ভুলেও এক টুকরো মন্তব্যও করব না। না শোনার ভান করে মনটাকে অন্য কোন চিন্তায় ডুবিয়ে রাখব। অয়নের সঙ্গেও বহুক্ষেত্রেই আমি এমন আচরণ করেছি। ভদ্রলোক যেমনভাবে বললেন ভালোমানুষি বা সরলতা সময় বিশেষে ক্ষেত্র বিশেষে শত্রুতা গড়ে ওঠার কারণ হতে পারে, এমন কথা বললে আমি নিদেনপক্ষে 'তাই কি' বা 'কেমন করে হবে' এই জাতীয় পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতাম। ভদ্রলোকের কথার পিঠে আমি কিন্তু সেটুকু প্রতিবাদও করলাম না। কারণ আবার একটি বিষয়ে অয়নের সঙ্গে ভদ্রলোকের পার্থক্যটা লক্ষ্য করলাম। অয়ন তার মতামতটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একগুঁয়ে জেদীর মতো আচরণ করত। আমি তার কথার সত্যতা মেন নিচ্ছি কিনা, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রীতিমত পীড়াপীড়ি করত। এ ক্ষেত্রে ভদ্রলোক যেন অয়নের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। কোথায় কতটুকু বলতে হয়, কখন থামতে হয়, এ বিষয়ে তীব্র সজাগ।

ষোল

স্কুল থেকে এখন একা ফিরি। আগে সহকর্মীদের মধ্যে কেউ না কেউ আমার সঙ্গে আসত। অন্তত বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। ইদানীং লক্ষ্য করি আমি বড়ি ফেরার জন্য তৈরী হচ্ছি বুঝতে পারলেই, সহকর্মীদের মধ্যে হঠাৎ ব্যস্ততা কিম্বা গা-ছাড়া ভাব জেগে ওঠে। হয় তড়িঘড়ি আমার আগে বেরিয়ে পড়ে। তা না হলে দেরী হয়ে যাচ্ছে বুঝেও চেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকে। কোনরকম ব্যস্ততা নেই, এমন ভাব করে। আর সাবধানে চেরা চোখে আমাকে দেখে। আমি জানি কেন ওরা আমাকে এড়িয়ে চলে। ওদের ধারণা আমার সঙ্গে পথে বেরোলেই না-চাইতে বৃষ্টির মতো উটকো কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব আমি এবং একটু আধটু হলেও যদি সে ঝামেলার আঁচ ওদের গায়ে লাগে এবং তার জন্য সামান্য দায়ভাগ বহন করতে হয়, এই ভয়ে ওরা আমাকে এড়িয়ে চলে। স্কুল চৌহদ্দির মধ্যে ওরা স্বাভাবিক আচরণ করে। পথে আমার পাশে হাঁটতে ওদের বুক কাঁপে। আমি জানি ওরা আমাকে বিপজ্জনক মনে করে বলেই ভয় পায়। অন্যথায় আমার

সম্পর্কে ওদের আর কোন এলার্জি নেই। প্রথম কয়েকদিন একা হেঁটে আসতে খারাপ লাগত। নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ ব্রাত্য বলে মনে হোত। এখন আর ও ধরণের কোন অনুভূতি আসে না। বরং অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে অন্তত একটি ক্ষেত্রে যে আমার পার্থক্য আছে, এটা ভেবে ভালই লাগে। আমি ওদের মতো ডি.এ.-র কিস্তি হিসেব বা স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে বড়দির আচার আচরণ নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে, সামাজিক কোন সমস্যা নিয়ে নিজের মতো করে অন্তত একটু ভাবনা চিন্তা করি। যদিও এখন বেশ বুঝতে পারি, আমরা একার ক্ষমতায় যে কোন অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো আমাকে নাড়া দেয়, ভেতরে ভেতরে আমি গর্জে উঠি। আমার বিশ্বাস আমার মতো যদি আরও অনেকের মধ্যে এইরকম আলোড়ন তৈরী হোত, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা ওলোটপালোট ঘটে যেতে পারত। নারী অবলা ভীরু অসহায় বলে যে ধারণাটা প্রচলিত আছে, সেটা মোটেই সত্যি নয়। আজ বলে নয়। কোন কালে কোন সময়েই নয়। দুটি ক্ষেত্রে একা এগিয়ে গিয়ে আমি সর্বাংশে সফল তো হইনি, উল্টে কিছু দুর্নাম জুটেছে এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সাহায্যে নিজেকে আপাত বিপদমুক্ত করেছি জেনেও, মনে মনে আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করি, যে কোন বড় ধরণের অঘটন ঘটানোর জন্য আমার মতো মেয়েদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং এখনও যদি চোখের সামনে ছোটবড় কোন অন্যায় চোখে পড়ে, আমি নির্দ্বিধায় ছুটে যাব।

'এসো নারী তুমিই অর্ধেক আকাশ।' মাও জে ডংয়ের এই কাব্যিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বান আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

আমি যে রাস্তাটা ধরে ফিরি শহরের অন্য রাস্তাগুলির তুলনায় এটি সামান্য নির্জন। সাইকেল রিক্সা এবং পথচলতি মানুষের শব্দ এবং ব্যস্ততা দুই-ই আছে। কিন্তু বাস লরির কোন যাতায়াত নেই এই পথে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম সচেতন ভাব নিয়েও এই রাস্তায় হাঁটা যায়। ঘাড় ফিরিয়ে ইচ্ছেমত এদিক ওদিক দেখা যায়। এমনকি গভীর কোন বিষয় নিয়ে গাঢ় চিন্তাভাবনা করতে করতে নিজের মতো পথ চলা যায়।

আজও মন্থর পায়ে নিজের মতো করে অলোকেশের খুন হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ, পুলিশের আক্রমণ এবং প্রায় তার গা ঘেঁষেই আগন্তুক ভদ্রলোকের অযাচিত আবির্ভাব, এইসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটছিলাম। আচমকা মনে হল আমার প্রায় ঘাড়ের ওপর ঝনঝন আওয়াজ করতে করতে একটি রিক্সা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখি নয়নচাঁদ তার আরোহীবিহীন

ফাঁকা রিক্সাটি একরকম আমার গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে, রিক্সার সিটে বসেই আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এ কদিনে নয়নচাঁদের ঘটনাটা বহুবার মনে এসেছে। কিন্তু যতবারই নয়নচাঁদের মুখটা ভাবতে বসেছি, সামান্য অস্বচ্ছ মনে হয়েছে। নয়নচাঁদকে দেখা মাত্রই মনে হল, এই সেই মুখ, প্রিয়লালের কথানুসারে, কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই, যে মুখটির কুটিল হিংস্র চেহারা দেখেও আমি পিছিয়ে আসার কথা না ভেবে, দুঃসাহসিকের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিলাম।

নয়নচাঁদ তার ছ্যাৎলা ধরা দাঁত বের করে হেসে বলল, নীরুদি, বাড়ি যাচ্ছেন তো? আমার গাড়িতে উঠে বসুন। পৌঁছে দিয়ে আসি।

— না, না। তার দরকার হবে না। আমি হেসে বললাম, আমি রোজ হাঁটতে হাঁটতেই ফিরি। এতে শরীর ভাল থাকে।

— একদিন গেলে কোন ক্ষতি হবে না। নয়নচাঁদ আব্দারের সুরে বলল।

— বললাম তো। ডাক্তারবাবুর কথামত আমি রোজ হাঁটি।

— তাহলে আর কী বলব? নয়নচাঁদ হতাশের গলায় বলল এবং রিক্সার সীট থেকে নেমে রিক্সাটিকে ঠেলতে ঠেলতে আমার পাশে পাশে চলতে লাগল। ব্যাপারটা কেবল বিরক্তিকর নয়, বেশ দৃষ্টিকটুও। যে কেউ দেখলে ভাববে, রিক্সায় চড়ব বলে আমি মনস্থির করেছি কিন্তু আমি যে ভাড়া বলেছি, রিক্সাওয়ালা তাতে রাজী নয়। আর তাই আমাদের দুজনের মধ্যে দর কষাকষি চলছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নয়নচাঁদকে বললাম, তুমি এগিয়ে যাও। তাড়া আছে নিশ্চয়ই?

— তাড়া আছে তো কী হয়েছে? বলে নয়নচাঁদ এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়াটা খুব জরুরী ছিল।

— তাহলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছ কেন?

— কতদিন পরে দেখা হল। নয়নচাঁদ হাসল, আমার ওপর আপনি খুব রেগে আছেন, তাই না?

ঘাড় ফিরিয়ে নয়নচাঁদকে দেখলাম। সলজ্জ মুখের অভিব্যক্তি। যেন না বুঝে সে যা করেছে, তার জন্য লজ্জিত এবং আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আর তাই হাজার তাড়া জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও সময় নষ্ট করে আমার পাশে পাশে হাঁটছে। খোশামুদির ভাব করে আমার রাগ প্রশমনের চেষ্টা করছে। বাস্তবিক সেদিনের ঘটনার পর আজই প্রথম নয়নচাঁদকে দেখছি। সেই উন্মত্ত হিংস্র মুখটা যেন এই লাজুক দুঃখী দুঃখী মুখটার মুখোশ। তবে কি নয়নচাঁদ সেদিনের অমন আচরণের জন্য সত্যি সত্যি অনুতপ্ত! আমার এতদিন

ধারণা ছিল শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকেরা মুহূর্তে মুখের চেহারা বদলে ফেলতে পারে। বাচনভঙ্গী এমনকি শব্দ প্রয়োগেও তাঁরা কৌশলী এবং পারদর্শী। নয়নচাঁদকে অবশ্যই তাদের দলে ফেলা যায় না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

— তোমার ওপর রাগ করে লাভ কী বল? আমি থেমে থেমে বললাম, আমার কথা তুমি শুনবে? না মানবে? মদ খাওয়া, বাড়ির বউকে মারধর করা, এসব কি রাতারাতি বন্ধ হয়?

— ছিঃ ছিঃ ছিঃ! রিক্সার হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে দু হাতে নিজের নাক কান মুলল নয়নচাঁদ, এসব বলে আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না, নীরুদি। এখন আমি আর ওসব করি না। ভুলেও মদের ঠেকে যাই না। বউয়ের সঙ্গে সবসময় হেসে হেসে কথা বলি। ও ঠেস দিয়ে কথা বললে, এই দেখুন! বলে ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেখাল, মুখে কুলুপ এঁটে থাকি।

নয়নচাঁদের কথাবার্তা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরী অভিনয় দেখে আমার হাসি পেল। আমায় হাসতে দেখে নয়নচাঁদ আরও একটু সাহসী হয়ে উঠল, আপনি ব্রাহ্মণের মেয়ে নীরুদি। আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, যা বলছি সব সত্যি। তিন সত্যি।

— তার মানে তুমি এতটা পাল্টে গেছ? আমি বেশ সিরিয়াস গলা করে বললাম।

— নিজে নিজে কি আর পাল্টেছি? দার্শনিকসুলভ ভঙ্গীতে বলল নয়নচাঁদ, চোখে আঙ্গুল দিয়ে একজন দেখিয়ে দিল, এভাবে চলটা ঠিক নয়। এতে ধ্বংস হয়ে যাব।

— একজন? আমি সত্যি অবাক হলাম, কে সে?

— তিনি তো মানুষ নন। নয়নচাঁদ কপালে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল, মানুষের বেশধারী সাক্ষাৎ ভগবান।

— কে তিনি? বুঝতে পারলাম আমার নিজের মধ্যে কৌতূহল এবং তার জন্য অদ্ভুত এক অস্থিরতা, তাঁর নামটা বলবে তো?

— নাম জানি না, নীরুদি। নয়নচাঁদ ঘাড় দোলাল, সবাই তাকে বাবু বলে ডাকে। আমিও তাই বলি। একটু থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল, এখনও ধরতে পারছেন না? বাবু! বলে হঠাৎ গলাটাকে নামিয়ে বলল, পুলিশের হেনস্থা থেকে যিনি আপনাকে রক্ষে করলেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা জি.টি.রোডের কাছ বরাবর চলে এসেছি। দুরন্ত বাস লরির সোঁ সোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মোড়ের মাথায় গ্যারেজে দুমদুম শব্দে হাতুড়ি পিটছে। লক্ষ্মণদা চিল চীৎকার করে তার চায়ের দোকানের কর্মচারীটিকে 'ছুঁচো' 'ছুঁচো' বলে ডাকছে।

শব্দের এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও আমার কানে নয়নচাঁদের ঢিমে লয়ে বলা কথাগুলো সবচেয়ে তীব্র হয়ে বিঁধছে। পুলিস আমায় নাস্তানাবুদ করতে পারত, পারেনি স্রেফ একজনের প্রবল প্রভাবের কাছে হার মেনে।

এ খবরটা এত দূর চাউর হয়ে গেছে! নয়নচাঁদ অব্দি জেনে গেছে, নিজেকে আমি নিজে রক্ষা করতে পারি না! অন্য কেউ এসে হেনস্থার হাত থেকে আমাকে বাঁচায়!

ছোট একটা ডোবার পাড়ে এক টুকরো জমিতে নয়নচাঁদ রিক্সাটিকে রেখে জামার পকেট হাতড়ে বিড়ি বার করল। জি.টি.রোডে উঠে রিক্সায় চড়ে বসবার আগের প্রস্তুতি। তারপরেও কিছুটা পথ আমাকে যেতে হবে। একা। রোজই যাই। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে বাকী পথটুকুও নয়নচাঁদ যদি আমার সঙ্গী হোত! দেশলাই জ্বেলে দু হাতের করতলে নয়নচাঁদ আগুনটাকে আড়াল করল। আগুনের ফিকে লালচে আভায় তার মুখটা চকচক করছে। বিড়িতে টান দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়ল। অল্প সময়ের জন্য চোখ বুজে কী যেন ভাবল। তারপর ঘাড় দুলিয়ে হাসল, নীরুদি, বাবু কিন্তু যে সে মানুষ নয়। মোটা গুঁড়িওলা গাছ। চতুর্দিকে ডালপালা ছইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি লক্ষ্য করলাম নয়নচাঁদের বলার মধ্যে শুধু মুগ্ধতা নেই। তার সঙ্গে জোরালো বিশ্বাসও আছে। তার চেয়েও অবাক হলাম, মাত্র এই কিছুদিনে ও এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে শিখল কেমন করে! আর ওর বাবুর বিষয়ে আমিও যে বেশ কৌতূহলী, কে, কী বৃত্তান্ত জানতে আগ্রহী, এ ব্যাপারটা আন্দাজ করল কেমন করে!

— আচ্ছা নয়ন? আমি বললাম, তুমি কেমন করে জানলে তোমাদের বাবুই আমাকে পুলিশের ঝামেলা থেকে রক্ষা করেছে? একটু থেমে বললাম, তোমাদের বাবু নিশ্চয়ই লোক ডেকে ডেকে এই গল্প শোনাচ্ছে?

— ইস্-স্ ...! নয়নচাঁদ লম্বা করে আওয়াজ করল, বাবু অমন ধারার মানুষই নন। মানুষের উপকার করে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা ওনার ধাতে নেই। বাবু বলে, মানুষের উবগার করবি। কিন্তু তার ফিরতি চাইবি না। বুক বাজিয়ে বলবি না। তাতে কাজের ধার কমে যায়। এমনকি আয়ুও কমে যায়।

নয়নচাঁদের গলার স্বরে কেমন যেন ঘোর লেগেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে অথচ চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে টপকে অনেক দূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। নয়নচাঁদ যেন আলগাভাবে মাটিতে পা দুটি রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু জোরে বাতাস বইলে বা কেউ সামান্য ঠেলা দিলেই টুপ করে পড়ে যাবে। বাবুর কথা বলতে গিয়ে নয়নচাঁদ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়েছে। নয়নচাঁদের এই প্রায় বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থাটা

খাঁটি নাকি কৃত্রিম এটা পরখ করার জন্যই গলাটাকে সামান্য চড়িয়ে বললাম, তোমার বাবু থাকেন কোথায়? করেন কী?

—মা যখন যেখানে রাখেন, সে গরীবের কুঁড়েঘর বা বড়লোকের রাজপ্রাসাদ, যেদিন যেমন কপালে জোটে।

বুঝলাম আমার প্রশ্ন নয়নচাঁদের কানে পৌঁচেছে।

—আর কী করেন? বলে নয়নচাঁদ চোখ বন্ধ করে ঘাড় দোলাল, এটি বড় কঠিন প্রশ্ন। একটু চুপ করে বলল, কাজকম্মের কথা বলতে পারব না, নীরুদি। তবে যে কোন মানুষের বিপদের কথা কানে এলেই, পড়ি কি মরি করে দৌড়োন। এই যেমন আপনার ব্যাপারটা ...।

—চুপ কর তো। আমি অপেক্ষাকৃত জোরে বিরক্তিভরা গলায় বললাম, তোমার বাবু না এলেও, অন্য কেউ এসে আমায় রক্ষা করত।

—অই তো! নয়নচাঁদ বিদ্রূপের সুরে বলল, এখন বলছেন ভরা পুকুর থেকে তুললি কেন? জল শুকোলে উঠতাম।

নয়নচাঁদের এমন জোরালো যুক্তির সামনে বেশ দিশেহারা বোধ করলাম। মনে হল, সত্যি তো, সেদিন ভদ্রলোকের পরিবর্তে অন্য কেউ নাও আসতে পারতেন! আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই, কোন একজন এলেন, কিন্তু পুলিশ অফিসারটি তাঁর কথা মানতেনই, এমন গ্যারান্টি কোথায়? সর্বোপরি আমি যখন কোন একজনের উপকার নিয়েছি, তাঁর দ্বারা আমার নিরাপত্তা রক্ষিত হয়েছে, লোকলজ্জার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তখন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে আমার তো কোনরকম মানসিক জটিলতা থাকা উচিত নয়। আসলে নয়নচাঁদের মতো একজন মানুষ, যাকে শিক্ষা দেবার জন্য, শায়েস্তা করব বলে ছুটে গেছিলাম, সে কিনা আমার অসহায়ত্বের, ক্ষমতাহীনতার উল্লেখ করে পরোক্ষে হয়ত একটু মজাই পাচ্ছে, এ ব্যাপারটি কিছুতেই মানতে পারছি না। নিজের মনেই বললাম, স্বল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্তের এ এক অদ্ভুত ইগো এবং অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানবোধ। যা ভাঙ্গে কিন্তু কিছুতেই মচকাতে চায় না। নয়নচাঁদের জায়গায় লেখাপড়া জানা অন্য কোন একজন থাকলে, সে আমার রেগে যাওয়ার কারণটা ধরতে পারত এবং তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমার অহংকারটুকু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত। অর্থাৎ নিজেকে আমি যতই অন্য সহকর্মীদের চেয়ে ভিন্ন ভাবি না কেন, মিডিল ক্লাস ভাইসেস এখনও আমার মধ্যে রয়েছে।

অয়ন প্রায়ই বলত মানুষের ধারাবাহিকতা তার রক্তে। এর সমর্থনে অয়ন জিনের

প্রভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করত। আমার কিন্তু মনে হয়, সংস্কারের ধারাবাহিকতা আমরা চট করে কাটিয়ে উঠতে পারি না। শ্রেণীসুলভ অহংকার, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতার নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না এবং এর কারণ বংশানুক্রমিক রক্তের ধারবাহিকতা হতে পারে না। এর মূলে রয়েছে আমাদের শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক গঠন আর তার সঙ্গে অসম অর্থনৈতিক বন্টন। সমাজের একেবারে উঁচুতলায় এবং সর্বনিম্ন শ্রেণীতে যে মানুষগুলি রয়েছে, তারা কিন্তু সামাজিক বহু সমস্যাকেই ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। আর আমরা মধ্যবিত্তরা, যারা এই দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছি, আবেগ বিষাদ, ন্যায় অন্যায়ের পাপপূণ্যবোধ, জিতে যাওয়া হেরে যাওয়ার আনন্দ, লজ্জা এইসব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লষণ করি। ইচ্ছেকে আড়াল করতে গিয়ে নিজেকে অবদমিত করি। সত্যকে স্বীকার করতে আমাদের ইগোতে লাগে বলে, মিথ্যে কারণ, অসার বুদ্ধি নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে ছলনা করি। মনে মনে যাই ভাবি না কেন, নয়নচাঁদের মতো বাবুর সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমি পারব না। বাবুর ক্ষমতা বা পরিচিতির কথা বলতে গিয়ে নিজের অক্ষমতাকে ভুলেও স্বীকার করব না।

বাবু সম্পর্কে নয়নচাঁদের এই মুগ্ধতার কারণ নয়নচাঁদের অজ্ঞতা। ব্যাপারটা নয়নচাঁদকে বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত জরুরী।

বললাম, তুমি তো বেশ সুন্দরভাবে কথা বলতে শিখেছ নয়ন। এ সবই কি তোমার বাবুর কৃপায়? একটু থেমে বললাম, যে কথাগুলো আমায় বললে, তার মানে বোঝ?

আমার প্রশ্নে নয়নচাঁদ ঘাবড়ে গেল। তার চোখমুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ক্ষমা চাওয়ার মতো করে দুহাত জড়ো করে বলল, বেফাঁস কিছু বলে থাকলে মাপ করে দেবেন নীরুদি। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কী বলতে কী বলে ফেলেছি!

— না, না। আমি ঘাড় নাড়ালাম, বেফাঁস কিছু বলোনি তুমি। সেইজন্যেই সন্দেহ হচ্ছে। কথাগুলো নিজের থেকে বললে, নাকি কারোর শেখানো বুলি আওড়ালে?

— কারোর মানে? নয়নচাঁদ আমার মুখের দিকে চাইল।

— এখন তো অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের সঙ্গে তোমার ওঠাবসা! আমি ব্যঙ্গের সুরে বললাম।

— কী যে বলেন! নয়নচাঁদ লাজুকভাবে হাসল, সে লোকের সিকি ভাগও যদি নিতে পারতাম! তবে হ্যাঁ, ওই যে বললেন না 'ওঠবোস', বজ্জাত আর সাধুর মধ্যে তো তফাৎ থাকবেই নীরুদি। যেমন খাবেন তেমন ঢেঁকুর উঠবে।

— তাহলে এখন তোমার মেলামেশা সৎ সাধু প্রকৃতির লোকের সঙ্গে, তাই তো?

আচ্ছা নয়ন! আমি যেন জানতে সত্যি উৎসাহী, তোমার পুরনো বন্ধুবান্ধবরা তোমার ওপর রাগ করে না? জানতে চায় না, কেন তুমি তাদের সঙ্গে মদের ঠেকে যাও না বা আগে যা যা করতে তেমন কিছু করো না।

— সত্যি বলছি নীরুদি, নয়নচাঁদ হঠাৎ করে গলাটাকে এমন নীচে নামিয়ে আনল যেন কোন গোপন কথা বলছে, বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই রাতারাতি সব ভোলচাল পাল্টে গেল। পুরনো বন্ধুরা রাগ করে কিনা জানি না, তবে এখনও মাঝেমাঝে ডাকেটাকে। এপাশ ওপাশ দু-চারটে কথাবার্তাও বলে। আমি ওসব গায়ে মাখি না। বাবু আমায়ে শিখিয়ে দিয়েছে, পানকৌড়ি পাখির মতো গায়ে জল লাগলে, ডানা ঝাপটালেই জল ঝরে যাবে। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি যদি গায়ে না মাখি, একঘেয়ে খারাপ কথা বলতে বলতে আপনিই ওরা থেমে যাবে। তাই না, নীরুদি?

বিভূতিভূষণ বনফুল তারাশংকরের গল্পে কিছু মানুষের আশ্চর্য রকম পরিবর্তনের কথা পড়েছি। কিন্তু গল্পের সেইসব চরিত্রগুলি একগুঁয়ে জেদে আপন প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে একটা পর্যায়ে উন্নীত করেছে। নয়নচাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়। শুধুমাত্র একজন মানুষের সান্নিধ্যে নয়নচাঁদের মৌলিক সত্তাগুলির পরিবর্তন হয়েছে। এমনটা যে হয় না বা হতে পারে না, তা নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন একজনকেও দেখিনি বা কারোর মুখে শুনিওনি, যেমন এখন এই মুহূর্তে নয়নচাঁদকে দেখছি। তার কথাবার্তা শুনছি। তবে কি 'বাবু' লোকটি, যাকে বলে জায়েন্ট পার্সোনালিটি, তেমন কিছুর অধিকারী? একটি শক্তিশালী চুম্বক বা বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি যন্ত্র যেমন আপন ক্ষমতায় কাছে টানতে পারে বা অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় পৃথিবীর চেয়েও ভারি কোন বস্তুকে ইচ্ছেমত তুলতে পারে, ঘোরাতে পারে, বাবু মানুষটিও কি ঐ চুম্বক বা যন্ত্রের মতো নিজের অনুকূলে, নিজের মতো করে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারেন! নয়নচাঁদ যা বলছে তার শতকরা তিরিশ ভাগ সত্যি হলেও স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রলোককে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বরং নয়নচাঁদের মতো আরও কিছু বিপথগামী চেতনাহীন মানুষকে যদি সুস্থ জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে, আমার ব্যক্তিগত ধারণায় ভদ্রলোক একজন বড় মাপের মানুষ। হয় আত্মপরিচয় গোপন করে আছেন বা প্রচারবিমুখ এবং অন্তর্মুখী।

— বাবুর সঙ্গে বুঝি তোমার রোজ দেখা হয়? আমি জানতে চাইলাম।

নয়নচাঁদ ঘাড় নেড়ে হাসল, না, নীরুদি। অমন মানুষের রোজ দেখা পাওয়া কি কম সৌভাগ্যির কথা!

— তুমি তো জানো, তোমার বাবু কোথায় থাকেন। সেখানে গেলেই পার।

— তাই যদি জানতাম। নয়নচাঁদ লম্বা করে শ্বাস ফেলল, তাহলে তো সেখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম।

আমার মনে হল নয়নচাঁদ সত্যি কথা বলছে না। হয় ও নিজেও সঠিকভাবে জানে না। তা না হলে ওর বাবুর নিষেধ আছে এ ব্যাপারে।

— আমি তো জানি, বাস স্ট্যান্ডের কাছে একজন বাজারী মেয়েমানুষের ঘরে ...!

— এ কী বলেছেন নীরুদি? বিস্ময় আর উত্তেজনায় নয়নচাঁদের দু চোখ জগন্নাথ ঠাকুরের মতো দেখাচ্ছে গোল ড্যাবডেবে, সুরিয়া হল গেয়ে বাবুর সাধনসঙ্গিনী, আমার মতো, সুরিয়ার মতো নষ্ট পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যেই তো বাবু এসেছেন। একটু থেমে বলল, সুরিয়া আর আগের মতো নেই নীরুদি। মদবেচা বন্ধ করে দিয়েছে। আনসান লোক ওর ঘরে ঢুকতে পারে না। বিশ্বাস না হয়, খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

কোন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখা ভাল। যেমন অয়নের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি আমি আস্থাশীল। কিন্তু এর পিছনে যুক্তিসম্মত কারণ থাকবে তো! পরিবর্তে কোন চতুর ধূর্ত মানুষ, বোকা বিচার-অক্ষম কিছু মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবে কেবলমাত্র চালাকি আর বুজরুকির দ্বারা, এটা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে, নয়নচাঁদের এমন গদগদ ভক্তি তর্পণ তার কাছে অবিশ্বাস্য অসহ্য মনে হলেও সে হয়ত চুপ করে থাকত, বাজে বিতর্কে জড়িয়ে লাভ নেই এইরকম কিছু ভেবে। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরণের অবস্থার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হয়। অন্যায় অসহ্য মনে হলে আমি প্রতিবাদ করি। চুপ করে থাকলে নিজেকে সুবিধাবাদী আপোষপন্থী মনে হয়।

— নয়ন? আমি ওর মুখের দিকে সোজা চোখে তাকালাম, তুমি আমায় যতই বোঝাও না কেন, আমি কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করছি না! যাচাই না করেই বলছি, সুরিয়া আগের মতোই আছে। মদও বেচে। দেহও বেচে।

এরপরে যা ঘটল তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। নয়নচাঁদ প্রথমে কড়া চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল অল্পক্ষণ। আমার কথায় সে যে খুব রেগে গেছে বুঝতে পারলাম তার স্ফীত নাসারন্ধ্র এবং শক্ত চোয়াল দেখে। শ্বাস ফেলছে ভোঁস ভোঁস আওয়াজ করে। আমার মনে হল সুরিয়া সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করায় সে যত না ক্ষুব্ধ হয়েছে, 'তোমার সব কথা বিশ্বাস করছি না', এটা শুনে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সে তো বলছিল তার বাবুর সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবে আমি বিশ্বাস করছি না মানে, পরোক্ষে তার বাবুর কীর্তি মহিমাকে অস্বীকার করছি। আমার এ ধারণাটা নয়নচাঁদ কিছুতেই মানতে পারছে না।

কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক হলে এইরকম অবস্থায় হয় যুক্তি তর্কের দ্বারা বিপক্ষকে হার মানাতে চেষ্টা করত। আর তা না হলে এমন ক্ষেত্রে আমি যা করি, করে থাকি, সেও তাই করত। আলোচনা থামিয়ে দিয়ে এমন বিনয়ের সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেত যে, অন্যজনের বুঝতে অসুবিধে হোত না, আমি যেটা করলাম, সেটা মূলত সৌজন্যের মোড়কে ভরা বিদ্রূপের একটি আস্ত গোলা।

নয়নচাঁদের মতো মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল, রাগ দুঃখ আবেগের তাৎক্ষণিক স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। নয়নচাঁদ রাগত গলায় বলল, নীরুদি আপনি যা বললেন, তা কিন্তু ন্যায্য কথা নয়। আপনারা লেখাপড়া জানেন বলেই, চোখের পলকে গিরগিটির মতো রং বদলে ফেলতে পারেন। আর আমার কিম্বা সুরিয়ার মতো রিক্সাওলা রেণ্ডী মানুষ যে বদলে যেতে পারে, এটা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। আমার ঘাট হয়েছে, আপনার সঙ্গে এতো কথা বলতে যাওয়া। আপনাকে এতবড় বিপদের হাত থেকে যিনি বাঁচালেন, আপনি তাঁর সঙ্গে বেইমানি করলেন। জানবেন ভগবানের খাতায় সব লেখা হয়ে যায়। এর ফল ভোগ আপনাকে করতেই হবে। বাবুর মতো দু-চারজন ভাল লোক আছে বলেই চন্দ সূয্যি নিয়ম করে ওঠে। নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে।

কথা শেষ করেই নয়নচাঁদ রিক্সার সিটে চেপে বসল। আমাকে 'যাচ্ছি' বা 'আসছি', অন্যসময় যেমন বলে, তার কিছুই বলল না। বার দুই রিক্সার ঘণ্টি বাজিয়ে, শনশন শব্দ করে রিক্সাটি নিয়ে সামনের বড় রাস্তার দিতে এগিয়ে গেল। আমি নয়নচাঁদকে ডাকলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম। নয়নচাঁদ ভুলেও পিছন ফিরে তাকাল না। এত জোরে রিক্সাটাকে চালাল যে চক্ষের নিমেষে সেটা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তার মানে আমি ডাকলেই যে থেমে দাঁড়াত বা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে পিছিয়ে ফিরে আসত, মনে হয় এ দুটির কোনটিই ঘটত না। অশিক্ষিত বিচার বিবেচনাহীন মানুদের এই এক রোগ! এরা যেটা করব মনে করে, সেটা করবেই। একবারের জন্যেও ভেবে দেখবে না, এর কোন বিরূপ ফল হতে পারে কিনা! বা অন্য কেউ সাবধান করে দিলে, ভুল ধরিয়ে দিলেও, এরা সেটাকে কিছুতেই স্বীকার করবে না। উল্টে তাকে শত্রু ভেবে নিতে এরা এক মুহূর্ত দেরী করে না।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। দিনের আলো যেন কত কিছু শুষে নিয়ে যাচ্ছে। গাছের পাতার রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে। পুকুরের জলে গাছেদের ছায়া, পুকুর পাড়ের বাড়িগুলির প্রতিবিম্ব অল্প অল্প কাঁপছে এবং আবছা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। পাখিগুলি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে না। যেন শববাহকের

দল। এমনি নিশ্চুপ তাদের উড়ে যাওয়া। শেষ বিকেলের একটি নিজস্ব আলো আছে। এই আলোয় নাকি অসুন্দরকে সুন্দর দেখায়। এক দৃষ্টিতে এই আলোর দিকে চাইলে, আবেগানন্দে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

আমার কিন্তু এ জাতীয় কোন অনুভূতি হচ্ছে না। পরিবর্তে নিজেকে একজন পরাজিত ক্লান্ত সৈনিকের মতো লাগছে।

বাড়ি ফিরে এলাম। মা প্রতিদিনের মতো অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে আছে। বৈঠকখানায় অনু আর তার দুই সহপাঠী, তাদের মধ্যে অনুরই বয়সী একটি ছেলে এবং এর আগে এই ছেলেটিকে আমি কোনদিন দেখিনি। তিনজনে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা করছে। তবে তিনজনেই এত উঁচু গলায় কথা বলছে যে, যে কেউ শুনলে ভাববে তিনজনে ঝগড়া করছে। অনু আমায় ডাকল, দিদি একবার শোনো।

আমি ঘরে ঢোকামাত্র ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। অনু মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, কৌশিক তুই উঠে দাঁড়ালি কেন? তুই তো দিদির ছাত্র নোস। এটা বৈঠকখানা, ক্লাসরুম নয়। কৌশিক নামের ছেলেটি লজ্জা পেয়েছে। জড়ানো গলায় বলল, না মানে, আমি জানি এটা বৈঠকখানা। আসলে দিদির সঙ্গে আমার আজই তো প্রথম আলাপ! আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে? তুমি বোস।

কৌশিকের সৌজন্যবোধটুকু আমায় বেশ আরাম দিল। বিশ্বায়ন, উদার খোলামেলা হওয়া, এইসবের স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলতে বসেছি। শাখাপ্রশাখা সবুজ পাতায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আছি। কিন্তু আমাদের শিকড় কমজোরী হয়ে পড়েছে। আমার প্রায়শই মনে হয় অতি আধুনিক হতে গিয়ে আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারছি না। কেমন মুণ্ডবিহীন কবন্ধের মতো হয়ে যাচ্ছি আমরা।

সতেরো

অনু আলাপ করিয়ে দিল, কৌশিক তার সহপাঠী। ওরা যে ছোট সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করে প্রতি সপ্তাহে, তার সম্পাদকীয়টি 'ভাবনা' এই নাম দিয়ে কৌশিকই লেখে। কৌশিক বেশ পয়সাওলা ঘরের ছেলে। ওদের তিন পুরুষের তামাক পাতার ব্যবসা। ওদের বংশে ওই প্রথম কলেজে পড়ছে। অনু যেভাবে বলল, তাতে কৌশিক উন্নাসিকের মতো ব্যবহার করলেও আমি অবাক হতাম না। কিন্তু যেটুকু সময় আমি ওদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বললাম, তাতে কৌশিককে বিনীত লাজুক এবং স্বল্পভাষী বলে মনে হল।

শরীরের ক্লান্তির চেয়েও মানসিক অবসাদে আমার মাথাটা ভারি ভারি লাগছিল। অনুর সহপাঠীদের বললাম, তোমরা বসে গল্প কর। আমি চা করে আনি।

কৌশিক ব্যস্ত গলায় বলল, সে কি? আপনি চা তৈরী করবেন কেন? সারাদিন স্কুল করে এসে ....! আপনি বরং বিশ্রাম নিন। আমরা পথে কোন দোকানে চা খেয়ে নোব।

আশ্চর্য, অনু কৌশিককে অদ্ভুতভাবে সমর্থন করল, সেই ভালো। পোশাক বদলে মুখ হাত ধুয়ে চা করতে তোমার অনেক দেরী হবে। আমরা বরং গলির মুখের দোকানে ...।

ওরা তিনজনে উঠে দাঁড়াল। অনু বলল, তুমি বরং দরজাটা দিয়ে যাও। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।

গল্প করতে করতে ওরা তিনজনে বেরিয়ে গেল। বাগানের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। অনুর ব্যবহারে আমি বেশ অবাক হলাম। সহপাঠীদের চা করে খাওয়ানোর মতো পরিশ্রমটুকুও করতে রাজী নয়। কৌশিক নিষেধ না করলে, অনু হয়ত আমার চা করার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত। চেয়ারে বসে বসেই আমায় ফরমাশ করত, অমুক বিস্কুট নয়, অমুকটা আনো। বা মিষ্টি কম লাগছে। চিনির কৌটো আর একটা চামচে নিয়ে এস, প্লীজ।

মায়ের ঘরের দরজাটা টানা মাত্রই মা দু হাতে মুখ ঢাকল।

জানি, এটা মায়ের অসুখ। তবু ধমকের সুরে বললাম, মুখ থেকে হাত নামাও। মা ওই অবস্থাতেই ঘাড় নাড়ল, না।

এইসব মুহূর্তে মাকে বাচ্চা মেয়ের মতো লাগে। আলোকে ভয় পাওয়াও একটা রোগ! ভাবলে কেমন অবাক লাগে! আমি জানি আমি যতই ধমকাই বা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে নরম করে বলি না কেন, মা কিছুতেই চোখ থেকে হাত সরাবে না। জোর করে হাত টেনে নামিয়ে দিলেও বন্ধ চোখের পাতা খুলবে না। বাধ্য হয়েই আমি ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। তারপর মায়ের গা ঘেঁসে বসে মায়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম, মা, তুমি দুপুরে ঠিক সময়ে খেয়েছিলে?

— হুঁ। অস্ফুটে সাড়া দিল মা।

— ঘুমিয়েছিলে?

এবার মা সাড়া দিল না। মাথা নেড়ে জানাল, না।

আমি জানি, একমাত্র রাতের বেলায় ম্যাজিটল ফোর হান্ড্রেড ট্যাবলেটটি খাওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মা ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ভোর রাত থেকে জেগে থাকে। সারাদিনে দু চোখের পাতা এক করে না। অথচ পাশ ফিরে শুয়ে আছে চব্বিশ ঘণ্টা। নিয়মিত স্নান

করে না। সময়ে খায় না। এমনকি ট্যাবলেট এবং জলের গ্লাস এগিয়ে না দিলে, নিজে থেকে চেয়ে ওষুধ খায় না। কখনও কখনও এমনও দেখেছি ট্যাবলেটটা হাতে ধরে চুপ করে বসে আছে। বা ট্যাবলেটের ছেঁড়া স্ট্রীপ ঘরের মেঝেতে। মা কিন্তু স্ট্রীপ থেকে খুলে খাওয়ার পরিবর্তে জানলা দিয়ে ট্যাবলেট ফেলে গিয়েছে। জানলার নীচে সবুজ ঘাসের মধ্যে সাদা ট্যাবলেট পড়ে থাকতে দেখেছি। কুড়িয়ে এনে মাকে দেখিয়েছি। মৃদু বকাঝকা করেছি। মা নির্বিকার। যেন আমার কথাগুলো মায়ের কানেই পৌঁছচ্ছে না। পৌঁছালেও মা সে কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

মা বরাবরই চুপচাপ। কম কথার মানুষ। বাবা বেঁচে ছিলেন যদ্দিন, মাকে দেখেছি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মুখ বুজে সংসারের কাজ করে যেত। স্বামী ছেলে মেয়ে কারোর সঙ্গেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলত না। এমনকি মা আমাদের ভাইবোনদের কোনদিন বকাঝকা করেনি। বাবার সঙ্গেও মায়ের ঝগড়া তর্ক দেখিনি কোনদিন। মাকে কখনোই মনে হোত না, এই পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কোন মতামত নেই, জিজ্ঞাসা নেই, রাগ অভিযোগ এসবও নেই। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী যেমন তার কাজটুকু করার বাইরে, অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামায় না, আমাদের সংসারে মায়ের ভূমিকাটাও ওইরকম গোছের। বাবা মারা যাওয়ার পর কী যে হল, মা যেন সংসারে থেকেও না থাকার মতো একটা অবস্থায় চলে গেল। কাজকর্ম প্রায় বন্ধই করে দিল। প্রথম প্রথম দিনরাত চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকত। আমার মনে হয়েছিল, বাবার হঠাৎ মারা যাওয়ার ধাক্কাটা মা কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না। অন্তর্মুখী মানুষ। ফলে এর ওর সঙ্গে কথা বলে বা অঝোরে কান্নাকাটি করে নিজেকে হালকা করতে না পারার জন্যই মা ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে। ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই ক্লান্তি এবং অবসাদে মা চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর আকাশ পাতাল ভাবে। আস্তে আস্তে মায়ের মধ্যে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। যেমন খিদে কমে যাওয়া। ঘুম না হওয়া। নিয়মিত স্নান না করা এবং শেষমেশ যে কোন ব্যাপারে, তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন, অমানুষিক ভয় পাওয়া। যে কোন ঘটনাকে নেগেটিভ দিক দিয়ে দেখা। ভয় মাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায় এল, যখন আলোকেও ভয় পেতে লাগল।

মায়ের মুখোমুখি হতে ইদানীং আমার মধ্যে অপরাধবোধ জাগে। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। অনু এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। সর্বোপরি আমার মতো ওদের কারোরই কোন বাঁধাধরা রোজগার নেই। বাবার অবর্তমানে আমি হয়ে গেলাম সংসারের গার্জেন। এখন প্রায়ই ভাবি মায়ের

অসংগতিগুলো লক্ষ্য করার পর আমারই বোঝা উচিত ছিল মা মানসিক রুগী হয়ে পড়েছে। তখনই যদি মাকে কোন সাইক্রিয়াটিস্ট বা নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে যেতাম, তাহলে মা হয়ত সম্পূর্ণ না হলেও, কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত। মায়ের কথা ভেবে প্রায়ই বিবেকের যন্ত্রণা হয় আমার। মাকে যখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও মায়ের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। রাতের বেলায় কিছু ঘন্টার জন্যে হলেও ঘুম হয়। ডাক্তার না দেখালে মা হয়ত কবেই আত্মহত্যা করত। বা ভীষণরকম ভায়োলেন্ট হয়ে উঠত। তাতে মাকে নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা আরও বাড়ত। কখন কী করে বসে! এ তবু নিজের ঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকছে এবং নির্জীবের মতো চুপচাপ শুয়ে রয়েছে।

— চল না মা! আমি বললাম, দু চারদিনের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

— তুই যা না! মা বেশ সহজভাবেই জবাব দিল।

— আমার একা যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। তোমাকে কে দেখবে বল? মা ইশারায় ওপর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল। অর্থাৎ ঈশ্বর দেখবেন।

— সে তো নিশ্চয়ই। আমরা সবাই তাঁর ছায়ায় রয়েছি। কিন্তু এই যে প্রতিদিন নিয়ম করে তোমায় ওষুধ খাওয়ানো, সে কম্মটি তো ঈশ্বর করবেন না।

মায়ের গোমরানো মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল, তা বলে জানবি তুই-ও করছিস না। তোকে দিয়ে তিনিই করাচ্ছেন। কোন কাজটা কে করবে, কার জন্যে করবে, সব তাঁর হিসেব করা আছে।

— দারুণ! আমি আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরলাম, তুমি ঠিক বলেছ।

মায়ের কথার বিরোধীতা করব না বলেই আমি আমার বিশ্বাসের বাইরে গিয়েও মায়ের কথা মেনে নিলাম। কতদিন পরে আজ মা কথা বলছে। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলছে। তার মানে প্রতিদিন মাকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গ দিলে, মা হয়ত খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আমার মনে পড়ে গেল, প্রথম যে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে মাকে নিয়ে যাই, তিনি সেকেলে ডিগ্রিধারী বয়স্ক একজন মানুষ। সব শুনেটুনে বলেছিলেন, এ জাতীয় রুগীদের সারা জীবন ওষুধ খেতে হয়। যদিও শুনি ছোকরা সাইক্রিয়াটিস্টরা বলে নিয়মিত কিছুদিন ওধুষ খেলে রোগটা নাকি নির্মূল হয়ে যায়। সম্পূর্ণ বাজে কথা। ওষুধ খেলে কম থাকবে। এই অব্দি! সম্পূর্ণ সুস্থ কোনদিনই হবে না। বুঝলে? বলে বৃদ্ধ ডাক্তার আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন নিজেই একজন রুগী এমনি হতাশ গলায় বলেছিলেন, ওষুধই যদি সব হোত, তাহলে শুশ্রূষা শব্দটা অবসোলিট হয়ে যেত। একটু বন্ধুত্ব, প্রতিদিন একজন

প্রিয় মানুষের সঙ্গ, এসব পেলে এ জাতীয় রুগীরা অনেক সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। সেক্ষেত্রে সাহস করে আমরাও ওষুধটির ডোজ কমিয়ে দিতে পারি।

মনে মনে ভেবেছিলাম, রোজ স্কুল থেকে ফিরে মাকে নিয়ে বাগানে একটু পায়চারি করব। পাঁচরকম গল্প করব। দু চারদিন যে এরকম করিনি তা নয়। তারপর আপনিই যে ব্যাপারটা সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়লাম। এটা সেটা এর তার ভাবনা ভাবতে গিয়ে, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, নিজের মায়ের প্রতি কম যত্নবান হয়ে পড়লাম। আর মা নিজে থেকে যেচে আমায় বলবে, 'বেড়াতে নিয়ে চল বা আয় না বসে গল্প করি', এটা একটা অলীক কল্পনা।

মাকে যে আজ আবার কি ভাল লাগছে!

বললাম, রোজ তো নিয়ম করে পুজোয় বসতে পার। তাতে মন ভাল থাকবে। মা হেসে বলল, তোর চেয়ে ঠাকুর মায়ের প্রতি আমার অনেক বিশ্বাস। ওনারাই তো বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটু চুপ করে থেকে বলল, আমাদের বাড়িতে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, উনি বেশ ভক্ত মানুষ। ওনার সঙ্গে তোর যে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে, আমি সব শুনেছি। আমার বেশ ভাল লাগছিল। লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল মা, ভদ্রলোক কেমন সুন্দর আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। অনেকটা তোর বাবার মতো, নয়?

মায়ের কথা যত শুনছিলাম, তত অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। প্রথমত মা যে এমন সুন্দর পরিশীলিত ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে, সেটা যেন আজই প্রথম আবিষ্কার করলাম। আর বাবার বিষয়ে মায়ের এমন নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যেও সেটা যথাযথ স্মরণে রাখা, এ বিষয়টাও কম আশ্চর্যের নয়।

ভদ্রলোককে তোমার ভাল লেগেছে? বাচ্ছা মেয়েকে আদুরে প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলাম।

— হুঁ-উঁ-উঁ। মা বেশ টেনে লম্বা করে বলল, সিদ্ধার্থকে বলিস না, আর একদিন নিয়ে আসতে।

— বলব। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, তুমি সেদিন সামনে আসবে বল?

— সে দেখা যাবে। মা প্রথমে বলল। তারপর আনমনার মতো বলল, আমি নাই বা এলাম। তুই কথা বলবি। পাশের ঘর থেকে আমি শুনব।

— আর ভদ্রলোক যদি আসতে রাজি না হন?

— তা অবশ্য ঠিক। একটু থেমে বলল, সিদ্ধার্থর কথায় যদি না আসেন, তুই গিয়ে বলবি আমার নাম করে। মনে হয় তখন 'না' করতে পারবেন না।

সিদ্ধার্থ খুব ভুল কিছু বলেনি। চেহারায় আচার আচরণে তো বটেই, কথাবার্তার মধ্যেও ভদ্রলোকের নিজস্ব একটি আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। মা না হয় সেকেলে কম লেখাপড়া জানা মানুষ। সিদ্ধার্থ তো আর তা নয়। সে পড়াশুনা করা একেলে ছেলে। তার ওপর রাজনীতি করে। তার মতো ছেলেকেও ভদ্রলোক সম্মোহিত করেছেন। আমাকেও যে একদম নাড়া দেননি, তা নয়। তবে অনেকে যেমন পারে, ভাল ভাল দু চারটে মন্তব্য শুনে বা দুঃসাহসিক একটি কাজের নিরিখে একজন মানুষকে 'বাঃ', 'অসাধারণ' বলতে, আমি তা পারি না।

বয়স কম ছিল বলেই বোধহয় অয়নের চটকদারি দুর্বোধ্য কথাবার্তা শুনে ওকে সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুতে এবং বেশ এগিয়ে থাকা মানুষ বলে মেনে নিতে আমার মনে কোন প্রশ্ন দ্বিধা বা সংশয় আসেনি। বেশ কিছুদিন মেলামেশার পর একসময় মনে হল, অয়ন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করতে, সোজা ব্যাপারকে অকারণে জটিল করে ব্যাখ্যা করতে ভালবাসে। আসলে এ সবই ওর অন্যের থেকে নিজেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ঝোঁক। ওর নিজের মধ্যে যে অসংখ্য বৈপরীত্য রয়েছে, সে বিষয়ে উল্লেখ করলে ও অসন্তুষ্ট হয়। যেন তেন প্রকারেণভাবে নিজের ঘাটতি, সে কথা কাজের ফারাক বা অযৌক্তিকভাবে অন্যকে হেয় করা যাই হোক না কেন, প্রাণান্তকর হাস্যকর চেষ্টা করে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব কষ্টের ছিল। অয়নের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারতাম না। কিন্তু কেবলই মনে হোত অয়ন এটুকু বোঝে না কেন যে একজন মানুষের সবটাই ভাল, সবদিকেই আলো এটা হতে পারে না। মাঝে মাঝেই আমার মতো করে আমি অয়নের কথার বা কাজের বিরোধিতা করতাম। আর তখন থেকেই একজন মানুষকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করে দেখে তবেই 'ভাল' বা 'খারাপ' বলার প্রবণতা তৈরী হয়েছে।

— তোমার নাম করলেই ভদ্রলোক আসবেন? আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

— মনে হয়। মা জবাব দিল, কথাবার্তা শুনে তো তেমনই মনে হল। কোন অহংকার নেই। মা-বাবাকে দেবতার চেয়েও বড় মনে করেন।

— এসব তো ওনার মনের কথা নাও হতে পারে।

— মিছিমিছি একজন মানুষ মিথ্যে কথা বলবে কেন, বল তো? মা অসহিষ্ণু গলায় বলল।

— মিথ্যে কথা বলছি না। আমি পড়া বোঝানোর মতো করে বললাম, প্রথম আলাপ হলে বড় কথা বলতে অনেকেই ভালবাসেন।

— বড় কথা? মনে হল মা যেন আমার কথা শুনে সত্যি খুব অবাক হয়েছে, বড়কথা বলল কখন? গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা এসব বিষয়ে তো একটা কথাও বলেনি।

— মাই গড! আপন মনেই এই বলে হেসে ফেললাম।

আমায় হঠাৎ হাসতে দেখে মা বেশ রেগে গেল, হাসির কী হল?

— তুমি না! বলে মায়ের চিবুক ধরে নেড়ে দিলাম, গাড়ি বাড়ি রোজগারের কথা বললেই বড় কথা বলা হয়? অযথা জ্ঞান উপদেশ দিলে বা নিজে যেটা মানে না, সেই বিষয়ে জলজ্যান্ত মিথ্যে বললে, সেটাকে বড় কথা বলা যায় না?

— অতশত জানি না বাপু! মা হার স্বীকারের ভঙ্গীতে হাত নাড়ল, আমার ভাল লেগেছে তাই বললাম। একটু থেমে বলল, অনেক দিন পরে ওইদিন রাতে আমি খুব ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নটপ্ন কিছু দেখিনি।

— সত্যি। এবার আমার অবাক হওয়ার পালা, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। ঠিক আছে, তোমার নাম ধরেই সেই ভদ্রলোককে আসার কথা বলা হবে। সিদ্ধার্থর দ্বারা না হলে, আমি নিজে বলব ওনাকে, আমাদের বাড়িতে আসার জন্য।

— হ্যাঁ, তাই বলিস। তোর যেদিন ইস্কুলে ছুটি থাকবে ...। কথা বলতে বলতে মা শুয়ে পড়ল এবং যথারীতি পাশ ফিরে, পা দুটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দেহটাকে ছোট করে নিল। অর্থাৎ মায়ের ঘুম পাচ্ছে। কিম্বা বহু বহুদিন পরে একসঙ্গে এত কথা বলে, ক্লান্ত বোধ করছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি বারান্দায় এলাম।

আকাশে জলভর্তি মেঘ রয়েছে। আবার মেঘের ফাঁক ফোকর দিয়ে চাঁদও দেখা যাচ্ছে। ফলে আমাদের বাগানে আলো আঁধারীর জাফরি তৈরী হয়েছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সামান্য গা শিরশির করছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে বোধহয়। কিম্বা ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলা বছরের আশ্বিন মাস আসতে চলল প্রায়। তার মানে দুর্গাপূজাও আর বেশী দেরী নেই। পুজোর সময় চারপাশে যখন আনন্দের হাট বসে যায়, তখন বাবার কথা বেশী করে মনে পড়ে। অন্ধকার ঘরে মা চুপচাপ শুয়ে থাকে। পুজোর সময় সিদ্ধার্থ অনু দুজনেই ইচ্ছেমতো বাড়ি থেকে বেরোয়, যখন খুশী বাড়ি ঢোকে। চারপাশের আলো শব্দ আনন্দের মাঝে আমাদের বাড়িটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অন্ধকার, চুপচাপ। আমি সেই নিশ্চুপ বাড়িতে মাকে আগলে একা বসে থাকি। বই পড়তে ভাল লাগে না। ভাল লাগে না গান শুনতেও। তখন কথা বলার একজন সঙ্গীর অপেক্ষায় দুকান উৎকর্ণ করে রাখি, ওই বুঝি সদরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া

গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ আসে না। তখন মায়ের মতো আমিও ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে হয় জানলা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি বাগানের দিকে চেয়ে, তা না হলে বিছানায় শুয়ে থাকি।

ভিড় ঠেলে হৈ চৈ করে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার শখ আমার কোনদিনই নেই। তবু পুজোর চারটে দিন বছরের অন্য দিনগুলির তুলনায় একটু অন্যরকম মনে হয়। কাজের ব্যস্ততা নেই। সময়ের হিসেব নেই। চায়ের কাপ হাতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যাও, 'ঘড়িতে কটা বাজল' এই আশঙ্কায় চমকে ওঠার প্রশ্ন নেই। সর্বোপরি যখন যেদিকেই তাকাও না কেন, প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ। রোদ্দুর নরম, গাছগাছালিকে বেশী সবুজ দেখায়, বাতাসও বয় ধীরেসুস্থে। আমি লক্ষ্য করেছি, পুজোর সময় বাতাসে একটা হালকা সুগন্ধ ভাসে। নাক টানলেই টের পাওয়া যায়। আমাদের বাগানের জবা টগর আর শিউলি গাছগুলি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। যেন পাতার চেয়েও ফুল বেশী। ছোট বড় কতরকমের পোকা আর বহু বর্ণ চিত্রিত প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। এ গাছ থেকে ও গাছে ঝুলন্ত দোলনা টাঙায় মাকড়সা। খালি চোখে দেখা যায় না। রোদ পড়লে স্পষ্ট দেখা যায় দোলনার দু প্রান্তে দুটি মাকড়সা। আর একটি শিশু মাকড়সা দোলনায় টালমাটাল দুলতে দুলতে এপাশ ওপাশ যাতায়াত করছে। ঠিক যেন মা বাবার তত্ত্বাবধানে শিশুটি ভবিষ্যতের কঠিন পথ পারাপারের মহড়া দিচ্ছে।

প্রাকৃতিক এই খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোর প্রতি বাবার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তার সঙ্গে ছিল এই আপাত অগ্রাহ্য বিষয়গুলিকে সুন্দর বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। যেমন প্রজাপতি ফুলের ওপর বসে মধু পান করতে করতে যখন নেশায় চুরচুর হয়ে যায়, তখন তার ছড়ানো পাখাদুটি গুটিয়ে আসে। মাথাটা গুঁজরে দেয় ফুলের মধ্যে। আমি দেখেছি, বাবা একজন নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিকের মতো পলকহীন চোখে এইসব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করতেন। সেইসময় বাবাকে ডাকলে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ইশারায় দেখাতেন, চুপ।

নাইট কুইন নামে একটি ফুলগাছের চারা এনে বাবা বাগানে পুঁতেছিলেন। খুব বেশী যত্ন ছাড়াই গাছটি বড় হল। তারপর যখন বোঝা গেল ফুল ফোটার সময় এসেছে, বাবা আমাকে বললেন, একটু সবুর কর। কি চমৎকার ফুল ফুটবে দেখবি!

সেদিন, নাকি তার পরদিনই রাতের বেলায় বাবা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন, মামন, আশ্চর্যকর একটা জিনিস দেখবে এসো।

বাবার হাতে বড় একটা টর্চ। ঘরের দরজা খুলে আমরা বাগানে এলাম। বাবা টর্চ

ফেলেছিলেন মাটির দিকে। আর সেই আলোয় বাবাকে অনুসরণ করছিলাম। একটু ভয় ভয়ও করছিল। রাত তখন কটা কে জানে! বাবাকে বললাম, কোথায় যাচ্ছ? কী দেখাবে?

বাবা খুব নীচু স্বরে বললেন, আস্তে কথা বল। গাছেদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। দেখছো না টর্চের মুখটা মাটির দিকে করে রেখেছি। বাবা আস্তো করে আমার হাতটা ধরলেন। আমার গলা শুনে কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছিলেন, আমি ভয় পেয়েছি। নিঃশব্দে বাবার হাতে ধরে আমি হাঁটলাম পনের বিশ পা। তারপর সেই নাইট কুইন গাছটির কাছে এসে হাতের টর্চটি নিভিয়ে দিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, নাইট কুইন মানে জান তো? রাতের রানী। স্বভাবে লাজুক অথচ ভীষণ আত্মগরিমা। রাতে ফুটে শেষ রাত্রেই শুকিয়ে যায়। এখন এই গোটা বাগানটা এনার দখলে। কাল সকালে তুমি এ ফুলকে আর দেখতে পাবে না। শুধু সারা বাগানময় গন্ধটুকু থেকে যাবে। ওই দেখ! বলে বাবা দক্ষ ম্যাজিসিয়ানের মত বন্ধ টর্চটা জ্বালিয়ে সদ্যফোটা একটি ফুলের ওপর ফেললেন। ধবধবে সাদা, মাঝারি আকার। সদ্যভূমিষ্ট শিশুর মতো ফুলের পাপড়িগুলি যেন খুব মৃদু লয়ে কাঁপছে। টর্চের আলোয় পাপড়িগুলিকে কেমন ভিজে দেখাচ্ছে। মাতৃ জঠরের জল যেন গায়ে লেগে রয়েছে। বাবা স্থির চোখে নাইট কুইনের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মনে হচ্ছে চারপাশ বিস্মৃত হয়ে তিনি কেবল ফুলটিকেই দেখছেন। আমারও খুব অবাক লাগছিল। ফুলটির সম্পর্কে বাবা যে সব কথা বললেন, আমি তার সবটুকুর অর্থ ধরতে পারিনি। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল, এমন সুন্দর গন্ধময় ফুলটা আজ রাতেই শুকিয়ে যাবে! এত অল্প আয়ুষ্কাল হয় কারোর! বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি সত্যি ফুলটা আজ রাতেই শুকিয়ে যাবে? কাল সকালে কিছু বোঝাই যাবে না?

অন্যমনস্কতার জন্য বাবা প্রথমে আমার প্রশ্ন শুনতেই পেলেন না। এবার আমি বাবার হাত ধরে নাড়া দিলাম, বল না! বলে একই প্রশ্ন করলাম। বাবা আমার মাথায় আস্তো করে হাত বুলিয়ে হাসলেন, রাতের রানী! গোপন অভিসারিকা। যাকে তাকে সে তার রূপ সৌন্দর্যই দেখাবেই বা কেন? একটু থেমে বললেন, কাল সকালে ফুলটা থাকবে না কিন্তু তার গন্ধটুকু সারা বাগানময় হেসে খেলে বেড়াবে। গন্ধটুকুই আভিজাত্য। জীবন যৌবন ধন মান হারিয়ে যেতেই পারে। আভিজাত্য হল বনেদীয়ানা। এর একটা আলাদা মূল্য আছে, মামন।

আমি শুনেছি আমার পূর্বপুরুষেরা কেউ-ই ধনী বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না। অহংকার করার মতো পাণ্ডিত্যও ছিল না তাঁদের। শিল্পকলাতেও তাঁদের কোন অবদান ছিল না। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালী যেভাবে জন্মায়, কিছুকাল কিছু বছর বেঁচে থাকে,

সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে এবং তারপরে মারা যায়, আমার পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বাবা। 'ধারাবাহিকতা রক্তে', এই থিয়োরীতে বাবাকে ফেলা যেত না। বাবা বৈষয়িক ছিলেন না। সংসারের কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ ছিল না বাবার মধ্যে। কারোর সম্পর্কে বাবাকে নিন্দা করতে শুনিনি। বাবা ছিলেন আদ্যন্ত কল্পনাবিলাসী, শিল্প অনুরাগী। গাছ ভালবাসতেন। নীল আকাশ ভালবাসতেন। একটানা বৃষ্টির সময়ে বাবাকে দেখেছি সে কী উচ্ছ্বাস! অফিস যাওয়ার প্রশ্ন নেই। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে জীবনানন্দ আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি বাবা মোটেও ভাল করতে পারতেন না। কিন্তু চোখ বুজে হাত পা নেড়ে এমনভাবে আওড়াতেন, আবার আসিব ফিরে/ধানসিড়িটির তীরে/এই বাংলায়/হয়ত মানুষ নয়/হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে — শুনতে শুনতে মনে হোত বাবা হয়ত সত্যি জানেন, মৃত্যুর পরে তিনি আবার মানুষ হয়েই জন্মাবেন এবং এই বাংলাতেই ফিরে আসবেন।

পুজোর চারদিনে বাবা এবং আমার দুজনেরই অফুরন্ত সময়। গাছের গুঁড়ি কেটে বাবা দুটি চেয়ার বানিয়েছিলেন। নিজেই। বাগানে গাছের গুঁড়ির চেয়ারে বসে সারাদিন ধরে বাবা আমাকে অজস্র গল্প শোনাতেন। তার অধিকাংশই আমি বুঝতে পারতাম না। তবু হাঁ করে বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকতাম। সে এক দুর্মোহ টান। আর বাবাও বিস্মৃত হতেন যে যাকে তিনি এত সব বলছেন, সে একজন নিতান্তই কিশোরী। কখনও কখনও জীবনানন্দ বন্ধ করে, বাবার বাবা মানে আমার ঠাকুর্দা বা তাঁর বাবার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প করতেন। গল্প বলছি এই কারণে যে সেগুলির সব কাহিনী সত্যি ছিল না। হয়ত ছিল শতকরা দশ বা বিশ ভাগ। বাকী আশি নব্বই ভাগ বাবা নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন, অনাস্বাদিত ভাললাগা পছন্দ ইত্যাদির দ্বারা ভরাট করে একটি নিটোল গল্প তৈরী করতেন। গল্পের সেইসব চরিত্রগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন তাঁরা নির্জন নদীর ধার বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন। এই অকারণ ভ্রমণে কোন না কোন সময়ে সংসারত্যাগী অবৈষয়িক একজন বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যেত। সেই মানুষটির সংস্পর্শে তাঁদের মনে বিচিত্র প্রশ্নের উদ্ভব হোত। তখন জাগতিক জীবনের বাইরে অন্য বৃহত্তর আর একটি জগতের হাতছানি দেখতে পেতেন। সংসারকে অসার মনে হোত। বিষয়কে মনে হোত বিষ। যদিও তাঁরা সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতে পারেননি, আর তাই ভেতরে ভেতরে প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছেন। পাঁজরে চোট নিয়ে, সংসারে থেকেও না থাকার মতো করে তাঁরা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের রক্তক্ষরণ বাইরে থেকে স্থূল

চোখে কেউ দেখতে পাননি। তাঁদের দীর্ঘশ্বাস কেউ শুনতে পায়নি। এই মারাত্মক অন্তর্বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে তাঁরা অসময়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছেন।

আমি জানি আমার ঠাকুর্দা এবং তাঁর বাবা খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন। ফলে আমার ঠাকুমা বা তাঁর শাশুড়ি উভয়কেই যথেষ্ট কৃচ্ছসাধন করে শিশুসন্তানকে বড় করতে হয়েছে। ন্যূনতম শিক্ষা দিতে হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থটুকু তাঁরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রোজগার করেছেন। ডাল বেটে, বড়ি দিয়ে, ঝাঁটার কাঠি ছুলে বা সম্পন্ন গৃহস্থের গিন্নি-মা'র ফাই ফরমাশ খেটে তাঁদের দিন কেটেছে। সাধারণ বিচারবোধ অনুযায়ী আমার ঠাকুর্দা বা তাঁর বাবার যেমনটি হওয়ার কথা, তাই হয়েছেন। রীতিমত লড়াই করে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সংসার সম্পর্কে অনীহা ভাব জাগা বা আকাশের চাঁদ ধরার মতো অলীক কল্পনা কেবল বেমানান নয়, অবিশ্বাস্যও। আমার বাবাকেও ওইরকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে মানুষ হতে হয়েছে। আমার দুই পিসি লেখাপড়া শিখতে পারেনি এবং তারা দুজনেই নিজেদের পছন্দমতো ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে একরকম বেরিয়েই গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিয়ে থাওয়া হয়নি। আমার দুজন পিসেমশাইয়ের মধ্যে একজন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজের দলের ছেলের হাতেই মার্ডার হয়ে যান। পিসির পেটে তখন মাস চারেকের বাচ্চা। সেই বাচ্ছা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিসির মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয়। বাড়তে বাড়তে সেটা এমন পর্যায়ে যায় যে, একদিন পিসি বাচ্ছাসমেত রেল লাইনে চলন্ত গাড়ির নীচে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় এবং মা ছেলে মুহূর্তে মাংসের দলায় পরিণত হয়। ছোট পিসি থাকে শান্তিপুরে। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। বাবা বেঁচে থাকাকালীন ছোট পিসি তার দুই ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার এসেছিল। এখন শুনতে পাই পিসি রোগভোগে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। দুটি ছেলের একজন ট্রাক ড্রাইভার। অন্যজনের ছোট একটি পান সিগারেটের দোকান আছে, শান্তিপুর স্টেশনের কাছে। রাগ দুঃখ বা অভিমানে যে কোন কারণেই হোক তারা তাদের মামার বাড়ি অর্থাৎ আমাদের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে, এইরকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে, অসহযোগী পরিবেশ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে আমার বাবা মনের দিক দিয়ে এমন ভাবুক, এমন নম্র বিনয়ী এবং কবিস্বভাবের মানুষ হলেন কেমন করে! অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাইসেস এসে হাজির হয়। আমার বাবা নিশ্চয়ই জীবনের কদর্য কুৎসিত সেইসব রূপগুলিও দেখেছেন। তারপরেও তাদেরকে অগ্রাহ্য করার মতো মানসিক গঠন তাঁর তৈরী হোল কেমন করে! –

বাবা যখন এইসব গল্প করতেন, তখন তিনি গল্পের মধ্যে এমন সম্পৃক্ত হয়ে যেতেন যেন তিনি নিজেই সেই চরিত্রটি, যাঁর সম্পর্কে বলছেন। সময় জ্ঞান থাকত না। আমি সবটুকু শুনছি কি শুনছি না সেদিকেও খেয়াল থাকত না। মা হয়ত ডাকল, অনেক বেলা হয়েছে গেল। স্নান খাওয়া করবে কখন? বাবার কানে মায়ের ডাক পৌঁছাতই না। তখন মা বাধ্য হয়ে বাগানে নেমে এসে বেশ কড়া গলায় আমাকে বলত, সব কিছুর একটা সীমা আছে। সেই কোন ভোরে হেঁসেলে ঢুকেছি। তোদের শরীরে কি মায়াদয়া বলতে কিছু নেই?

মায়ের মুখে 'তোদের' শুনে, বাবা বুঝতে পারতেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে আসলে কথাগুলো মা বাবাকেই বলছে। বাবা ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় বিড়বিড় করতেন, সত্যি অনেক বেলা হয়ে গেছে। মামন, তুই তো একটু খেয়াল করিয়ে দিবি।

বাবার চোখমুখের চেহারায়, বলার ভঙ্গীতে অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠত, তুমি কিছু মনে কোর না। মাকে বলতেন, পুরনো দিনের গল্প করতে করতে এমন একটা ঘোর এসে যায়। আর মামনও! বলে আমার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করতেন, এটা ওটা কেন কখন এইসব প্রশ্ন জানতে চায়। ফলে মূল ব্যাপারটা ডালপালা ছড়াতে ছড়াতে...!

— যেমন তুমি! বাবাকে কথা শেষ করতে দিত না মা, তেমনি তোমার মেয়ে। পুজোর সময় কোথায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরবে বেড়াবে, তা না, বিধবা বুড়ির মতো বাড়ির মধ্যে বসে যতসব বাসি বস্তাপচা গল্প শুনে বেলা কাবার করছে!

মায়ের অমন রণংদেহী মূর্তি দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে যেতাম, চোখে জল এসে যেত। মা যেভাবে যে ভাষায় আক্রমণ করত, তাতে বাবার জায়গায় অন্য কোন পুরুষ থাকলে নির্ঘাৎ রাগে ফেটে পড়ত। বাবা ছিলেন অন্যরকম মানুষ। ঝগড়া বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। মায়ের অমন কড়া কথার প্রত্যুত্তরে বড় জোর বলতেন, সবাইকার ইচ্ছে রুচি তো সমান হতে পারে না। বন্ধুদের সঙ্গে অকারণে ঘুরে বেড়াতে মামনের হয়ত ভাল লাগে না।

— তুমি জানলে কেমন করে? মা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ত। সবাইকে নিজের মতো ভাব বুঝি?

'নিজের মতো' বলতে মা কী বলতে চাইত, আমি বুঝতে পারতাম না। বাবাকেও দেখতাম যেন ঘোরতর কোন অন্যায় করে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন, এইরকম ভঙ্গীতে মায়ের কথার প্রতিবাদ না করে আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতেন। টিপিক্যাল সংসারী লোক বাবা নন, এটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এর বাইরে চোখে লাগার

মতো বা কানে শুনে চমকে ওঠার মতো কোন অসংগতি, যা বাবাকে মানায় না, পীড়াদায়ক, লজ্জাজনক, এমন কিছুই আমার চোখে কোনদিন পড়েনি। স্বভাবতই মায়ের ওপর রাগ হোত। যদিও ভয়ে কোন কথা বলতে পারতাম না। আর এটা তো সত্যি, বাবা তো আমায় ধরে বেঁধে জোর করে বসিয়ে গল্প শোনাতেন না। আমার ভাল লাগত বাবার মুখে পুরনো দিনের গল্প শুনতে। সে প্রকৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, কোন কল্পকাহিনী বা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে, যাই হোক না কেন! বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করে পথে পথে ঘুরে ঠাকুর দেখতে বা এর ওর বাড়ি গিয়ে হাবিজাবি মাথামুণ্ডুহীন বিষয়ে আলোচনা করতে আমার কোনকালেই ভাল লাগত না। আমার বান্ধবীদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জামাকাপড়, কসমেটিক, চুল বাঁধার স্টাইল, তাদের কলেজ পড়ুয়া মামাতো পিসতুতো দাদাদের চেহারার বর্ণনা কিম্বা পাশের বাড়িতে ভাড়া আসা নতুন কাকিমার মেধাবী ছেলেটি, আপাতভাবে যাকে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, কিন্তু ফাঁক পেলেই চশমার নীচ দিয়ে আমার বান্ধবীটিকে দেখে। গাছে জল দিতে বারবার পাশের বাড়ির দিকে তাকায়, এইরকম সব একঘেয়ে হালকা কথার কচকচি। তখনও অয়ন আসেনি আমাদের বাড়িতে। তা সত্ত্বেও বান্ধবীদের চেয়ে বাবার সঙ্গ আমার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল। জল মাটি আকাশ গাছপালা তার সঙ্গে পুরনো দিনের গল্প, যার মধ্যে অভাব দারিদ্র্য, আবার তার মধ্যেই টিকে থাকার জন্য, মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য, অদম্য জেদ পরিশ্রম নিষ্ঠা এইসব মিলেমিশে, বহু বর্ণ বিচিত্র ছোট ছোট কোলাজের মতো ছবি এবং স্বপ্ন, আমাকে মুগ্ধ করত। এইসব শুনতে শুনতে বড় হবার, নতুন করে নতুনভাবে কিছু গড়ে তোলার মতো মনের জোর পেতাম। নিজেকে অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী মনে হোত।

তারপর জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো অয়ন এসে ঢুকল যখন আমাদের বাড়িতে, তখন তো বাড়ির বাইরের পৃথিবীটা আমার কাছে অসহ্য গুমোট বলে মনে হতে লাগল। তখন পুজোর চারটে দিন তো দূরের কথা, একান্ত প্রয়োজনে সামাজিকতা রক্ষা করার জন্য একদিনের জন্য বাড়ির বাইরে কাটাতে হবে ভাবলে কান্না পেত। কেবলই মনে হোত অয়ন এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে, আবার সাহস করে আমার সম্পর্কে বাড়ির কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না পেরে, একা একা কিছুক্ষণ এ বই সে বই নাড়াচাড়া করে, অনিশ্চয়তার আশঙ্কা বুকে নিয়ে চুপচাপ ফিরে গেলে, সে বড় অন্যায় হবে। অয়নের মুখোমুখি বসে সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি নামীদামী লেখকদের লেখার চাতুরি, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া, এমনি সব বিষয়ে দুর্বোধ্য অথচ ঘোরলাগা

কথাবার্তা না শুনলে, আমি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হব। এমনকি নিজের অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও অনেকখানি পিছিয়ে পড়ব।

সেই ছোটবেলা থেকেই পুজোর কদিন আমার কাছে নিছক ছুটির দিন বা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের দিন নয়। এ কদিন মুখোমুখি বসিবার দিন। প্রথমে ছিলেন বাবা, তারপর অয়ন। সকাল পার হয়ে দুপুর, গড়িয়ে সন্ধ্যে। পুজোর চারটে পাঁচটা দিন, এক এক বছর মনে হোত আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জল গলে যাওয়ার মতো কেমন অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, আচমকাই পার হয়ে গেল।

আঠারো

একে কী বলব! মায়ের ইচ্ছের জোর? নাকি মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো কাকতালীয় কোন ঘটনা?

ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে বেণুবিনোদ মিশ্র নামে পরিচয় দিয়েছেন, একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি, মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন। ভদ্রলোক বসেছেন কাঠের হাতলওলা চেয়ারে। আর মা তাঁর মুখোমুখি চৌকির ওপর বসে হেসে হেসে গল্প করছে। ভদ্রলোকের হঠাৎ করে আসাটা যেমন বিস্ময়কর, অন্ধকার ঘর ছেড়ে আলোর মধ্যে বসে, অচেনা একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে মায়ের গল্প করার ঘটনাটি তার চেয়েও অবিশ্বাস্য। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি অনু সিদ্ধার্থ মাকে বদ্ধ ঘরটির বাইরে নিয়ে আসার জন্য কতদিন কতরকমভাবে চেষ্টা করেছি। মজার গল্প বলে, পুরনো ঘটনার উল্লেখ করে মাকে কথা বলাতে চেয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মা ফ্যালফেলে চোখে এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, যা দেখে মনে হয়েছে সত্যি মায়ের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর ডাক্তারবাবু যখন বললেন মায়ের মূল অসুখটা হোল ফিয়ার নিউরোসিস, আমরা হাল ছেড়ে দিলাম। আমাদের ধারণা জন্মে গেছিল, মা যতদিন বেঁচে থাকবে, অন্ধকার ঘরে চুপ করে শুয়ে থেকে কাটিয়ে দেবে। কারোর সামনে আসবে না। কোন প্রশ্ন করবে না। অন্যের কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না। ইচ্ছে হলে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন মাথায় দু মগ জল ঢালবে। নিয়মিত পোশাক পাল্টাবে না। সময়মত খাবে না। প্রায়ই দিন মা না খেয়েই কাটিয়ে দেয়। সিদ্ধার্থ বা অনুর কাছে মায়ের এভাবে বেঁচে থাকাটা কতখানি পীড়াদায়ক জানি না। কিন্তু আমার প্রায়শই মনে হয়েছে এভাবে বেঁচে থাকা এবং না-থাকা, দুই-ই সমান। যদিও মা থাকবে না, ভাবলেই বুকের মধ্যেটায় কেমন হাওয়া বাতাস শূন্য ফাঁকা হয়ে গেছে। মা যেভাবেই বেঁচে থাকুক না কেন, সে

নিছক জড় পদার্থের মতো হলেও, মায়ের জীবিত অস্তিত্ব, গাঢ় অন্ধকারে এক চিলতে আলোর মতো। মাঝে মাঝেই মনে হয় মা যেন আমাদের সংসারের যাবতীয় অসংগতি, ঘাটতিকে আড়াল করে রেখেছে। মায়ের অবর্তমানে সেগুলি সব প্রকট হয়ে ফুটে বেরোবে।

মায়ের সম্পর্কে যখন এইরকম সব ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়ে গেছে, সেইসময় যদি দেখি মা আগের মতো হয়ে গেছে রাতারাতি এবং একজন সুস্থ মানুষের মতো কথা বলছে হাসছে, তখন অবাক তো হতেই হয়, তার সঙ্গে যাঁর সাহচর্যে এমন অঘটনটি ঘটল, তাঁর প্রতি মন আপনিই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয় ভদ্রলোকের মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে। সাধারণ পাঁচটা মানুষের মধ্যে যা নেই।

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে হাসলাম, কেমন আছেন? কতক্ষণ এসেছেন?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ভাল আছি। এসেছি মিনিট পনেরো হোল।

— বসুন। এক মিনিট আসছি। আমি বললাম।

— শোন? মা আমায় ডাকল, একটু চা বসা, আর দেখ? বলে ইশারায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন ঘরে মিষ্টি বা ঐ জাতীয় কোন খাবার আছে কিনা।

— ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সবে ফিরলেন। মুখ হাত ধুন। একটু বিশ্রাম করুন। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে হেসে বললেন, চা না খেয়ে আমি যাবও না।

— দেখুন? আমি বললাম, এসেছেন স্ব ইচ্ছায়। কিভাবে ফিরবেন, কখন ফিরবেন, সেটা কিন্তু আমাদের ইচ্ছানুযায়ী।

— বাঃ! ভদ্রলোক খুশিতে ঘাড় দোলালেন, কথাটা আপনি যদি নিছক আবেগের বসেও বলে থাকেন, তবু বলব এমন কথার নিজস্ব ফ্লেভার আছে। যা মস্তিষ্কের আগে, হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

— অতশত বুঝি না। জল আগে না মাছ আগের মতো, যুক্তির আগে আবেগ, নাকি আগে যুক্তি পরে আবেগ, অত হিসেব করে কথাও বলতে পারি না।

— ম্যালা বকিস না তো! মা যেন অবিকল দশ বার বছর আগের মানুষটি, বয়স্কদের মুখে মুখে তক্কো করার স্বভাবটা তোর গেল না। যা বললাম, আগে সেটি কর।

— তর্ক নয় দিদি। ভদ্রলোক মায়ের দিকে চেয়ে হাসলেন, একে বলে মেজে ঘষে দেখে নেওয়া। ঠিকই তো। বলে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাইলেন, যাচিয়ে নিলে ঠকবার ভয় কম থাকে। আর যদি তারপরেও ঠকতে হয়, জানবে এটাই ছিল তোমার নিয়তি।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে রইলেন এবং এই সময়টায় স্থির নীরব দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন আমার নিয়তি ভাগ্যলিখন ইহকাল পরকাল সব তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কপাল ভাগ্য প্রারব্ধকর্ম, এসব মানেন তো?

— না। আমি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লাম, এখন অব্দি মানি না। আর তেমন ঘটনা ঘটছেই বা কোথায়? তবে মিরাকল্ কিছু ঘটে গেলে ...!

— তার মানে বিশ্বাস করেন। ভদ্রলোক আমায় কথা শেষ করতে দিলেন না, এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যুক্তি তক্কো চুলচেরা বিশ্লেষণ, এসব দিয়ে যার তল খুঁজে পাওয়া যায় না!

— তাই কি? আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, তেমনভাবে তলিয়ে খুঁজে দেখা হয় না হয় তো!

— যুক্তিবাদীদের এই ভারি দোষ। ভদ্রলোক লম্বা করে শ্বাস ফেললেন, কিছুতেই মানতে চায় না।

— থামবি? মা আমাকে রীতিমত ধমকে উঠল, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে বকবক করছিস, ততক্ষণে চায়ের জল ফুটে যেত।

আমি হেসে বললাম, তুমি রাগছ কেন মা? উনি তো চা না খেয়ে যাচ্ছেন না।

— নীরু? মা মুহূর্তে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, সব ব্যাপারে রসিকতা করা ঠিক নয়। আর এ সবের একটা বয়স আছে। ভুলে যেও না, সে বয়সটা তোমার পার হয়ে গেছে।

পরিবেশটা হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে গেল। আমি যেমন, ভদ্রলোক নিজেও তেমনি আন্দাজ করতে পারেননি যে মা এমন তীব্র ভাষায় আমাকে অকারণে আক্রমণ করবে। এমনিতেই যে কোন মেয়ের ক্ষেত্রেই বয়স ব্যাপারটা খুব স্পর্শকাতর এবং টপ সিক্রেট। তার ওপর অচেনা একজন পুরুষ, তিনি যে বয়সেরই হোন না কেন, তাঁর সামনে কোন মা যদি তার নিজের মেয়ের বয়স নিয়ে হুঁশিয়ারী দেয়, নিতান্ত তালকানা একজন মানুষও বুঝতে পারবে যে, এমন সাবধান বাণীর মধ্যে কোনরকম মিথ্যে নেই। অর্থাৎ মা যখন বলছে, আমার রসিকতার বয়স পার হয়ে গেছে, তখন সত্যি আমার বেশ বয়স হয়ে গেছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার পরিবর্তে মা যদি এমন পরিবেশে ঠিক এই কথাটিই অনুকে বলত, অনু রীতিমত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত। মায়ের এমন ধমকানিতে ভদ্রলোক নিজেও যে যথেষ্ট অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছেন, সেটা বুঝতে পারলাম, পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য ভদ্রলোকের সে কী তড়িঘড়ি আপ্রাণ চেষ্টা!

প্রথমে আমার দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসলেন। যেন মা যা বলেছে সেটা নিছকই মজা করার জন্যে বলেছে। যদি আমি সেটা ধরতে না পেরে থাকি, তাহলে তাঁর হাসি দেখে যেন সেটা বোঝার চেষ্টা করি। তারপর ভদ্রলোক মায়ের দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে ভাবগম্ভীর গলায় বললেন, এ বাজারে রসিকতা অত্যন্ত দুর্মূল্য জিনিস দিদি। ছ বছরের বাচ্ছার মুখে ষাট বছরের গল্প। রামগড়ুরের ছানার মতো সবসময় মুখ গোমড়া করে রয়েছে। হাসির ছিটেফোঁটা নেই। যে কোন প্রশ্ন করলে তার অবজেকটিভ টাইপ উত্তর দেয়। সে সব জবাবের ভাষাও আলাদা। রসিকতা ঠাট্টা তামাশা মজলিসি আড্ডা, এখনকার ছেলেমেয়েরা সেসবের স্বাদও পেল না। একটু থেমে হঠাৎই পাকা অভিনেতার মতো গলাটাকে খাদে নামিয়ে বললেন, নীরু কেবল বুদ্ধিমতীই নয়। বেশ রসিকও। একটা কথা বলি দিদি। বলে অল্পক্ষণ আগে মা যেমন চৌকি ছেড়ে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেই ভঙ্গীমায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর গলায় থেমে থেমে বললেন, আপনি রাগ করলেও, আমি কিন্তু নীরুর কথা বেশ উপভোগ করছি। এই রসবোধটুকু ও যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে, তাহলে কোন দুঃখ হতাশা এমনকি কোন পাপও ওকে ছুঁতে পারবে না।

মুখ হাত ধুয়ে স্কুলের পোশাক পাল্টেআমি রান্নাঘরে চা করতে গেলাম। স্কুল থেকে ফিরে আমি প্রতিদিনই নিজে চা তৈরী করি। এই সময় মা'ও কম চিনি দিয়ে এক কাপ চা খায়। মায়ের ঘরে চা পৌছে দিয়ে আমি বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে একা একা চা খাই। কদাচিৎ কোনদিন অনু বা সিদ্ধার্থ থাকলে তার জন্যও চা করি এবং মিনতির সুরে বলি, আয় না বারান্দায় বসে একসঙ্গে চা খাই।

আসলে চুপচাপ একা বসে থাকলে হয় বাবার কথা, তা না-হলে অয়নের কথা মনে পড়ে যায়। চায়ের কাপ হাতে বাবা আমি বা আমি অয়ন মুখোমুখি বসে কথা বলতে বলতে এমন মশগুল হয়ে যেতাম যে, প্রায়ই আমাদের হাতে ধরা চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যেতাম। চা ঠাণ্ডা জলের মতো হয়ে যেত। তখন সেই ঠাণ্ডা চা গরম করে আনতে বা সেটাকে ফেলে দিয়ে নতুন করে চা তৈরী করে আনতে কোন বিরক্তি বোধ হত না বা বাড়তি খাটতে হচ্ছে এমন কিছুও মন হোত না। এখন প্রায় প্রতিদিনই যখন একা একা বসে চা খাই তখন পুরনো সেইসব স্মৃতি স্মরণ করে নিজের একাকীত্বকে ভুলতে চেষ্টা করি। তবে স্মৃতি তো সততই সুখের হয় না। ফলে এক একদিন মনটা এমন ভারি হয়ে ওঠে যে চোখে জল এসে যায়। বেশ বুঝতে পারি কাপড়ের খুঁটে সেই জলটুকু মুছে না নিলে, জলের ফোঁটা টপ করে ঝরে পড়বে। চোখের সামনে টেবিলের

ওপর চায়ের কাপটা বসানোই থাকে। হাতে তুলে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে না। আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে নতুন করে তৈরী করা দূরে থাক, চাটুকুকে গরম করতেও ইচ্ছে করে না। তেঁতো ওষুধ গেলার মতো করে চোখ বুজে নাক মুখ কুঁচকে কোনরকমে ঠাণ্ডা চাটুকু এক চুমুকে গিলে ফেলি। তা নাহলে যেমনকার চা তেমনই বসানো থাকে টেবিলে। অনু বা সিদ্ধার্থ যেন আমায় করুণা দেখাচ্ছে এই ভাবে আমার মুখোমুখি বসে কোন কোন দিন। ব্যাস ওই অব্দি। গরম চায়ে ফুঁ দিয়ে বা আরও দ্রুত সেটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য কাপ থেকে ডিশে ফেলে চোঁ চোঁ করে খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ে। 'উঠছি' বলার মতো সময়টুকুও ওদের থাকে না। এঁটো কাপ ডিশটা টেবিলে নামিয়ে রেখেই দ্রুত বারান্দা ছেড়ে চলে যায়। তখন নিজেকে নির্বোধ বোকা বলে মনে হয়।

আজ আমার চা-সঙ্গী আছে, শুধু এইটুকু ভাবতেই বেশ ভাল লাগছে। ভদ্রলোক তো আছেনই। তার চেয়ে খুশির কারণ বহুদিন, বহু বছর পরে মা আজ সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করছে। কথা বলছে। প্রশ্ন শুনে নিয়ে তার ঠিকঠাক জবাব দিচ্ছে। আবার আমার ভুল ত্রুটি শুধরে দেওয়ার জন্য আমাকে ধমকাচ্ছে। শাসন করছে। মায়ের আচার আচরণের ব্যাপারটা যতই ভাবছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। গল্পে বা সিনেমাতে এমন কাণ্ড ঘটতে দেখলে সেটাকে আজগুবি অসম্ভব মনে হোত। এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। 'অঘটন আজও ঘটে' শিরোনামে কোন কোন অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ করা হয় যেমন, মায়ের ব্যাপারটাও সেরকমই। অন্য কেউ তো বটেই, এমনকি অনু এবং সিদ্ধার্থকেও যদি বলি, মা এইরকম করছে বা এতটা পাল্টে গেছে রাতারাতি, ওরাও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছে এ বিষয়ে তো কোনও সংশয় নেই। আমি নিজে চোখে দেখছি মা স্বইচ্ছায় অন্ধকার ঘর ছেড়ে আলোর মধ্যে এসে বসেছে। নিজের কানে মায়ের হাসির আওয়াজ শুনেছি। পরিবেশ এবং প্রসঙ্গানুযায়ী মাকে কথা বলতে শুনেছি। সর্বোপরি ফিয়ার নিউরোসিস রুগী আমার মা, ভয়কে অগ্রাহ্য করে আমার ওপর রাগ দেখিয়েছে। আমাকে ধমকেছে।

দৈব অলৌকিক বা তার সঙ্গে অ্যালায়েড বশীকরণ বা সম্মোহনী শক্তি, আমি কোনকালেই এসবে বিশ্বাসী নই। প্রাকৃতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন কোন মানুষের সংস্পর্শে কিছু পরিবর্তন বা বিপরীতধর্মী আচরণ ঘটতে পারে। কিন্তু সেটা রাজকুমারের রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো মাত্রই, রাজকুমারীর কালঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার কখনোই হতে পারে না। ভিন্নতর পরিবেশে বা কোন আগন্তুকের সঙ্গলাভে একজন অসুস্থ মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এটা একটা

সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। মুহূর্তের ফাঁকে বা চোখের পলকে যদি এমন কিছু ঘটে যায়, যেমন মায়ের ক্ষেত্রে দেখছি, তখন আমি কেন, হাজার যুক্তিবাদীও বেসামাল হয়ে যেতে বাধ্য।

আজ আমার সত্যি বড় খুশির দিন। কোনরকম সাধ্যসাধনা ছাড়াই আজ আমার মা দশ বার বছর আগের মতো সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করছে। এ সংসারে এখন আমার কাছেরজন বলতে, মা। অনু সিদ্ধার্থ বড় হয়ে গেছে। বয়সে যতটা না, চিন্তাভাবনা কথাবার্তায় আচার আচরণে ওরা যেন প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ওদের সঙ্গে আমার দূরত্ব ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এটা জেনারেশন গ্যাপ ঐ জাতীয় কিছু নয়। যে কোন বিষয়ে, বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীতে ওদের সঙ্গে আমার কোন ফারাক নেই। বড়দি বলতে যা বোঝায়, আমি তো ঠিক ততটা বয়স্কা নই। গুরুগম্ভীর মুখ করে কথা বলি না। সেকেলে মূল্যবোধের জাহির করা বা এখনকার সব খারাপ, তখনকার সব ভাল এই ধরণের মন্তব্য করা আমার মাথাতেই আসে না। তারপরেও বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি অনু এবং সিদ্ধার্থ আমাকে সময়োপযোগী বলে ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। তাই আমার সঙ্গে বসে গল্প করে, কথা বলে, ওরা সময় নষ্ট করতে চায় না।

বহুদিন বহু বছর পর আজ বাড়িটা অন্যরকম লাগছে। মেজাজ ফুরফুরে থাকলে কাজে এনার্জি আসে। গরম জলে চা পাতা ভিজতে দিয়ে আমি মশলার পাঁপড় ভাজলাম। বারান্দার টেবিলে চায়ের কাপ সাজিয়ে ডাকলাম, মা এখানে এসো। ওনাকেও আসতে বলো।

সব ব্যাপারে আজ আমার আশাতীত সাফল্যের দিন। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার ডাকের প্রত্যুত্তরে মা ভদ্রলোককে কেমন সুন্দর নরম করে বলল, নীরু চা খাবার জন্য ডাকছে। চলুন। গল্প করতে করতে চা খাওয়ার আনন্দই আলাদা। আর দেখুন! মা গলাটাকে যতই আস্তে করুক না কেন, আমি ঠিক শুনতে পেলাম, মা আমার সম্পর্কে ভদ্রলোককে সাবধান করে দিচ্ছে, ও অনেক কথা বলবে। নিজের কথা বলতে শুরু করলে, সহজে থামবে না। দয়া করে তার জন্যে কিছু মনে করবেন না।

আমার হাসি পেল। আমি কি এখনও খুকি পর্যায়ের কোন মেয়ে! বেতাল বেফাঁস কী মন্তব্য করে বসব বা আহাম্মকের মতো নিজের ঢোল কাঁসি বাজিয়ে নিজের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলব, মূলত যা শোনাবে আত্মম্ভরিতা প্রকাশের মতো! আমার এমন আচরণে ভদ্রলোক পাছে বিব্রত বিরক্ত বোধ করেন, সেই আশঙ্কাতে মা ভদ্রলোকের থেকে, আমার হয়ে পরোক্ষে মাফ চেয়ে নিল।

উনিশ

কোথাও কিছু নেই, একদিন সকালে শচীন ডাক্তার এসে হাজির আমাদের বাড়িতে, নীরু আছ নাকি?

সকালে কাজের চাপে আমি রীতিমত দৌড়োদৌড়ি করি। রান্নাবান্না তার সঙ্গে মায়ের দুপুরের খাবার, ওষুধপত্র সব ঠিকমত গুছিয়ে রাখা, নিজের স্নান খাওয়া, পোষাক পরা, দম ফেলার সময় পাই না। দৈনিক কাগজের হেড লাইনগুলিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই। একান্ত ইচ্ছে থাকলেও সবিস্তারে খবরটি পড়ার সময় পাই না। আমাদের পোষা কুকুরটি একটু আদরে, আমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করে আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করে। আমি ওই অবলা জীবটির কাতরতা অনুভব করতে পারলেও, ওর সাধ মেটাবার সুযোগ পাই না। স্রেফ সময়ের অভাবে। এক এক দিন স্কুলে পৌঁছতে সামান্য দেরী হয়ে গেলে দেখি বড়দির মুখ ভারি। তখন লজ্জাও যেমন করে, নিজেকে অপরাধীও মনে হয়। প্রথম প্রথম কয়েকবার বলেওছিলাম, আপনি তো আমার বাড়ির পরিস্থিতি সবই জানেন দিদি। একা মানুষ সব দিকে সামলে উঠতে পারি না। দেরী হয়ে যায়। ইদানীং এসব কিছুই বলি না। কারণ প্রথম দু একবার বড়দি আমার কথার প্রত্যুত্তরে 'তাই তো', 'আহা রে' এই জাতীয় সহানুভূতির শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কিছুদিন পর থেকে আমি দেরীর কারণ বলতে শুরু করলেই, বড়দি দৃষ্টিকটুভাবে আলমারী ড্রয়ার এইসব খুলে অযথা কী যেন সব খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অকারণে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকেন। অর্থাৎ আমার কথা যে তিনি শুনছেন না বা শুনতে চাইছেন না, এটা বোঝাবার জন্য খানিকটা নির্লজ্জের মতোই এটা ওটা করতে শুরু করে দেন। একে ওকে ডাকতে শুরু করেন। বড়দির এই আচরণটার সঠিক কারণ যেদিন আমি বুঝতে পারলাম, তার পরদিন থেকেই সচেতন হয়ে গেলাম। এখন কোনদিন দেরী হয়ে গেলে আমি বড়দিকে বেশ গম্ভীরভাবেই বলি, সই করব, না করব না, বলুন? সামান্য কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে কে আর চায় খারাপ ব্যবহার করতে? আর বিশেষত একটি স্কুল, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমানও কেউ কেউ তাদের মধ্যে। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার প্রশ্নের জবাবে বড়দি ঠাণ্ডা স্থির চোখে আমার দিকে কিছুটা ইনডিফারেন্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বুঝিয়ে দেন, আমার দেরী করে হাজির হওয়ার ব্যাপারটা তিনি কোনমতেই সুস্থ মনে মেনে নিতে পারছেন না। চুপ করে আছেন, সেটা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই। নীরব চাউনিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমার কোন অজুহাত তিনি মেনে নিচ্ছেন না। হয়ত বিশ্বাসও করতে চাইছেন না।

স্বভাবতই সকালে স্কুল যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি কারোর সঙ্গে অতিরিক্ত একটি কথা বলার বা কোন ব্যাপারে সামান্য উঁকি দেওয়ার মতো ফুরসতটুকু পাই না।

শচীন ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের কোনরকম পারিবারিক সখ্যতা নেই। আমাদের বাড়ির কেউ ওনার পেসেন্টও নয়। তাহলেও একজন বয়স্ক মানুষ সর্বোপরি একজন ডাক্তার হিসাবে ওনার সামাজিক মর্যাদাকে আমি তো অস্বীকার করতে পারি না। আর আমার খোঁজে আমার বাড়িতে নিজে এসেছেন যখন, তখন 'আসুন', 'বসুন', 'কী ব্যাপার', এটুকু সৌজন্য না দেখানোটা নিতান্তই অসামাজিক এবং অমানবিক ব্যাপার হয়ে যায়। বাগানের দরজা খুলে ডাক্তারবাবু সটান রোয়াকের কাছে চলে এসেছেন। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে জোড় হাত করে নমস্কার করলাম, কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু? আসুন। ভেতরে এসে বসুন।

— সাত সকালে তোমাকে আবার বিরক্ত করলাম না তো? বলতে বলতে ডাক্তারবাবু চার পাঁচটি সিঁড়ি ভেঙ্গে রোয়াকে উঠে এলেন, তোমার কাছে একটা খবর জানতে এলাম।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কস্মিনকালেও আমার সামান্য বাক্যালাপ হয়েছে কিনা সন্দেহ। উনি যেমন আমার মুখ চেনেন, হয়ত নাম পরিচয়ও জেনে থাকতে পারেন, আমিও সেইরকমই ওনার মুখ চিনি। নাম জানি। দে পাড়ায় বাড়ি, এই অব্দি জানি। কোন বাড়িটা বা ওনার ছেলেমেয়ে কারা, কী করে তারা, এসবের কোন খবরই রাখি না। এমনকি ডাক্তার হিসাবেও হাতযশ কতখানি তাও জানি না। স্কুল যাওয়া আসার পথে ওনার চেম্বার চোখে পড়ে। খুব কম সময়েই চেম্বারে রুগীর ভিড় দেখি।

ঘরে ঢুকে ডাক্তারবাবু এদিক ওদিক এমনভাবে চাইতে লাগলেন যেন এ ঘরটা ওনার পরিচিত। বহুদিন পরে এসে স্মরণ করার চেষ্টা করছেন, ঘরের মধ্যেকার আসবাবপত্রের কোন সংযোজন বা বিয়োজন হয়েছে কিনা, কিম্বা তাদের কোনরকম স্থান পরিবর্তন হয়েছে কিনা। যেমন দেওয়ালে ঝোলানো বাবার ছবিটার দিকে মুহূর্তকাল অপলক চেয়ে থেকে বললেন, ছবিটা দরজার সোজাসুজি দেওয়ালে ছিল না? আমি বললাম, না তো। বরবারই ওখানেই টাঙানো আছে।

— হ্যাঁ। তাই হবে। ঠিক বলেছ। ডাক্তারবাবু এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন যেন আমার উত্তরে উনি নিজের ভুলটুকু ধরতে পারলেন। হেসে বললেন, একে বয়স হয়েছে। তার ওপর ডাক্তারি সূত্রে এত অসংখ্য লোকের বাড়ি যেতে হয় যে সবকিছু ঠিকঠিক স্মরণে রাখতে পারি না।

এটা একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা। অন্তত আমার জ্ঞানে আজই উনি প্রথম আমাদের

বাড়িতে এলেন। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই, তারও আগে আমাদের বাড়িতে উনি এসেছেন কোনদিন, সেক্ষেত্রেও একটি বিরাট অসংগতি থেকে যাচ্ছে। তা হল, বাবার ছবিটা একটা গ্রুপ ছবি থেকে আলাদা করে নিয়ে এনলার্জ করা হয়েছে এবং সেটি বাবার মৃত্যুর পর। ডাক্তারবাবু মিথ্যা কথা বলছেন এটা ভাবতে খারাপ লাগল বলেই আমি ব্যাপারটা অন্যভাবে ধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করলাম এইভাবে যে, যে কোন বয়স্ক মানুষের মধ্যে 'সব জানি' এইরকম একটা চাপা শ্লাঘা থাকে এবং প্রায়শই যা নির্দেশের রূপে প্রকাশ পায়, 'এটার পরিবর্তে ওটা', বা 'এখনের পরিবর্তে তখন', এই ধরণের মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে।

চা খাবেন তো? বলে আমি নিজের ব্যস্ততা বোঝাতে কাজের মানুষের উদ্দেশে বললাম, এখন বাথরুম আটকাবে না মোহনের মা। চা করেই আমি স্নান করতে যাব।

মনে হয় আমার কথা ডাক্তারবাবুর কানে পৌঁছায়নি বা পৌঁছে থাকলেও উনি তার মর্মার্থ ঠিকমতো ধরতে পারেননি। চেয়ারে বসলেন মুখ দিয়ে আরামসূচক শব্দ করে হুম্। তারপর আমার দিকে চেয়ে নির্দেশের সুরে বললেন, 'খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু সময় লাগবে। সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, আগে তুমি চা-টা করে নিয়ে এসো তো।

— আসলে আমার তো স্কুল যাওয়ার ব্যাপার ...! আমি বেশ সংকুচিত গলায় কথা শেষ করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ডাক্তারবাবু এক ফুঁয়ে আমার কথা উড়িয়ে দিলেন, একদিন স্কুল কামাই করলে তোমার চাকরি যাবে না। আমি যেটা জানতে বা জানাতে এসেছি, সেটা মাচ মোর ইমপর্ট্যান্ট। এর সঙ্গে তোমার মান সম্মান, এমনকি চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনাও জড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ করে আমার সারা শরীরটা কেঁপে উঠল থরথর করে। এ কী ভয়ংকর কথাবার্তা! মানসম্মানের ব্যাপারটা আপেক্ষিক ধরে নিলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, এই বিষয়টা বেশ ধোঁয়াটে। এমন কি একটু বড় করে ভাবলে বেশ ভয়েরও।

— কী ব্যাপারে ...! মানে সিদ্ধান্ত টিদ্ধান্ত ...! আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমার গলার স্বরে আড়ষ্টতা জড়িয়ে ধরছে।

— অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? ডাক্তারবাবু এমনভাবে বললেন, যেন এখুনি হো হো করে হেসে বলবেন, তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম। ধরতে পারোনি তো?

আমার জায়গায় আপনি থাকলে, আপনিও ঘাবড়ে যেতেন। মনে মনে এটুকু বললাম। আর মুখে বললাম, আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল মানুষ যখন নিজে থেকে ছুটে এসেছেন এবং কোন একটি ব্যাপারে আমার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে, যার জন্য

আমাকে ফাইনাল ডিসিশন নিতে হবে! একটু থেমে কষ্ট করে হাসবার চেষ্টা করলাম, এসব শুনলে আমি কেন অতি বড় শক্ত মনের মানুষও চমকে উঠবে।

— ডিসিশানটা কি তুমি একলা নেবে? ডাক্তারবাবুর হাসিতে আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত, আমি তো তোমার পাশে আছি। আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলে যে কোন বিপদে তাঁর সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করতে, তাঁর পরামর্শ চাইতে, ধর না কেন, তোমার বাবার জায়গায় এখন আমি, শচীন চৌধুরী, দি রিনাউন্ড ফিজিসিয়ান অফ্ দি টাউন। অর অফ দি কান্ট্রি।

এমন ভয়াবহ ইঙ্গিতময় আবর্তে দাঁড়িয়েও, ডাক্তারবাবুর কথায় আমার পরস্পর বিরোধী দুটি অনুভূতি জাগল ডাক্তারবাবু সম্পর্কে। প্রথমটি তাঁর ওপর আমার যথেষ্ট রাগ এবং বিতৃষ্ণভাব জাগল। যেহেতু উনি বাবার জায়গায় নিজেকে এসট্যাবলিস করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে সামান্যতম হলেও দুঃখ এবং মায়াও হল। কোন মানুষ যখন নিজেকে নিজেই তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং এরজন্য যথেষ্ট সচেতন থেকেও মিথ্যা বিশেষণে নিজেকে গ্লোরিফায়েড করেন, তখন সেই মানুষটির ভেতরের নিঃস্ব অসহায় ভাবটুকু বড় করুণ নির্মম সুরে ধ্বনিত হয়। অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়।

একবার ভাবলাম মাকে ডাকি। মা এখন সুস্থ। বলতে গেলে সাধারণ মানুষের মতোই মায়ের আচার আচরণ কথাবার্তা। এমনও তো হতে পারে, ডাক্তারবাবুর কোন প্রশ্নে আমি দিশেহারা বা হতবাক হয়ে পড়লে, মা আমার হয়ে সঠিক জবাবটা দিতে পারবে। প্রয়োজনে আলোচনার মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

বেণুবিনোদবাবু যেদিন এসেছিলেন, মা স্বতস্ফূর্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। গল্প হাসি শাসন অনুযোগ এসবও করেছিল। আজ কিন্তু মা আবার আগের মতোই নিজের ঘরে বসে রয়েছে। ডাক্তারবাবু যথেষ্ট উঁচু গলায় কথাবার্তা বলছেন। মায়ের কানে সে শব্দ অবশ্যই পৌঁচোচ্ছে। তারপরেও যখন মা সামান্য দরজা ফাঁক করে দেখার কৌতূহল বোধ করছে না, তখন হয় মা আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে গেছে। তা না হলে সব বুঝেও, মা আমার কোন ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে না।

সময় বিশেষে আমারও যে কেন এমন নার্ভাস বোধ হয়! শচীন ডাক্তার তো আমার রগে পিস্তল ঠেকিয়ে প্রশ্ন করবে না বা এমন কোন দুঃসংবাদ শোনাবে না যাতে আমি মূর্ছা যেতে পারি। তারপরেও মনে হচ্ছে আমার এবং ডাক্তারবাবুর মধ্যে তৃতীয় একজন কেউ থাকলে মনে বল পেতাম। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে নিজের বিচার এবং বিবেক অনুযায়ী যেটা সঠিক বলে মনে করি, নির্দ্ধিধায় সে কথা বলতে পারতাম। কেন যে এমন মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবুর কথামত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভুল করব! বা নিজের বিশ্বাসের

কথা জোরের সঙ্গে বলতে গিয়ে সব উত্তর তালগোল পাকিয়ে যাবে!

মায়ের ঘরের বন্ধ দরজায় আস্তো করে টোকা দিয়ে ডাকলাম, মা একবার ঘরের বাইরে এস। দেখ কে এসেছেন? যথারীতি কোন সাড়া নেই। তখন একরকম বিরক্তিভরেই মায়ের ঘরের দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। মা সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বেশ কর্কশ গলায় বলল, আলো জ্বাললি কেন? কী হয়েছে?

— দেখবে এসো, কে এসেছেন? আমি বললাম।

— আলো নিভিয়ে দে। আমার ঘুম পাচ্ছে। মা পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, যেই এসে থাকুক, আমার কী তাতে?

মন খারাপ হয়ে গেল। অর্থাৎ মা রাতারাতি সুস্থ মানুষ থেকে আবার রুগী হয়ে গেছে। আবার আগের মতো আলোর ভীতি। অন্ধকার ঘরে নিজেকে গুটিয়ে লুকিয়ে রাখা।

চা করতে করতে বিগত কয়েক দিনের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করে নিজেরই কেমন অবাক লাগতে লাগল। আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে যেন একের পর এক ঝড় বয়ে গেল। ঘটনাগুলি কেবল আকস্মিক নয়। অদ্ভুত রকম বৈপরীত্যে ভরা। নয়নচাঁদের বাড়িতে ছুটে যাওয়া, অলোকেশদের বন্ধ কারখানার গেট মিটিং-এ আচমকা অংশগ্রহণ করা, তারপর অলোকেশের খুন হওয়া, শিকারী বেড়ালের মতো পুলিশের আগমন আমাদের বাড়িতে, আবার কোনরকম অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না করে ভালমানুষের মতো পুলিশের ফিরে যাওয়া, আর এসব কিছুর মূল গ্রন্থি হিসাবে একজন অলীক মানুষ, বেণুবিনোদ মিশ্রের আগমন। আবার তাঁরই সান্নিধ্যে হাজার বছরের অন্ধকার ঠেলে আমার মায়ের আলোয় ফেরা, সব কেমন যেন কল্পকাহিনীর মতো, আজগুবি বায়োস্কোপের মতো মনে হচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে একটি গোল টেবিলের দু পাশে দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম দুজনে। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, খাসা চা হয়েছে। এখন থেকে প্রায়ই আসতে হবে চায়ের লোভে।

— আসবেন। আমি হেসে বললাম, গল্প করার একজন সঙ্গী পেলে আমারও ভাল লাগবে।

— শুনেও শান্তি। ডাক্তারবাবু চোখ বুজে মাথা নাড়লেন, তবে কিনা! বলে ভয়চকিত চোখে এদিক ওদিক চেয়ে গলাটাকে যথাসম্ভব নামিয়ে বললেন, আজ ছুটে এলাম বাধ্য হয়ে। তা না হলে কোথা থেকে কী হয়ে যাবে। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তখন বলবে ডাক্তারবাবু আপনি সব জানতে পেরেও আমায় আগাম কিছু জানালেন না? একটু সতর্ক করে দিলেন না?

— কী হয়েছে বলবেন তো? এবার আমি একটু জোরে এবং বিরক্তির সুরেই বললাম, তখন থেকে কেবল ভয়-ই দেখিয়ে যাচ্ছেন?

— বলছি। বলছি। ডাক্তারবাবু গরম চা দ্রুত ঠাণ্ডা করার জন্য কাপ থেকে ডিশে ঢেলে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলেন বেশ কয়েকবার। তারপর প্রায় এক চুমুকে চার ভাগের তিন ভাগ চা টেনে নিলেন মুখের মধ্যে। তৃপ্তিসূচক আওয়াজ করলেন, আঃ! পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছলেন। আমার দিকে চেয়ে অযথাই একটু হাসলেন, সিগ্রেট খেলে তোমার আপত্তি নেই তো? আমি 'হ্যাঁ', 'না' বলার আগেই পকেট থেকে সামান্য দোমড়ানো একটি সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের খোলে বারকয়েক ঠুকলেন, আজকাল আবার ধূমপানের ব্যাপারে কড়া আইন হয়েছে কিনা। বিশেষ করে ট্রেনে বাসে।

— আপনি তো বসে আছেন আমার বাড়িতে। আমি বললাম।

— তাহলেও! ধোঁয়াটা তো বাতাসে উড়বে।

— তেমন অসুবিধে হলে, আমি নাকেমুখে শাড়ির আঁচল চাপা দোব। আমার কথায় ঘাড় দুলিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। পাকা নেশুড়েদের মতো বেশ আয়েস করে সিগারেট ধরালেন। লম্বা একটা টান দিলেন সিগারেটে এবং ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ সরু করে ধোঁয়া ছাড়লেন। একে উত্তেজনা, তায় সময়ের স্বল্পতা, আমি অধৈর্য বোধ করছিলাম। আমার ভেতরের অস্থিরতা নিশ্চয়ই চোখমুখের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠছিল। ডাক্তারবাবুর বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়ে গেল।

— জানি তুমি খুব টেনসড্ হয়ে রয়েছ। ডাক্তারবাবু থেমে থেমে বললেন, আসল কথাটা তাহলে বলেই ফেলি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, মানে এই সাতসকালে চেম্বারে রুগী ফেলে তোমার কাছে ছুটে আসার কারণটা কি।

— হ্যাঁ, মানে —! ভয় নাকি উত্তেজনায় আমার গলার আওয়াজ দেবে যাচ্ছে। আমি নিজেই বুঝতে পারলাম, আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে বিষয়টা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তাই আর কি ...!

— যতটা তুমি ভাবছ, ততটা নয়। ডাক্তারবাবু অবজ্ঞার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন, বিশেষ করে ব্যাপারটা যখন আমার নলেজের মধ্যে এসে গেছে। সামান্যক্ষণ থেমে হঠাৎই গলার স্বর পাল্টে বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, ধুতি পাঞ্জাবী পরা সুদর্শন একজন পুরুষ তোমাদের বাড়ি প্রায়ই আসেন। তাই না?

— প্রায়ই তো নয়। আমি বললাম। দুদিন এসেছিলেন। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

আমার জবাবের মধ্যে যথেষ্ট তির্যকভাব ছিল। অনেকটা প্রতি আক্রমণের মতো। ডাক্তারবাবু কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। বরং আমি যেন তাঁর মুখোমুখি বসে একজন

রুগী এবং উনি আমার রোগ বিষয়ক প্রশ্ন করছেন, এমনি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, তুমি ওই ভদ্রলোককে চেন? নাম জান? এ শহরে আগে কখনও দেখেছ? কারোর কাছে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর করেছ?

এমন থমথমে অর্থবহ পরিবেশের মধ্যেও ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন করার ধরণে আমার হাসি পেল, প্রশ্নগুলো পার্ট বাই পার্ট করলে আমার একটু সুবিধা হয়।

— না, না। এটা হাসির ব্যাপার নয়। ডাক্তারবাবু দু চোখ বড় বড় করে বললেন, হি ইজ এ ভয়ংকর লোক। ওর সঠিক পরিচয় কেউ জানে না। কিছু ফলোয়ার জোগাড় করে সব ব্যাপারে মাতব্বরিতা করে বেড়াচ্ছে। তোমার ভাই তো শুনি এই শয়তানটার ডান হাত না বাঁ হাত কী যেন একটা হয়েছে।

— তাই নাকি? আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম, আমার ভাই মানে সিদ্ধার্থ তো ওনার ঠাঁইঠিকানা জেনেছিল আপনার কাছ থেকেই।

— দ্যাটস অ্যান ওল্ড হিস্ট্রি। তোমার মতো আমারও প্রথমে ভুল হয়েছিল লোকটাকে চিনতে। তুমি কি জান? বলে সোজা আমার দিকে চেয়ে ডাক্তারবাবু ফিসফিস করে বললেন, ও পুলিশের ইনফর্মার। চরিত্তিরেরও দোষ আছে। এ শহরের একজন নোংরা মেয়েমানুষ ওর রক্ষিতা।

ডাক্তারবাবু বয়সে আমার বাবার চেয়েও বড়। একজন বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে অন্য আর একজনের চারিত্রিক দোষত্রুটির ব্যাখ্যা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগল না। মনে হল ডাক্তারবাবু হয়ত এই ধারণা নিয়েই এসেছেন যে ভদ্রলোকের স্বভাব চরিত্র খারাপ জেনেও, আমি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরিবর্তে রীতিমত আপ্যায়ন করে বাড়িতে ডেকে এনেছি। স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারবাবুর হঠাৎ উপস্থিতির ব্যাপারটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না। ভদ্রলোক সম্পর্কে তাঁর রাগ বিতৃষ্ণাভাব থাকতেই পারে। কিন্তু সেই নিরিখে উনি যদি আমাকেও ভদ্রলোকের পছন্দসই একজন সঙ্গী বা ঐ জাতীয় কিছু ভেবে থাকেন, সেটা কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না।

— আমার কিন্তু ভদ্রলোককে মোটেই তেমন কিছু মনে হয়নি, যেমনটি আপনি বলছেন। আমি এ কথা বলা মাত্রই ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে থমথম করছে মুখটা। নিশ্বাস ফেলছেন এতটাই জোরে যে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা চায়ের কাপের মধ্যে গুঁজরে রেখে দিলেন। তারপর একরকম শাসানোর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে আমাকে বললেন, গরীবের কথা, হরিণের মাংস। বাসি না হলে মিষ্টি হয় না। ভেবেছিলাম তুমি শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমার কথার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করবে। একটু থেমে বললেন, লোকটার আসল উদ্দেশ্য কি জান?

আমি সহজভাবে ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

— ওই যে ছোকরা তোমাদের বাড়ি আসত, কমিটেড নকসালাইট, ও এখন কোথায় আছে, কাদের সঙ্গে আছে, কী করছে, এইসব গোপন খবর জানার জন্যই বদমাইশটা ভালমানুষির মুখোস এঁটে তোমার কাছে এসেছে।

ডাক্তারবাবুর কথায় আমি সত্যি চমকে উঠলাম। মনে হল তাই তো, ভদ্রলোক অযাচিতভাবে আমাদের বাড়িতে এসেছেন শুধু তাই নয়, মার্ডার কেসের মতো একটা জটিল সমস্যা থেকে আমায় কি অনায়াসে মুক্ত করে দিয়েছেন। আর পুলিশও কেমন বাধ্য ছেলের মতো ওনার কথা শুনে চলে গেল। সামান্য কয়েকটি অতি সাধারণ প্রশ্ন, যা না করলে ওদের চাকরির ন্যূনতম শর্তটুকু পালিত হয় না, সেটুকু পর্ব শেষ করেই পুলিশ অফিসার তার দলবল নিয়ে যেন মানে মানে পালিয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পুলিশ মান্য করে রাজনীতির দাদাদের, দোস্তি পাতায় নামজাদা সমাজবিরোধীদের সঙ্গে। আর রীতিমত পয়সাওলা লোকেদের কাছে পুলিশ নায়েব গোমস্তা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চাকরবাকরের মতো 'জো হুজুর' আচরণও করে।

ভদ্রলোক মানে বেণুবিনোদ মিশ্র অন্তত আমাদের এ অঞ্চলের বা আশপাশের কোন্ জেলার কোন রাজনৈতিক দলের হর্তাকর্তা নন। তাহলে চোখে না দেখলেও, নামটার সঙ্গে পরিচিত থাকতাম। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে তথাকথিত সমাজবিরোধী বলতে যা বোঝায়, তাদের চেহারার সামান্যতম মিলও নেই। যদি এমনটিও ধরে নেওয়া যায় যে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজবিরোধী গুণ্ডাবদমাইশদের পোশাক, চালচলন কথাবার্তা, সব কিছু বদলে গেছে, তাহলেও ফান্ডামেন্টালি খারাপ লোকেরা কখনোই এমন চটজলদি মন্তব্য করতে পারে না, যা ভদ্রলোকের অনায়াস দক্ষতার মধ্যে বা ঐ শ্রেণীর লোকেরা কখনোই যথার্থ উপমা দিয়ে নিজের বক্তব্যকে এসট্যাবলিশ করতে পারে না, যেমনটি বেণুবিনোদবাবু পারেন।

এত সব বাদ দিলেও ডাক্তারবাবুর কথা অনুযায়ী একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। তা হল ভদ্রলোক পুলিশের ইনফর্মার ধরে নিলে তাঁর পোশাক, আচার আচরণ, এবং অর্থবহ কথাবার্তা সব কিছুই যথার্থ এবং সঠিক বলে মনে হয়। এমনকি তাঁর কথা শুনে পুলিশ যে আমার গায়ে আঁচরটি না কেটে পরাজিতের মতো নিঃশব্দে ফিরে যায়, এ ঘটনাটিও তখনই সম্ভব মনে হয়, যখন ভদ্রলোক মূলত পুলিশেরই একজন। যিনি নাকি অয়নের

সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর করার জন্যই, অন্য একটা সূত্রের মাধ্যমে আমার কাছাকাছি আসার চেষ্টায়, দ্বিতীয় দিন অযাচিতভাবে আমাদের বাড়ি এসেছেন। একজন পাকা গোয়েন্দা যেভাবে তার জাল বিস্তার করে, অবিকল সেই পদ্ধতিতে আপাতত আমাকে পাশে সরিয়ে রেখে আমার মায়ের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তুলতে চাইছেন।

এখন মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু সম্পর্কে ভুল ধারণা করা বা তাঁর কথার বিপরীত অর্থ ধরে নিয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়াটা আমার সঠিক কাজ হয়নি। ডাক্তারবাবু এ শহরের একজন পুরোনো দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবেই আমাকে সাবধান সতর্ক করতে এসেছেন। পাছে আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে না চাই, এই কারণেই হয়ত ডাক্তারবাবু লোকটি সম্পর্কে ইনফর্মার ছাড়া আরও যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করলেন, তা মূলত ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার রাগ ঘৃণা এবং সন্দেহকে ঘনীভূত করার জন্য। উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

আপনি এত সব জানলেন কেমন করে? আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে আরও বেশী নিশ্চিত হওয়ার জন্যই জিজ্ঞেস করলাম।

— আমি? জানলাম কেমন করে? বলে ডাক্তারবাবু শব্দহীন হাসলেন একটু, যেখানে সূর্যের আলোও ঢোকে না, তেমন জায়গাতেও আমাদের যেতে হয়। অবশ্যই প্রফেসনের খাতিরে। একটু থেমে বললেন, তেমনই এক নোংরা কুরুচিকর জায়গায় ভদ্রলোককে আবিষ্কার করি। প্রথম প্রথম আমারও তোমার মতোই ধারণা ছিল লোকটার সম্পর্কে। তাই তোমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। তারপর খোঁজখবর করতে করতে দেখলাম ঝোলা থেকে বেড়াল বেড়িয়ে পড়ল। মুখোশের আড়ালে অন্য মুখ।

— কিন্তু উনি তো অয়নের ব্যাপারে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। আমি বললাম।

— অয়ন? হু ইজ হি? ডাক্তারবাবুর দুই ভ্রু বিস্ময়ে কুঁচকে উঠল।

— কমিটেড নকসালাইট। যার খোঁজখবর করাই ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য। আমি বললাম, আপনি তো তেমনই বললেন।

— হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়লেন, আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে জেনেছি অয়নের হোয়্যার অ্যাবাউটস জানার জন্যই পুলিশ ওকে লাগিয়েছে।

— আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। আমি বললাম, এখন থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে মেপেজুপে কথাবার্তা বলতে হবে।

— এখন থেকে মানে? ডাক্তারবাবু বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, তুমি ওই পাজী শয়তানটাকে এরপরেও বাড়িতে অ্যালাও করবে? দরজা থেকে বিদায় জানাতে পারবে না?

— তা কেমন করে সম্ভব? আমি হেসে ফেললাম, তাতে তো ওনার সন্দেহ আরও গাঢ় হবে।

— হোক না।

— আপনি কি আমাকে এতটাই বোকা ভাবেন? পেছলা পথ জানার পরও আমি অসাবধানে পা ফেলব?

—এখন সেটা তোমার ব্যাপার। নিজের ওপর কতটা কন্ট্রোল রাখতে পারবে। ডাক্তারবাবু কাঁধ ঝাঁকালেন, আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। আমার ডিউটি শেষ। ব্যাস। আজ চলি।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। উনি যেভাবে এসেছিলেন, যাওয়ার চিত্রটা তার বিপরীত। ঘাড় গোঁজ করে বড় বড় পা ফেলে বাগানটুকু পেরিয়ে গেলেন। মুহূর্তের ভুলেও মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক বা পিছন ফিরে তাকালেন না। বাগানের দরজাটা হাট করে খুলে রেখে গেলেন। হয়ত ডাক্তারবাবু ভেবেছিলেন, ওনার মুখ থেকে ভদ্রলোক সম্পর্কে সব কিছু শোনার পর, আমিও ওনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভদ্রলোকের নামের আগে পিছে নিন্দাসূচক কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করব। বা কাতর গলায় ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করব আমার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। প্রয়োজনীয় পরামর্শ চাইব কীভাবে ভদ্রলোককে অপমান করা যায়, হেয় করা যায়। এমনকি বুঝিয়েও দেওয়া যায় যে আমি তাঁর আসল উদ্দেশ্য স্বরূপ সব ধরতে পেরে গেছি। চিনতে পেরে গেছি।

এ সবের পরিবর্তে আমি আমার আত্মবিশ্বাসের কথা বলে ডাক্তারবাবুকে বোঝাতে চেয়েছি যে, সূত্রটুকুর জন্য আমি ঋণী আপনার কাছে। কিন্তু মোকাবিলা আমি-ই করব। আমার মতো করে। ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর পছন্দ হয়নি। উনি ভেবেছিলেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবেই আমি ওনার নির্দেশমত চলব। তা কেমন করে হয়? একজন মানুষের সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানোর তো কিছু পর্ব আছে। কার্য কারণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা আছে। ডাক্তারবাবু যা বললেন, তার একশ ভাগ সত্যি হলেও, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তা বিচার করে দেখবো না?

অয়ন একটা কথা প্রায়ই বলত, যে কোন মানুষকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হয়।

আমি যদিও অয়নের মন্তব্যের বিরোধিতা করতাম, নিজের চোখে জগৎকে বিচার

করতে গেলে সে তো এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার হবে।

— কেন? কেন? অয়ন উদগ্রীব গলায় প্রশ্ন করত।

— বারে! চোর অসৎ ঠগ জোচ্চর জগতের সকলকেই নিজেদের ক্যাটিগরির লোক ভাববে। দুর্বল ভাববে সবাই তার মতোই দুর্বল।

— মোটেই তা নয়। অয়ন প্রতিবাদী ভঙ্গীতে মাথা দোলাত, আমি দৃষ্টিভঙ্গী বলতে বিচারবোধের কথা বলছি। রাম বলে গেল শ্যাম খারাপ, সুতরাং শ্যাম খারাপ, এইরকম চটজলদি সিদ্ধান্তে আসার আগে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে রামের মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

অয়নের এই একটা ব্যাপারের কাছে আমি তাৎক্ষণিক হার মানতাম। কথা শুরু করে হঠাৎ করে থেমে যেতাম, আঙ্গুলে শাড়ির আঁচল জড়াতাম, এসব দেখে হয়ত অয়নের মায়া হোত। হেসে ফেলে বলত, তুমি হয়ত ভাবছ আমি কি না কী বলছি?

আমি যদি সলজ্জ হেসে বলতাম, আমি তো আর তোমার মতো পড়াশুনো করিনি। আমার মেলামেশার গণ্ডীটাও তোমার মতো চওড়া নয়।

— এটা তো অভিমানের কথা হয়ে যাচ্ছে। অয়ন হেসে বলত, পড়াশুনো করনি, করবে। তবে কিনা ডিগ্রিধারী পণ্ডিত মানেই বিচক্ষণ ব্যক্তি, এ ধারণাটাও ঠিক নয়। আসলে কি জান! অয়ন একটু থেমে কেমন উদাস গলায় বলত, আমাদের ঘাড়ে সব কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অমুকচন্দ্র বলেছেন, তমুকচন্দ্র দেখিয়েছেন, সুতরাং আমরাও ওই 'বলাটা' 'দেখানোটা'-কে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিই। মানে মানতে বাধ্য করা হয়। প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দৈনন্দিন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে একজন মানুষ বা একটি ঘটনার যে বহুমাত্রিক পরিস্ফুটন হয়, বিবর্তন হয়, আমরা সে সবের বিচারে যাই না। চোর কেন চুরির পথটা বেছে নিল, সেটা তলিয়ে দেখি না। আবার দানবীরের দান করার পিছনে অন্য কোন কারণ আছে কিনা, তেমন ভাবনা আমাদের মনের কোণায় আসে না। কি আশ্চর্য, তাই না?

আমি জবাব দেব কি? মুগ্ধ বিস্ময়ে অয়নের মুখের পানে চেয়ে থাকতাম। বয়সে অয়ন আমার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়। কিন্তু যে কোন ঘটনার কেমন সুন্দর বিশ্লেষণ করত। যে কোন ব্যাপারে নিজের মতামতকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রেজেনটেবল রিপ্রেজেনটেশন তৈরী করতে পারত। অয়নের বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধীতা ছিল। ঠিক হচ্ছে না জেনেও নিজের মতামতকে এদিক সেদিক দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে খাড়া করার একটা বদ জেদ ছিল। কিন্তু তারপরেও ওর তাৎক্ষণিক জবাবে মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকত না।

যেমন এখন মনে হচ্ছে আমার পাশে অয়ন থাকলে, ডাক্তারবাবুর প্রতিটি কথাকে

ও প্রতি আক্রমণে চিরে ফালা ফালা করে দিত। বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে ডাক্তারবাবু আমাকে যত কথা বলতেন, তার সিকিভাগ বলার আগেই অয়নের প্রত্যুত্তরের কাছে মাথা নুইয়ে ফেলতেন। আমার জবাবে ডাক্তারবাবু যেমন অসন্তুষ্ট হলেন, হয়ত রেগেও গেলেন ভেতরে ভেতরে, আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে যে কথাগুলি বললাম, সেই একই কথা আমার পরিবর্তে যদি অয়ন বলত, তা ভাষার ব্যবহারে, বাক্যগঠনের নৈপুণ্যে এবং যুক্তির স্বপক্ষে উদাহরণের প্রয়োগে এমন একটা আবহ তৈরী করত, যাতে ডাক্তারবাবু রাগ করা তো দূরের কথা, হয়ত অয়নের পিঠ চাপড়ে বলতেন, ঠিক বলেছ। আবসলুটলি কারেক্ট।

আজ আর স্কুল যাওয়া হল না। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। তার ওপর অয়নের প্রসঙ্গ তুলে ডাক্তারবাবু আমার মন খারাপ করে দিয়ে গেছেন। আর মুখে যাই বলি না কেন, বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে সন্দেহ এবং ভয় দুই-ই জাগছে মনে।

চমৎকার রোদ উঠেছে। বাতাসে অল্প গা শিরশিরানি ভাব। আজ মনের মতো সঙ্গীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ার দিন। কলেজ জীবনের বান্ধবীদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। কেবল জ্যোৎস্না ছাড়া। বেচারী বোনেদের বিয়ে দিয়ে, ভাইদের লেখাপড়া শিখিয়ে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে করতে অকালে বুড়িয়ে গেল। আজ জ্যোৎস্নাদের বাড়ি যাব। টেবিল থেকে চায়ের কাপ ডিস গুছিয়ে বাথরুমে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম দুজন পুরুষ মানুষ কলকল করে কথা কইতে কইতে বাগান পেরিয়ে বারান্দার দিকে আসছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। দুজনের একজন সিদ্ধার্থ, অপরজন বেণুবিনোদ মিশ্র।

সিদ্ধার্থ এমনভাবে বলল, দিদি দেখ কে এসেছেন! যেন বেণুবিনোদবাবুকে আমি আজই প্রথম দেখছি। সিদ্ধার্থর হাসিতে, চোখের দৃষ্টিতে অপার মুগ্ধতা। যা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে সিদ্ধার্থ কেবল শ্রদ্ধাবনত নয়, যথেষ্ট গর্বিতও।

যেহেতু সামান্যক্ষণ আগেই ডাক্তারবাবু বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর অপ্রীতিকর মন্তব্য করে গেছেন, সঙ্গত কারণেই আগের দুদিনের মতো আজ আমি তাঁর উপস্থিতিতে খুশি হওয়ার পরিবর্তে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যদিও মিথ্যে হাসির আবরণে ঘাড় নেড়ে তাঁকে স্বাগত জানালাম, আসুন। ভাল আছেন তো?

বেণুবিনোদবাবু ঘাড় নেড়ে হাসলেন, তোমার শরীর ভাল আছে? মাসীমাকে দেখছি না তো? শরীর খারাপ নাকি?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মায়ের সামান্য জ্বর জ্বর ভাব। দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে।

তার আগেই সিদ্ধার্থ রীতিমত হাঁকডাক শুরু করে দিল, মাকে ডাকো। উনি তো মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।

আমার একটু অবাক লাগল। কারণ আমার মা নিতান্তই সাধারণ মাপের একজন মানুষ। তেমন কইয়ে বইয়েও নয়। সর্বোপরি এক দিনের কথোপকথনের সূত্রে মাকে বিশেষভাবে আবিষ্কার করার মতো কোন অভিজ্ঞতা বেণুবিনোদবাবুর নিশ্চয়ই হয়নি। ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। বেণুবিনোদবাবু ইজ এ ডেঞ্জারাস লোক। নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই শ্রেণীর মানুষ, অকিঞ্চিতকর কোন ঘটনা বা অ-জরুরী কোন মানুষ সম্পর্কে এমন উৎসাহ উৎকণ্ঠা দেখান, যেন তাঁর বিচারে ছোট বড় কোন ভেদাভেদ নেই। সকলকেই তিনি সমান চোখে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেন। নিজের আধিপত্য বিস্তারের এটি একটি পুরনো কৌশল।

আমার যদ্দূর মনে হয় সিদ্ধার্থ এবং বেণুবিনোদবাবু ডাক্তারবাবুকে আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেনি। বা দেখে থাকলেও ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেয়নি। আর যে লোকের একবার ধারণা জন্মে গেছে যে সব শ্রেণীর সব বয়সের মানুষের কাছেই তিনি আকর্ষণীয় এবং গ্রহণীয়, সে লোক ভাবতেই পারে না যে তার বিরুদ্ধাচরণের মতো ক্ষমতাবান অন্য কোন লোক থাকতেই পারে। বুদ্ধির দৌড়ে তাকে ধরে ফেলবে, তার গোপন অভিসন্ধির খবরাখবর চাউর করে দেবে, এমন কেউ যে সবসময়ে তার খুব কাছেই থাকতে পারে, এমন বিশ্বাস মনের কোণাতেও স্থান পায় না।

মায়ের শরীরটা ভাল নেই। আমি বললাম, সকালবেলায় ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল ডাক্তারবাবুর মুখোমুখি বসে একটু গল্প করবে। কিন্তু শরীর নিচ্ছে না। ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ শুয়ে আছে।

— মায়ের পক্ষে বিশ্রাম নেওয়াটা, আমি বললাম, এখন খুবই জরুরী।

— একশবার। বেণুবিনোদবাবু আমায় সমর্থন করে বললেন, শরীরটা প্রত্যেকের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। হাসিঠাট্টা কথাবার্তায় মনের ক্লান্তি দূর হয় হয়ত কিন্তু তাতে শারীরিক অসুস্থতার কোন উপশম হয় না। বেণুবিনোদবাবু সামান্যক্ষণ থামলেন। তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে এমন চমকে উঠলেন যেন অত্যন্ত জরুরী কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, ইতিমধ্যে যার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ব্যাগ্র গলায় বললেন, দশটা বেজে গেল। তুমি স্কুল যাবে কখন?

— যাব না। আমি হেসে বললাম, ডাক্তারবাবু আজই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন কিনা। স্বভাবতই একথা সেকথা বলতে বলতে বেশ দেরী হয়ে গেছে। আর গল্প করার জন্য মনোমত একজনকে পেলে সময় যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায়! কথা শেষ

করেই আমি চেরা চোখে বেণুবিনোদবাবুর চোখ মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। বেণুবিনোদবাবু ঠোঁট চেপে হাসলেন একটু। যেন আমার বলার আসল উদ্দেশ্যটুকু তিনি ধরতে পেরে গেছেন। নিস্পৃহ গলায় বললেন, ডাক্তারবাবু মানে তুমি শচীনবাবুর কথা বলছ নিশ্চয়ই?

আমি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলাতে, বেণুবিনোদবাবু চোখ বুজে আস্তো করে ঘাড় দোলালেন, অতুলনীয় মানুষ। বলতে পার এ শহরের গর্ব। একটু চুপ করে থেকে ঠাণ্ডা গলায় থেমে থেমে বললেন, ডাক্তার হিসাবে তেমন বিরাট কিছু নন হয়ত, বাট এ নন হারমফুল গুড ম্যান।

— আমি তো আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। আমি যেন সত্যি সত্যি আমার মনের কথাটিই বলছি, এমনি আবেগভরা গলায় বললাম, মানুষ হিসেবে যত বড়, ডাক্তার হিসাবেও ওনার সুখ্যাতি ততটাই।

— তা হবে! বেণুবিনোদবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল উল্টে দেখালেন, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমার পরিচিত একজনকে দেখতে গিয়ে ওষুধ তো কিছু লেখেননি, উল্টে অসংলগ্ন কিছু কথাবার্তাও বলেছেন। সেই মহিলা রোগিনীকে দেখে নিজেই কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠিক অসুস্থতা নয়। বরং রিজিডলি বলতে গেলে মহিলাটির কাছে নিজের মিনিমাম সম্মানটুকু পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি।

— এতদিনে তো তাহলে সে খবর পেঁজা তুলোর মতো শহরময় উড়ে বেড়ানোর কথা!

— বেড়াচ্ছে তো! একটু কান করলে তুমিও শুনতে পাবে।

— ঘটনাটি যখন ঘটে, আপনি পাশে ছিলেন নাকি? আমি সরাসরি শ্লেষাত্মক গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

— তা ছিলাম না। বেণুবিনোদবাবু বললেন, রোগিনী আমায় নিজে বলেছে!

— দেখুন, এই জাতীয় ঘটনা এক তরফা শুনে কোন মন্তব্য করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়।

— তোমার কথা অস্বীকার করছি না। তবে কিনা শচীনবাবুর মতো বয়স্ক শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ সম্পর্কে অকারণে মন্দ কথা বলবেই বা কেন? একটু থেমে বললেন, রোগিনীর সঙ্গে তো ওনার কোন শত্রুতা নেই।

— শত্রুতা না থাকলে বুঝি বদনাম করা যায় না? আমি বললাম, কোন কোন মানুষের স্বভাব, বলতে পারেন সহজাত স্বভাবই হল, অপরের সম্পর্কে দুর্নাম করা। বদনাম

রটানো। আর নারীপুরুষ সম্পর্কিত যে কোন রকম স্ক্যান্ডাল কিছু সংখ্যক মানুষ খায়, হজম করে। আবার বিনা পারিশ্রমিকে প্রচারও করে।

আমি লক্ষ্য করলাম বেণুবিনোদবাবু স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমার কথাগুলো যে তিনি খুব মন দিয়ে শুনছেন বা বোঝার চেষ্টা করছেন, তাঁর দৃষ্টিতে কিন্তু সে ধরণের কোন মনোযোগের ছাপ নেই। বরং কমবয়সী ছেলেমেয়েরা বয়সের তুলনায় ভারি ভারি কথা বললে, বয়স্ক মানুষজন যে রকম কৌতুকী দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে থাকে, বেণুবিনোদবাবুর তাকানোয় সেই ছাপ স্পষ্ট। ব্যাপারটা আমার কাছে অপমানজনক মনে হ্ল। আমি ওনার কথার জবাব দিয়েছি এবং যা বলেছি সেটা না বোঝার মতো নয় যেমন, আবার খুব যে অপ্রাসঙ্গিক বা জ্ঞান উপদেশের মতো শুনতে, তাও নয়। কোন কারণে অপমানিত বোধ করলে আমার রাগ হয়। আবার দুঃখও হয়। এমন অবস্থায় অনেককে দেখেছি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোমর বেঁধে লড়াই করতে শুরু করে। যার পরিণামে কখনোই হারজিতের মীমাংসা হয় না। বরং উত্তেজনার বশে প্রসঙ্গের বাইরে চলে গিয়ে, শালীনতার সীমা ডিঙ্গিয়ে, কিছু অরুচিকর আপত্তিজনক মন্তব্য করে ফেলে। যা থেকে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বেণুবিনোদবাবুকে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। চা করে আনি। আমি যে প্রসঙ্গটাকে সম্পূর্ণ উহ্য করে দিয়ে ওনাকে বসার জন্য অনুরোধ করব, এটা উনি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারেননি। 'নিশ্চয়ই' বলছি এই কারণে যে মুহূর্তে ওনার কৌতুকী দৃষ্টি বদলে গিয়ে চোখমুখে অপ্রস্তুত এবং কিছুটা অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠল। জড়ানো গলায় বললেন, বসব বলছ?

আমি হেসে বললাম, অবশ্যই। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

বেণুবিনোদবাবু বেতের একটি মোড়াকে অযথাই বার কয়েক এপাশ ওপাশ করে তার ওপর বসলেন। যেন আমাদের বারান্দার মেঝেটা অসমতল। মোড়াটাকে তাই এপাশ ওপাশ করে অ্যাডজাস্ট করলেন। বা মোড়াটা তাঁর শারীরিক ভার সহ্য করার মতো শক্তপোক্ত কিনা, এটা পরখ করে নিলেন। বুঝতে পারলাম উনি যা করলেন সেটা ওনার বিস্মিত ভাবটুকুকে আড়াল করার একটি দুর্বল হাস্যকর চেষ্টামাত্র।

সিদ্ধার্থ এমনিতে চায়ের ভক্ত নয়। কিন্তু আজই হঠাৎ চায়ের কাপ ডিস হাতে

আমাকে দেখেই আদুরে গলায় বলে উঠল, আমার একটু হবে? দু আঙ্গুলের মাপে দেখাল, এতটুকু হলেও চলবে।

সিদ্ধার্থ বেণুবিনোদবাবুর পাশের চেয়ারটিতে বসেছে। উল্টোদিকের একটি চেয়ার দেখিয়ে বলল, মাকে ডাক না। এই চেয়ারটায় বসবে।

আমি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম, মায়ের শরীর খারাপ। ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই কথা বলতে পারল না। তুই একবার ডেকে দেখ না।

— ডাকলাম তো। সিদ্ধার্থ হতাশ গলায় বলল, সাড়াই দিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে!

— যদি কিছু মনে না কর! বেণুবিনোদবাবুর গলার স্বরে অপরাধীর আকুতি, আমি একবার ডেকে দেখব? একটু থেমে বললেন, যদি না ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন, আমি এসেছি শুনলে অন্তত একবার একমুহূর্তের জন্যও এখানে আসবেন।

— চেষ্টা করেই দেখুন না। আমি বললাম, যদি জেগে থাকে, আপনার ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। বলা যায় না ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার বটে। বেণুবিনোদবাবু বার দুই 'মাসীমা-মাসীমা' বলে ডাকতেই মায়ের সাড়া পাওয়া গেল ক্ষীণ স্বরে, কে?

— আমি। আপনার বড় ছেলে। নরম গলায় জবাব দিলেন বেণুবিনোদ।

— ওমা! বিনোদ এসেছো! বলতে বলতে মা পরণের শাড়ি কোনরকমে জড়িয়ে পাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। অবাক তো আমি হয়েইছি। তার চেয়ে বেশী রাগ হল মায়ের ওপর। মা এমন আত্মহারার মতো ঘরের দরজা হাট করে খুলে অবিন্যস্ত শাড়ি সামলাতে সামলাতে একরকম ছুটেই এল, যেন মায়ের অতি প্রিয় সৈনিক পুত্র বিপদসংকুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরে 'মা' বলে ডাকছে।

আমি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে চাপা গলায় মাকে বললাম, তোমার শরীর ভালো হয়ে গেছে?

বেণুবিনোদবাবুর গলার আওয়াজ শুনে মা এমনই অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যে আমার কথা শুনতেই পেল না। কিম্বা শুনে থাকলেও কোনরকম গুরুত্ব দিল না। সিদ্ধার্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে মাকে ডাকল, এসো মা। তুমি এখানে বসো।

আমি জানি এখন এই মুহূর্তে আমি যদি পিছন ফিরে তাকাই, অবশ্যই দেখব সিদ্ধার্থ এবং বেণুবিনোদবাবু দুজনের ঠোঁটের কোণেই অর্থপূর্ণ হাসি এবং দুজনেই চেরা চোখে আমাকে দেখছে। শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করে আমি ওদের দুজনকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, মা কোনমতেই বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসতে পারবে না। আমার

ধারণাকে ভেঙ্গে দিতে পেরে ওরা দুজনেই যে খুশি, ওদের হাসিতে, চোখের দৃষ্টিতে তারই ইঙ্গিত। ইচ্ছে করলে আমি মাকে আর একবার উঁচু গলায় ডাকতে পারতাম। বা মাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে শাড়িটাকে ঠিকঠাকমত পরিয়ে দিতে পারতাম। এ দুয়ের কোনটাই করলাম না। কারণ আমার কেন যেন মনে হল, মা, ডাক্তারবাবু এবং বেণুবিনোদবাবু দুজনের ক্ষেত্রে যে দুরকম আচরণ করল, এটা একটা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। এর একমাত্র কারণ আমি। বেণুবিনোদবাবুকে আমি যে খুব একটা পছন্দ করি না এবং কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখি ওনাকে, এটা বুঝতে পেরেই মা ডাক্তারবাবুর উপস্থিতিতে আমার অনুরোধে বাইরে আসার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করে, পরমুহূর্তেই বেণুবিনোদবাবুর একবার ডাকেই উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে, হয়ত আমায় বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, বেণুবিনোদবাবুকে আমি যে চোখেই দেখি না কেন, মা তা নিয়ে এতটুকু বিচলিত নয়। বরং এক্ষেত্রে আমার বিরোধীতা করে মা পরোক্ষে বুঝিয়ে দিল যে ভবিষ্যতে আমি যেন এমন ভুল না করি বা করলেও মা তার বিপরীত আচরণ করে আমায় হেয় অপদস্থ করে বুঝিয়ে দেবে যে, বাবার অবর্তমানে মা এখনও শেষ কথাটি বলার অধিকারী। কে আসবে, কে আসবে না অথবা কার উপস্থিতি অসহ্য বিরক্তিকর বা কার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী, এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্তটি মা-ই নেবে।

চায়ের ট্রে হাতে আমাকে আসতে দেখেই বেণুবিনোদবাবু হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, এয়ার ইন্ডিয়ার পাগড়ি মাথায় মানুষটির মতো সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাসিমুখে বললেন, চা হাতে তোমাকে মা জগদ্ধাত্রীর মতো দেখাচ্ছে।

কথাটার মধ্যে তীব্র শ্লেষ রয়েছে যা আমাকে বিঁধল, এটা নিশ্চয়ই স্তুতি নয়। বিদ্রুপ বলেই ধরতে পারি।

বেণুবিনোদবাবু হতচকিত গলায় বললেন, আমি অকারণে তোমায় বিদ্রুপ করতে যাব কেন?

— বারে! জগৎকে ধারণ করে আছেন যিনি, তাঁর হাতে চায়ের ট্রে! একটু থেমে বললাম, কেমন অবিশ্বাস্য শোনায় না?

— আমি কিন্তু মোটেই সে অর্থে বলিনি। বেণুবিনোদবাবুর গলায় আত্মরক্ষার সুর, প্রত্যেক সংসারেই একজন জগদ্ধাত্রী আছেন। তিনি জননী জায়া যে কেউ হতে পারেন। সংসার তো এই জগৎ সংসারের ক্ষুদ্র রূপ। বলতে পার একক। একটু চুপ করে থেকে বললেন, চায়ের ট্রে হাতে সাবধানে তোমাকে আসতে দেখে জগদ্ধাত্রীর উপমাটাই মাথায় এল। আমরা যারা এখানে বসে রয়েছি, মানে আমি তোমার মা, সিদ্ধার্থ প্রত্যেকের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাটুকু দুহাতে আগলে নিয়ে আসছ। জগদ্ধাত্রী কেবল অন্নের সংস্থানই করেন না,

যখন যার যা কিছু এবং যত অকিঞ্চিকর ইচ্ছাই জাগুক না মনে, মা সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাসনাটুকুকে পূরণ করে দেন। ধারণ করে আছেন কিনা! সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি।

টেবিলে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে মাকে বললাম, তোমার জন্য চিনি কম, লিকার চা। সিদ্ধার্থ আবার চায়ে চিনি বেশী খায়, প্রায় সরবতের কাছাকাছি, এই আকাশি রংয়ের কাপটা সিদ্ধার্থর। আর বেণুবাবু? বলে আমি বেশ বড় মাপের একটি কাপ তাঁর সামনে এগিয়ে ধরলাম, এটা আপনার। মাঝারি চিনি। দুধের পরিমানও বেশী নয়।

— আর নিজের? বেণুবিনোদবাবু চায়ের কাপ গুনতে লাগলেন।

এবার আমি হেসে ফেললাম, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে সে ধরণের বোকা বলে মনে করেন না। রান্নাঘরে রাখা আছে। একসঙ্গে আনতে অসুবিধা হচ্ছিল। গুলিয়ে ফেলার ভয়ও করছিল। আপনাদের দিয়ে থুয়ে! বলে আমি হাতে হাত ঘষলাম, এবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের খাওয়া।

— ঠিক এই জায়গাটাই বোঝাতে চাইছিলাম আমি। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যিনি প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, খুঁটিনাটি কার কী প্রয়োজন, নিজের সব কাজ ফেলে আগে সেই কাজ সম্পন্ন করেন, সংসারে তাঁকেই জগদ্ধাত্রী বলে। জগদ্ধাত্রী শব্দটা আমাদের অতি পরিচিত এবং এর আভিধানিক বা ব্যবহারিক অর্থও বোঝেন সকলে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি হলে জগদ্ধাত্রী। নামটির পৌরাণিক ব্যাখ্যাটুকু উপেক্ষা করতে পারলে, জগদ্ধাত্রীর পরিবর্তে দিদি বললেই বা কী আসে যায়।

বেণুবিনোদবাবুর কথাবার্তায় অয়নের ঝোঁক আছে। পার্থক্য একটাই, তা হল, অয়ন যে কোন প্রসঙ্গে আর্থ-সামাজিক নীতি, রাজনীতি এইসব টেনে নিয়ে আসত, বেণুবিনোদবাবু সেসবের পরিবর্তে ঘরোয়া পারিবারিক উদাহরণ বা পৌরাণিক বিষয়কে নিজের বক্তব্যের মধ্যে গুঁজে দেন। শুনতে মন্দ লাগে না। আবার যেহেতু ভদ্রলোক আমার পছন্দের তালিকাভুক্ত নন, সেই কারণে ওনার কথার পিঠে পাল্টা কথা চাপিয়ে দিতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাই। অয়নের কাছে পরাজিত হলে মনে হত সেটা আমার গৌরব। এনার ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। মনে হয় হেরে গেলাম। যে হারের মধ্যে লজ্জা আছে। রাগ আছে।

রান্নাঘর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি, মা বেশ উঁচু গলায় কথা বলছে, আপনি এলে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায়! আর মনটাও বেশ ভাল হয়ে ওঠে।

— সেটা তো আমার সৌভাগ্য। বেণুবিনোদবাবুর জবাব, দুঃখের পৃথিবীতে একজন

মানুষকেও যদি আনন্দ দিতে পারি, তার চেয়ে বড় পাওনা আর কি আছে বলুন? ঈশ্বরের এই আনন্দময় পৃথিবীতে আনন্দ লুটে নিতে হয়। যিনি তার খোঁজ পাছেন না, তাঁকে খুঁজে দিতে হয়।

— একশবার। সিদ্ধার্থর গলা, সেইজন্যেই না আপনাকে খুঁজে নিয়ে আসি। মা যে আবার আগের মতো কথাবার্তা বলবে, হাসবে, আপনি না এলে তা ভাবতেই পারতাম না।

— তুমি যেভাবে বলছ, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। বেণুবিনোদবাবুর বিনয়ী গলা, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ বা তোমাদের বাড়িতে আমার আসা, না-আসা সবই পূর্বপরিকল্পিত। তিনিই সব ঠিক করে দিয়েছেন, কাকে দিয়ে কাঁটা বেঁধাবেন। ফুল ফোটাবেন কাকে দিয়ে। তুমি আমি তো নিমিত্তমাত্র। তাঁর দাস। যেমন যেমন হুকুম করছেন, তেমন তেমন করছি। জানবে ভালোতেও তিনি। আবার মন্দতেও তিনি। তিনিই ধ্বংস করেন। আবার সৃষ্টির বীজ তিনিই বপন করেন।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশ। সোনার পাতের মতো রোদ্দুর। গাছের সবুজ পাতা। নীচু স্বরে একটা পাখি ডাকছে। এই ভিস্যুয়াল ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবহ সংগীতের মতো শোনাচ্ছে পাখির ডাক। আমি নাস্তিক নই। আবার পুরোপুরি আস্তিকও নই। তবু বেণুবিনোদবাবুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে, চার পাশের এমন প্রাকৃতিক সমারোহ এবং এত অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্বের মূলে সত্যি বুঝি কেউ একজন আছেন। অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় কোন কোন ঘটনার কার্যকারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া না গেলে, অদৃশ্য সেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাকে বুঝি বা অস্বীকার করা যায় না। যেমন আমার মায়ের ক্ষেত্রে যে আশ্চর্যরকম পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, সেখানে বেণুবিনোদবাবুকে উপলক্ষ্য ভেবে নিলে, দ্বিতীয় আর একজন বা একটি শক্তির অস্তিত্বকে মানতেই হবে। মায়ের নানাবিধ চিকিৎসা করানো হয়েছে। অনেক বড় মাপের ডাক্তার মায়ের সম্পর্কে হতাশ মন্তব্য করেছেন। আমি এবং বাড়ির অন্যান্যরাও ধরে নিয়েছিলাম, মা যেকদ্দিন বাঁচবে, আলো থেকে মুখ লুকিয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে মায়ের দিন কাটবে। মা যে স্বইচ্ছায় ঘর ছেড়ে বেরোবে বা অচেনা একজনের মুখোমুখি বসে সাবলীল গল্পগুজব করবে, এটা আমাদের স্বপ্নের অতীত ছিল। কিন্তু আজ নিয়ে পরপর দুদিন নিজের চোখে দেখছি, মা যেন আগের মানুষটির মতো বা তার চেয়েও আরও বেশী সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। এটা যেমন বেণুবিনোদবাবুর ব্যক্তিত্ব বা সম্মোহনী ক্ষমতা বা ঐ জাতীয় কিছু, আবার এটাও তো অস্বীকার করতে পারি না যে

বেণুবিনোদবাবুর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক আলাপটিও অভাবনীয় অবিশ্বাস্যরকম একটা কিছু। এখন সেই পূর্বপরিচিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী সব কিছু হচ্ছে। পরিচালক অন্তরালে। যদি তিনি বোঝেন চিত্রনাট্যে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে হবে বা এখন এই মুহূর্তে কাজ শুরু করে সামান্য বিলম্বিত লয়ে এবং সম্পূর্ণ বিপরীত কৌশলপদ্ধতির দ্বারা কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে, তবে তাই হবে। তখন হয়ত দেখা যাবে, বেণুবিনোদবাবু কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলেন বা মা হঠাৎ করে বেঁকে বসল ঘর ছেড়ে বেরোলেই না বা বেণুবিনোদবাবুর কথার জবাবে এলোমেলো যোগসূত্রহীন জবাব দিতে শুরু করল, যাতে বেণুবিনোদবাবু অসন্তুষ্ট এবং অপমানিত বোধ করে চলে গেলেন। পরিবর্তে অন্য কেউ এলেন বা মায়ের মনেই হঠাৎ করে বোধোদয় হল, মায়ের চোখের ওপর বাঁধা কালো কাপড়টা এক ঝটকায় নিজেই খুলে ফেলল, এমনি কত কী-ই হতে পারে।

— আপনার আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্য নেই। যদি বলেন, মনের জোর, সেটাও তো তাঁরই দান। তাঁর কৃপা হলে অসাধ্য সাধন হবে। জলে শিলা ভাসবে। বেণুবিনোদবাবুর কথাগুলি মনে হচ্ছে যেন ফুলের রেণুর মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে রান্নাঘরের জানলা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

— আর এসবের মূলে চাই বিশ্বাস। সত্যি সত্যি সত্যি, তিন সত্যির মতো জোরদার বিশ্বাস হলে, তার জোরে উতরে যাবেন। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা জড়িয়ে যাবার ভয় থাকে না। বিশ্বাসের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে নিলে, অনিষ্টকারী কোন শক্তিই সাহস পাবে না আপনার কাছে ঘেঁসতে।

মা কী বুঝছে বা আদৌ কিছু বুঝছে কিনা জানি না। তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই অপার বিস্ময়ে বেণুবিনোদবাবুর মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। আমারও কেমন যেন মনে হচ্ছে, সামনাসামনি নয়, বরং কিছুটা দূরে এবং অন্তরালে বলেই বোধহয় কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণময়তায় আমার বোধ সত্তা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেদরেখা, যুক্তিতর্কের প্রবণতা, সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে বাবা নয়, কিন্তু বাবার মতো একজন, তাঁর পেলব কথার প্রলেপে মা সিদ্ধার্থ এমনকি আমারও সমস্ত ক্ষতকে ঢেকে দিচ্ছেন। বাবার অবর্তমানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, নিরাপত্তার যে স্তম্ভটি কাত হয়ে পড়েছিল, দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ এবং ভালবাসার ঘাটতি হেতু যে ছন্দপতন ঘটেছিল, বেণুবিনোদবাবুর আগমনে সে-সবের যেন পুনরুদ্ধার ঘটতে চলেছে।

চায়ের কাপটা রান্নাঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে আমি জানলা ধরে দাঁড়িয়ে বেণুবিনোদবাবুর কথাগুলি শুনছি এবং সত্যি রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বুঝতে পারছি চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব বুঝে এবং জেনেও আমি যেন সেই অসহায় মানুষটি যে বুকের মধ্যে কান্নাকে আটকে রেখে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে জেনেও, আই অ্যাম আনডান। আর বুঝিবা পিছন ফিরে তাকালেও সেই পথটির কোন চিহ্ন খুঁজে পাব না, যে পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, পথের দুপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সচেতন সাবধানী পায়ে এতটা দূরত্ব পার হয়ে এলাম।

— সংসারী মানুষদেরও উপায় আছে বৈকি! সামান্যক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বেণুবিনোদবাবুর গলা শুনতে পাচ্ছি, সুযোগ পেলেই তাঁকে স্মরণ-মনন করা। গেরস্ত বাড়ির বৌ যেমন উতলে ওঠা দুধে ফুঁ দিচ্ছে, আবার পিছন পানে না ফিরেও কোলের সন্তানটির মাথায় আস্তো চাপড় দিয়ে তার কান্না থামাবার চেষ্টা করছে, ঠিক সেইরকমভাবে একহাতে সংসার প্রতিপালন, অন্য হাতে তাঁর পা দুটি ছুঁয়ে রাখা। সেই আগের কথা, বিশ্বাস। মা যেমন চোখে না দেখেও, ক্রন্দনরত শিশুটিকে থামাবার জন্য তার গায়ে হাত রেখে স্নেহ মায়া মমতাকে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন, আমরা সাধারণ মানুষরাও তেমনি একাজ সেকাজের মধ্যেও তাঁর পাদুটি ছুঁয়ে থাকি মাত্র, তাতেই সব হবে। অসম্ভব সম্ভব হবে। সমস্ত দুঃখকষ্টের পূর্ণ নিরাময় হয়ত নয়, কিন্তু লাঘব হবে। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলি তাঁর চরণে সঁপে দিলে, তিনি সঠিকটি বেছে নেবেন। আমাদের আর পাঁকে পরার ভয় থাকবে না। দড়ির ফাঁসেও কেউ আমাদের বাঁধতে পারবে না।

আমি বুঝতে পারছি, আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত কাঁপন শুরু হয়েছে। আমার চেনা বাগান, পরিচিত চারপাশ সব কেমন বদলে যাচ্ছে। কানের মধ্যে তীব্র জলোচ্ছ্বাস। জাগতিক কোন শব্দই আমার কানে পৌঁছচ্ছে না। আমার পায়ের নীচের মাটি যেন প্রবল আলোড়নে দুলতে শুরু করেছে। আমি কোনমতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। খুব জোরে চীৎকার করে 'মা' বলে ডাকবার চেষ্টা করলাম। কোন শব্দ বেরোল না মুখ দিয়ে। পরিবর্তে আমার চোখের সামনে হাত বড়ানো দূরত্বে ভেসে বেড়াচ্ছে দুটো তিনটে চারটে ছটা, সার সার রামধনু। ছোট বড় মাঝারি। হাজার চেষ্টা করেও আমি জানলার গরাদ থেকে নিজের হাতটাকে খুলতে পারছি না। আমার নাগালের মধ্যে সাতরঙা বাহারী রামধনু। আমি কিছুতেই তাদের নাগাল পাচ্ছি না।

দূরাগত ট্রেনের শব্দের মতো ঘুম ছুটে আসছে। আমার সারা শরীর জুড়ে কুয়াশা

নামছে। তারা ছড়িয়ে পড়ছে। জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা লম্বা শ্বাস বুকের মধ্যে থেকে বেরোনোর জন্য হাঁসফাঁস করছে। আমি আমার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মাকে ডাকতে চাইলাম। ঘুম আসার আগে মাকে একবার কাছে ডাকা খুব জরুরী। কেন, সে কি ছাই জানি। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জানি মা ছাড়া আমার এই আর্তি কেউ শুনতে পাবে না। আমার এই অদ্ভুত ঘোরলাগা অবস্থার কারণ কেউ বুঝতে পারবে না। মা ... শুধু মা! মাকে যে আমার খুব দরকার। ভীষণ প্রয়োজন।

কুড়ি

সত্যিই কি আমি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম? তাহলে অমন একটা স্বপ্ন দেখলাম কেমন করে? আমি আর অয়ন একটা নদীর পার ধরে হেঁটে যাচ্ছি। নদীটি তেমন চওড়া নয়। কিন্তু খরস্রোতা। সবুজ বনের মধ্যে দিয়ে নদীটি বয়ে চলেছে। সূর্যের আলো গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে মাটিতে সুন্দর সুন্দর নক্সা তৈরী করেছে। বিভিন্ন পাখির ভিন্ন সুর আর তীব্রতার ডাক মিলেমিশে ইংরেজী বাংলার মতো শোনাচ্ছে। সময়টা শেষ সকাল এবং দুপুরের কাছাকাছি। অয়নের পরনে সৈনিকের পোশাক। হাতে রাইফেল। মাথার টুপিটা বুকের কাছ বরাবর ঝুলছে। আমার সঙ্গে কথা বলছে, নীচু গলায় হাসছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্রতা। থেকে থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন পানে এপাশ ওপাশ দেখছে।

আমি তো অয়নকে কোনদিন এমন পোশাকে দেখিনি। আমার বেশ হাসি পাচ্ছে। কিন্তু সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না। এমনকি আমি একবার আস্তো করে ওর হাত ছোঁওয়ার চেষ্টা করতেই চকিতে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, এখন আবেগের সময় নয়।

আমার বেশ অবাক লাগল। মনে মনে একটু আহতও হলাম। প্রকৃতির এমন মনোরম সজ্জার মধ্যে দিয়ে নির্জনে শুধু আমরা দুজনে হাঁটছি, কোন অনুসরণকারী গোপনে আমাদের ওপর নজর রাখছে না, অনুশাসনকারী কোন চোখের ভয়ে অমাদের মধ্যে কোন সন্ত্রস্ত ভাব নেই, এ সময়ে আবেগ উচ্ছ্বাস এমনকি একটু প্রগলভতাই তো স্বাভাবিক। শাড়ির আঁচল আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে আমি অভিমানী গলায় বললাম, আমার উপস্থিতিতে তুমি কি বিরক্ত বোধ করছ?

অয়ন ঠোঁট বন্ধ করে শব্দহীন হাসল একটু। যেন আমার প্রশ্নটা নিতান্তই

ছেলেমানুষের মতো বা অবিবেচকের মতো মনে হয়েছে তার। আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। নির্লিপ্ত চাউনি অয়নের। গলাটাকে যথাসম্ভব নামিয়ে থেমে থেমে বলল, বড় কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা পার হচ্ছি নীরু। চারপাশে চরম মাৎসন্যায়। একটু থেমে বলল, মাঝে মাঝে ভয় হয়, হঠাৎ না দুর্বল হয়ে পড়ি। পদস্খলন ঘটে।

অয়ন রাজনীতি করে। অহিংস নয়, সহিংস রাজনীতি। নিজের কেরিয়ারের তোয়াক্কা না করে, শহুরে সুখস্বাচ্ছন্দ ছেড়ে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সংগঠনের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে কাজ করে চলেছে। ওর এবং ওর মতো আরও অনেকে যারা আত্মগোপন করে চরম কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে জীবনের একটা অমূল্য সময় পার করে দিচ্ছে, স্বীকার করি এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মহান, কিন্তু বাস্তবে কি তা কোনদিন সম্ভব হবে? আমাদের এই বিশাল দেশ, বিভিন্ন ধর্ম এবং ভাষাভাষির মানুষজন সকলকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে আসা কি সত্যি সম্ভব? সর্বোপরি অয়নরা যেভাবে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে আমার কাছে সেটা, অসম্ভব অবাস্তব ইউটোপিয়ান চিন্তাভাবনা বলে মনে হয়। কয়েক দশক আগে একই রকম কায়দায় লড়াই চালাতে গিয়ে ওরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেক অমূল্য প্রাণ অকারণে অকালে নষ্ট হয়েছে। ওরাও প্রাণ নিয়েছে অনেক নির্দোষ নিরীহ মানুষের। কান পাতলে এখনও শোনা যায়, ওদের সম্পর্কে মানুষের যতটুকু শ্রদ্ধাসম্ভ্রম আছে, ভয় এবং অবিশ্বাস তার চেয়ে বেশী। ওরা সবাই খারাপ বলছি না। আবার ওরা যাদের প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী বলে ধরে নিয়েছিল, তারাও সবাই খারাপ ছিল না। একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু প্রয়োগকৌশলের পথ ভিন্ন। এর বাইরে আর কি তফাৎ থাকতে পারে?

'পাওয়ার ট্রেন্ডস টু কোরাপ্ট' — এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কে বলতে পারে অয়নরা ক্ষমতায় এলে তাদের মজ্জাতেও ঘুণ ধরবে না? অয়ন যে সমস্ত মানুষকে তার আদর্শ বলে মনে করত, যারা ছিল ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকর্মী আজ তাদের অনেকেই শিবির বদল করেছে। পোশাকের রং পাল্টে ফেলেছে। এককালের শত্রুরাই আজ তাদের কাছের মানুষ। সামাজিক স্তরভেদে তারা উচ্চবৃত্তীয়। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশুনা করে। তা নাহলে মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানীতে চাকরি করে উঁচুপদে। যদিও এখনও তারা সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপক্ষে আলোচনা করে। কেবলমাত্র পাড়ায় এবং কর্মস্থলে শাসকদলের প্রতি আনুগত্য দেখায়।

অয়ন প্রায়ই বলত, বিপ্লবীদের মধ্যে বর্ণচোরা গিরগিটিরা থাকে আত্মগোপন করে।

তবে এরা নাকি বেশীদিন নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে না। চিহ্নিত হয়ে যায়। কিম্বা জনজোয়ারের ধাক্কায় ভেসে যায়। তলিয়ে যায়।

আজ যদি অয়ন এ শহরে থাকত, আমি ওকে চোখে আঙুল দিয়ে হাতে গুণে দেখিয়ে দিতাম, ওর বিশ্বাসে যারা ছিল আদর্শবান খাঁটি সৈনিক, আজ তারা কেমন অনায়াসে চলতি স্রোতে গা ভাসিয়ে কেউ ব্যবসায়ী, কেউ প্রমোটার, কেউ বা আবার তুখোড় উকিল। চুটিয়ে টিউশন করে কেউ আবার, এ শহরের নামী মাস্টারমশাই।

এরা কি কেউ অয়নকে মনে রেখেছে? এদের মধ্যে অনেকেই জানে অয়নের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কই, কেউ তো কোনদিন ভুলেও আমার কাছে অয়নের খবর জানতে চায় না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এরা হয়ত অয়নকে হঠকারী নির্বোধ বা ক্ষমতালোভী বলে। কারণ মূল লড়াই থেকে দূরে সরে গিয়ে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আজ এরা এত দল এবং উপদলে বিভক্ত যে, অয়নকে ব্যক্তিগতভাবে এদেরে মধ্যে কে বা কতজন সমর্থন করে, আমি জানি না। আমি যখন এদের দেখি এদের সুখী মুখগুলির দিকে সন্তর্পণে তাকাই, তখন এক কালের এইসব বীর সৈনিকদের কপালে তিলক এবং পরণে হলুদ বসন দেখে, অয়নকে স্মরণ করি এবং একমাত্র এই আপেক্ষিক তুলনায় অয়নের জন্য গর্ব বোধ করি। মনে মনে ওকে ডাকি 'রাজর্ষি' বলে।

আমি জানি প্রত্যেক মানুষের মতো অয়নের মধ্যেও কিছু বৈপরীত্য আছে। আবার এটাও জানি নিজের বিশ্বাসে ও যেটাকে সঠিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে, তার পরিণামটুকু শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ে না। এমন ক্ষেত্রে বহুদিনের অভ্যাস বা অতি প্রিয় কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে হেলায় ঠেলে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। যেমন একটা সময় ছিল যখন ও প্রতিদিন নিয়ম করে আমাদের বাড়ি আসত। পাখি পড়ানোর মতো করে ওর রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা শোনাত আমাকে। আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বকে ছাপিয়ে অন্যরকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিল। আমি তখন সদ্য কৈশোর ছেড়ে যৌবনের উপবনে প্রবেশ করেছি। সঙ্গত কারণেই অয়নের উপস্থিতি, তার কথা বলার ধরণ, আলোচনাকে বিভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার সাহস এবং ক্ষমতা, এসব কিছুই আমাকে ভীষণভাবে টানত। মনে মনে আমি স্থির বিশ্বাসী ছিলাম যে, স্থায়ী একটা রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেলে, অয়ন নিজেই হয়ত আমার দ্বিধাসংকোচ এবং লজ্জার আবরণটা টেনে নামিয়ে দিয়ে বলবে, আগামী মাসেই আমি তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব পাকাপাকিভাবে।

আমার ধারণা অয়নকে যে আমি নিবিড়ভাবে পেতে চাইছিলাম, অথচ আর পাঁচটা

সাধারণ মেয়ের সঙ্গে মুখ ফুটে যে কথা বলতে পারছিলাম না, এ ব্যাপারটা ও বুঝতে পারত।যে সব মেয়ে আগ বাড়িয়ে নির্লজ্জের মতো নিজের মনের গোপন বাসনা প্রকাশ করে ফেলে, আমি যে তাদের দলে পড়ি না, এটা অয়ন বুঝতে পারত। তারপরেও অয়ন মুখের ফাঁসে কোনদিন এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি, যা শুনে মনে হতে পারে, আমাকে ও নিজের জীবনসঙ্গিনী বা ঐ জাতীয় কিছু মনে করে। একটা সময় এল যখন আমার মনে হতে লাগল অয়ন আমাকে ওর শিক্ষার্থী বলে মনে করে। বা আমার মনে ওর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে চারিয়ে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

অয়ন সম্পর্কে আমার ঠিক মোহভঙ্গ নয়, কিন্তু একটু অন্যরকম ধারণা তৈরী হতে লাগল। আমি ওর মতো আপাদমস্তক রাজনীতিক নই। পৃথিবীর যে কোন ঘটনাকে ও যেমন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে ভালবাসে, আমি তার সঙ্গেও একশভাগ একমত নই। সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত মেয়ে যেমন হয়, আমিও সেই গোত্রীয়। আমার যেমন রাগ দুঃখ অভিমান আছে, সমপরিমাণে আবেগ উচ্ছ্বাস আছে। আমার বুদ্ধির তারিফ করলে, রূপের প্রশংসা করলে, আমি খুশি হই। আমি অয়নের মতো যে কোন ঘটনা এবং অবস্থার পিছনে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ খুঁজতে চাই না, বরং অয়ন ভীষণ ইমপ্রেসিভ কোন কথা বললেই, সারাদিন সেই কথাটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করি।

এই যেমন স্বপ্নের মধ্যে অয়ন আর আমি মনোরম প্রাকৃতিক প্রচ্ছায়ার মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি বা অয়ন আমার খুব কাছে সরে এসে আস্তো করে আমার হাতটা ধরবে বা আমার কপালে নুয়ে পড়া অবাধ্য একটি চুলকে সযত্নে সরিয়ে দেবে যথাস্থানে। এ সবের কিছুই হচ্ছে না। আবেগ উচ্ছ্বাসে আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে। অথচ কিছু বলতেও পারছি না। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না গোছের অবস্থা। এ অসহনীয় কষ্ট। নিজের ইচ্ছাবাসনাকে দমিয়ে রেখে নিজেকে পীড়িত করার যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। অথচ অবাক কাণ্ড, তারপরেও আমি নিঃশব্দে অয়নকে অনুসরণ করে চলেছি। এইসব মুহূর্তে অয়নকে রক্ত মাংসের মানুষ বলে ভাবতে আমার কেমন ধন্দ জাগে মনে। যে মানুষ তার সবচেয়ে কাছের জনের বুকের স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারে না, শিল্পী, দার্শনিক, যোদ্ধা হিসাবে সে বড় মাপের হতে পারে, কিন্তু কখনই মানুষ নয়। রাগ বিদ্বেষ ঘৃণা যেমন সত্যি, আবার আবেগ, সে-ও তো মিথ্যে নয়। আমার তো মনে হয় আবেগ সবচেয়ে বড় অনুভূতি। আবেগের আতিশয্যে কোন মানুষ যদি সামান্য বাড়াবাড়ি করে ফেলে বা অকারণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়, তবু আমার বিচারে সেই

মানুষটি রাজার রাজা। একজন মানুষের মধ্যে আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, কেবলই সে যুক্তি তর্কের জাল বোনে, সব কিছুর মধ্যেই সন্দেহ অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পায়, রূপরসে টইটম্বুর এমন সুন্দর পৃথিবীটা তার কাছে নিতান্তই গদ্যময়, এমন মানুষের সান্নিধ্য কিছু সময়ের জন্য ভাল লাগে, হয়ত কিছু অবাক মুগ্ধতাও তৈরী হয় তার সম্পর্কে, কিন্তু অচিরেই তার রেশ কেটে যায়। যে ফুল কেবলই দেখতে ভাল, কিন্তু এতটুকু সুবাস ছড়ায় না, সেই ফুলটি নিয়ে দুচার দিন ভুলে থাকা যায়, কিন্তু সুগন্ধী ফুল শুকিয়ে ঝরে গেলেও তার সৌরভটুকু যেন বাতাসে ভর করে কেবল চারপাশে উড়েই বেড়ায় না, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাকাশ পরিব্যাপ্ত করে ফেলে।

চলতে চলতে আমি আর অয়ন একটি বিস্তীর্ণ মাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এখানে আকাশটা ঝুঁকে পড়ে চরাচরের বুকে মুখ লুকিয়েছে। সোনালী রোদ্দুরে সবুজ ঘাস আর গাছের পাতায় সোনার দ্যুতি। এমন ধূ ধূ দৃষ্টি-ছাড়ানো চরাচর আমি আগে কোনদিন দেখিনি।

অয়ন হঠাৎ সেই মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চাপা কিন্তু উত্তেজিত গলায় বলল, তুমি কি কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ নীরু?

আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম, কই না তো!

— কোন গন্ধ পাচ্ছ?

এবারেও ঘাড় দোলালাম, না।

— আলোর ক্ষীণ অস্পষ্ট কোন রেখা কি তোমার চোখে পড়ছে?

অয়নের এমন আজগুবি প্রশ্নে চোখ বন্ধ করে আমি নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়লাম, কিচ্ছু দেখতে পারছি না। নাক টেনেও বাতাসে কোন গন্ধের উপস্থিতি টের পাচ্ছি না।

— সত্যিই না! কথাটা অয়ন এমন টেনে টেনে উচ্চারণ করল, যেন ওর জিজ্ঞাস্য প্রতিটি জবাবের সঠিক জবাব একমাত্র আমিই দিতে পারি।

আমার নেগেটিভ জবাবে অয়ন নিশ্চয়ই খুশি হয়নি।

তারপরেও আশ্চর্য, অয়ন গম্ভীর মুখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমার একটু কাছে এগিয়ে এসে, যেন কোন গোপন কথা বলছে, এমনি নীচু স্বরে বলল, আমি কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। প্রদীপের ক্ষীণ আলো আমার চোখে পড়ছে। আর চারপাশ জুড়ে ধুনোর গন্ধ ম-ম করছে। একটু থেমে বলল, কেন আমার এমন হচ্ছে বল তো?

— জানি না। আমি আস্তো করে ঘাড় নাড়ালাম।

— যুদ্ধ তো এখনও শেষ হয়নি। তবে কি! বলে অয়ন একটু থামল, আমাদের শেষ লড়াইটা লড়তে হবে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে?

— ধার্মিক মানেই মৌলবাদী, এটা বোধহয় ঠিক কথা নয়। আমি মৃদু আপত্তির সুরে বললাম, পরাধীন ভারতের অনেক বিপ্লবী, যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী ছিলেন।

— তা ঠিক। অয়নের গলার স্বরে বিস্মিত চিন্তার ছাপ, ধর্ম মানে তো কোন প্রতিযোগিতা নয়। অকারণে বিরুদ্ধবাদীকে আক্রমণ করা নয় বা নোংরা কুৎসিত কুসংস্কারকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা নয়। অয়ন একটু থামল, ইদানীং আমার কি মনে হয় জান, নীরু? মনে হয় ধর্ম মানে আত্মবিশ্বাস। যে বিশ্বাস একটি মানুষকে আরও বেশী সৎ উদার এবং নির্ভীক করে তোলে।

এতক্ষণ অয়নের কথাবার্তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ধর্ম সম্পর্কে ওর ডেফিনেশনটা কেমন সব গোলমাল করে দিল। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম অল্পক্ষণ। ও বোধহয় আমার এমন অপলক চেয়ে থাকা খেয়ালই করল না। যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। এমনি ওর চোখমুখের চেহারা।

— আমাদের অনেক ভুল হয়েছে। যেমন স্কুল কলেজ বয়কট করা। মূর্তি ভাঙ্গা। সর্বোপরি যাকেই শত্রু বলে মনে হয়েছে, মুহূর্তে তার নাম খতম তালিকায় তুলে নিয়েছি। একবারও ভেবে দেখিনি, শত্রুতার মূল কারণটা কি! নীতি আদর্শগত বিরোধ নাকি নিছকই বিপক্ষ শিবিরের লোক, তাই! অন্যেরাও যে আমাদের ক্ষেত্রে এমন আচরণ করেনি, তা নয়। আমাদেরও অনেক নিষ্ঠাবান সৎ কমরেড খুন হয়েছে। কাশীপুর বরানগরে গণহত্যা চালিয়েছে পুলিশ। আবার আমাদের মধ্যে থেকেও সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ পুলিশের চর হয়েছে। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চুপিসারে বিদেশ পালিয়েছে। পোশাকের রং বদলেছে। শিবির পাল্টেছে। এদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেছি, যেখানে অরণ্য শেষ। সামনে খরস্রোতা একটি নদী। নদীর ওপারে বাঁশের অমজবুত সেতু। আর নদীর ওপারে খুব উঁচু নাহলেও বেশ উঁচু খাড়া একটি পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বাড়ি। বাড়িগুলি কাঠের তৈরী। ইতস্তত কয়েকজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। এত দূর থেকে তাদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তারা ব্যস্ত সমস্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে। আর একটি ছোট ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের ঢালু গায়ে সে এমনভাবে

দাঁড়িয়ে আছে, যেন পেরেক দিয়ে কেউ তাকে সেঁটে দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ছেলেটির হাতে ধরা দড়ির একটি প্রান্ত। দড়িটির অপর প্রান্ত একটি গরুর গলায় বাঁধা। অর্থাৎ ছেলেটি রাখাল বা ঐ জাতীয় কিছু। ছেলেটি আমাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকছে। তার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু সে যে কিছু বলছে, এটা বেশ বুঝতে পারছি তার দু ঠোঁটের অবিরাম নড়াচড়ায়।

এই প্রথম অয়ন আমার দিকে চেয়ে সুন্দর করে হাসল, যে হাসির মধ্যে ভাল লাগা এবং অনুরাগের ছোঁয়া। তারপর আচমকাই আমার হাতটি ধরে নদীর ওপারে ছেলেটিকে দেখাল, মনে কর ওই ছেলেটি আমাদের লক্ষ্য। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের উঠতে হবে। তার আগে অপলকা সেতুটা পার হয়ে নদীর ওপারে পৌঁছতে হবে।

আমার কেমন ভয় করতে লাগল। বললাম, আমি কোনমতেই সেতুটা পার হতে পারব না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এবড়ো খেবড়ো পথে ওপরে ওঠাও আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অয়ন হতাশ গলায় বলল, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটা কখনই সুগম মসৃণ হয় না, নীরু।

— তোমার লক্ষ্যে আমায় পৌঁছতে হবে? আমি বললাম, এমন মাথার দিব্যিই বা কে আমায় দিয়েছে?

— অন্য কেউ নয়। আমি বলছি। বলে অয়ন হাসল, আমার কথা ফেলতে পারবে তুমি?

অয়নের বলার ধরনে একটা অদ্ভুত মনমাতানো অনুভূতি। আবেগে আমার গলার স্বর বুজে এল। কোনরকমে বললাম, আমার ওপর তোমার এতটা জোর!

— হ্যাঁ, এতটাই। অয়ন মাথা ঝাঁকাল, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, আছো এবং থাকবেও।

বাঁশের সাঁকোর ধারে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। খরস্রোতা নদীর জল ছোট বড় পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণী তৈরী করছে। লম্বা ঠোঁট বকের মতো দেখতে একটি পাখি, অনায়াসে ছোট ছোট মাছকে ঠুকরে জল থেকে পাড়ে তুলছে। নাক টেনে বাতাসে হালকা সুগন্ধ পেলাম। দু চোখ বন্ধ করে সমস্ত মনটাকে এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করলাম। মুহূর্তকাল পরেই আমার বন্ধ দুচোখের পাতায় প্রদীপের আবছা কাঁপা কাঁপা আলোর শিখা এবং দু কানের পর্দায় অস্পষ্ট ঘণ্টা এবং শাঁখের আওয়াজের স্পন্দন। আমি আনন্দের আতিশয্যে অয়নকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বললাম, এখন সব বুঝতে

পারছি। গন্ধ শব্দ আলোর রেখা, সব আমার অনুভূতিতে সাড়া দিচ্ছে।

অয়ন আমার মাথার চুলের মধ্যে এলোমেলো আঙ্গুল চালিয়ে গাঢ় গলায় বলল, তুমি যে উপলব্ধিটার কথা বলছ, সেটা যদি সত্যি হয়, তবে আমাদের যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরী নেই। তখন তুমি এবং তোমার মতো আরও অনেকে বাতাসে বারুদের গন্ধ পাবে। কানে বাজবে দুন্দুভি নাকাড়া। আর আলোর অস্পষ্ট রেখাটা আরও উজ্জ্বল হয়ে, মশাল হয়ে জ্বলবে।

একুশ

দু চোখ খুলে চারপাশে তাকিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি সংজ্ঞা হারাইনি। যে কোন কারণেই হোক না কেন, চারপাশ বিস্মৃত হয়ে কল্পনার জগতে পৌঁছে গেছিলাম এবং সেখানে একটি সুন্দর স্বপ্নের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। হয়ত অবচেতনে অমি অয়নকে ওইভাবেই পেতে চাই, স্বপ্নে যার প্রতিফলন।

এখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি আমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত মুখ। তার মধ্যে বেণুবিনোদবাবুর মুখে হালকা প্রসাধনের মতো হাসির প্রলেপ এবং তিনিই প্রথম কথা বললেন, কোন ভয় নেই। চিন্তাভাবনার স্তর ভেদে কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে কখনও কখনও এমন বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত দশা হয়। সাধকদের ক্ষেত্রে একেই বলে ভাবসমাধি। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতেই সিদ্ধার্থ বাধা দিল, উঠো না। মাথা ঘুরে যেতে পারে।

বেণুবিনোদবাবু কিন্তু সাহস এবং অভয় দুই-ই দিলেন, কিছু হবে না। আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা কর। তুমি তো আর সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়নি। মনোজগতে একটু ঢেউ উঠেছিল মাত্র। সবাই এর মর্মার্থ বোঝে না। ভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছিল, এপিলেপটিক রোগী।

বেণুবাবু যা-ই বলুন না কেন, আমার নিজের কিন্তু শরীরটা বেশ ভারশূন্য মনে হচ্ছে। বিশেষ করে মাথাটা। গলাটাও কেমন শুকনো লাগছে। আমি ইশারায় আমার তেষ্টার কথা জানালাম। সিদ্ধার্থ ব্যস্ত সমস্তভাবে ছুটল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমার জন্য এক গ্লাস জল আনবে বলে। মাকে রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। দালানে একটি চেয়ারে বসে আছে। মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে। অনেকটা অপরাধীর ভঙ্গীতে।

শুয়ে শুয়েই জল খেলাম। জল খাওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম,

এবার আমি নিজের চেষ্টাতেই উঠে বসতে পারব। সেইমত বার দুই এপাশ ওপাশ করে উঠে বসতে গেলাম যেই, বেণুবাবু হঠাৎই আমার একটা হাত ধরে অল্প টান দিলেন। আর আমি সটান উঠে বসলাম। আর একটু হলেই বেণুবাবুর বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। উনি বেশ সাবধানে এবং প্রশংসনীয় শালীনতা বজায় রেখে আমার হাতটা ধরে নরম করে বললেন, আবার বলছি ভয়ের কোন কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন বিশ্রাম দরকার। চল, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। অন্য কেউ হলে হয়ত দুর্ভাবনা হোত, কিন্তু আমি জানি, আমার নীরু-মা'র শরীর খারাপ করে নি। বরং চিন্তা ভাবনার একটা নতুনতর ভিন্ন স্বাদের সকাশে, মা আমার ঋদ্ধ হল। একটু থেমে বললেন, এটার প্রয়োজন ছিল।

নিজের ঘরে বিছানায় শোয়া মাত্রই মনে হল, আঃ! কি আরাম! আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হল দুচোখে। হয়ত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছিলাম বলেই, দুপুরে খাওয়ার জন্য কেউ আমায় ডাকে নি। আমার ঘুম ভাঙ্গল যখন তখন বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। দলবদ্ধভাবে পাখিরা ঘরে ফিরছে। অনেকক্ষণ গভীর ঘুমের জন্যই বোধহয় মাথাটা সামান্য ভার ভার লাগছে। কিন্তু শরীরে কোন জড়তা বোধ নেই। আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এলাম। প্রিয় কুকুরটি এলোমেলো দৌড়চ্ছে বাগানে। হয়ত কোন ইঁদুর বা কাঠবিড়ালীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। নিত্যকর্ম সেরে ফেলার জন্যই শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে সন্ধ্যারতি সারছে কোন গৃহবধূ। বাগানের সবুজ গাছপালায় শেষ বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। নরম হালকা এবং আবেশী। একে বলে কনে দেখা আলো। এ আলোয় অসুন্দরীকে সুন্দরী দেখায়। অপছন্দের ব্যক্তি বা বস্তুকেও প্রিয় আপন মনে হয়।

বাগানের দরজা খোলার শব্দ শুনেই আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালম। বেণুবাবু আর তাঁর সামনে সিদ্ধার্থ, ঠিক যেন বেণুবাবুর ছায়াটি হয়ে বাগান পেরিয়ে ভেতরপানে আসছে। আমার দিকে চেয়ে বেণুবাবু হাসলেন, এখন শরীর ঠিক আছে তো?

আমি ঘাড় নাড়লাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

— বেশ, বেশ। বেণুবাবু ঘাড় দোলালেন, এখন তাহলে তোমার সঙ্গে জরুরী একটা বিষয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। একটু থেমে বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমার চোখের ওপব চোখ রাখলেন, মানসিকভাবে সকলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম, বিষয়টা নিয়ে কথা বলব বলে। হঠাৎ অমন একটা ঘটন্না ঘটল! বলে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট

কামড়ে বিজ্ঞোচিত স্বরে বললেন, যে কোন বড় কাজের সূচনায় যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, ঈশ্বর নিজের গরজেই তা নির্মূল করে দেন।

— ঠিক বুঝলাম না। আমি বললাম।

— মানুষ কি সব বোঝে? বেণুবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, তিনি যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তখন এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিভে যাওয়ার মতো সমস্ত অবিশ্বাস সংশয় দূর হয়ে যায়। কে যেন কানে কানে বলে দেয়, এই সেই মানুষ বা এই সেই পথ। তখন খড়ের টুকরো আঁকড়ে ধরে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যায়।

বেণুবাবুর কথাবার্তা কেমন হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে। বললাম, ভেতরে আসুন। চা খাবেন তো?

— একদম নয়। বেণুবাবু এমনভাবে মাথা দোলালেন যেন আমি নিতান্তই ছোট একটি মেয়ে, চা করার মতো দুরূহ একটি কাজ আমার কখনই করা উচিত নয়।

— ভয় পাচ্ছেন? আমি হাসলাম, ভাবছেন আবার যদি সকালের মতো আমি হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়ে ...!

— মোটেও না। বেণুবাবু আমায় কথা শেষ করতে দিলেন না, প্রথমত কথাগুলি অত্যন্ত জরুরী। চায়ের কাপ হাতে হালকা মেজাজে বলা এবং শোনা কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বিতীয়ত সময় বড় অল্প। একটু থেমে আবার একই কথা বললেন, সময় বড় অল্প। কলিতে অন্নগত প্রাণ। যে কোন ভাল কাজ, যত চটপট সম্ভব সেরে নেওয়া উচিত। অন্যথায় পাঁচমিশেলী কথার তোড়ে, অপ্রয়োজনীয় কাজের ভিড়ে আসল কাজটি আর করা হয়ে উঠবে না। তখন হাপুস নয়নে কেঁদেও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।

বেণুবাবুর কথাগুলি রাতে ঘুম আসার আগে পর্যন্ত আমি নানাভাবে নানা দিক দিয়ে ভেবেছি। কেবলই মনে হয়েছে উনি যা বলছেন বা যেভাবে আমায় বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে কোনভাবেই আমি ওনার বিরুদ্ধে যেতে পারি না।

মন্দির মানে তো কেবল দেবালয় নয়। একটা মিলন ক্ষেত্র। বিগ্রহ তো প্রতীক মাত্র। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এলাকার বা এলাকার বাইরের মানুষজন যদি একটি স্থানে মিলিত হতে পারি, জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংহতির পক্ষে এটা তো একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। আর মুখে যাই বলি না কেন, মনের গভীর গভীরতম প্রাঙ্গণে আমরা সকলেই কম বেশী আস্তিক। অয়নের মতো যুক্তিবাদীও ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। মনে প্রাণে যদি পারত, তবে ওর বাড়ির লোককে ও এ ব্যাপারটায় সর্বাগ্রে বাধা দিত। আমি তো অয়নের সহকর্মীদের অনেককেই চিনি, যারা ধর্মকে আফিমের সঙ্গে

তুলনা করে, অথচ তাদের বাড়ির মা-বোনেরা ইতু পুজো করে। ষষ্ঠী পুজো করে। খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে বজরংবলীর জন্মদিনও পালন করে।

আর বেণুবাবু যা বললেন, তার সিকি ভাগও যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তখন মন্দিরটা গৌণ হয়ে যাবে। বরং মন্দিরটাকে ঘিরে দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, অসহায় সম্বলহীন মহিলাদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প, এগুলিই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। মূলত এটা তো একটা সামাজিক কাজ, যার সুফল আছে। পাদ্রীরা আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম বা পাহাড়তলিতে কেবল গির্জা বানিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেনি। গির্জায় ভগবান যীশুর প্রার্থনা করতে, তাঁর জীবনের কাহিনী শুনতে এসেছে যে অসংখ্য নিপীড়িত হতদরিদ্র পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষগুলি, তাদের সন্তানদের জন্য স্কুল করেছে। আদিবাসী মানুষগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে দেবার জন্য শিক্ষায় স্বাস্থ্যেয় এবং চেতনায় তাদের হীনমন্যতা দূর করেছে। একজন 'কিছুই নেই' অস্তিত্বহীন মানুষ যদি লেখাপড়া শিখতে পায়, নিজের যোগ্যতায় রোজগারের পথ খুঁজে পায়, সারা দেশের আর পাঁচজন শিক্ষিত সচেতন মানুষের মতো, নিজেকেও একজন সঠিক নাগরিক বলে ভাববার মতো চিন্তা চেতনার অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে সে ধার্মিক বা অধার্মিক এটা কোনই ফ্যাক্টর হতে পারে না। শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং চেতনার চেয়ে যেমন ধর্ম বড় নয়, আবার ধর্মের কারণেই যদি এগুলি প্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে ধর্মকে নস্যাৎ করাটাও কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাপার নয়। কারণ পিছনের সারির একজন মানুষ যখন তার অবহেলিত জীবনকে অতিক্রম করে যাবে, তখন ধর্মের পোশাক আপনিই তার গা থেকে খসে পড়ে যাবে। বেণুবাবু চমৎকার একটা কথা বলেছেন, যে কোন দেশের লড়াই সে দেশের ভৌগলিক সামাজিক অবস্থানের নিরিখে নির্দ্ধারিত হবে। লোকাচার, প্রয়োজনে সংস্কারকেও কাজে লাগাতে হবে। অমুক দেশে অমুক পদ্ধতিতে বিপ্লবী লড়াই হয়েছে, সুতরাং আমার দেশেও হুবহু একই পদ্ধতিতে বিপ্লব সাকসেসফুল হবে, এই থিয়োরী কোন অবস্থাতেই সত্যি নয়। আমার বাড়ির সমস্যা আর রামবাবুর বাড়ির সমস্যা তো এক হতে পারে না। সুতরাং সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতেও ফারাক থাকবে বৈকি। লক্ষ্য তো আমার এবং রামবাবুর দুজনেরই এক।

বেণুবাবুর যে কথাটি আমার সবচেয়ে বেশী মনে ধরেছে, তা হল, দুধের স্বাদ যে পেয়েছে, চুনগোলা জলের বাটি সে আপনিই সরিয়ে দেবে। মোটিভ এবং ওয়ে অব মোটিভ, আমার মনে হয়, অয়নরা এই জায়গাটা গুলিয়ে ফেলে।

বেণুবাবু চমৎকার বোঝাতে পারেন। হাঁ করে শুনতে হয়। এবং সবশেষে 'হ্যাঁ' বলা

ছাড়া, দ্বিতীয় কোন উত্তরের কথা ভাবাও যায় না। আমিও আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললাম, যাব। নিশ্চয়ই যাব।

সিদ্ধার্থ বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে বেশ জোরে তালি বাজাল, দিদি, তাহলে তুমি যাচ্ছ! এই অব্দি বলে একটু চুপ করে রইল, কাকাবাবুকে বলেছিলাম, আমার দিদি খুব জাসটিফায়েড। কোনরকম ইগোতে ভোগে না।

বাইশ

আমাদের শহরটা আয়তনে ছোট। কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরা। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, যুক্তিবাদী, সংস্কারপন্থী সব ধরণের মানুষ আছে। ফলে সরকারী বেসরকারী নামী স্কুল কলেজ যেমন আছে, পাশাপাশি রেল লাইনের ধার ঘেঁষে ঘিঞ্জি বস্তিও আছে, যেখানে এখনও শতকরা একশজন মানুষই নিরক্ষর। যুক্তিবাদীদের সংগঠনের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে মন্দির মসজিদ আছে। যেখানে অসংখ্য মানুষ নিত্য যায়। পুজো দিতে। মানত করতে। প্রাচীন গাছের গায়ে গোপন ইচ্ছাপূরণের আশায় ঢিল বাঁধে। শুক্রবারে বাসস্ট্যান্ডে সন্তোষী মায়ের মন্দিরে এবং শনিবারে বারের ঠাকুরের পূজায় অনেক লোকের ভিড় হয়। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক উকিল ডাক্তার এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে বউরাও হাজির থাকে।

নামী কোন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক বা কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতার মিটিংয়ের খবর যে পদ্ধতিতে যে ব্যাপকতায় প্রচারিত হয়, তার চেয়েও জাঁক করে বেণুবাবুর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ ঘোষিত হচ্ছে। লোকের মুখে মুখে ফিরছে, আগামী বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন, শহরের সবচেয়ে ব্রাত্য জায়গায়, বেণুবিনোদ নামে একজন সিদ্ধপুরুষের উদ্যোগে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে নাকি কোন দেবতার বিগ্রহ থাকবে না। পূজা প্রণামীও নিষিদ্ধ এখানে। এই মন্দিরকে ঘিরে অদূর ভবিষ্যতে এখানে সমাজের অবহেলিত পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল, দেশজ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের একটি অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে এবং সেখানে অনাথ ও অর্থনৈতিকভাবে দীনহীন মানুষদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু, তার সবরকম সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা হবে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর যেটা তা হল মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন শহরের ঘৃণ্য অবহেলিত একজন মহিলাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবেন, আত্মপরিচয় গোপনকারী জন্মসিদ্ধ এক সাধক, যার নাম এবং পরিচয় এ শহরের প্রায় কেউই জানে না। তিনি নাকি বাঙালী। বাংলায় কথা বলেন। টিপিক্যাল সাধুদের মতো গেরুয়া পরেন না। সময় অসময় নেই সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান না বা ধর্মকে বর্ম করে

তুকতাক, মাদুলি কবচের সাহায্যে অসাধ্যকে সাধ্য করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দেন না।

একদিন স্কুল যাওয়ার পথে দেখি একটি রিক্সায় চড়ে মুখে মাউথপীস লাগিয়ে সিদ্ধার্থ, বেশ বয়স্ক মানুষদের মতো থেমে থেমে নাটকীয় গলায় বলছে, নিজেকে জানুন। আগামী ৭ই আষাঢ় বুদ্ধপূর্ণিমার দিন হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে আপনিও পা মিলিয়ে চলুন মহাতীর্থ 'মাতৃমন্দিরম্'-এ। জন্মসিদ্ধ ঠাকুর বেণুবিনোদ মহারাজের একক প্রচেষ্টায় যে প্রতিষ্ঠান সামাজিক বৈষম্যকে দূর করে সাম্য এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, ভবিষ্যতে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের স্বদেশভূমির প্রতিটি মানুষের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসীতে পরিণত হবে, সেই মহামিলন ক্ষেত্রে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছি।

রাস্তার পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমি সিদ্ধার্থের পুরো ঘোষণাটি শুনলাম। মন দিয়ে। একবার নয়, বার দুই তিন। তার মানে সত্যি একটা কিছু হতে চলেছে। স্কুলে টিচার রুমেও 'মাতৃমন্দিরম্' নিয়ে জোরদার আলোচনা। আমার কয়েকজন সহকর্মী তো রীতিমত উচ্ছ্বসিত। তারা কেউ-ই বেণুবিনোদবাবুকে চোখে দেখেনি। কিন্তু তিনি যে নতুন ধরণের একটা কিছু করতে চলেছেন, যেখানে বৈদিক ভারতের সনাতন রূপের সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী সমস্যাগুলির একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটবে। ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে আমাদের চিরন্তন যে ধারণা, তার ব্যতিক্রমী কাজকর্মের নতুন একটা ধারা এবং ধারণা গড়ে উঠবে, এ ব্যাপারটা কমবেশী সকলকেই নাড়া দিয়েছে। যেমন সমাজে ব্রাত্য অপাংক্তেয় একজন নারীকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করা হবে। এ ব্যাপারটা প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগতভাবে বেণুবিনোদবাবুর কথা শুনে আমারও মনে হয়েছে তিনি যেভাবে পরিকল্পনা করেছেন, তার সিকি ভাগ যদি বাস্তবায়িত করতে পারেন, সেটাও অনেকখানি করা। সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলগুলি তো বটেই, এমনকি অয়নদের মতো রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যারা ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে, এই দুই শ্রেণীর মানুষেরই মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ হল সামাজিক বৈষম্যকে দূর করা। অর্থে শিক্ষায় প্রতিষ্ঠায় যারা এগিয়ে আছে লড়াই তো তাদের জন্য নয়। লড়াই সেইসব হতভাগ্যদের জন্য যারা হাজার বছরের অন্ধকারের ওপারে পড়ে রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর প্রচেষ্টায় এইসব বঞ্চিত মানুষগুলির জন্য কিছু করতে চান, আমার বিচারে সেটা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তিনি কীভাবে করবেন সেটা কখনই মুখ্য বিষয় নয়। তাঁর সদিচ্ছা এবং সহমর্মিতাই বড় কথা। পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালেই একজন মানুষের চেষ্টায় আমূল কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু বৈষম্য এবং বিভেদের সীমারেখাটা যখন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সংসদীয় পথে কিম্বা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করা

যাবে, সেই ভরসায় বসে না থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাকে সাধুবাদ জানানো এবং সমর্থন করা একান্ত জরুরী। বেণুবিনোদবাবু যে পরিকল্পনাটি নিয়েছেন শুরুতে তার আকার এবং আয়তন যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অদূর ভবিষ্যতে যদি তাঁর হাতে পোঁতা সেই বীজটি থেকে সত্যি সত্যি পল্লবিত একটি বৃক্ষ সোজা টানটান হয়ে দাঁড়ায়, তার ছায়ায় বিশ পঞ্চাশজন ছন্নছাড়াও তো আশ্রয় নিতে পারে। সেটাই বা কম কি? কে বলতে পারে বেণুবিনোদবাবুর কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন না?

অয়ন যদিও বলত, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়। দলের চেয়ে দেশ বড়। এখন মনে হয় এই জাতীয় কথাগুলি শুনতে বেশ লাগে। চায়ের কাপ হাতে ব্যক্তি, না দল, না দেশ বড়, এইসব নিয়ে গরম গরম আলোচনা করা যায়, তত্ত্বকথা আওড়ানো যায়, বাস্তবে কিন্তু এ জাতীয় কূটকচালি তর্কের কোন স্থান নেই। পরিবর্তে একজন যদি তার প্রতিবেশীর দুর্দশা দূরের জন্য নিজ উদ্যোগে কিছু করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁকে বাহবা দিতেই হবে। সংগঠন বা তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের বদলে ইনডিভিজুয়ালি কিছু করে দেখানো অনেক বড় কাজ। আর সর্বোপরি ব্যক্তির সমষ্টিতেই তো দল। সুতরাং ডিম আগে না মুরগী আগে, এই ধরণের ফ্যালাসির জবাব খোঁজার চেয়ে, ব্যক্তি এবং দলের আগে পিছে তর্ককে সরিয়ে রেখে, ভাল কাজের স্বার্থে, ভাল লোকের, ভাল কিছু করার বাসনাকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। কোন পথটা ঠিক বা বেঠিক এর বিচার মহাকাল করবে। আমার মতো সাদামাটা একজন মেয়ে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোরে দোরে গিয়ে ভোটভিক্ষা করতে পারবে না বা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বন্দুক কাঁধে করে জঙ্গলের গোপন ডেরায় গিয়ে জীবন কাটাতে পারবে না, তার পক্ষে যা রয় বসে তেমন কিছুই করা উচিত। বেণুবিনোদবাবুকে আমি বলেছি, আপনার উদ্দেশ্য যদি খাঁটি হয়, আমি আপনার পাশেই আছি। তারপর সত্যি যদি কোনদিন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়, তখন আপনি এবং আমি অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কাজকর্মের ফসলকে মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দোব।

বেণুবিনোদবাবুর মুখে সব শোনার পর আমি যখন উৎসাহিত গলায় বললাম, আমি আপনার সৎ উদ্দেশ্যর সফলতা কামনা করি এবং কিছুদিন লক্ষ্য করে বিচার বিবেচনা করে যদি মনে হয়, আপনি ঠিক পথে চলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকব সক্রিয়ভাবে। আমার কথায় বেণুবিনোদবাবুর দু চোখ হঠাৎই জলে ভরে উঠল। ধরা গলায় কোনরকমে বললেন, সেটাই সত্যি হোক।

বাচ্ছা মেয়ের মতো মায়ের বায়না, 'মাতৃমন্দিরম্'-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে যাবেই যাবে। যত বোঝাই তোমার শরীর খারাপ করবে। লোকের ভিড়ে নিখুঁতভাবে সব কিছু দেখতে পারবে না, কোনভাবেই মা আমার কথা মানতে রাজী নয়। একসময় অভিমানী গলায় বলল, নিজে তো বেশ যাচ্ছিস। আমাকে নিয়ে যেতে যত অসুবিধে!

আমি হেসে বললাম, যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন ব্যস্ততা নেই। ঠিক আছে। আমি যাব না। তুমি যাও।

— আমি একা কেমন করে যাব? অসহায়ের মতো শোনায় মায়ের গলা, তোর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে একদিনও বাড়ির বাইরে যাইনি। রাস্তাঘাট সব ভুলে গেছি।

— ঠিক আছে। আমি বললাম, দু চারদিন পরে তোমাতে আমাতে একসঙ্গে একদিন যাব। তখন ভিড়ও কম হবে।

— বিনোদ অনেক করে বলেছিল মাসীমা যাবেন কিন্তু। একটু চুপ করে থেকে মা বলল, কী ভাববে বল তো?

— কী আবার ভাববে? উনি তো জানেন তোমার শরীর সুস্থ নয়। ভিড়ের মাঝে তুমি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়তে পার। তখন তোমাকে নিয়ে উনিই বিব্রত হয়ে পড়বেন। সেটা কি ভাল হবে?

— তা ঠিক। আমার কথার সমর্থনে মা ঘাড় নাড়ল, অনেক করে বলে গেছে কিনা তাই ...!

— আমি তো যাচ্ছি। যদি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন, বুঝিয়ে বলব সব।

— জিজ্ঞেস করেন মানে! মায়ের গলায় আত্মবিশ্বাসীর সুর, করবেই। ছেলেটা বড় ভাল কিনা! আমাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

আমি কোন সাড়া দিলাম না। বিনোদবাবুকে খুব কাছ থেকে যা মনে হয়েছে আমার, ভদ্র মার্জিত। যে কোন মানুষের ভালবাসা স্নেহ মমতা আদায় করে নিতে পারেন। এটা অবশ্যই একটি গুণ। যা সবার মধ্যে থাকে না। আবার সবটাই ওনার মুখোশ কিনা, তাই বা কে জানে?

তবে মা বিনোদ বলতে যেমন আবেগে ভেঙ্গে পড়ে, আমার ক্ষেত্রে মোটেও তা নয়। আমি যাচ্ছি কিছুটা কৌতূহলবশত। আবার সবটাই যে নিছক হুজুগ বা তামাশা করার ছল, তাও নয়।

আজ পর্যন্ত নিজের একক ক্ষমতায় ভাল কোন কাজ করে উঠতে পারিনি। হয়ত অয়ন আরও কিছুদিন এখানে থাকলে দুজনের প্রচেষ্টায় কিছু করতে পারতাম। বেণুবিনোদবাবু এ শহরের সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ, তাঁর একার চেষ্টায় কিছু একটা

করতে চলেছেন এবং সারা শহর সে খবর জেনে গেছে। বিশেষ করে মন্দিরটিকে প্রতীক হিসাবে খাড়া রেখে তিনি সমাজ সেবামূলক যেসব কাজের পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলি সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণীয়। আমার যাওয়ার ইচ্ছে মূলত এই একটি কারণে। তারপর যদি দেখি আমার ধারণার সঙ্গে ওনার প্রতিশ্রুতি মেলার মতো মিনিমাম সম্ভাবনাও নেই, আমি চুপিসারে ফিরে আসব। বেণুবাবু তো আর অয়ন নন, যে আশাভঙ্গ হলে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ব।

বাজারের চৌরাস্তার মোড়ের আগেই রিক্সা দাঁড়িয়ে গেল। এমনিতেই বাজার এলাকাটা ঘিঞ্জি, তার ওপর আজ পথের দুধারে ফুলওলা এবং পূজার উপকরণ বিক্রেতারা লাইন দিয়ে বসেছে। কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দির এলাকায় যেমনটি দেখা যায়। আমাদের শহরে ধর্মপ্রাণ এত মানুষ আছে, আমার ধারণাই ছিল না। অনেক কিশোর কিশোরী যানজট নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে। নীচ ঘরের মেয়ে বউরাও জমকালো পোশাক পরে এসেছে। দুর্গাপূজা বা বাংলা নববর্ষের দিন বাজারের চৌরাস্তার মোড়টা যেমন দেখতে হয়, আজও সেরকমই লাগছে।

হঠাৎ করেই মনে হল যে শহরে এত মানুষ মন্দির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে স্বতস্ফূর্তভাবে ভিড় করে, অয়নরা সেই শহরের বুকে বসে বন্দুকের নলের দ্বারা সামাজিক সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করত! এমন অনেক মহিলাকে দেখছি, যাদের বাড়ির ছেলেরা সাতের দশকের উন্মাদনায় রাতারাতি সমাজের খোলনলচে পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এখানেই অয়নদের ব্যর্থতা। তারা তাদের বাড়ির মানুষজনকেই নিজেদের বিশ্বাসে সম্পৃক্ত করতে পারেনি।

মাইকে গান বাজছে, 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান। মাতৃভূমি করে আহ্বান'। বেণুবিনোদবাবুর উদ্দেশ্যটা কী বা সেটা কতদূর সফল হবে তা জানি না, তবে তিনি যে মন্দিরটাকে কেন্দ্র করে, সামাজিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা বা তার কিঞ্চিৎ সংশোধনের চেষ্টায় পা বাড়াবেন, তার অনেকখানি ধরা পড়ছে মাইকে বাজছে যে গানটি, তা শুনে। অন্যথায় মন্দির এলাকা শ্যামাসংগীত এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একচেটিয়া দখলে।

রিক্সাওলা জিজ্ঞেস করল, ফুল বা পুজোর ডালি কিনব কিনা। আমি ঘাড় নেড়ে 'না' জানাতে সে বেশ অবাক হল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি জান এখানে কী হচ্ছে?

আমার প্রশ্ন শুনে সে তড়াক করে রিক্সা থেকে নেমে হাত পা ছুঁড়ে বোঝাতে চাইল, বাংলা মুলুকের বাইরে থেকে একজন দেওতার মতো সাধু এসেছে। আজ তার উদ্যোগে

নতুন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এলাকায় এবং তার বাইরেও এবার শান্তি এবং সমৃদ্ধি দুই-ই আসবে।

বুকে গেরুয়া কাপড়ের ব্যাজ গুঁজে একটি কিশোর এবং তার পিছনে পিছনে একজন কিশোরী এসে অনুরোধের সুরে বলল, কাইন্ডলি ভাড়া মিটিয়ে রিক্সাটাকে ছেড়ে দিন।

আমি সামান্য বিরক্তির সুরে বললাম, দিচ্ছিরে বাবা। দিচ্ছি।

এবার মেয়েটি বলল, আমাদের ইনচার্জ সিদ্ধার্থদার নজরে পড়লে রাগ করবে।

ছেলেটি ইশারায় মেয়েটিকে কী যেন বলল। মুহূর্তে মেয়েটি এক গাল হাসল, আপনি সিদ্ধার্থদার দিদি। কি সৌভাগ্য! মহারাজের মুখেও আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বলে মেয়েটি আমার হাত ধরে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল, সরুন। একটু জায়গা দিন। ইনি যাবেন। চারপাশের মানুষজন আমায় দেখছে। তাদের চোখে বিস্ময় এবং অসন্তোষ দুইয়েরই ছাপ। আমি একবার মেয়েটিকে বললাম, তুমি আমার হাতটা ছাড়ো না।

মেয়েটা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, উঁহু। মহারাজ আপনার কথা আমাদের বলে রেখেছেন। আপনি এলেই যেন ওনার কাছে আপনাকে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অব্দি বলে মেয়েটি একটু চুপ করল এবং তারপরেই 'সরুন সরুন' বলে আমার হাতটি ধরে ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল। নিজেকে আমার একজন প্রতিবন্ধী বা একটি অ্যাম্বুলেন্সের মতো মনে হতে লাগল।

তেইশ

অপেক্ষাকৃত সরু একটি গলির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটি বলল, এবার একটু সাবধানে আসবেন। গলিটা সরু কিনা! তার ওপর একটি নর্দমা আছে।

নর্দমার ধার ঘেঁষে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়েছে। এতদিন এই শহরে বসবাস করেও আমি এই গলিটিতে ঢুকিনি। দুপাশের বাড়িগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু এবং দেখতে পুরনো আমলের মতো। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোট ছোট ধাপি। বাতাসে নাক টানলে যেমন সুগন্ধী ফুল কিম্বা বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়, এ গলির বাতাসেও যেন অন্যরকম একটা গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকা বা বস্তি অঞ্চলের সঙ্গে এ গলিটির সামাজিক অবস্থানে যে কিছুটা ফারাক আছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি। অন্য কোন সময় হলে আমি হয়ত দু এক পা এগিয়ে থেমে যেতাম। আজ থামাথামির প্রশ্ন নেই। আমার মতো আরও অনেক মানুষ দলে দলে চলেছে। গলিটি অপরিসর বলে অনেকের সঙ্গে মৃদু ধাক্কাও লাগছে। ডান বাঁ ডান বাঁ করে বার চার ছয় মোচড় খাওয়ার পর যে

জায়গাটিতে এসে পৌছলাম, সেটি বেশ বড়সড় একটি মাঠ। মাঠের এক ধার ঘেঁসে ছোট একটি মন্দির। গতকাল কিম্বা আজ সকালে মন্দির তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। কারণ দেওয়ালের রং এখনও দু এক জায়গায় ভিজে। মন্দিরের পেছনেই বেশ বড়সড় একটি পুকুর। যার পার বলতে কিছু নেই। ঠিক যেন মাঠটির নীচু অংশে জল জমা করে কোনরকমে আটকে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে পুকুরটা মোটেই গভীর নয়। জলও অপরিষ্কার। পুকুরটির চারপাশ জুড়ে বাঁশবন। বুনো ঝোপঝাড়। নারকেল এবং তালগাছও রয়েছে বেশ কিছু। গাছপালার জন্যই পুকুরের জল আবছা কালো লাগছে।

মন্দিরটির গা ঘেঁসে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। মঞ্চের পিছনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ ক্রশ, ত্রিশূল, চাঁদতারা, হাতাখুন্তি, এই ধরণের নানা প্রতীক থার্মোকল কেটে বানিয়ে হালকা হলুদ একটি কাপড়ের গায়ে লাগান হয়েছে। মঞ্চের মাঝখানে ফুল দিয়ে সাজানো সুন্দর একটি সিংহাসন।

এমন সরু একটি গলির ভিতরে যে এতবড় মাঠ পুকুর সবুজ গাছগাছালি আছে, বাজারের চৌরাস্তার মানুষ গাড়ির ভিড়ে দাঁড়িয়ে তা ধারণাই করা যায় না।

আমাদের শহরে এখন জমির দাম আকাশছোঁয়া এবং তেমন জমিও আর নেই। অথচ এই এতবড় মাঠটিতে আজও কোন প্রমোটরের থাবা পড়েনি, আমার ব্যক্তিগত ধারণা তার একটিই মাত্র কারণ। তা হল পরিবেশটা ভাল নয়। এটা ভদ্রলোকদের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা নয়।

আমি যদ্দূর জানি আমাদের শহরের বড় দুটি বেশ্যাপল্লীর একটি নাগরিক কমিটির নিয়মিত বিরোধীতায় প্রায় উঠেই গেছে। সেখানকার লোকেরা যে যেমনভাবে পারে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখনও এই একটি জায়গাতে আদিম ব্যবসা থাবা মেরে বসে রয়েছে। মন্দির হিসেবে এই জায়গাটি বেছে নিয়ে বেণুবিনোদবাবু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের ঘৃণ্য লাঞ্ছিত মানুষগুলিকে মূলস্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার সু উদ্দেশ্য নিয়েই মন্দিরটা এখানে তৈরী করা হয়েছে। কেবল একটা জিনিস কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, মন্দির তৈরী এবং তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ইত্যাদির জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সেটা কে বা কারা জোগাচ্ছে! বেণুবিনোদবাবু আমাদের শহরের মানুষ নন। তাঁর সঠিক পরিচয়ও কেউ-ই জানে না। এমন অপরিচিত একজন, সম্পূর্ণ নতুন একটা জায়গায়, এতগুলি মানুষ এবং এই বিপুল পরিমান টাকা পয়সার সংস্থান করলেন কেমন করে?

তবে কি সিদ্ধার্থ যা বলে সেটাই সত্যি! উনি আত্মগোপনকারী একজন বড় মাপের মানুষ। ইন অল রেসপেক্টস। ওনার পরিচিতির শেকড় বহুদূর বিস্তৃত। মিডিয়াকে এড়িয়ে

যান তাই, তা না হলে ম্যাগসেসের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা অনেকদিন আগেই অর্জন করেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি, সিদ্ধার্থ যখন এইসব কথা বলে, তখন শ্রদ্ধায় এবং আবেগে ওর গলা ধরে আসে। চোখের কোণে জল চিকচিক করে। অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে সিদ্ধার্থর কোমল হৃদয়ের জন্যই, বেণুবাবুর মতো লোকেরা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু অস্বীকার করব না, আজ এখানে এসে দেখছি সিদ্ধার্থর বলার মধ্যে কোনরকম অতিশয়োক্তি ছিল না। টাকা পয়সার জৌলসটুকু পাশে সরিয়ে রাখলেও, শহরের সব শ্রেণীর মানুষকে বেণুবিনোদবাবু একটি ছাতার নীচে জড়ো করতে পেরেছেন। এটাও বড় কম কথা নয়। এর জন্য একটা আলাদা রকম ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। সেটাকে প্রখর ব্যক্তিত্ব বলতে বাধো বাধো ঠেকলেও, হিপনোটাইজ বা ঐ জাতীয় কিছু বলাও বোধহয় ঠিক হবে না। তাতে যুক্তির ঘাটতি থাকবে বোধ হয়।

মন্দিরের পিছন পানে ত্রিপলের ছোট একটি ছাউনি। খান কয়েক ডেকরেটরের চেয়ার পাতা। তার একটিতে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত বেণুবাবু। তাঁকে ঘিরে ছোটখাট একটি জটলা। যার মধ্যে সুবেশী সুন্দরী কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বেণুবাবু কীভাবে যে আমায় দেখতে পেলেন, কে জানে! চেয়ার ছেড়ে ভিড় ঠেলে হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন, এসো। নীরু মা এসো। কী সৌভাগ্য!

সামনের দিকে দু হাত বাড়িয়ে বেণুবাবুর এমন এক আকুলতা, যেন আমিই আজ এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। আমার অনুপস্থিতির জন্যই অনুষ্ঠান শুরু করা যাচ্ছে না।

— সৌভাগ্যের কী আছে! আমি লজ্জিত গলায় বললাম, আপনি নিমন্ত্রণ না করলেও আমি আসতাম। যে শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি কাজ শুরু করতে চলেছেন, তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারি যদি, সেটা হবে আমার জীবনের সবচেয়েবড় সৌভাগ্য। সবচেয়ে বেশী পাওয়া।

বেণুবিনোদবাবু তাঁর পাশের চেয়ারটিতে উপবিষ্ট একজনকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে আমায় বসতে বললেন। আমার লজ্জা করছিল। আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে যারা, তারা অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল। যেন এই মন্দিরটা বা তার সংগে যুক্ত অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির পিছনে আমার সক্রিয় ভূমিকা আছে। একে আমি স্কুল শিক্ষিকা, তার ওপর অবিবাহিতা। সুতরাং এই জাতীয় চ্যারিটেবল কাজকর্মের প্রতি আমার দুর্বলতা থাকাটাই স্বাভাবিক।

নির্দ্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পরে মূল অনুষ্ঠান শুরু হল। এর জন্য জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষদের কারোর মুখে সামান্যতম রাগ ক্ষোভ বা বিরক্তির ছাপ নেই। যারা এসেছে তারা যেন জেনেই এসেছে, এমনটিই হবে। অনুষ্ঠান শুরুর প্রথম পর্যায়টি যেমন

বর্ণময় তেমনি সুসংহত। উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি শেষ হওয়া মাত্রই মাইকে সুরেলা গম্ভীর গলায় রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি — চিত্ত যেথা ভয়শূন্য/উচ্চ যেথা শির।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যাপার। আর আশ্চর্য, উপস্থিত সমস্ত মানুষজন মুহূর্তে চুপ। যেন জরুরী কোন ঘোষণা হচ্ছে। মন দিয়ে সবাই তা শুনছে। পেশাদার কোন আবৃত্তি শিল্পীর গলা। ঘেরা প্রেক্ষাগৃহ নয়। খোলা আকাশের নীচে অনেক মানুষ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গোটা কবিতাটি শুনল। আবৃত্তির ক্যাসেটটি শেষ হওয়া মাত্রই ঘোষণা করা হল, অন্তজ শ্রেণীর একজন মহিলাকে মাতৃরূপে বরণ করা হবে।

আমার খুব অবাক লাগছে বেণুবিনোদবাবু নিপুণ দক্ষতায় একের পর এক এমন চমক তৈরী করেছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না, এর মধ্যে তাঁর বুদ্ধি রুচি ইত্যাদিরও ছাপ যেমন আছে, সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী একটি মহড়ার ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

তার মানে আমাদের এই শহরের মানুষজনের মধ্যে থেকেই উনি তেমন সব মানুষকেই বেছে নিয়েছেন, যারা কেবল যোগ্যই নয়, নিষ্ঠাবানও বটে। নিষিদ্ধ কোন রাজনৈতিক দল যে কায়দায় তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়, বেণুবিনোদবাবুও হুবহু সেই পদ্ধতিতে আজকের অনুষ্ঠানটিকে সর্বার্থে সার্থক করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন গোপনে। চারপাশে তাকিয়ে বহু চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি। এতদিন আমার ধারণা ছিল অয়নদের মতো গুটিকয় যুবক ছাড়া, এ শহরের বাকিরা ছাপোষা সংসারী মানুষের মতো দিনাতিপাত করে। সব বয়সের সব শ্রেণীর মানুষ এসেছে। যদি এটাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করি, তবে অবশ্যই ভাবের ঘরে চুরি করা হবে। কারণ তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে যারা এসেছে, তাদের অনেকেই 'ব্যাপারটা কী হচ্ছে', এমন মনোভাব নিয়ে এসেছে, তাহলেও মানতেই হবে তাদের মধ্যে দু পাঁচ শতাংশ মানুষ খোলা মনে, ভাল কিছু একটা হতে চলেছে এমন ভেবেই এসেছে। আর বাকিরা যদি নিছকই ভান করছে ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ভাল-র ভালটুকুও ভাল।

বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে আমার ধারণা ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। শেষ অব্দি পারুন না পারুন, শুরুতে যে কোন ফাঁক নেই, আন্তরিকতার অভাব নেই, এটা মানতেই হবে। রাজনৈতিক দলগুলি বা বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি রাতারাতি এতগুলি মানুষকে এক মঞ্চে জড়ো করতে পারবে না। এর জন্য আলাদা একটি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আছে। একজন ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় এত বড় একটি কর্মকাণ্ডের সূচনা করতে চলেছেন, শুধুমাত্র এই একটি কারণের জন্যই বেণুবিনোদবাবুকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

তাঁর সম্পর্কে আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, নিমেষে তা উবে গেল।

চব্বিশ

এখন এই মুহূর্ত থেকে বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার। শহরের এই ঘিঞ্জি পরিবেশে যদি সত্যি একটা প্রাইমারী স্কুল হয়, তার সঙ্গে একটি বিনা পয়সার দাতব্য চিকিৎসালয়, আমার বিশ্বাস, বেণুবিনোদবাবুকে এই অঞ্চলের মানুষ কোনদিন ভুলবে না।

নীচু সুরে সেতার বাজছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর। মঞ্চের জোরালো আলো নিভিয়ে হালকা সবুজ আলো জ্বালা হয়েছে। আলো আর সুরের এই অপরূপ মেল বন্ধনের মধ্যে ব্রীড়াবতী নারীর মতো ধীর পায়ে মঞ্চে হাজির হল যে মহিলাটি, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, অতো বড় নিন্দুকও ক্ষণিকের ভুলে অজান্তে 'বাঃ' বলে উঠবেই।

মহিলাটির পোশাক তেমন জাঁকজমকপূর্ণ নয়। দেহের কোথাও একটুকরো অলঙ্কার নেই। কিন্তু নিরাভরণ কোন মহিলা যে এতটা আকর্ষণীয়া হতে পারে, চোখে না দেখলে হয়ত আমিই বিশ্বাস করতাম না।

সেই স্মিত হাসিমুখ লাবণ্যময়ী নারী মঞ্চের মাঝখানে রাখা একটি চেয়ারে বসল। তার মধ্যে কোনরকম জড়তা নেই। সাবলীল স্বচ্ছন্দ। বেণুবিনোদবাবু একটি রেকাবীতে কিছু ঝুরো ফুল এবং অন্যান্য উপকরণ নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট নারীর সামনে বসলেন। ধূপ জ্বালিয়ে আরতি করলেন। চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন মহিলার কপালে। তারপর ঝুরো ফুল মহিলাটির মাথার ওপর ছড়িয়ে দিলেন বৃষ্টির মতো। এই নান্দীমুখ পর্বটুকু সারতে বড় জোর পাঁচ সাত মিনিট সময় লাগল। তারপরেই মঞ্চের জোরালো আলো জ্বলে উঠল। মাইকে সেতার বাদন থেমে গেল। বেণুবিনোদবাবু মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সাবলীল একটি বক্তব্য পেশ করলেন। যার মূল কথা, নারী কেবল শয্যা বা সাধনসঙ্গিনী নয়। নারী একটি জাতির একটি দেশের অগ্রগতির সূচক। পৃথিবীর যে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, সেখানে নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যই হল নারীকে একাধারে মা অন্যধারে শক্তিরূপিণী জ্ঞানে পূজা করা। নারীর জন্য যুদ্ধ হয়েছে যেমন আবার নারীর নেতৃত্বেও যুদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ ধ্বংস এবং সৃষ্টি, বিপরীতমুখী এই দুই প্রক্রিয়াতেই নারী সমান অপরিহার্য।

বেণুবিনোদবাবুর বক্তব্যের যে অংশটুকু আমাকে বেশী মুগ্ধ করল, তা হল, নারী বলতে তিনি উচ্চবিত্ত হালফ্যাসনের নারীর পরিবর্তে সমাজের পিছনের সারিতে রয়েছে যারা, অন্তজ অশিক্ষিত সেইসব নারীদের এগিয়ে আসার ব্যাপারেই বেশী গুরুত্ব দিলেন। এ ব্যাপারে সমাজের উচ্চবর্ণীয় এবং শিক্ষায় ও অর্থবলে সমর্থ মানুষদের যে একটি বিশাল দায়বদ্ধতা আছে, এ ব্যাপারে ছোট ছোট বাক্যে, সরল বোধগম্য উপমায় বিষয়টি

বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর বক্তব্যে। যেমন বললেন, লেখালিখি আলোচনা সেমিনার ইত্যাদি তো অনেক হল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও আমরা বিবাহিতা স্ত্রীকে আইনসিদ্ধ দাসীর ওপরে ভাবতে চাই না অনেক ক্ষেত্রে। তুলসিদাসের একটি দোঁহার চমৎকার ব্যবহার করলেন, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে —

কত প্রদীপ জ্বলে/নগরে নগরে
তুমি যেই তিমিরে/তুমি সেই তিমিরে।

এতদিন বেণুবিনোদবাবু সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল, ভদ্রলোক যে কোন ঘটনার ব্যাখ্যাকে যেন তেন প্রকারেণভাবে আধ্যাত্মিকরূপ দেবার চেষ্টা করে থাকেন। আজ মনে হচ্ছে আমার বিচারে ভুল ছিল। আধ্যাত্মিকতা তাঁর চরিত্রের একটা দিক মাত্র। আসলে তিনি মনেপ্রাণে একজন বিপ্লবী এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। আউটলুকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আধুনিক। সব মানুষের সম অধিকারের জন্য লড়াই যে কেবল পুরুষই করবে, তা নয়। তত্ত্বকথা যে কেবল পুরুষই শোনাবে এবং নারী তা শুনে যাবে মাত্র, তা নয়। প্রয়োজনে নারী নেতৃত্ব দেবে। আঁতুরঘর এবং রান্নাঘরের চৌহদ্দির বাইরেও যে তার একটি ভূমিকা রয়েছে, সময় এসেছে, এখন সেটা মেনে নিতে হবে।

— যে যাই বলুক, মানতে তোমাকে হবেই, বেণুবাবু কিছু করে দেখাবেন।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি শচীন ডাক্তার আমার ঠিক পিছনটিতে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলি বললেন।

— আপনি কখন এলেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— এই কিছুক্ষণ আগে। শচীন ডাক্তার জবাব দিলেন, চেম্বারে রুগী বসিয়ে রেখে ছুটে এলাম। এমন একটা ব্যাপার হচ্ছে। না এসে পারা যায়? শচীন ডাক্তার একটু থামলেন, কে আসেনি বল তো?

প্রশ্নটা একটু তির্যক। কারণ আমি যে এখানে আসতে পারি, এটা যেন ওনার ধারণার সঙ্গে মিলছে না।

— মেয়েটিকে চিনতে পারছ? শচীন ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে হাসি, কী পরিবর্তন ভাবলে অবাক হতে হয়!

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না। কে বলুন তো?

— সত্যি চিনতে পারছ না? যেন আমি চিনেও না চেনার ভান করছি।

— সত্যি না।

— সুরিয়া। শচীন ডাক্তার গলা নামিয়ে বললেন, আগে চোলাই মদের ব্যবসা করত। আরও সব আজে বাজে কাজ করত। শব্দ করে শ্বাস ফেললেন, বেণুবাবুর সংস্পর্শে

এসে মেয়েটা আমূল পাল্টে গেল। এককালে সবাই যাকে ঘেন্নার চোখে দেখেছে, আজ তারাই পুজো করছে।

সুরিয়া নামটা শুনে, প্রথমেই মনের মধ্যে একটা বিজাতীয় ভাবনা এল। আমাদের শহরে এমন একজনও মানুষ নেই যে সুরিয়ার নাম শোনেনি। সামাজিক সমস্ত রকম অপকর্মের সঙ্গে মেয়েটি জড়িত। আমিও এতদিন তার নাম শুনেছি। আজই প্রথম চাক্ষুষ দেখছি। যে কোন পুরুষ, সে যত বড় বিত্তবান, শিক্ষিত হোক না কেন, এমন নারীর সান্নিধ্য পেলে নিশ্চয়ই উপভোগ করবে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু সেই রুচিহীন বিকৃত চরিত্রের একজন নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা হবে, অন্যদের কথা বাদ দিলাম, আমি নিজে সেটা দাঁড়িয়ে দেখব এবং তারপরেও বলব বেণুবাবু বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষ! তিনি দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকি বানাতে পারেন, এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

— একজন বাজারী মেয়েমানুষ রাতারাতি তার স্বভাবচরিত্র বদলে ফেলতে পারে? আমি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম শচীন ডাক্তারের উদ্দেশে।

— ইস্-স্! শচীন ডাক্তার ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল দিয়ে আমাকে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন, চুম্বকের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে লোহার মধ্যেও চুম্বকত্ব এসে যায়। শচীন ডাক্তার ভারিক্কি গলায় বললেন, এটা ভুললে চলবে কেন?

— তার মানে বেণুবাবুর সংস্পর্শে মেয়েছেলেটার স্বভাব চরিত্র সব পাল্টে গেছে? আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম।

— ছিঃ! শচীন ডাক্তার মাথা নাড়লেন, ওইভাবে 'মেয়েছেলে' বলাটা কিন্তু ঠিক কাজ হল না। আফটার অল সে তোমার মতোই একজন নারী। ভাব না কেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণর কথা। বিনোদিনীর মাথায় হাত রাখলেন, তোর চৈতন্য হোক। মুহূর্তে নটী থেকে সে অন্য একটা জীবনে পৌঁছে গেল।

— আপনি না! আমি ইচ্ছে করেই শব্দ করে হাসলাম, কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন?

— কেন? আমার উপমাটায় কোন ভুল আছে? শচীন ডাক্তার জেরার ভঙ্গীতে বললেন, রামকৃষ্ণের সময়ে সকলে কি রামকৃষ্ণকে চিনতে পেরেছিল? বিনোদিনীর অভিনয় ছেড়ে দেওয়াটা কি সবাই বিশ্বাস করেছিল? একটু চুপ করে থেকে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিজের ব্যাপার। মাত্র একজন চালাক বুদ্ধিমান, বাকী সবাই বোকা ভোঁতা, এটা ভাবাও ঠিক নয়।

ঠোক্করটা যে শচীন ডাক্তার আমাকেই দিলেন, এটা বুঝতে পারলাম। তার সঙ্গে

এটাও বুঝলাম, আমি একা মেনে না নিলেও কিছুই যায় আসে না। কারণ আমি বাদে সকলেই বেণুবাবুর ঐশ্বরিকক্ষমতা এবং সুরিয়ার পরিবর্তনটুকু শুধুমাত্র যে মেনেই নিয়েছে, তা নয়, মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছে।

শেষের দিকে অয়নের সঙ্গে প্রায়ই একটা বিষয়ে আমার তর্ক হোত, তা হল মোড অফ প্রোটেস্ট। অয়ন বলত, যেটা তুমি মানতে পারছ না, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। যুক্তির দ্বারা তোমার বক্তব্যকে এসট্যাবলিস কর। আমি বলতাম, তর্ক করতে বা রুখে দাঁড়াতে, কোনটাই আমার রুচিতে মেলে না। আমি যাকে বা যে বিষয়টাকে মানতে পারব না, সেটাকে বা সেই বিষয়টাকে অগ্রাহ্য করব। এটাই আমার মোড অফ প্রোটেস্ট। অয়ন হেসে বলত, হয় তুমি মনে প্রাণে ভিতু। তা না হলে সুবিধাবাদী আপোসপন্থী।

— মোটেই না। আমি জোরের সঙ্গে বলতাম, অবজ্ঞা করা অগ্রাহ্য করাটাও একটা বড় আঘাত। হয়ত সেটা নীরব বলে সকলের নজরে আসে না। অয়ন কিছুতেই নিজের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে নড়তে চাইত না, পাল্টা আঘাত তোমায় করতেই হবে। নীরব প্রতিবাদ বলে কিছু হতে পারে না। সেটা হার স্বীকার করে নেওয়া বা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র।

যে উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছিলাম বা বেণুবাবু সম্পর্কে আমার যে ধারণাটা গড়ে উঠছিল, মুহূর্তে চুপসে গেল। এখন এই ভিড়ের মধ্যে যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। ভিড় ছেড়ে এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পরতে পারলে বাঁচি। নিঃশব্দে আমি অনুষ্ঠানের জায়গাটা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

মনের মধ্যে মাথার মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার পথটাও মনে করতে পারছি না। সর্বোপরি শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এই লোকের ভিড়, আলো শব্দ সব কিছুর বাইরে, নির্জন কোনো জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকি।

সন্ধ্যে পার হয়ে সবে রাত নামছে গুটি গুটি পায়ে। আকাশে চাঁদের আলোও রয়েছে বেশ। হঠাৎ করে মনে হল, অনেকদিন নদীর পাড়ে বসিনি। আগে আমি আর অয়ন প্রায়ই নদীর পাড়ে বসে গল্প করতাম। আজ আমার পাশে অয়ন নেই। তা না থাকুক। আমি একাই বসে থাকব নদীর পাড়ে। এখন একটু একা থাকা, নির্জনতা, আমার ভীষণ জরুরী। দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় ইত্যাদি মিলে মিশে মনের মধ্যে যে অসংখ্য নতুন প্রশ্ন জেগেছে, একা নির্জন কোন স্থানে বসে, নিজের সঙ্গে নিজে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললে, সে সবের উত্তর পাওয়া যাবে হয়ত।

অনুষ্ঠান স্থল থেকে বেরিয়ে আমি নদীর পাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

পঁচিশ

নদী তুমি কোথা থেকে আসছ? না, মহাদেবের জটা থেকে। কোথায় যাবে? না, মহাদেবের জটায়। অয়ন বলেছিল কথাটা ভাববাদের ভঙ্গীতে বলা হলেও, এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যাখ্যাটা অয়ন আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল।

শুনে মনে হয়েছিল অয়ন তো ঠিকই বলেছে। তবে কেন জগদীশ বসুর মতো একজন জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'মহাদেবের জটা' শব্দটা ব্যবহার করলেন?

অয়ন হেসে বলেছিল, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক কারণকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে মুড়ে দিতে না পারলে, মানুষ শুনবেই না। অন্তর্নিহিত কারণ খোঁজা তো দূরের কথা।

আজ কিন্তু জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন নদীর পাড়ে বসে মনে হচ্ছে পদ্ধতিগতভাবে অয়নরাও হয়ত ভুলই করছে। যে দেশের শতকরা আশিজন মানুষ আজও নিরক্ষর, চেতনার আলোর ছিটেফোঁটাও পড়েনি যাদের অন্তরে, তারা একটি সংগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' এই শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারে হাজারে ছুটে আসবে, এটা কখনোই হতে পারে না।

সংস্কার আবদ্ধ মানুষগুলি রাতারাতি সংস্কারমুক্ত মনের হয়ে যাবে, এটা একটা অকল্পনীয় ভাবনা। আমার মনে হয় অয়নরা যদি সংস্কার দিয়ে সংস্কার ভাঙ্গার কাজটা শুরু করত, তাহলে হয়ত খারাপতর থেকে খারাপ এবং তা থেকে একদিন খারাপ-ভাল, ঠিক বেঠিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত। জানি এটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সময় এবং ধৈর্য সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এর পরিবর্তিত পদ্ধতিটিই বা কি? জোর করে ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দিলে, হয় সেটা বমি হয়ে উঠে আসবে, তা না হলে বদহজমের কারণ হবে। মানুষই যেখানে প্রধান হাতিয়ার, সেখানে হাজার হাজার বছরের প্রচলিত রীতি ধ্যান ধারণা, থেকে তাকে এক হ্যাঁচকায় বিপ্লবের ময়দানে এনে ফেলা যাবে, এটা ম্যাজিকাল কোন স্বপ্ন হতে পারে, কিন্তু কখনোই রিয়ালিসটিক কোন পদ্ধতি হতে পারে না।

এখন নদীর জল কম। জলের স্বল্পতাহেতু নদীর মাঝে একটি চর জেগেছে। দু চারজন গরীব উদ্বাস্তু মানুষ ওই চরে ধান চাষ শুরু করেছে। শুনেছি ওই চরটুকুর দখল নিয়েও প্রায়ই তর্কবিতর্ক, তা থেকে হাতাহাতি লাঠালাঠি পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। ওই চরটায় নাকি সাপের উপদ্রব খুব। স্কুলের একজন সহকর্মী বলেছিল, জ্যোৎস্না রাতে সে এবং তার প্রেমিক নৌকো ভাড়া করে চরে যাবে ঠিক করেছিল। মাঝি বলেছিল, ওই চরে নাকি জ্যোৎস্না রাতে মা-সাপেরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে তার ছানাপোনাদের নিয়ে অলসভাবে গা

এলিয়ে শুয়ে থাকে। এ কথা শুনে আমার সহকর্মীর প্রেমিক ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। চরে যাওয়া হয়নি ওদের।

আজ কিন্তু আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে ওই চরে গিয়ে সাপেদের ঘর গেরস্থালি দেখে আসি। আমি জানি অয়ন যদি এখন এই মুহূর্তে আমার পাশে থাকত, ও এককথায় রাজি হয়ে যেত। যে কোন রকম অ্যাডভেনচারে ওর তীব্র আকর্ষণ।

অয়ন হয়ত এখন ওদের গোপন ডেরায় বসে নতুন কোন আক্রমণের পরিকল্পনা ছকছে ওর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। শেষ চিঠিতে ও লিখেছিল ওদের গোপন ডেরাগুলি জনবসতি থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে। এমন নিবিড় সে জঙ্গল যে সূর্যের আলোও পৌঁছায় না সেখানে।

কেমন দেখতে হয়েছে অয়নকে এখন, কে জানে! মনোমত খাবার তো দূরের কথা, পেটপুর দু বেলা খেতেও পায় না প্রতিদিন। বাজরার আটা দিয়ে তৈরী রুটি এবং বুনো পাকা পেয়ারার তরকারি হয় যেদিন, সেদিন নাকি ওদের নিজেদের মধ্যে খাবার নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যায়।

শহুরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে অয়নদের মতো বেশ কিছু ছেলে গভীর জঙ্গলে চরম কষ্ট আর দুর্ভোগের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, তার পিছনে কোন ব্যক্তিস্বার্থ নেই। এটা আমি জানি। আসমুদ্র হিমাচল এই দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে সমানাধিকারে জীবন কাটাতে পারে, সেই লক্ষ্যেই অয়নদের যুদ্ধঘোষণা। ওদের উদ্দেশ্যের প্রতি আমি শ্রদ্ধাবনত। পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন সময়ে যখনই অন্যায় অবিচার হয়েছে, সেখানে বিপুল সংখ্যকের মধ্যে অল্পসংখ্যক মানুষই সেই অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটাও আমি জানি। সব লড়াই সফল হয় না। লড়াই একটা ক্রমাগত পদ্ধতি। যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। প্রতিনিয়ত যার স্রোতে বেশী সংখ্যক মানুষ ভিড় করে। হয়ত অয়নদের ক্ষেত্রেও এমনটিই হবে।

কিন্তু আমার মতো অসহায় নিঃসঙ্গ যে মানুষগুলি পর্দার আড়ালে থেকে, নিজেদের স্বপ্ন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে, এই সমস্ত বীর সৈনিকদের লড়াইয়ের প্রতি নীরব সমর্থন জানাল, তাদের আত্মতুষ্টির জায়গা কোথায়? আজ যেমন এই নির্জন নদীর চরে, স্বপ্নালোকিত মায়াময় মুহূর্তে অয়নকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছে। কেবলই মনে হচ্ছে ঘাড় ঘোরালেই দেখব হাসি হাসি মুখে অয়ন আমার দিকে চেয়ে ইশারায় বলছে, চল আজ বাধা বাঁধনহারা হয়ে দুজনে ভেসে পড়ি।

অজান্তেই আমার দু চোখ জলে ভরে উঠেছে কখন খেয়াল করিনি। টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল। আর মুহূর্তেই তা শুষে নিল শুকনো বালি। বুক খালি করে লম্বা একটা শ্বাস, বেশ শব্দ করে বেরিয়ে এল আপনা আপনি।

হঠাৎই মনে হল দীর্ঘ একটা ছায়া আমার ঠিক পিছনেই। ছায়াটি আমাকে টপকে নদীর জল ছুঁয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সুঠাম মজবুত শরীরের সুবেশ একজন পুরুষ আমার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসছেন।

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, আপনি?

— হুঁ। বেণুবিনোদবাবু মৃদু স্বরে সাড়া দিলেন। তারপর ঝুপ করে আমার পাশটিতে বসে পড়ে গাঢ় স্বরে বললেন, তুমি এভাবে চলে এলে কেন? একটু থেমে, আমার যা কিছু পরিকল্পনা সবই তোমাকে ঘিরে। বলতে বলতে বেণুবাবু যেন আমি তার কত কাছের এমনি সহজতায় আমাকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিতে দু হাত বাড়িয়ে ধরলেন। আমি মুহূর্তে ছিটকে সরে গেলাম। ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপছে। কান্না ঠেলে উঠছে গলার কাছে। মিনতিভরা গলায় বললাম, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বেণুবাবু।

— জানি। বেণুবাবু হেসে ঘাড় দোলালেন, ভয়ের পাশে ভালবাসা থাকে না, এ তো সহজ কথা।

— তা বলে আপনি ...? শাড়ির আঁচল মুখে চাপা দিয়ে আমি হু হু করে কেঁদে ফেললাম।

আমার সেই অসতর্ক মুহূর্তে বেণুবাবু আমার হাতটা ধরে সজোরে টান দিলেন। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মাটিতে। আমার পোশাক অবিন্যস্ত। খোঁপাটি ভেঙ্গে পড়েছে। দু হাতে কাপড় জড়ো করে বুক দুটিকে আড়াল করার চেষ্টা করলাম। বেণুবিনোদ মিশ্র আমার পাশে বসে পড়ে নরম সুরে বললেন, এর মধ্যে কোন পাপ নেই নীরু। তুমি আমায় পছন্দ কর। আমিও তোমাকে ...!

— না। আমি বীভৎস চীৎকার করে উঠলাম, আমি আপনাকে ঘেন্না করি। আপনি শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত। লম্পট। দুশ্চরিত্র।

— আমি ধূর্ত? বলে বেণুবিনোদবাবু হাসলেন, যদি বলি লোকজনের ভিড় এড়িয়ে একা তুমি এমন নির্জনে এসে অপেক্ষা করছ, সে শুধু আমারই জন্য।

— মিথ্যে কথা। আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম, অসহায় একজন মেয়ের ওপর যারা জোর খাটাতে আসে, তারা নপুংসকেরও অধম।

— সে প্রমাণ এখনই পাবে।

ছাব্বিশ

কে যেন সজোরে চাবুক মারল আমার পিঠে। কে যেন বলে উঠল, আত্মসমর্পণ নয়। আত্মরক্ষার লড়াই শুরু। এখনই। এই মুহূর্তে যদি আমি বাধা দিতে না পারি, তাহলে হিংস্র নখ আর দাঁতের কামড়ে আমার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। আগামীকাল নদীর পারে আমাকে, স্খলিত পোশাকে ধ্বস্ত শরীরে পড়ে থাকতে দেখবে, শহরের মানুষজন।

দেহের যতটুকু শক্তি ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে আমি এক খাবলা মাটি ছুঁড়ে মারলাম বেণুবিনোদের মুখ লক্ষ্য করে। বেণুবিনোদ এমন অভাবিত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল না বলেই, প্রথমে 'অঁক' করে একটা আওয়াজ করল। তারপর চোখ অন্ধ মানুষের মতো এলোমেলো দুহাতে বাতাস খামচে ধরার চেষ্টা করল।

আমি সেই ক্ষণিকের সময়টুকুতে মাটি থেকে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করলাম। আর তার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলাম বাঁচাও। কে আছ, বাঁচাও।

আমার শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। হাওয়ায় অগোছাল চুল চোখ মুখ ঢেকে দিচ্ছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার পিছনে ভারি পায়ের শব্দ। শব্দটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। পিছন ফিরে তাকাবার কোন অবকাশ নেই। নিজেকে বাঁচাতে মরীয়া আমি লাজলজ্জা ভুলে অবিন্যস্ত শাড়িটাকে এক ঝটকায় টেনে খুলে ফেললাম। অনেকটা হালকা মনে হল নিজেকে। এখন আমার শরীরে আবরণ বলতে সায়া আর হাতাওলা একটি ব্লাউজ মাত্র।

রাত তো মোটেই গভীর নয়। কিন্তু চারপাশ জুড়ে যেন শ্মশানের নীরবতা। আমি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে একটানা চীৎকার করছি। প্রত্যুত্তরে কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না। আমি কি তবে ভুল পথে ছুটছি? নাকি লোকালয়ের পরিবর্তে আরও নির্জন নির্জনতর প্রান্তের দিকে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার নিয়তি? আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। চোখের সামনে সব কিছু কেমন ঘোলাটে আবছা দেখছি। নদীটা গেল কোথায়? আমার সামনে বিস্তীর্ণ চরাচর। ভূতের মতো চেহারা নিয়ে বিক্ষিপ্ত দাঁড়িয়ে ঝাঁকড়া কয়েকটি গাছ। আমি কি তবে আমার শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছি? দিকভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে আমি নিজেই আমার বধ্যভূমিতে হাজির হয়েছি? এখন বাতাস যেন আরও জোরে বইছে। আমার দু কানে কেবল বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ। কিছুতেই আর শরীরটাকে ধরে রাখতে পারছি না। শরীরের নীচের অংশে পায়ের অস্তিত্ব

টের পাচ্ছি না। শিয়রে শমন। আমি বুঝতে পারছি এই নির্জন প্রান্তরে বড় অসহায়ের মতো আমাকে মরতে হবে। এ বড় অসম যুদ্ধ। একজন কামুকের লালসার আগুনে আমার শরীরটা পুড়তে শুরু করবে। তারপর সেই লোভী হিংস্র পুরুষটি তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে মিটিয়ে, আমার দেহের জল রক্ত স্বেদ চেটেপুটে নিয়ে, উচ্ছিষ্টের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে আমাকে। তখন আমি জীবিত না মৃত, সে ঘুরেও দেখবে না। পৃথিবী এ রহস্যের কারণটি হয়ত খুঁজেও পাবে না কোনদিন। কেবল লোকমুখে ধর্ষিতা একজন নারীর গল্প ছড়িয়ে পড়বে শহরময়। শহর ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত।

আমি ঘাড় গুঁজে পড়ার আগে 'মা-মাগো' বলে খুব জোরে কেঁদে উঠলাম। তারপর আপনিই আমার হাত পাগুলি শিথিল হয়ে গেল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। বেণুবিনোদ আমায় ধরবে বলেই হয়ত হাতদুটি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

বেণুবিনোদ হয়ত ভাবল আমি অচৈতন্য হয়ে পড়েছি। আমার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত এবং আমি যে আর কোনমতেই উঠতে পারব না, ছুটতে পারব না, এমনি ধারণা করে নিয়ে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে লাগল। হাতের ফাঁক দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বেণুবিনোদের চোয়াল শক্ত। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। কিন্তু শিকার তার জালে বন্দী, যেন এমনি আনন্দে এবং গৌরবে সে এখন আমার থেকে চোখ সরিয়ে পরম নিশ্চিন্তে তার চারপাশটুকু দেখে নিচ্ছে। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলার ঘাম মুছছে। জামার হাতা গুটিয়ে তুলছে ওপর পানে। যেন আমাকে নিয়ে তার সাধের উৎসব শুরুর প্রাকমুহূর্তে সে নিজেকে একটু হালকা মেজাজী করে তুলছে।

— এত কিছু করার দরকার ছিল না। বেণুবিনোদের হাসিতে ছুরির ধার, এই গরমে ছোটাছুটি করে দুজনের প্রাণশক্তির একটু ক্ষয় হল বৈকি।

আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেই বেণুবিনোদ টের পেল আমার সংজ্ঞা হারায়নি। মুহূর্তে সে পরনের পাঞ্জাবীটি খুলে সেটি আমার মুখে গুঁজে দেবার চেষ্টা করল। আমি আমার দুর্বল হাতটি দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই বেণুবিনোদ গর্জে উঠল, একদম ছেলেমানুষি করবে না। কেউ নেই চারপাশে যে তোমায় বাঁচাতে পারবে।

— আছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অচেনা একটি পুরুষগলা যেন মাটি ফুঁড়ে আমার পিছন থেকে বলে উঠল। মুহূর্তে বেণুবিনোদ ছিটকে সরে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠল, নয়ন, চলে যা, না হলে তোর সর্বনাশ হবে।

আমি মাথা তুলে তাকাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মাথাটা যেন জগদ্দল পাথরের মতো ভারি।

— নীরুদি? নয়ন আমার মাথায় আস্তো করে হাত রাখল, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি নয়নচাঁদ।

নয়নচাঁদ এই নামটুকু কানে যাওয়া মাত্রই মনে হল যেন আমার পুনর্জন্ম হচ্ছে। প্রতিদিন রাতে যেমন নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুই, ঠিক তেমনিভাবে আমি ভারি মাথাটা মাটিতে রেখে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। তারপর ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে আমি যুযুদ্ধমান দুজন পুরুষের আস্ফালন এবং তার সঙ্গে নাম না জানা একটি পাখির একটানা টুই টুই ডাক শুনলাম। মনে হল যেন নদীটি খুব দূরে নয়। জলের শব্দ কানে বাজছে। তার সঙ্গে ঢাক আর কাঁসরের আওয়াজ।

সাতাশ

জানি না কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম আমি। সংজ্ঞা ফিরল যখন তখন আমি নয়নচাঁদের রিক্সায় জড়োসড়ো হয়ে বসে। আমার পরণে শাড়ি এল কোত্থেকে? আমার বেশ মনে আছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি যখন ছুটছিলাম, তখন নিজেই শাড়ি খুলে ফেলেছিলাম, যাতে আরও জোরে দৌড়তে পারি।

এখন শহর জুড়ে লোডশেডিং। তবু বিভিন্ন দোকান এবং কয়েকটি বাড়ির জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। জেনারেটরের আলো। নয়নচাঁদ হয়ত আমার বিধ্বস্ত শরীরটাকে আড়াল করার জন্যই রিক্সার সামনে পলিথিনের পর্দাটা ফেলে দিয়েছে। জল বৃষ্টি হলে প্যাসেনজারের সুবিধার্থে যেমনটি করা হয়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখার সাহসটুকু পর্যন্ত আমার নেই। ফলে রিক্সাটি কোন পথে চলেছে আমি বুঝতে পারছি না। সামান্যক্ষণ পরেই রিক্সাটি আমাদের গলির মুখে এসে পৌছল।

নয়নচাঁদ খুব নীচু গলায় বলল, এখানে নামতে হবে না, নীরুদি। আমি আপনাকে বাড়ির গেটে পৌছে দিচ্ছি।

আমি 'হ্যাঁ', 'না' কোন জবাব দিলাম না। আসলে আমার শরীরের চেয়েও মনের কষ্টটা এত প্রবল যে মনে হল, সাড়া দিতে গেলেই আমি কেঁদে ফেলব। এই অবস্থায় বাড়ি ঢুকব কেমন করে, ভাবতেই শিউরে উঠলাম। জানি, মা এখন নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে চুপ করে। কিন্তু যদি সিদ্ধার্থ ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসে থাকে? বা অনু তার বন্ধুর দল নিয়ে বৈঠকখানায় কিম্বা বারান্দায় বসে গল্প করে? আমার এমন বিপর্যস্ত শারীরিক অবস্থা, বেমানান পোশাক দেখে ওরা নিশ্চয়ই চমকে উঠবে। অজস্র প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে আমার উদ্দেশে। আমি কিভাবে সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মোকাবিলা

করব? সর্বোপরি আমার শরীরের যা অবস্থা, শেকড় ওপড়ানো গাছের মতো টলছে, বেশীক্ষণ চোখ দুটি অব্দি খুলে রাখতে পারছি না।

বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমি নয়নচাঁদকে বললাম, দেখে এসো তো বাড়ির ভেতরে কেউ আছে কিনা?

নয়নচাঁদ বাঁশের দরজাটি একপাশে ঠেলে সরিয়ে দু চার পা ভেতরপানে এগিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল। ফিসফিস করে বলল, কেউ নেই নীরুদি। আপনি হেঁটে যেতে পারবেন তো?

আমি ঘাড় নাড়লাম, হ্যাঁ।

চাঁদের আলো ছটফট করছে। পোষা কুকুরটি মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই বেশ জোরে ডেকে উঠল। তারপর আমাকে দেখেই একান্ত বাধ্যের মত মাথা নামিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে আমার সামনে সামনে চলতে লাগল। পায়ে চটী নেই। নরম ঘাসের ওপর পা ফেলা মাত্রই শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল মাথাটা যেন সামান্য টলে গেল। ঝাঁকড়া আমগাছটির একটি ডাল ধরে দাঁড়িয়ে পড়তেই নয়নচাঁদ উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, শরীর খারাপ করছে নীরুদি? আমি আস্তে করে ঘাড় নাড়লাম, না।

আঠাশ

সামান্যক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকটা সহজ বোধ করলাম। পরণের শাড়িটা দেখিয়ে নয়নচাঁদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ শাড়িটা কার নয়ন?

— আমার বউয়ের। বলে নয়নচাঁদ এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, বাবুকে উঠে যেতে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল নীরুদি। সেই ঠেঙ্গে খুঁজে যাচ্ছিলাম। একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েমানুষের গলার ডাক কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেটা যে আপনি, তা ঠাওর করতে পারিনি। নয়নচাঁদ এমন লাজুক ভঙ্গীতে মাথাটা নামিয়ে নিল যেন সময়মতো আর একটু আগে পৌঁছতে না পারার জন্য, নিজেকে অপরাধী ভাবছে সে।

— নয়ন? আমি বললাম, তুমি না থাকলে কী হতো বলো তো?

নয়নচাঁদ এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

বেণুবাবু, বলতে গিয়েও থমকে গেলাম। মনে হল ওই লোকটার নাম উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

— তোমরা ওই জানোয়ারটাকে চিনতে পারোনি, নয়ন?

— না। নয়ন ঘাড় নাড়ল। আজ পারলাম। আজ থেকে আমার একটাই কাজ নীরুদি, লোকটাকে খুঁজে বার করে একেবারে জানে খতম করে দেওয়া।

আমি চমকে উঠে বললাম, না, না। ওসব করতে যেও না। তাতে তোমার বিপদ হবে। জেল পুলিশ হবে।

— হোক। নয়নচাঁদ জেদীর গলায় বলল, আমি একলাই এ কাজ করব। একটু থেমে বলল, কাউকে বলতে গেলে সে তো বিশ্বাস করবে না। ভাববে — বলে মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে আমার মুখের পানে চাইল, ভাববে আপনিই খারাপ। সেটা তো মানা যাবে না। নয়নচাঁদের ঘাড় দোলানোর ভঙ্গীমায় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ, চিনে যখন একবার ফেলেছি নীরুদি, ওকে শেষ না করা অব্দি আমার নাওয়া খাওয়া নেই।

নয়নচাঁদের মুখটা ঘামে ভরে গেছে। দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত চাপার জন্য চোয়ালটা অপেক্ষাকৃত চওড়া দেখাচ্ছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, যেভাবে বোঝাই না কেন, যেমন করে ভয় দেখাই না কেন, নয়নচাঁদকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারব না।

আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম, তুমি একটু দাঁড়াবে নয়ন? শাড়িটা নিয়ে যাবে?

এবার নয়নচাঁদ হো হো করে হেসে উঠল, ওটা আমার বউয়ের শাড়ি। সস্তার, ফ্যারফেরে। একটু থেমে বলল, শাড়িটা দিয়ে আপনার লজ্জা ঢাকতে পেরেছি, এই না কত জন্মের সৌভাগ্যি!

নয়নচাঁদ পিছন ফিরে চলতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় ওর ছায়া পড়েছে বাগানের মাটিতে, ঘাসে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, নয়নচাঁদের ছায়াটা মানুষ নয়নচাঁদের চেয়ে আকারে অনেক বড়। আর সেটা চলছেও তার আগে আগে।

হঠাৎ নজরে পড়ল বাতাবী লেবু গাছের গোড়ায় মুখ বন্ধ সাদা একটি খাম অলসভাবে শুয়ে রয়েছে ঘাসের ওপর। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সামান্য ঝুঁকে খামটা মাটি থেকে তুললাম। খামের ওপরে ইংরাজী ক্যাপিটাল অক্ষরে আমার নাম ঠিকানা লেখা। আবার আমার শরীর জুড়ে শুরু হল অস্থিরতা। আমি জানি এ চিঠিটা কার। কারণ খামের গায়ে বিশেষ একটি চিহ্ন আঁকা আছে। পোস্টম্যান ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে বাগানে ঘাসের ওপর আস্তো শুইয়ে রেখে গেছে খামটি। মুহূর্তে নিজেকে অনেক স্বাভাবিক এবং সচল মনে হল। আমি অপেক্ষাকৃত বড় বড় পা ফেলে বাগান পেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। বড় আলোটা জ্বাললাম। বেশ বুঝতে পারছি উত্তেজনায় আমি হাঁফাচ্ছি। হাত দিয়ে

কপালের ঘাম মুছলাম। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে খুব সাবধানে খামের বন্ধ মুখটা খুললাম।

উনত্রিশ

এই প্রথম অয়নের চিঠিতে এমন মোহিনী সম্বোধন আমাকে, নীরু, সুচরিতাসু তোমাকে। বড় বড় অক্ষরে ফাঁক ফাঁক করে লেখা চিঠি। অয়নের অন্য চিঠিগুলির চেয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লেখা। এর আগে অয়ন আমায় যে কটি চিঠি লিখেছে, তার সবকটির বিষয় এবং শৈলী প্রায় একরকম। অয়নের লক্ষ্য আদর্শ কর্মপদ্ধতি এবং জয়ের তীব্র বিশ্বাসে ভরা সেই চিঠিগুলি। এক ঝলক পড়লে মনে হবে কোন পার্টির কর্মসূচীর খসড়া।

কিন্তু আজকের চিঠিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখা। সম্বোধন থেকে বক্তব্য বিষয় এমনকি পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আদ্যন্ত নতুন। একবার পড়ার পরেও আমার নিজেরই কেমন অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য মনে হওয়ার কারণে, চিঠিটি গভীর মনোযোগে আমি দ্বিতীয়বার পড়লাম। অয়ন লিখেছে, তোমাকে দেখতে বড় সাধ হয়। পিছন ফিরে তাকালে প্রায়শই মনে হয়, তোমার প্রতি অবিচার করেছি। একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর এমন মানসিক দুর্বলতা মানায় না। যদি সেদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে আসতে পারতাম, তুমি আমায় ভুলে যাও নীরু, কারণ বিপ্লবীর কোন অতীত থাকতে পারে না, সে কেবল বর্তমানকে চেনে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ছকে, তবে বুঝি এই মানসিক দহনে দগ্ধ হতে হোত না। এখন বেশ বুঝতে পারি আমার মনের গভীরে কোন এক কোণায় তোমার প্রতি ভালবাসা, তোমার গর্ভে আমার একটি সন্তানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কলহ প্রেম মান অভিমান ভুল বোঝা এবং তা ভাঙ্গা, এইসব কিছু নিয়ে যে জীবন, সেই জীবনের প্রতি আকর্ষণের কারণে, অনেক সহযোদ্ধা যারা রণে ভঙ্গ দিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করছে, তাদের মুখগুলি মনে পড়ে। তাদের প্রতি ঈর্ষা জাগে মনে। তখন নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করি।

জীবনের মূল স্রোত না স্রোতের বিরুদ্ধে আমার চলা, এ বড় ভীষণ দ্বন্দ্ব, আমি গোপনে আলোচনা করে দেখেছি আমাদের সহযোদ্ধাদের মধ্যেও অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, আমরা ঠিক পথে আছি তো? তুমি বলে দাও নীরু, কোনটা সঠিক পথ হবে আত্মসমর্পণ না আত্মোৎসর্গ?

জীবনের মূল স্রোতে ফিরেও দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের জন্য অনেক কিছু করা যায়।

আমার বিশ্বাস তোমাকে পাশে পেলে আমি নতুন উদ্যমে সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নতুন পদ্ধতিতে কাজ করতে পারব।

চিঠির শেষ প্যারাটি অয়ন লিখেছে এইভাবে, সুকান্তনগরে জহর বসুর হাতে তুমি এ চিঠির জবাব পৌছে দেবে। সে আমার কাছে পৌছে দেবে। তবে যত তাড়াতাড়ি পার, তোমার মতামত জানাও। কারণ আগামী মাসেই আমাদের নতুন একটি আক্রমণের পরিকল্পনা ছকা হয়েছে। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে কিম্বা বলতে পার, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে, সে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। তার আগেই তোমার মতামতটুকু জানতে পারলে, আমি সেই মতো সিদ্ধান্ত নোব।

চিঠিটি খামে ভরে আমি বালিশের নীচে রেখে দিলাম। তারপর প্রতিদিনের মতোই স্নান করলাম। মাকে খেতে দিলাম। নিজের খাবার ঢাকা দিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে দিলাম। সিদ্ধার্থ অনু দুজনেই বাড়ি ফিরে এল। ঘরে বসেই আমি ওদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছি। সিদ্ধার্থর সঙ্গে অনুর তর্ক শুরু হয়েছে 'মাতৃমন্দিরম্'-র অনুষ্ঠানকে ঘিরে। স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধার্থ অনুষ্ঠানের পক্ষে এবং অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনু সিদ্ধার্থর বক্তব্যের বিরুদ্ধে।

আমি ভাবছি, খাওয়া শেষ করে ওরা কখন উঠবে এবং যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দেবে।

আমার মনের মধ্যে তুমুল ঝড়। সন্ধ্যের ঘটনাটি যেন আপনিই ফিকে হয়ে গিয়ে তার পাশাপাশি অয়নের চিঠির জবাব লেখাটা, অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে।

যে অয়নের হাত ধরে ধারাবাহিক প্রাত্যহিক চিন্তাভাবনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়েছিলাম, সেই অয়ন আজ আমার হাত ধরে তার পুরনো জীবনে ফিরতে চাইছে। আমি যদি অয়নের চিঠির নেগেটিভ জবাব দিই, স্পষ্ট করে লিখে দিই, আত্মসমর্পণ নয়, আত্মোৎসর্গই তোমাকে মানায় বেশী, অয়ন কি আমার নির্দেশ মানবে? আমিও কি পারব, অয়ন নেই, এ পৃথিবীর কোন গোপনতম প্রান্তেও তার শারীরিক অস্তিত্ব নেই, এই নির্মম সত্যটুকু মেনে নিতে? আমি কি পারব অয়নের আত্মোৎসর্গের গর্বটুকুকে সম্বল করে আমৃত্যু পথ চলতে?

এখন রাত গভীর। চারপাশ নিঃঝুম। আমি খুব সাবধানে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মধ্য আকাশ পেরিয়ে চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তার আলোর তীব্রতাও যেন একটু কমে গেছে। চাঁদেরও তো বয়স হল। তবু কত হাজার বছর ধরে এবং আগামী আরও কত হাজার বছর পর্যন্ত একইভাবে বুড়ি থুত্থুরি চাঁদ তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে

হেঁটে যাবে পূব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিম ছুঁয়ে আবার পূবে। আজকের রাতের মতো আরও কত সহস্র জ্যোৎস্নালোকিত রাত আসবে। জনপদ জঙ্গল জলাভূমি বিস্তীর্ণ চরাচর জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কবির কলমে, চিত্রশিল্পীর তুলিতে, সুরের মূর্চ্ছনায়, প্রেমিক প্রেমিকার গাঢ় আবেগে, বুড়ি চাঁদ মহিমান্বিত হবে।

কেবল পৃথিবীর অতি নগণ্য তুচ্ছ একটি মানুষও জানবে না, নীরু বলে একটি মেয়ে এমনই এক জ্যোৎস্নাময় রাতে, কি ভীষণ মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না কিছুতেই।

কী লিখবে নীরু, অয়নকে?